উত্তরপূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প

স ম্পা দ ক
অনুপ ভট্টাচার্য
শুভব্রত দেব

অক্ষর
আগরতলা ত্রিপুরা

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০
প্রচ্ছদ : ইমানুল হক

অক্ষর প্রকাশনার পক্ষে কৃষ্ণনগর আগরতলা-১ থেকে চিত্তরঞ্জন দেব কর্তৃক প্রকাশিত এবং ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স কৃষ্ণনগর আগরতলা-১ থেকে মুদ্রিত

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের
উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আমরা সবিশেষ লক্ষ্য করেছি—এক বিচিত্র পরিমণ্ডলে অবস্থান করে উত্তবপূর্বের বাংলা গল্পকাররা যে গল্প লিখেছেন বা লিখছেন তা বাংলা গল্পের মূল ধারার থেকে ভিন্ন নয়। যদিও গল্পেব শৈলী ও বিষয়ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে এমন একটি বিভঙ্গ যা একান্তই স্থানিক ও ব্যক্তিমানসিক। ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও বাজনৈতিক কাবণে উত্তরপূর্বের বাঙালি মূল ধারা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের জীবনে মননে এনেছে এক ভিন্ন মাত্রা। ভিন্ন মাত্রাই গল্পকে দিয়েছে আলাদা চরিত্র। স্বতন্ত্র গডন। স্বতন্ত্র বিষয় ও বৈচিত্র। মূলত এই বাঁক থেকেই আমরা বিশ্বাস কবতে শুরু কবি—এই স্বাতন্ত্রই বাংলাগল্পের বহমান ধাবায় নতুনতর সম্ভাবনাব তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

উত্তবপূর্বের আলাদা স্বাদেব গল্পগুলি আজও বৃহত্তর পাঠক সমুদায় থেকে ছিটকে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিযে। অনাবিস্কৃত হয়ে পড়ে থাকাব কারণ, এ অঞ্চলে কোন বড প্রকাশনা সংস্থা নেই! দাযিত্ব নিয়ে গল্পগুলোকে সংকলিত করা এবং পাঠকদেব কাছে পৌঁছে দেবাব মত কাউকেই আমবা পাইনি এতদিন।

অক্ষব প্রকাশন সহৃদয়তার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসার ফলে একটা বিবাট সম্ভাবনা এবাব ইতিহাস হলো। এই কাজ করতে গিয়ে আমবা অনেকেরই সহাযতা পেয়েছি। তাদেব মধ্যে ত্রিপুরার দুলাল ঘোষ দীপক দেব শুভাশিস তলাপাত্র, বরাক উপত্যকার বিজিত ভট্টাচার্য ও দিলীপকান্তি লস্করের নাম আমবা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

যথেষ্ট সতর্কতাব সঙ্গে সংকলনটির কাজ শেষ কবেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে হয়ত। সহৃদয় পাঠক সহানুভূতির সঙ্গে ধবিয়ে দিলে পরবর্তী সংকলনে সেসব আমাদেব অমূল্য অভিজ্ঞতা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস কবি।

বিনীত
অনূপ ভট্টাচার্য
শুভব্রত দেব

সূচীপত্র

অসম

মেঘালয়

□

ত্রিপুরা

□

উত্তরপূর্বের
নির্বাচিত বাংলা গল্প

দেবীপ্রসাদ সিংহ

১.

বাসে দাঁড়ানোর জায়গা পায় নি অনন্ত। মেজাজ তেতেই ছিল। তার ওপর যদি জুলাই মাস-এর ঠা ঠা করা বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়া রোদে উর্বশীর সামনে শো শুরু হয়ে যাবার পরও টিকিট হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঝাড়া পনেরো মিনিট, মেজাজকে দোষ দেয়া যায় না। বিশাখা দূব থেকেই আবহাওয়ার জানকারী আঁচ করতে পেরেছিল, চালু জিনিষ তো, প্রতিরক্ষার জন্যে পাল্টা চাল হিসেবে স্যাকারিন মাখানো এক ফালি হাসি উর্বশীর গলির মুখ থেকেই ছুঁড়ে রেখেছিল। এখন কাছে এসে ব্যস্ত গলায় বলল— ইশ দেরি হয়ে গেছে, না। চলো চলো ঢুকে পড়ি, না হলে প্রথম গানটা মিস করে যাবো! অনন্ত এতো রেগে গিয়েছিল যে উত্তরে তাব মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। বিশাখা বীরদর্পে অনন্তের হাত ধরে ব্যালকনির সীট খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল।

ভেতরে পাখার বাতাসে আর ব্যালকনির সীটের পা ছড়িয়ে দেয়া আরামে অনন্তের মেজাজ আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এল। বিশাখা কায়দা করে তাব ডান হাতটা অনন্তের কোলের পর ফেলে রেখেছিল, সেটাও কিছুটা সাহায্য করল বলা যায়। পর্দায় রাজেন্দ্রকুমাব যখন সাধনার থুৎনিতে আঙুল ছুঁইয়ে গাইছে অ্যায় ফুলোঁ কি রানী বাহারোঁ কি মালিকা, অনন্ত তখন বিশাখার সমর্পিত হাতে আলতো আঙুল বোলাতে আবম্ভ করল। আঃ কি সিল্ক মসৃণ। আঃ কি মাখন নবম! অনন্তের আঙুল বেহালায ছড টানাব মতো উঠে নেমে আসছিল বিশাখার ব্লাউজের হাতার প্রান্ত থেকে নিরাববণ নিরাভবণ (একগোছা কাচের চুড়ি কি আভরণ হিসেবে গ্রাহ্য?) হাতের এমাথা থেকে ওমাথা। সিনেমায় রাজেন্দ্রকুমাব প্রেমেব জন্যে আত্মত্যাগের খাতিরে সাধনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূরে, অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল অনন্ত টেব পাচ্ছিল অন্ধকারে বিশাখার চোখ ভিজে এসেছে। বড়ো নরম মন বিশাখার, তুলতুলে, যেমন পাকা টম্যাটো। বিশাখার হাতের তালুতে অনন্তের আঙুলগুলো ডুবে যাচ্ছিল। বেহালায় বাজছিল মালকোষ। আলাপ যখন ঝালায় এসে পৌঁছেছে, বিশাখাব হাতের অপর দিকের সোনালী রোমরাজি কেঁপে উঠল, শক্ত হয়ে এল। সাধনার সুন্দর মুখে সেসময় ঘনিয়ে এসেছে দুঃখ। বেদরদি বালমা তুঝকো মেরা মন ইয়াদ করতা হ্যায়। অনন্ত বিশাখার হাতের তালু তুলে নিল নিজের মুঠোয, ঠোঁটের সামনে নিয়ে এল, চুমু দিল আশ্লেষে। কি দারুণ ঘুমপাড়ানি গন্ধ উঠে আসছে বিশাখার হাতের তালু থেকে! ঝিমঝিম করে উঠল অনন্তের মাথা। পেছন থেকে আওয়াজ উঠল। বিশাখা চট করে হাতটা সরিয়ে নিল। আবার কেউ খিক করে হেসে উঠল পেছন থেকে। বিশাখা নিচু গলায় বলল—চলো, চলে যাই। অন্ধকারে ঢেউ-এর মতো পা-এর পর পা ডিঙিয়ে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছনের সীট থেকে কেউ সিটি

মারল। অনন্ত ঘুরে দাঁড়ায় নি, কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়াতেই চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল আ রে বোকারা, উই ওয়্যার মিয়ারলি সেলিব্রেটিং দ্য বডি। আজ থেকে পঁচিশ বছর পর তোরাও বুঝতে পারবি দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং ওয়ার্থ সেলিব্রেটিং।

পঁচিশ বছর অনেক বড়ো সময়। পঁচিশ বছরে পৃথিবী বদলে যেতে পারে।

২.

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তার ছ তলা অফিসের কাচের জানালা দিয়ে সে রোজই দেখতে পায় ব্রহ্মপুত্রের ওপারে সূর্য নদী ও আকাশ রঙে থৈ থৈ করে অস্ত যাচ্ছে। প্রথম দিকে সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ, ফাইল পড়ে থাকত টেবিলে। আজকাল সে আর তাকায় না, নেহাৎ চোখ পড়ে গেলে দু এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, এই যা। সুন্দর জিনিষ প্রতিদিনের হয়ে গেলে তা আর সুন্দর থাকে না। আর তা ছাড়া দেখার চোখও তো পাল্টে যায় মানুষের। অনন্ত কি সেই অনন্তই আছে না কি এখনো? তাকাও, তাকিয়ে দ্যাখো তার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কপালে বলিরেখা, চোখের পাওয়ার সে গত তিন বছরে দুবার পাল্টেছে। আর অর্শের ব্যথাটা যখন চাগাড় দেয় তখন তার কাছে জগৎ সংসার তেতো হয়ে যায়। এছাড়া অ্যাসিডিটির প্রবলেম তো আছেই। অনন্ত দত্ত এক সময়ে ত্রিভুবন চষে বেরিয়েছে। আজ সে বাইরের জলটুকু পর্যন্ত খায় না।

সামনের টেবিলের হাজারিকা ফাইল গোছাচ্ছিল। ডেকে বলল— কি অনন্তদা, ইউনিয়ন অফিসে তো যাবেন না আজ? অনন্ত অন্যমনস্ক মাথা নাড়ল। ইউনিয়ন অফিসে তো যেতেই হবে। যেমন সে প্রতিদিন সকালে উঠে দাঁত মাজে, পায়খানায় যায় তেমনি রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে সে ইউনিয়ন অফিসে বসবেই। এটা অভ্যেসের ব্যাপার, অন্যরকম হলেই তার অস্বস্তি হবে। আর রবিবারেও কি রেহাই আছে? বাইরের ব্রাঞ্চ অফিসগুলো থেকে নানান আবেদন, মিনতি, অনুরোধ নিয়ে সকাল থেকে অনেকেই তার বাড়ির ড্রইংরুমে বসে থাকে। তার স্ত্রী গজগজ করে। ছেলেপুলের পড়াশোনা আছে, রান্নাবান্না হরেকরকম কতো কি ঝামেলা আছে, তার ওপর দফায় দফায় চা করো। অনন্তর অবশ্য খারাপ লাগে না। টিভি সে বড়ো একটা দেখে না, রাত নটার সিরিয়াল ছাড়া, আর বইটই পড়াও সে বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে। লেখা? সেটা একটা রহস্য কেন না বাঁধানো একটা জাবদা খাতায় সে মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে কি সব লেখে। কী লেখে অনন্ত? গল্প লেখে আগে যেমন লিখত? নাকি দাঁত মাজার মতো, পায়খানায় যাওয়ার মতো ইউনিয়ন করার মতো এও একটা অভ্যেস?

ইউনিয়ন অফিসে ঢুকতেই সে দেখতে পেল তার টেবিলের সামনের চেয়ারে তিন চারজন ইতিমধ্যে এসে বসে আছে। সে চেয়ারে বসতে বসতে সামনে উপবিষ্ট একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল— কি রে ব্যানার্জি, চৌধুরীসাহেব নাকি আবার ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছে? ব্যানার্জি বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে বলল— সেজন্যই তো তোমার কাছে এলাম অনন্তদা। চৌধুরী হারামজাদাকে একটু টাইট না দিলে চলছে না। অনন্ত আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাতটা একটু তুলে বলল— হবে হবে। চিন্তা করিস না। এমন টাইট দেবো বাছাধন বাপের নাম ভুলে যাবে। ব্যানার্জি বিগলিত

ভাবে হাসল— তুমিই তো আমাদের ভরসা অনন্তদা।

এসবই অনন্তর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। সে কাউকেই ফেরায় না, সবার কাজই করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজ আর কি কারো ট্রান্সফার, কারো পোস্টিং, কারো উপরঅলার সাথে মনান্তর সেটা মিটিয়ে দেয়া এইসব। সবার কাজ অবশ্যই সে করে দেয় না, সেটা সম্ভবও নয়। ইউনিয়নের কাজ পার্সেন্টেজ গেমের মতো —কতো দিলে ফিরে কতো পাবার আশা আছে সেটা আগেভাগে মেপে নেয়া অত্যন্ত দরকার। ফিরে পাওয়া মানে টাকাকড়ির ব্যাপার নয়, অনন্ত অন্তত এদিকে সৎ। দু বছর পরপর ভোটাভুটির ব্যাপার আছে, রাইভ্যাল গ্রুপের শক্তির কথা হিসেবে রাখার ব্যাপার আছে। অনন্তকে তাই সুবিধে পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাওয়ার সেন্টারগুলিকে খুশি রাখার দিকটা বিবেচনায় রাখতে হয়। এটার মধ্যে নিজস্ব স্বার্থ জড়িত নেই, সে অন্তত ব্যাপারটা সেভাবে দেখে না। এটার সঙ্গে, যাকে বলে বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত, সে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে ইউনিয়ন করছে তার সারভাইভ্যালের প্রশ্ন এখানে জড়িত।

ব্যানার্জি ও অন্য যারা বসেছিল ওদের সাথে কথাবার্তা আধঘন্টার ভেতরে সেরে ফেলল অনন্ত। এর ভেতরে চা এসেছে। হেডকোয়ার্টারে পোস্টিং করানো হয়েছিল একজনের, সে সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে গেল। কিছু চিঠিপত্র লেখার ব্যাপার ছিল, দুটো সার্কুলার ইস্যু করার ছিল—এসবেও কিছুটা সময় গেল। তারপর তার দুই সহকারি কাকতি আর রায় তার সামনে এসে বসল। ডিসেম্বরে ভোট আসছে, এখনই আটঘাট বেঁধে ফেলা দরকার। কাকতি বলল অনন্তদা শুনেছেন তো ডিব্রুগড় রিজিয়নে ওরা কী স্ট্যাটেজি নিচ্ছে? অনন্ত ঘাড় নাড়ল। রায় বলল অচিন্ত্য সরকার মহা ধড়িবাজ লোক। সে ডিব্রুগড়ে ট্রান্সফার নিয়েছে কেবল ডিব্রুগড় রিজিযনটা কব্জা করার জন্য। যতীন গোস্বামী তো আগে থেকেই ট্রাবল ক্রিয়েট কবে আসছে ওখানে। নন্দীর কেসটা নিয়ে ওরা যা কবল। এখন থেকে স্টেপ না নিলে ডিব্রুগড় নিয়ে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে। অনন্ত সিগারেটে দুটো জোর টান মারল, তারপর বলল— তুই শর্মাকে কাল ফোন কবে বলে দে ওদেব ওপর ওযাচ রাখতে। আর ব্যানার্জির সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের কেসটা নিয়ে লেটস ক্রিযেট সাম রিয়েল হার্ড নয়েজ। দরকার হলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পেন ডাউন স্ট্রাইকে যেতে হবে। শর্মাকে বলে দে ওরা দু পা গেলে আমরা চাব পা যাবো।

সাড়ে আটটা নাগাদ অনন্ত ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরোল। ভূপেন দাস রোজই স্কুটারে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, আজও তাব কাজকর্ম শেষ হবার পরেও অনন্তর জন্যই বসে ছিল। ভূপেন বয়সে ছোকরা, ইউনিয়নের খুব উৎসাহী কর্মী। চিঠিপত্র টাইপ করা, খাতায় হিসেব তোলা— এসব ও-ই করে।

ভূপেন স্কুটার বেশ জোরে চালায়। দশ মিনিটের ভেতর অনন্ত তার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। ভূপেনকে শুভরাত্রি জানিয়ে অনন্ত বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, ভূপেন পেছন থেকে ডাকল—অনন্তদা! অনন্ত ফিরল, ভূপেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ভূপেন একটু ইতস্তত করছিল, তারপর বলেই ফেলল—একটা জিনিষ আমি ক'দিন ধরে খুব ভাবছি, জানেন অনন্তদা। আমাদের ইউনিয়ন তো একটা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড, যাদের একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ

আছে। এই যে আমরা ট্রান্সফার পোস্টিং ডি এ বাড়ানো নিয়ে কেবল ব্যস্ত থাকছি, শ্রমিকদের পোলিটিক্যালি এডুকেট করার যে মূল উদ্দেশ্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পেছনে রয়েছে, সেটাই কি আমরা ভুলে থাকছি না?

ভাগ্যিস অনন্ত সেদিন মদ খায় নি, নির্ঘাৎ সেই রাত্রে রাস্তার ওপরেই কেঁদে ফেলত !

৩.

অনেকখানি পথ দৌড়ে এসেছে সঞ্জীব, হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল— সর্বনাশ হয়েছে, অনন্ত। ডি এস পি ত্রিবেদী পুলিশ ফৌজ নিয়ে এসেছে নবীন নগরে রেল লাইনের পাশে রেফুজি ঝুপড়িগুলো উচ্ছেদ করার জন্য। ছেলেবুড়ো সবাইকে লাঠিয়েছে। বস্তির মেয়েরা বহুত কান্নাকাটি করছে।

অনন্ত কলেজ ফেরতা দাসদার দোকানে চায়ে সবেমাত্র প্রথম চুমুক দিয়েছিল, লাফিয়ে উঠল। গভর্মেন্ট বহুদিন ধবেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, ইনজাংশন-ফাংশন আনিয়ে এতোদিন কোনমতে আটকে রাখা গিয়েছিল। এখন গত মার্চে ভোটে আবার জিতে এসেই নতুন করে বদমাইশি শুরু করেছে। সে টেবিলেব দিকে তাকিয়ে বলল চল, তোরাও যাবি তো? রঞ্জন বলল— বড়দা তো নেই, একটু ওয়েট করে গেলে হয না। বড়দা মানে প্রোঃ ধর, তাদের লোকাল কমিটি সেক্রেটারি। অনন্ত বলল —শালা ত্রিবেদী তো তোর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে, গেলে বসিয়ে চা বিস্কুট খাওয়াবে! চল চল, বড়দা খবর পেলে স্পটে চলে যাবে।

ওরা পাঁচজনই গেল। একটা স্কুটার ছিল, দুটো সাইকেল। ওরা যখন জায়গায় পৌঁছল, ত্রিবেদী ততোক্ষণে প্রায় আধখানা কাজ সেরে এনেছে। রেললাইনের পাশে নিচু জমিটায ছুঁড়ে ফেলা ঘরোযা জিনিষপত্রে টাল হয়ে আছে। জিনিষপত্র মানে আর কি, কটা শস্তা কাঠের খাট আব টেবিল, কিছু মোড়া, হাঁড়ি কুড়ি, কেরোসিনের বোতল, টিনের তোবড়ানো ট্রাঙ্ক এইসব। কয়েকটা কালী আর রামকৃষ্ণের বাঁধানো ফটোও ঘাসজমিতে গড়াচ্ছিল। অনন্তের মাথার ভেতবে টং করে উঠল। হারামি পুলিশ! মেয়ে আর বাচ্চাদের কান্নাকাটিতে কান পাতা যাচ্ছিল না। মরদগুলো একদিকে জটলা বেঁধে থাকা জনতাকে উদ্দেশ করে বলল—ভাইসব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তোমাদের ঘবদোর ভাঙছে, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো? জনতার ভেতর মৃদু গুঞ্জন উঠল। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা মধ্যবয়স্ক একটা লোক জনতার মধ্য থেকে বলল—কি করমু কন, আমাগো দশডারে ভ্যানে উঠাইয়া নিয়া গেল। বেঁটে খাটো একটা লোক খ্যানখেনে গলায় বলল—পুলিশ খালি ডাণ্ডা দিয়া পিটাইলে কথা আছিল। জেলে ভর্যা দিলে আমাগো বউ বাচ্চাগুলার কি অইব?

জয়নাল বিবি অনন্তের পায়ে কেঁদে পড়ল। আমার ঘর পোড়ারমুখাগুলি ভাঙ্গ্যা ফালাইতাছে। পোলাপানগুলারে নিযা অখন আমি কই যামু। আপনে কন এই পুলিশগুলারে! জয়নালের স্বামী বউকে তালাক দিয়ে অন্য বিবি নিয়ে শহরের আরেক প্রান্তে থাকে, জয়নালের পাঁচ অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে। জয়নাল বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝি-এর কাজ করে পেট চালায়। অনন্ত দৌড়ে গেল জয়নালের ঘরের দিকে। একটা পুলিশ ঘরের হাঁড়ি আর সানকি হাতে তুলেছিল ছুঁড়ে ফেলার জন্যে, অনন্ত

ওর হাত চেপে ধরল। আপনাদের অর্ডার কোথায় দেখান, এভাবে গরীব মানুষের ঘরদোর ভাঙছেন কেন? ততক্ষণে বাকি চারজনও পৌঁছে গিয়েছে, পুলিশগুলো একটু ভড়কে গেল। ওরা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করছিল কী করা যায়, অনন্ত আওয়াজ দিল— গরীবের ওপর জলুমবাজী চলবে না! ওরা চারজন অভ্যস্ত গলায় কোরাস ধরল— চলবে না চলবে না! অনন্ত বলল— বস্তী উচ্ছেদ বন্ধ করো! চারজনের গলায় আওয়াজ উঠল— বন্ধ করো বন্ধ করো!

ত্রিবেদী জীপের ভেতর বসে ছিল, গোলমাল শুনে নেমে এদিকে এগিয়ে এল। জনতা নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল, এবারে কি রগড় জমে! ত্রিবেদী অনন্তের পেটে ব্যাটন ঠেকিয়ে বলল — কী হলো, গোলমাল করছো কেন? একটা পুলিশ বলল — স্যার আমরা কাজ করছিলাম, আমাদের অবস্ট্রাকশন দিচ্ছে। অনন্ত বলল — আপনারা ঘরদোর কোন অধিকারে ভাঙছেন? বাকি চাবজন অনন্ত থেকে একটু তফাৎএ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল ত্রিবেদীর দিকে। ত্রিবেদী ব্যাটন নামিযেই শান্ত গলায় বলল — কোর্ট অর্ডার আছে। অনন্ত বলল — তাই বলে আপনি এই মানুষগুলোকে প্রস্তুতিরও সময় দেবেন না? মানবিকতাও নেই আপনাদের? ত্রিবেদী এবাব কঠিন গলায় বলল — ঘরদোর ভাঙছি ওদের ভাঙছি, তোমার কি? তুমি কেন ইণ্টারফিয়ার করছো? অনন্ত হাঁ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দিকে তাকাল। আমি জনতার প্রতিনিধি। ত্রিবেদী ব্যাটন দিয়ে সপাটে বাড়ি মারল অনন্তের গালে। টাল সামলাতে না পেবে সে পড়ে গেল মাটিতে, তার নাকের কাছটায় কেটে রক্ত পড়ছিল। ত্রিবেদী পুলিশগুলোব দিকে ফিরে বলল— এই পাঁচটাকে ভ্যানে তুলে দাও। জনতা দেখাচ্ছে বাঞ্চোত।

ভ্যানে অনন্ত ডানহাতে নাকের কাছটা চেপে বসেছিল। সঞ্জীব বলল— হঠাৎ মারল শালা, বুঝতেই পারি নি। শান্তনু বলল— তুই কিন্তু ভালো টক্কর দিয়েছিস ত্রিবেদীর সাথে। রঞ্জন ভ্যানের জানালা দিয়ে চলমান বাইরেটা দেখছিল, মুখ ফিরিয়ে বলল— এইজন্য আমি বলেছিলাম বড়দার জন্য ওয়েট করতে, বডদা লোকগুলোকে অর্গানাইজ কবতে পারত। শান্তনু বলল— ওই হারামজাদা জনগণ দিয়ে কিস্যু হবে না। কেমন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল দেখলি, যেন শালা সিনেমা দেখছে! অনন্ত বলল— নারে জনগণকে আণ্ডার-এস্টিমেট করিস না। আজ ওরা বুঝতে পারছে না, কিন্তু আমরা যদি জনগণের সঙ্গে থাকি, ওদেব অভাব-অভিযোগগুলোকে তুলে ধরি, একদিন ওরা ঠিক বুঝে নেবে ওদের বন্ধু কারা আর শত্রু কারা। আর সেদিন—!

ভ্যানের ভেতর থেকে কোরাস উঠল। উই শ্যাল ওভারকাম। উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে!

৪.

মিলান কুন্দেরার 'অমরত্ব' বইটিতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি টাইকো ব্রাহে বিষয়ে, যিনি ছিলেন একজন খুব বড়ো জ্যোতির্বিদ। কোন উৎসব উপলক্ষে সম্রাট রুডলফ অন্য অনেকেব সাথে ব্রাহেকেও এক রাতে ডিনারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রাসাদে রাজকীয় টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসেছেন সবাই। হাসি-

ঠাট্টা, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া চলছে, কিন্তু এদিকে ব্রাহের অবস্থা সঙ্গীন, তাঁর, শিশুর ভাষায় বলতে গেলে, হিসি পেয়েছে প্রচণ্ড। অথচ লজ্জায় ব্রাহে না পারলেন কথাটা কাউকে বলতে, না পারলেন উঠে গিয়ে নিজেকে হালকা করে আসতে। ফলে পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে রাজসভায় খানাপিনার হুল্লোড়ের ভেতর বেঘোরে মূত্রনালী ফেটে মারা গেলেন!

মূত্রের কথায় অনন্তর মনে পড়ল তার এক ছোট ভাই ছিল। দিগন্ত। পড়াশোনায় মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সে ছিল একটি গোপালের মতো সুবোধ বালক। সেই সুবোধ বালকটি একদিন পিকিং রেডিওতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ শুনে ঘর ছেড়েছিল। বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বহুদিন। তখন চারদিকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মাথা কাটা পড়ছে, ট্রাফিক কনস্টেবল থেকে শুরু করে জোতদার—একের পর এক শ্রেণীশত্রু খতম হয়ে চলেছে, 'সংশোধনবাদী', 'নব্য-সাম্রাজ্যবাদী', 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া' এইসব শব্দের ধাক্কায় আকাদেমিয়ার দরজা জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে, বিপ্লব মানে তখন শুধুমাত্র একটি ভোরের অপেক্ষা। দিগন্ত তার কলেজের আরো কারো কারো সঙ্গে গিয়েছিল গ্রামে, বিপ্লবের অগ্রগামী সেনা হিসেবে শোষিত নিপীড়িত কৃষক সমাজের সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে দেয়ার মহান উদ্দেশ্যে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা বলেছিলেন চেয়ারম্যান মাও। প্রচুর কষ্ট সয়েছিল তারা, দিগন্ত ও তার বন্ধুরা, তাদের চেষ্টাতেও কোন খাদ ছিলনা, কিন্তু আমাদের মহান ভারতবর্ষের ধর্মীয়-সামাজিক পরম্পরা, যা সহস্র বৎসরের ধুরন্ধর শ্রেণীস্বার্থচিন্তার ফসল, তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল বিশাল গ্রানাইট পর্বতের মতো। ডন কিহোটের মতো উইণ্ডমিলের সাথে লড়াই করে করে গা হাত পা ব্যথা করে তিন বছর পর দিগন্ত এক রাতে ফিরে এসেছিল ঘরে। অনন্ত সে সময় 'মিসায়' আটকা পড়ে জেলে। পরে মায়ের কাছে শুনেছে দিগন্ত কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মাকে বলেছিল — বড্ডো খিদে পেয়েছে মা, ভাত খাওয়াবে? দরজায় দুমদাম ধাক্কা পড়েছিল, গণতন্ত্রের ধাক্কা, দিগন্তকে মা বোনের সামনে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরদিন সকালে সামনের পার্কে তার ডেড বডি পাওয়া যায়। অনন্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বাড়ি ফিরে এসেছিল, দেখেছিল তাদের বাড়ির উল্টোদিকের দেয়ালে লাল কালিতে বড়ো বড়ো করে কারা লিখে রেখেছে— কমরেড দিগন্ত অমর রহে। অনেকদিন ছিল লেখাটা, তারপর ক্রমশঃ রোদ ও বৃষ্টিতে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। সে সময় একদিন বিকেলে অনন্ত দেখতে পায় একটা নেড়ি কুকুব পেছনের পা তুলে অমব রহেব ওপর মূত্রত্যাগ করছে।

মূত্র, যা একদিন টাইকো ব্রাহেকেও অমরত্ব দিয়েছিল!

৫.

সেদিন রাত্রে সিরিয়াল, ইংরেজি খবর দেখা শেষ, আলো নিবিয়ে শুয়ে আছে, হঠাৎ অনন্তর মনে হলো শরীর কি তাকে ভুলে গিয়েছে, না কি সে-ই শরীরকে ভুলে থেকেছে এতোদিন। তার স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়েছিল, অনন্ত বাহুতে হাত রেখে আলতোভাবে টানল নিজের দিকে। স্ত্রী ঘুমের আমেজ-লাগা গলায় বলল— উঁ

অনন্ত বিছানায় কনুই-এর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করল। স্ত্রীর ঘুম চটে গিয়েছিল, বিরক্তির গলায় বলল— কি হচ্ছে, পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা আছে না!

— থাকুক। অনন্ত স্ত্রীর ব্লাউজে হাত দিল।

— ব্যাপার কি! হঠাৎ যে আজ এতো সোহাগ উথলে উঠল! বলল স্ত্রী।

অনন্ত স্ত্রীর স্তন দুহাতে চটকাচ্ছিল। পুরনো বিদ্যুচ্চমক তো ফিরে এল না! হাতের মুঠোয় মাংস উঠে আসছিল শুধু, শরীর কোথায়, শরীর?

শরীর খুঁজতে পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলল অনন্ত। তার স্ত্রীর শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজল। আসলে সে কি খুঁজছিল? তার বিস্মৃতির ভেতর, তার অবসাদের ভেতর, তারপর হয়ে আসা দিন ও রাতের ভেতর ছায়া গোপন হয়ে আছে যে জলকল্লোল, মিছিলের মুখ আর হাতে হাত রাখার উজ্জ্বল উত্তাপ, হয়তো অনন্ত আশা করছিল তার দুহাতের মুঠোয় উঠে আসবে তার হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছার, ভালো লাগার, ঘৃণার তীব্রতা। কিছুই ফিরে আসে না, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না সময়, এমন কি আশাও নয়। তার স্ত্রী বলল— যা করার তাড়াতাড়ি করো আমার ঘুম পাচ্ছে!

স্ত্রীর ছড়ানো, আলুথালু, চেষ্টাহীন শরীরের পর হাপরের মতো উঠছিল আর নামছিল অনন্ত, নামছিল আর উঠছিল। কিন্তু কিছুতেই পেরোতে পারছিল না দুই শরীরের মাঝের সহস্র যোজন দূরত্ব। বাইরে বৃষ্টি কাচের জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, এদিকে সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম পড়ছিল অনন্তের। কিন্তু কোথায় সেই আগুন? চুল সাদা হয়ে গেল অনন্তের, কপালে দীর্ঘ বলিরেখা, হাড়গুলো একে একে খুলে পড়তে থাকল কিন্তু ঘামে স্যাঁতসেঁতে দুই শরীরের মাঝখানে আগুন জ্বলে উঠল না। অনন্ত তাকিয়ে দেখল তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল অনন্ত। কাচ বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় নামছে বৃষ্টি। দূরে ঝাপসা হয়ে আছে মধ্যরাতের রাজপথ, একটা গাড়ি বৃষ্টির বুক চিরে নিঃশব্দে ছুটে গেল। অনন্ত তাকিয়ে দেখল তার পরাজিত, অপমানিত লিঙ্গ দুপায়ের মাঝখানে ভারী সঙ্কুচিত, বিষণ্ণ হয়ে ঝুলে আছে। মহাযুদ্ধের সমাপন। দেবতারা পাণ্ডবদের দিব্যাস্ত্র একে একে সব ফিরিয়ে নিয়েছেন। বীর অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না, অসহায়ের মতো দেখলেন দস্যুরা পাণ্ডব কুলবধূদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনন্ত আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

মস্কোয় তখন লেনিনের স্ট্যাচু ক্রেন দিয়ে টেনে নামানো হচ্ছে। উপস্থিত জনতার হাততালিতে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল আমাদের।

৬.

আজ বসন্ত। ফুল ফুটুক না ফুটুক।

মলয়কান্তি দে

মনুসংহিতা

গল্পকার, গল্প বলো,

বলছি, শোনো তাহলে, এক শহরে সে ছিলো এক ভীষণ সময়। দিনরাত কারফিউ, চারদিকে আতংক..

বুঝেছি বুঝেছি, এটা দাঙ্গার গল্প।

হ্যাঁ, ঠিকই, আবার ঠিক নয়ও। দাঙ্গাই চলছিলো বটে। তবে আমি বলছি, দাঙ্গাব সময়কার অন্য এক গল্প। তা, যা বলছিলাম এক ভয়ংকর সময় ছিলো সেটা। দিনের বেলা মানুষগুলো ভয়ে ভয়ে বেরোতো পাড়ার ভেতর। ত্রস্ত সতর্ক ঘোরাফেরা সাংকেতিক কুশল বিনিময়। আর সন্ধ্যা নামতেই সব সুনসান। তখন পাড়ায় পাড়ায় অন্ধকারে জটলা। শোনা কথা কুড়িয়ে বাড়িযে ছড়িয়ে দেওয়া। পালা কবে রাতপাহারা। বড়োরাস্তা দিয়ে রাত্রির স্তব্ধতা চুরমার করে ট্রাক যায়। পুলিশের ট্রাক। মানুষগুলো বুকে হাত দিয়ে সেই শব্দের অনুরণন টের পায়। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখে কোথাও কালো আকাশেব গায়ে আগুনের আভা লেগে লাল দগদগে হয়ে উঠেছে কিনা। নিশ্বাস চেপে রেখে অনুভব করতে চায় ঘাড়ের ওপর অন্য কারো নিশ্বাস পড়ছে কিনা। এমন কি...

আরে অতো কথার দরকার কি? দাঙ্গা আমরা খুব জানি। এই তো গত বছরই আমাদের শহরে...

আমাদের শহরেও তো গত পুজোর আগের পুজোয়... ...

আরে কোথায় নেই বলো, ভাগলপুর, মীরাট, আমেদাবাদ... মোট কথা, অতো ফেনাবার দরকার নেই। সোজাসুজি বলো। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা তো?

না।

না! ও বুঝেছি, অসমীয়া বাঙ্গালী...

না।

না? তবে কি? ওহো, হিন্দু শিখের দাঙ্গা, কিন্তু সে তো আমাদের দিকে হয়নি। তুমি দিল্লীর কথা বলছো?

না।

আবার না?

হ্যাঁ। আবার 'না'। দাঙ্গার বেলায় ওসব ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়ের কথা অর্থহীন। দাঙ্গা দাঙ্গাই। দাঙ্গাবাজ, সে যে ধর্ম কিংবা ভাষা কিংবা সম্প্রদায় কিংবা সংস্কৃতিরই হোক—সে অপরাধী। খুনী। লুটেরা। দাঙ্গার বিরুদ্ধে কথা না বলে যারাই ভয়ে কিংবা স্নেহে প্রশ্রয় যোগায়—সবাই অপরাধী। দাঙ্গাবাজের আর অন্য পরিচয় নেই। সে তার ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম সর্বোপরি মনুষ্যত্ব নামক ব্যাপারটাকে কলঙ্কিতই করে। গৌরবান্বিত করে না। সব দাঙ্গার পেছনেই থাকে স্বার্থের সংঘাত। সব দাঙ্গাই

শক্তির এক অন্ধ, নিষ্ঠুর, করুণ, মদমত্ততা ; আর সব দাঙ্গায় রক্তের দাগ লাগে পুলিশ-প্রশাসক-সরকারের গায়ে। হয় সরাসরি হত্যার রক্ত, নয় দাঙ্গা থামাতে না পারার ব্যর্থতার রক্ত। দাঙ্গার বেলায় তাই ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা-সংস্কৃতির পরিচয়...

ব্যাস ব্যাস ব্যাস। অনেক হয়েছে। অনেক লেকচার হয়েছে। ওসব কেতাবী বুলি অনেক শুনেছি! ওসব হচ্ছে বক্তৃতার কথা। কাজের কথা অন্য। সে সব মাঠে বলা হয় না। বলা হয় ফিসফিসিয়ে। বলা হয় অন্ধকারে। সব তোমার বুদ্ধিতে ধরবে না। তুমি হাঁদা গল্পকার। গল্প বলতে এসেছো। তা-ই বলো।

গল্পই তো বলছিলাম। তোমরাই কথা তুললে। থাকগে, বলছিলাম যে এক শহরে একবার দাঙ্গা বেধেছিলো। বিরাট ভয়ানক দাঙ্গা। কাজের মধ্যে দাঙ্গা, কাবণ কাকে মারলো, কারা বেশি মবলো—অতো কথায় গিয়ে কাজ নেই। দাঙ্গা বাধাতে কেউ-ই কম যায় না। সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে কোপ বসাতে অতি বড়ো ধর্মপুত্রেরও হাত কাঁপে না। নিজের স্বার্থে শূদ্র হত্যা কবতে পুরুষোত্তম রামের বিবেকে সামান্য ধূলোর ছিটেও লেগেছিলো কি?

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি তোমরা উসখুস করছো। তা সেই শহরে, মানে যে শহরে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, ছিলো এক মেয়ে। মেয়ে ছিলো তো মেয়ের বাবাও ছিলো। কাকা ছিলো। মা, কাকীমা ছিলো। ছিলো খুড়তুতো মিলিয়ে সাতটি ভাই বোন। মানে পাঁচ বোন আর দুই ভাই। মেয়েটি ছিলো ভাই বোনদের মধ্যে বড়ো। বয়স তার পনেরো ষোলো। তবে পনেরো ষোলোর সিঁটিয়ে থাকা হাড্ডিসার চেহারা নয়। শরীর তার বেশ ভরন্ত, ফুলন্ত। জন্মের সঙ্গে সে এনেছিলো তার মায়ের জন্য দুরন্ত লজ্জা। শুধু সে নয়। তার পরের আরো দুটো বোন। স্বামী শাশুড়ী এমন কি আত্মীয় স্বজন, পাড়া-পড়শী সবাই মুখ বাঁকিয়ে ওর মাকে বলতো মেয়ে বিয়োলো। লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভাগ ওর কপালেও জুটেছে। তারপর যখন ওব ছোট্ট ভাইটি হলো, কাকারও ছেলে হলো একটা, সেই সব অনাদর অবহেলার কথা এখন পুরোনো হয়ে গেছে। এদিকে মেয়েটি যখন ধীরে ধীরে ফ্রকের আড়ালে বড়ো হয়ে গেলো, গায়ে লাগলো আশ্চর্য এক মায়াবী জোছনার মায়া, মুখে নামলো ঢল, চোখে খেললো মেঘ, ওর বানের রুখুসুখু চোয়াড়ে চেহারার ভিতরে গোপনে কোথাও মমতার এক প্রস্রবন জাগলো। মা, ঠাকুরমার চোখেও জ্বললো স্নেহের এক স্নিগ্ধ জ্যোতি। সঙ্গে জাগলো ভয়। অমন শরীর। কু-লোকেব চোখ আঁঠা হয়ে লেগে থাকে। কখন যে কী হয়।

এই বছরেই ম্যাট্রিক দেবে মেয়ে। পাশ করলে কলেজে যাবে কিনা, তা কিন্তু এক্ষুনি বলা যাবে না। কারণ মেয়েটির বাপ, পরিবাবের যিনি কর্তাপুরুষ, তিনি এই সেদিনও গল্পে গল্পে পাশের বাড়ীর অমুক কাকুকে বলেছেন,— বলেছেন যে, মেয়েদের বেশী পড়াশোনা করিয়ে লাভ কি? সেই তো বিয়েই দিতে হবে। বরং বাইরে বেরিয়ে কোথায় কি কলংক রটাবে, বংশের মান নিয়ে টান পড়বে। তার চেয়ে সময় থাকতে ঘর বর দেখে বিয়ে দাও। সুখে থাকুক। দেখে শুনে তোমারও সুনিদ্রা হোক। অবশ্য পড়াশোনায় মেয়েটির মাথা কিছু আহামরি নয়। কলেজে যেতে পারলে বোধহয় ভালোই লাগত। কিছু একটা অজানা—কিছু একটা নিষিদ্ধ—বয়ঃসন্ধির

স্বপ্নিল চোখে যার আমেজে মাথায় ঝিমঝিমে নেশা জাগে। পাশ টাস তো করতে পারবে না। তখন নয় ছাড়িয়ে দিয়ো। তবে মেয়েটির কলেজে পড়ার সম্ভাবনায় কিন্তু এক্ষুনি ট্যাঁড়া পড়ে যায়নি। বাবা রাজি হলেও হতে পারেন। মেয়েটি তাই আশা পুরোপুরি ছাড়ে নি।

আচ্ছা, তখন থেকে কেবল মেয়েটি মেয়েটি করে যাচ্ছো। ওর একটা নাম দিয়ে দিলেই হয।

তোমরা বড্ডো খুঁটিয়ে দেখো সবকিছু। হ্যাঁ, নামতো একটা দিতেই হয়। শুধু ওর কেন। ওর বাবা কাকারও নাম থাকা দরকার। কিন্তু আমার মুশকিল তো এখানেই। দাঙ্গা বলে কথা কি না।

এর মধ্যে আবার দাঙ্গার কথা কি? দাঙ্গা হয়েছে তো হয়েছে। তার সঙ্গে নামের সম্পর্ক কি?

আছে গো, আছে। অনেক সম্পর্ক। ধরো তোমার শহরে দাঙ্গা বেধেছে। বিপাকে পড়েছো তুমি। খুনোখুনির মধ্যে আটকে পড়েছো কোথাও। সারাদিন কেটেছে ত্রাসে, আতঙ্কে। এরমধ্যে একসময় ঝুপ করে সন্ধ্যা নামলো। তুমি ভাবলে, যে ভাবেই হোক বাড়ী যাওয়া দরকার। সাহসে ভর করে, এ গলি সে গলি হয়ে তুমি এগোচ্ছো। হঠাৎ একটা মোড় পেরিয়েই তুমি দেখলে যে তোমার হয়ে গেছে। তোমার চারদিকে চারজন। হাতে ছোরা, চোখে গনগনে আগুন। গলা দিয়ে চেরা আওয়াজ বের করে একজন জিজ্ঞেস করলো, মানে, তোমাকে স্ত্রীর ভাই বলে সম্বোধন করে তোমাকে তোমার শুভ নামটি জানাতে আদেশ করলো। তখন কী হবে বাপধন? তখন বুঝবে, তোমাব পিতৃদত্ত নামটি রাম না রহিম এটা ভেবে ঠিক করতেই তোমার প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। কেমন কি না? তাই ভাবছিলাম হট করে নামটা বলে ফেলা ঠিক হবে কি না? দাঙ্গা বলে কথা কিনা।

আরে ধুত্তোর। তুমি তো গল্পই বলছো। সত্যিকারের দাঙ্গা তো আর নয়। নাম বলতে তোমার অতো ভয় কিসের?

ভয় নেই বলছো? ধরো মেয়েটা, এবং ওদের পুরো পরিবারটাই দাঙ্গার মুখে পড়েছে। এখন ওরা হয়তো মরেও যেতে পারে। বা ওদের টাকা পয়সা লুট হতে পারে। আর মেয়ে যখন, তখন তার টাকা পয়সার বাড়া আরেকটি দায়ও আছে। ইজ্জৎ বয়ে চলার দায়। সেই ইজ্জৎও লুট হতে পারে। এখন আমি যদি বলি মেয়েটির নাম ঝর্ণা তো তুমি সহজেই বুঝে নেবে মেয়েটি হিন্দু। এবং ধরে নেবে মুসলমানরাই এই দাঙ্গায় হত্যাকারী। লুণ্ঠনকারী, মানে, ধরে নেবে আমি হিন্দুদের ধোয়া তুলসীপাতা সাজিয়েছি। নিজে হিন্দু কিনা। আবার যদি বলি মেয়েটার নাম জাহানারা, তো বলবে আমি হিন্দু হয়েও গৃহশত্রু বিভীষণ। মুসলমানদের ভালো সাজিয়ে হিন্দুদের সাজিয়েছি অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী। যে হিন্দুরা কিনা পরম পরধর্মসহিষ্ণু। নারীমাত্রকেই যারা মাতৃজ্ঞানে পুজো করে, অথবা মেয়েটির নাম হতে পারে মাজলী কিংবা লখিমা। ওর বাবার নাম হতে পারে কিনারাম কলিতা কিংবা ডিম্বেশ্বর নিয়োগ। বা হতে পারে অমুক বড়ো কি তমুক বরগোঁহাঞ। বা কর্ত্তার সিং বা প্রকাশচান্দ। কতো নামই তো আছে পৃথিবীতে। আর সব নামের সাথেই যুক্ত হয়ে আছে মানুষের জাতি-ভাষা-বর্ণ সম্প্রদায়গত পরিচয়। আর যেহেতু দাঙ্গা

বলে কথা, কে কোথায় ভালো কিংবা খারাপের সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে, তোমরাও অমনি ভেবে বসবে আমি বলেছি অমুক জাতি ভালো কিংবা তমুক সম্প্রদায় খারাপ। একি কম ঝামেলা?

কিন্তু তা বলে তুমি ওরকম মেয়েটি আর ছেলেটি আর বাবাটি আর কাকাটি বলে গল্প চালাবে? এ রকম হয় কখনো?

জানি হয় না। তবু চেষ্টা একটা আমাকে করতেই হবে। জানি ফাঁক ফোকরে হয়তো হঠাৎ মেয়েটার জাত ধর্ম সংক্রান্ত খানিক আভাস তোমরা পেয়েও যেতে পারো। তখন শুধু আমার আগের কথাগুলো খেয়াল রেখো। দাঙ্গাবাজের কোনো জাত ধর্ম নেই। অবস্থান ভেদে যে কেউ যেমন আক্রান্ত হতে পারে, সুযোগে আবার সে-ই হয়ে উঠতে পারে চূড়ান্ত মাপের নিষ্ঠুর আক্রমণকারী। তবে হ্যাঁ, আরেকটা কথাও বলার আছে। দাঙ্গা মানেই তো পাশবিক বলাৎকারিতা। সেখানে তাই জনবলের জোরে আক্রমনের দায়ভার সংখ্যাগুরুরই কাঁধে। সংখ্যালঘুকে মার ঠেকাতেই হয় শুধু। ঠেকাতে পারলে বাঁচো। না পারো তো ধড়মুণ্ড আলাদা হয়ে মাটি ছুঁয়ে পড়ে থাকো।

যাক বাবা। গল্পকার বটে তুমি। আশকথা পাশকথা এতো বেশী বলো যে গল্প শোনার ইচ্ছেটাই মরে যায়। নাও এখন কী শোনাবে শুনিয়ে বিদেয় হও ঝটপট।

হ্যাঁ ভাই। বড্ড মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে এই আশকথা পাশকথা বলার অভ্যেস। যাক, আর দেরী করবো না। চলো এখন আমরা সরাসরি গল্পের ভিতরে যাই। সেই এক দেশে, যেখানে ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সেই এক শহরে, যেখানে আছে আমাদের গল্পের মেয়েটি। আছে তার বাবা কাকা। তাদের ব্যবসাপত্র, জমি, বাড়ী।

দাঙ্গা কী করে বাধলো সে গল্প অন্য। সে কথা আমার বলার দরকার নেই। আর বলতে গেলে তো সেই বাইরের ঘটনাগুলোই বলবো। যা সাজানো। লোক-দেখানো। আসল প্যাঁচটা যে খেলানো হয় আড়াল থেকে, ভিতর থেকে, সে তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু সে তো গুহ্য কথা। ঢাক পিটিয়ে বলার নয়। তা ছাড়া এ তো ঠিক দাঙ্গার গল্প নয়। দাঙ্গার কারণ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকারই বা কী?

তাহলে আসা যাক সেই মেয়েটির কথায়, এবং তার বাপ কাকার কথায়, এবং তাদের শহরে শুরু হওয়া দাঙ্গার কথায়। দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলো হঠাৎ একদিন। ঠিক আচমকা নয়। কানা ঘুষোয় কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিলো কিছু একটা হবে। কেউ ভেবেছিলো, লাগলে লেগেও যেতে পারে। আবার কেউ ভাবছিলো লাগবে টাগবে না। হাওয়ায় উড়িয়ে নেবে মেঘ। কিন্তু হঠাৎই একদিন লেগে গেলো। কথায় কথায় সামান্য কাটাকাটি হলো। দেখতে না দেখতে অমনি দু-দল যার যার লাঠিসোটা বর্শা বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পরস্পরের উপর। মজার কাণ্ড দেখো। আগে থেকে প্যাঁচ কষানোই যদি না থাকবে, হুট করে তাহলে অমন অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় হয়ে যায় কোত্থেকে? তো অস্ত্র-শস্ত্রে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটি দোকানে আগুন জ্বললো। কয়েকটি লাশ পড়লো। রক্তে ধূলায় মাখামাখি হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলো কয়েকদিন। পুলিশ এলো। দমকল এলো। এম্বুল্যান্স এলো। মাইকে ঘোষণা

হয়ে গেলো কারফিউ।

এরকম যে কিছু একটা হঠাৎ শুরু হয়ে যেতে পারে, কদিন থেকেই শহরের বাতাস শুঁকলে তার সম্ভাবনার গন্ধ পাওয়া যেতো। মেয়েটির বাবাও একদিন রাতে বলেছিলেন যে, শহরে বেশ টেনসন চলছে। বলা যায়না কখন কী হয়। খেতে বসে বলা কথাটা। শুনলেন মেয়েটির মা। তারপর, রাতে নিজেরা খেতে বসে, মেয়েটির মা বললেন মেয়েটির কাকীমাকে, শহরে বেশ টেনসন চলছে। বলা যায় না কখন কী হয়। কাকীমা বললেন ঠাকুমাকে, শহরে বেশ টেনসন চলছে। বলা যায় না কখন কী হয। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন কাকীমাকে, কেনো গো দাঙ্গা টাঙ্গা লাগবে না কি? কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন মা কে, কেন গো? দাঙ্গা টাঙ্গা লাগবে না কি? মা জিজ্ঞেস করলেন—নাঃ। মা আর কাকে কী জিজ্ঞেস করবেন। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে তো সাফ জবাব মিলবে, জবাব মিলবে যে—সে খবরের তোমার কী দরকার? বাইরের ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে হবে না। তাই নিজেদের মধ্যেই জল্পনা কল্পনা করলেন। পাড়া পড়শী বউ-ঝিদের সঙ্গে জল্পনা কল্পনা করলেন কী হতে পারে না পাবে। কিন্তু এবই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর, অন্ধকার যখন একটু গুছিয়ে বসেছে, তখন বাড়ীব পিছন দিককার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো দুটো গরুর গাড়ী। বড়ো বড়ো চটের বস্তা আর কাগজের পেটিতে বোঝাই। দোকানের বিক্রি সামগ্রী। গরুর গাড়ী থেকে এসে মজুদ এলো বাড়ীরই শক্ত পোক্ত একটি কোঠায়। কাঠের দরজা বন্ধ হলো। বড়ো বড়ো লোহাব কড়ায় ঝুললো তালা। তালায় পড়লো চাবি। আর অমনি যারা চাবপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলো এই পুরো কার্যক্রম, অর্থাৎ বাড়ীর বউ-ঝি, চাকর বাকর, বাচ্চা কাচ্চা—সকলেব মুখে পড়লো কুলুপ। না কেউ দেখে নি কিন্তু। না না। কিছুই নেই ঐ ঘরটায়। কিছুই আনা হয়নি বাইরে থেকে। তবে সবাই জেনেও গেলো—কিছু একটা সত্যিই হতে চলেছে। আর তার পরদিনই বেধে গেলো দাঙ্গা।

দাঙ্গা বাধলো। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে গেলো দমকল। সারা শহরে রটে গেলো কারফিউ। কাবফিউ, কারফিউ। সঙ্গীন উঁচিয়ে গাড়ী বোঝাই পুলিসেরা চোখে মুখে বীভৎসতা ফুটিয়ে টহল দিতে লাগলো রাস্তায়। ঝুপ ঝাপ বন্ধ হলো দোকান পাট। খালি হলো হাট বাজার। পড়ি-মরি করে যে-যেদিকে পারলো রাস্তা খালি করে বাড়ীর পথ ধরলো। কিন্তু, এই রে! এদিকে যে আবার কাণ্ড হয়েছে একটা! আমাদের গল্পের মেয়েটাতো রয়েছে ইসকুলে! কী হবে এখন? মেয়ের মা বুক চাপড়ালেন। ঠাকুমা মাথায় হাত দিলেন। বাবা বেরোলেন খোঁজে, কিন্তু কোথায় খুঁজবেন? রাস্তায় পা দেওয়া তো সাপের লেজ নাড়ানো। এ বাড়ী ও বাড়ীর লোকেরাও জুটলো। বাচ্চা রয়েছে স্কুলে। কী করা যায়? থানায় টেলিফোন করবে? কিন্তু সারা পাড়ায় টেলিফোন নেই কারো বাড়ীতে। যেতে হয় রাস্তা পার হয়ে ওষুধের দোকানে। সে অসম্ভব। কী করা? গলা শুকিয়ে গেলো মেয়ের বাপের। মনে পড়লো মেয়ের বাড়ন্ত শরীর। বুকে হাতুড়ী পেটার শব্দ উঠছে তার। নাঃ। অনেক হয়েছে স্কুলকলেজ। এবার ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরলে হয়। আর বাইরে বেরোতে দেওয়া যায় না মেয়েকে। এই ভাবে দুর্ভাবনায় উৎকণ্ঠায় মাথা ঝিমিয়ে আসার পর বিকেলের দিকে পাড়ার গলির মুখে এসে থামলো এক পুলিসের গাড়ী। গাড়ী ভর্ত্তি স্কুলের পোশাক

পরা ছেলে মেয়ের দল। তার থেকে যাদের বাড়ী এ পাড়ায় তারা নামলো লাফিয়ে লাফিয়ে। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। ছাড়া পেয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এসে ঢুকে গেলো বাবা কাকা জেঠা মামার কোলে।

যাক, একটা ফাঁড়া কাটলো। মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন বাবা। ধাতস্থ হলেন মা ঠাকুমা। কাকীমা বললেন, দিয়েছিলি মাথা খারাপ করে। শুকনো মুখে অপরাধীর মতো মাথা নুইয়ে খেয়ে চলে যায় সে কুয়োতলায় হাত মুখ ধুতে। সন্ধ্যা নামে। রাত নামে। বড়ো রাস্তা থেকে পুলিশেব গাড়ীর গম্ভীর শব্দ ভেসে আসে। লোকেরা বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বালায় না। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ঘরের কাজ সারে। বাচ্চাদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দেয়। রেডিও চালিয়ে স্থানীয় সংবাদ শোনে। কিন্তু ওখানে আবার বড়ো রাখ ঢাক। ভালো বোঝা যায় না কি হয়েছিল আজ দুপুরে। পাড়ার ভিতর কারফিউ নেই। মেয়েটির কাকা বেরোয় খবরের সন্ধানে। বাবা বসে থাকে গম্ভীর মুখে বৈঠকখানায়। লোক আসে, জন আসে। আলাপ পরামর্শ চলে। ব্যাপারটা কি ছড়াবে আরো, নাকি থেমে যাবে? 'ঠিক কি হয়েছিল জানাই গেলো না।' 'সত্যিই কি অতো জন মরেছে?' 'অবশ্যই গুরুতব কিছু না হলে আর কারফিউ দিয়েছে কেন।'

সে রাত ভালোয় ভালোয় কাটলে লোকের মনে স্বস্তি ফোটে। থামলো বোধ হয়। বুঝি কালকের ঘটনাটি নেহাতই উটকো ছিলো। দিনের বেলায় পাড়ার ভেতর গুলতানি চলে। টুকরো টুকরো খবর জড়ো হয়। শোনা যায়, ঐ একটি ঘটনাই নয়। কাল শহরের আরো কয়েক জায়গায় ছোট খাটো হামলা হয়ে গেছে। দু পক্ষই সেজে আছে। ঝোপ বুঝে কোপ মারবে বলে। মেয়েটির বাবা বসার ঘরে আসর জমান। পাড়া পড়শীরা আসেন। পুরোনো কালের সেই সেই বছরের দাঙ্গার সময়কার সেই সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে। মেয়েটি তার বাবাকে বলতে শোনে—এদিকটায় দাঙ্গা না ছড়ালে বাঁচি। আমরা তো চার দিকেই ঘেরা। তিন দিক 'ওদের' দখলে, এক দিকে খানাখন্দ ডোবা। অন্য কে যেন বলে, নাঃ পাড়ায় ঢুকবে বলে মনে হয় না। বাবা বলেন, কিন্তু আমরা তো বলতে গেলে বাস্তার মুখেই। কোপের তলায় একেবারে। আরেকজন বলেন, রাস্তার মুখে আব কোথায়। চারটে বাড়ী পেরিয়ে তবে তুমি। আর অতো ভেবো না। আমরা তো আছি।

রাত নামে। লোকে ভাবে কাল হয়তো সামান্য সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল হবে। চাল তেলে টান পড়েছে। জানা তো ছিলো না, নইলে কিছু মজুত করা যেতো। সেই রাতও আগের রাতের মতোই নিষ্প্রদীপ থাকে। বাচ্চাকাচ্চারা জলদি জলদি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বড়োরা শুয়ে শুযে ভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে কিনা। গাছে গাছে বাদুড় নামে ঝুপঝাপ শব্দে। শেয়াল চলে যায় উঠোনে খরখর শব্দ তুলে। তড়াক করে জেগে ওঠে মানুষেরা। নিশ্বাস চেপে উৎকর্ণ হয়। রাত গভীর হয়। হঠাৎই বড়ো রাস্তার দিক থেকে হল্লা ভেসে আসে। চিৎকার চেঁচামেচি। ঘরে ঘরে সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বুঝতে পারে না কি করবে। উত্তেজনায় থর থর করে। বাইরে বেরোতে সাহস পায় না। মেয়েটিরও ঘুম ভাঙে। উঠতে যাবে, কিন্তু মা ওকে আঁকড়ে ধরে। শুয়ে থাক চুপ চাপ। ভয়ে শুকিয়ে গেছে গলা। মেয়েটির বাবা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কাকা যায় জানালার পাল্লা ফাঁক

করে বাইরেটা একটু দেখে নিতে। হ্যারিকেন নিভিয়ে দেয়, পাছে আলো ছড়ায় বাইরে। জানালা খুলতেই নজরে পড়ে, আকাশের কালো অন্ধকার ঝলসে উঠেছে লাল আগুনে। ঘন্টা বাজিয়ে দমকল আসে। পুলিসের গাড়ী আসে ভারী শব্দ তুলে। চিৎকার চেঁচামেচি চলতেই থাকে। সাহস করে কেউ কেউ বাইরে বেরোয়। কালো ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। তার মধ্যে আগুনের ধকধকে আভা। অন্ধকারেই পরস্পরের সাড়া পেয়ে দু'চারজনের জটলা হয়ে যায়। ঠিক কোথায় হতে পারে আগুনটা? কার ঘরে? কার দোকানে? লোকজন কেউ মারা পড়লো নাতো? আস্তে আস্তে আগুন কমে। চিৎকার চেঁচামেচি কমে। দমকল চলে যায়। পুলিসের গাড়ী টহল দেয়। মেয়েটির বাবার কপালে ভাঁজ পড়ে। রাস্তার উপরে যখন এসে গেছে, পাড়ায় ঢুকতে আর কতক্ষণ। মেয়েটির কাকা বাইরে বেরোয় অন্ধকারে। অন্ধকারে জল্পনা কল্পনা চলে। ঠিক হয়, আজ রাতে আর ঘুমানো ঠিক হবে না। কিছু কিছু লাঠি সোটা ইঁট পাথর জড়ো হয়। যদি সত্যিই আসে, কিছু একটা তো করতেই হবে। আটকাতে হবে। পালা করে রাত পাহারার আয়োজন হয়।

এই ভাবে রাত কাটে। ভোর হয়। পাহারায় জেগে থাকা ছেলেরা ঘুমোতে যায়। বড়ো রাস্তায় পুলিশের টহল। কিন্তু লোকের মনে এতে কোনো স্বস্তিবোধ জন্মায় না। উটকো খবর আসে এখান সেখান থেকে। জানা যায় কাল বাজারের পাঁচ ছটা দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমন কি দোকানের সঙ্গে লাগোয়া বাসা ছিলো দু চারটি। পুড়ে ছাই। লোকজনের কি হলো? জানা যায় না সঠিক সংবাদ। কেউ বলে পুড়ে ছাই হয়েছে। কেউ বলে পুলিশ এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। গলিরাস্তার মুখে আজ আর যাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশেরা মানুষ দেখলেই তাড়া করে আসছে। এর মধ্যে বেপাড়ার খবর চোরা চালান হয়ে আসে এ পাড়ায়।

'অমুক রোডের সাতটি ঘরে আগুন দিয়েছে কাল রাতে।'

'কচুকাটা করেছে। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় নি।'

'মেয়েদের নাকি......।'

'পুলিশ তো শুনলাম পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো।'

'আরে পুলিশের গাড়ী থেকেই পেট্রোল এনে ঢেলেছে।'

শুনে শুনে মানুষগুলোর কপালে বিনবিনে ঘাম ফোটে। মেয়েটির বাবা গুম হয়ে বসে থাকে। কী করবে বুঝতে পারে না। এর মধ্যে খবর পাওয়া যায়, কেউ কেউ নাকি পাড়া ছেড়ে পালাবার কথা ভাবছে। পিছন দিকের খানাখন্দ পেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর একটা রাস্তা নাকি বানানো যাবে। 'ওদের' এলাকায় পা দিতে হবে না। আর একবার স্টেশনে পৌঁছুতে পারলে তো যেখানে খুশি চলে যাওয়া যায়। স্টেশনে তো আর কারফিউ নেই। সবাই বিবেচনা করে কথাটা। মেয়েটির বাবাও। কিন্তু আস্তমস্ত পরিবার নিয়ে পালাবো বললেই তো আর পালানো যায় না। একবার পালালে কি আর ফেরার পথ থাকবে? তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে শরীরের সমস্ত রস ঢেলেছে এই মাটিতে। নিজেরা ছিবড়ে হয়ে গেছে, মাটি সেজেছে ফুলে ফলে। সকলেরই পিছনে রয়েছে আরেক দাঙ্গার, আরেক পালানোর দগদগে পোড়া স্মৃতি। ছোট ভাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়েটির বাবা। কী করা যায়।

দুটো দিন, দুটো রাত যায়। কাছাকাছি নতুন কিছু ঘটে না। তবে চারদিকের খবর যা শোনা যায়, বোঝা যায় অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এদল ওদল যার যার সুযোগ মতো কেউই পিছিয়ে নেই। এদিকে গুজব যা ছড়ায় তাতে এখন বেশ জায়গা করে নিয়েছে মেয়েদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা। ছেলে ছোকরা থেকে বুড়ো হাবড়া, সবাই রসালো ধারালো জিভে লালা ঝরিয়ে গল্প করে। অমুক পাড়ায় হানা দিয়ে ধরে এনেছে বেছে বেছে ছ'টি মেয়ে। তারপর......। মেয়েটির বাবাও শোনে এই সব গল্প। অন্যসব সোমত্ত মেয়েদের বাবার মতো তারও কানে কথাগুলো গরম শিসে হয়ে ঢোকে। তারই মধ্যে এক রাতে একেবারে কাছে পিঠের এক বাড়ীতে হামলা হয়ে যায়। কেউ প্রস্তুত ছিলো না। হঠাৎই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে আঘাত পড়ে। ঘর জ্বলে, লুটপাট হয়। মেয়েদের গায়ে হাত ওঠে। বাধা দিতে গিয়ে গলায় কোপ পড়ে বাড়ীর কর্ত্তার। বেঁচে যান, কারণ আঘাত তেমন মোক্ষম ছিলো না। পাড়ার ছেলে ছোকরারা দৌড়ে আসে। পুলিশও এসে পড়ে। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে পুলিশের গাড়ীতে করে কর্ত্তাপুরুষ হাসাপাতালে যান। বোবা হয়ে জবুথবু বসে থাকে পরিবারের বাকী মানুষেরা। পাড়া পড়শী সান্ত্বনা দেয়। ভাগ্যিস, প্রাণে তো বেঁচে গেলেন। আমাদের গল্পেব মেয়েটির বাবার মুখে কথা ফোটে না। কেবলই তার মনে হতে থাকে, এবার তার পালা। এর পরের আক্রমণ তার ঘরে। চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে এক বীভৎস দৃশ্য। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে ঘরে। সার সার পড়ে আছে মৃত দেহ। বক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। আতংকে লাফ দিয়ে ওঠে লোকটা। না, আর দেরী নয়। কিছু একটা সিদ্ধান্ত করতেই হবে।

সারা দিন পাড়া পড়শীর সাথে শলা পরামর্শ চলে। এক এক জনের এক এক মত। কেউ বলে বউ ছেলে মেয়ে পাঠিয়ে দাও। দু ভাই পড়ে থাকো মাটি কামড়ে। লোকটা ভাবে, পাঠাবে কোথায়? আত্মীয় স্বজন দূরে দূরে যারা আছে, তারা কি এত জনের বোঝা সামলাতে পারবে? ভেবে ভেবে দিশা পায় না লোকটা। ঘরের প্রতিটি মানুষ যন্ত্রের মতো, পুতুলের মতো দৈনন্দিন কাজ সারে। বাচ্চারা খেলাধূলা ভুলে মায়ের আঁচলে আঁচলে ঘুর ঘুর করে। যারা খুবই ছোট, তাবা কোল আঁকড়ে থাকে। এমন কি পাখি পাখালিরা যেন টের পেয়ে গেছে, মানুষের সংসারে কোথাও গভীরে খুব বড়ো রকমেব তাল কাটা গেছে। তাবা কিচির মিচির ভুলে এপাশে ওপাশে তাকায় শুধু। ধান কুড়োতে উঠোনে নামে না।

সেই রাতে ভাই ও মাকে ডেকে পবামর্শে বসলেন মেয়েটিব বাবা। কী করা যায় এবার। ঘাড়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিপদ। পালাবার পথ বলতে কিছু নেই। আছে আঘাটা। খানাখন্দের ভিতব দিয়ে পথ করে নেওয়া। অনেক সময় ধরে জল্পনা কল্পনা চললো। মা কাকীমার দূত হযে মেয়েটি ছুতোনাতায় ঘরে ঢুকেছিলো কথা শুনতে। বাপেব ধমক খেয়ে ফিবে গিযে চুপচাপ বসে পড়লো দুজনের মাঝখানে। অনেকক্ষন পর বাবা ডাকলেন মাকে। জানালেন সিদ্ধান্তের কথা। ছেলে দুটোকে তৈরী করে দাও। আজ রাতেই ওদের পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো বাইরে কোথাও। শুধু ছেলে দুটো কেন? মা জিজ্ঞেস করলেন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে। বাড়ী খালি করে সবাই তো আর যেতে পারবো না। ছেলে দুটোই যাক। যদি কাটা পড়ি, বংশটা তো বেঁচে থাকবে! মা গেলেন রান্নাঘরে। কাকীমাকে বললেন, ছেলে দুটোকে

তৈরী করে দে। আজ রাতেই ওদের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু ছেলে দুটো কেন? কাকীমা জিজ্ঞেস করেন মাকে। বাড়ী খালি করে সবাই তো আব যেতে পারবো না? ছেলে দুটোই যাক। যদি কাটা পড়ি, বংশটা তো বেঁচে থাকবে!

তারপর মাঝরাতের অন্ধকারে বাবা, মা, ঠাকুমা, কাকা ও কাকীমার সঙ্গে সার দিয়ে মেয়েটিও দাঁড়ায়। ছোট ভাই দুটো, একটি সহোদর, একটি খুড়তুতো, অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে ঘুম-ঘুম চোখে বেরিয়ে পড়ে বাড়ীর বিশ্বস্ত এক কাজের লোকের সঙ্গে। মা কাকীমাব চোখ চিকচিক করে অন্ধকা৻ব। ঠাকুমা ঈশ্বরকে ডাকেন মনে মনে। আর দাঙ্গা নামক এক পাশবিকতাব মুখে কি' কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসহায় কয়েকটি মানুষ।

থেমে পড়লে কেন? বলো, কী হলো তারপর?

মেয়েটির বাড়ীতে হামলা হলো তো?

মেয়েটাব কি খারাপ কিছু, মানে ইজ্জত নিয়ে......

একটু চুপচাপ

আঃ। তোমরা বড্ডো বকতে পারো। একটু চুপ কবো না। আমাকেও একটু চুপ থাকতে দাও। মেয়েটার কী হলো তার আমি কি জানি? কিন্তু বংশটাতো বেঁচে গেলো!

শেখর দাশ

ফেরারী

'বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার'......

এই শহরটা শহর নয়, ছাউনি। অস্থায়ী। একদিন সবকিছু গুটিয়ে ফেলবে ওরা; চলে যাবে অন্যকোথাও। শহর তখন হয়ে পড়বে তেপান্তরের মাঠ। মানুষ নিজের খেয়ালে বসত গড়ে, ভেঙ্গেও ফেলে ; যেভাবে নিয়তির খেয়ালে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যত বিশ্বাস-স্বপ্ন-সম্পর্ক। জীবনের কোনো স্থিরতা নেই।

এই শহরের প্রবেশমুখে লেবেলক্রসিং। ক্রসিং-এব পাশে বাধাধরা নীরব রেলগুমটি। মাঝেমাঝে লোহাব ভারী গেট আড়াআড়ি শুয়ে পড়লে জানান দেয়, ট্রেন আসছে। ট্রেন আসে, বেরিয়ে যায়। সারসার বাস-ট্রাক-রিক্সা-অটো দুপাশে থমকে থাকে। গেট তুলতেই সরব হয় দুপাশের সদাপ্রস্তুত যানবাহন। তারপর যে যার পথে ছিটকে চলে যায়। রেলগুমটিব লোকটা সবুজ নিশান আস্তে আস্তে ভাঁজ করে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে একটা ভাঙ্গাচোরা শহরের আপৎকালীন চলাচল।

এই সময় বাসে বসে সৈকতের মনে পড়ে নীলুদির কথা। নীলুদি হয়তো দাঁড়িয়ে আছে সেই বারান্দায়, যে বারান্দাটা ববফিকাটা বাঁশের বেড়ায় আড়াল করা, আর বরফির শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবুজ মানিপ্ল্যান্ট। বিকেলে দেখা হলেই হেসে নীলুদি বলবে, 'এই মাত্র তোব কথা মনে হচ্ছিল।' সৈকত অবিশ্বাসের হাসি হেসে খামোখা ওকে একটু চটিয়ে দেবে, 'আচ্ছা! তা তোর কথায় তোকে আবার নতুন করে মনে পড়লো।' নীলুদি অভিমান করবে, যদিও বোঝে স্রেফ ফাজলামো। গোলাপী চাদর আলতো হাতে খুলে আবাব জড়িয়ে দেবে শরীরে, বলবে—'তোর স্বভাবটা আর গেল না। ফিউজ কবাব ব্যাপাবে খুব পারদর্শী, দাঁড়া তোকে একদিন...।' এরপর কিছু বলবে না নীলুদি। ঢিলেঢালা সোয়েটার সামলে মুচকি হেসে সৈকত বলবে, 'ঠিকই, কেমন আছিস তোবা।' নীলুদি জবাব দেবেনা এবাবো। মানিপ্ল্যান্টের কচি পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্ষীণ ধমক দেবে—'রাস্তায় কেন, ভেতরে আয়।' ঠিক এই মুহূর্তের জন্যে সৈকতের ভেতরে এক চিবকালীন অপেক্ষা। গেট খুলে এগিয়ে যাবে নীলুদির খুব কাছে। হয়তো অনেক কথা বলে ফেলার সাধ হয তখন, হয় না। কাছে যেতেই নীলুদি সৈকতের ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বলবে—'কাকের বাসা! এই, আজ এত দেরী যে?' সৈকত ফাজলামো করে বলবে— 'ড্রাইভারটা তো আর নীলুদি নাম্নী মহিলাব বর......' মুখে দুহাতে চাপ দিয়ে এবার সত্যি ধমকাবে —'দেখো অবস্থা।' নিশ্চুপে হাসবে দুজনে। গম্ভীর হয়ে আবার জিজ্ঞেস করবে— 'ক'টার বাসে ফিরলি রে?' সৈকত জবাব দেবেনা, ঠিক জোগায় না। বোকার মত চেয়ে থাকবে। অবাক হয়ে নীলুদি বলবে— 'কি দেখছিস?' ম্লান হাসবে সৈকত। প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে। অদরকারী একটা কথা বলে ফেলবে—'আয়েম এক্সট্রিমলি

টায়ার্ড।' নীলুদি তখন ব্যস্ত হয়ে বলবে—'তা বাইরে কেন? ভেতরে আয়। যা ঠাণ্ডা রে বাবা? পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকবে সৈকত। হাতল ভাঙ্গা চেয়ারটা ওর নির্দিষ্ট স্থান। সেখানে বসবে এরপর। উসখুস করবে। নাচানাচি করবে, কখনো ছিটকে যাবে আয়নার কাছে, কখনো আলমিরার কাছে, গড়াবে বিছানায়, পাটকরা বিছানা দোমড়াবে, আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে চেয়ারে। নীলুদি লক্ষ্য করবে, সব চঞ্চলতার পর আপাতক্লান্ত সৈকতকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে ধমক দেবে—'হলো তো? এবার চুপ করে বোস।' সৈকত আবার হাবার মত নীলুদিকে দেখবে, অজ্ঞাতসারেই এলোমেলো শিশুর মত বলে ফেলবে— 'না-আ।' নিঃশব্দে প্রশ্রয়ের হাসি হাসবে নীলুদি, স্মিত স্বরে বলবে— 'সত্যিরে, তোর কথাই ভাবছিলাম'। একধরণের অবিশ্বাস্য উষ্ণতা আচমকা স্পর্শ করে যাবে ওকে। কথা জোগাচ্ছেনা আর। এইবার মনেপ্রাণে নীলুদিকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হবে। আবার চুলে বিলি দিয়ে নীলুদি বলবে—'কী গন্ধ! ক'দিন চান করিসনি বলতো!' ভেতরে ভেতরে আরো কাতর হয়ে পড়বে সৈকত। অস্থির অনুভূতি চাপা দিতে অস্বাভাবিক স্মার্ট ভঙ্গিমায় দুহাত বুকের ওপর রেখে সুরহীন চেঁচিয়ে উঠবে—'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।' কৃত্রিম ভাবলেশহীন মুখে নীলুদি অবাক হবে- 'তাই নাকি?' 'ইয়ারকি করছিস্।' 'না, না। আচ্ছা মানলাম তুই বিষই খেয়েছিস। এবার চুপ। কি পাগলরে বাবা! তুই এমন কেনরে!' সৈকতের শরীরে একটা ডানাকাটা ফড়িং অনবরত লাফাবে তখন। নীলুদির স্নেহশীল মুখ দুহাতের চেটোয় আকড়ে ধরে ফিসফিস করবে— 'জানিনা, জানিনা, বলবোনা, যাঃ।'

রেলগাড়ী বাদামী, রেল গুমটি বাদামী, রেলের ক্ষুদেক্ষুদে পুল বাদামী। কোথায় কোথায় হারিয়ে যাওয়া নিঃসঙ্গ রেললাইন-ও বাদামী। একধরণের বাদামী নিঃসঙ্গতা। ট্রেনে চাপলে এরকম হয়; কোথায় যেন সবুজ অরণ্যে হু-হু বাদামী বাতাসেব প্রবেশ। কদাচ সেরকম বাতাসের দেখা মেলে। ঝাঁক ঝাঁক শালিখ রেললাইনের দুধারে বাতাসের মত ওড়াউড়ি করে। শালিখের বং বাদামী। আর কি আছে ঐ রঙে? ফুসফুস! বক্তধোয়া নিস্প্রাণ ফুসফুসের-ও আসল বং ওবকমই।

বাসের ঘুপচি জানালায় সৈকতের ঠাঁই নেই। ড্রাইভারের পাশের সীটে বসেছিল এতক্ষণ, থামতেই পোড়া ডিজেলের ধোঁয়ায় বসা দায় হলো। অসহ্য গ্যাস। রামনগরের মুখে দুনম্বর গেটে প্রায়ই গাড়ী থামে। শিলচব ছেড়ে এইসময় রোজ একটা ট্রেন বেরিয়ে যায়। পাহাড় লাইন। সারবন্দী জানালায কত অপরিচিত যাত্রী উঁকিঝুঁকি দেয়। সৈকত পরিচিত মানুষের মুখ খোঁজে, মেলেনা, নাঃ, চেনাজানা কেউই হয়তো শিলচব ছেডে যায়নি। গুমটি-ম্যান গেট তুলে নেয়ার পরও বাসটি ছাড়েনা। কখনো ড্রাইভার বা অন্য যাত্রীদের জড়ো করতে বেশ সময় কেটে যায়। অন্যদের মত সৈকত সিট ছেড়ে নামেনা। স্থির চোখে চেয়ে থাকে দূরের ছুটন্ত পাহাড়লাইনের দিকে। ঝাপসা মানুষের মুখ-শরীর চোখে পড়ে। মনে হয়, তবু মানুষগুলো বড় পরিচিত ছিল, আপনজনেরা ছেড়ে চলে গেল ওকে। ওরা দূরের যাত্রী, বিদেশে যাবে, কারণ রাতের ট্রেন বিদেশ ভালবাসে। এইসময় সৈকতের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হবে—'তোমরা যদি রাঁচী যাও তো সেখানকার আকাশ-বাতাসকে বলে দিও, আমি ভাল আছি। কিন্তু সাবধান, মোরাবাদী মাঠের সেই ঘুমন্ত স্বপ্নের ঘুম যেন

ভুলে-ও ভেঙ্গে দিওনা।'

বাস এগোয়। সৈকত চেয়ে থাকে। শিলচরের উপকণ্ঠে শেষ বিকেলের ছায়াছায়া ভাব। দূরে ওৎ পেতে থাকা চতুর বিড়ালের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে শান্ত নীল বড়াইল। চূড়াটা অদ্ভুত। ঠিক জোড়া স্তনের মত। নীলস্তন। এমন পাহাড় বিশ্বব্যাপি খুঁজলেও মিলবে কিনা সন্দেহ। ঐ পাহাড়ের গহীন আলপথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে এইমাত্র বেরিয়ে যাওয়া ট্রেনটা কাল ভোরে পৌঁছাবে লামডিং। সৈকত ডানদিকে তাকায়। খোলা জমি। ধানকাটা। খাকিরঙের মত রুক্ষ। জায়গাটা নীচু অপেক্ষাকৃত। বর্ষায় জল জমলে নৌকো চলে, শীতে গরু চরে। এখনো গরু-চরছে, রাখালবিহীন। আজ-কাল রাখালের পাট চুকে. গেছে। নাহলে গরু আর রাখালের পায়ে ঝিলিক দিত গোধূলি। পৃথিবীব বহুবিধ জিনিষ স্থিরতা হারিয়ে ফেলে শীগগীর। কোনোকিছুই স্থয়ী নয় বিশেষ। সেই রাখাল নেই. গোধূলিও নেই। গাভীর পায়ে নূপুরের মত ধূলোর খেলার নামই তো গোধূলি, সংগে রাখাল! এসব আর চোখে পড়েনা।

বাস আবার দম নেয় ওভারব্রিজের মুখে। ফ্যাচাং! ওয়ান ওয়ে রোড। উল্টোমুখের গাড়ী বেরিয়ে গেলে ছাড়ান পাওয়া যাবে। বাঁশের লম্বা গেট আড়াআড়ি রাস্তায় কাৎ। বাসে খিস্তির ঝড়। রাস্তার বাঁদিকে জোড়াকালীর বারোয়ারী-তলা। সৈকত গুণে গুণে দুবার নমস্কার করে, ভাবে, কালীর মুঠোয় নীলরক্ত! বোধহয় ঐ নীল পাহাড়েব শরীর থেকে নেয়া। বড়াইল আর দেখা যায না এখান থেকে। গাছগাছালি বাড়ীঘব আড়াল করেছে। বাঁদিকেব মাছিমপুবের রাস্তায় ধুলোওড়া গাড়ীর ভিড় জমে। অনন্তকালের জন্যে বাসটা থমকে গেছে হাফ্‌ফিনিশড্ ওভার ব্রিজের মুখে। বিপরীত মুখী গাড়ীর এখনো পাত্তা নেই। ব্রিজের পাশ ঘিরে রাস্তাটা বেশ কযেকবার শরীর মুচড়ে ছুঁযেছে রেলস্টেশন। এবমধ্যেই আবার আবেকটা লেবেলক্রসিং। শানটিং ইনজিনেব ঝামেলা হলে তো আব কথাই নেই। এভাবে একনাগাড়ে থামতে থামতে বাস যখন স্টেশনে পৌঁছাবে তখন যাত্রাপথে দু'ঘণ্টা অতিক্রান্ত প্রায। কুড়ি মাইল দূরত্ব পেরোতে সময় লাগে দু'ঘণ্টা। লাইনবাস, মর্জিমাফিক। সৈকত-র বিরক্তি বাড়ে, কিন্তু তাড়া নেই। কে আছে শিলচরে এমন আর। নিতান্ত সংসারের গুটিকয়েক অবসন্ন মানুষ ছাড়া। এরা কি দিয়েছে ওকে। কতটুকু দেবাব শক্তি আছে ওদের। আছে, স্বীকার না করলে বিবেক দংশায়। এক শতচ্ছিন্ন নাভির মর্ম্মমূল ছুঁয়ে জন্মেছে সবাই, ভাইবোন, নিঃশব্দ তুষাবপাতেব মত বুকে জমে গেছে মায়া টান। এরাই রক্তে গুজে দিয়েছে এক নির্লিপ্ত নিমন্ত্রণ। স্নেহ অতি বিষম বস্তু, কথায় বলে। দয়ামাযা সংসারের উল্টোপিঠ। তবু এখনো মানুষ মানুষের রক্তে আশ্রয় খোঁজে। সংসার ছাড়া আব কে আছে। বোধহয় কেউ নেই। আছে, অনেক আছে। সময়ক্ষেপে যারা বদলে যায়, যারা ওর কাছে নির্বান্ধব স্বজন। মানুষের কোনো বন্ধু নেই; এও এক চলতি নিয়ম। কিন্তু নীলুদি কে হয়!

উল্টোমুখের যানবাহন এগোচ্ছে। বিভিন্ন যন্ত্রেব বিচিত্র শব্দ, ক্লান্তি বাড়ায়। মাছিমপুরের রাস্তায় ছুটে চলেছে গাড়ীর তীব্র স্রোত। এই রাস্তাটা ধরে মাইল পাঁচেক এগোলে সেই পাহাড় মত টিলার ওপর অরুণাচলের কালীবাড়ী। পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসে প্রতি বছর। নীলুদি একদিন বলছিল, 'পুজো দিতে হবে।' বোধহয় মানত

আছে ওর। বাস স্টার্ট নেয়। যাত্রীর খিস্তি থেমে গেছে। একটা ব্যস্ত অটো চঞ্চল শিশুর মত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। খুব আস্তে বাস এগোয়। সামনে পেছনে অজস্র গাড়ী। বাসের বাঁপাশে দেয়ালের মত পিছলে যায় ওভারব্রীজ। কে যেন প্রায় চেঁচিয়ে বলে যায় 'শ্লা, সাফোকেশন।' ঠিকই কেমন যেন দমআটা ভাব। সূর্য হুড়মুড় করে সরে গেছে সারাদিনের ক্লান্ত শহর ছেড়ে, এখন রোদহীন আলো।

নীলুদি কি আজ সেই গোলাপী চাদর জড়াবে? শীত তো কম মনে হচ্ছে। বোধহয় সবুজ মানিপ্ল্যান্ট ছিঁড়ছে বরফিকাটা বেড়ার আড়ালে। নীলুদি তোর জন্যে-ও শিলচরে আসতে মন চায়।

বাস ষ্টেশনে ঢুকছে। একদিন ঠিক এমন সময় একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল এই চত্বরটায়। কি যেন খুঁজছিল এদিকওদিক। বোধহয় রিক্সা। নীল শাড়ীব সীমানায় হলুদ পাড়। শরীরে শরীর হযে আছে। সৈকত-র টপ্ ফেভারিট। ছিপছিপে, পাতলা দুধের মত গায়ের রং, ভুল করে অর্ধমৃত পাখীর মত কপালে নীল টিপ, কাঁধে এয়ার ইণ্ডিয়ার ফোমব্যাগ, ক্লান্তির ছাপ নিয়ে সেই তরুণী! এখনো বুকে মোচড় দেয় বারবার। কোথায় থাকে সেই নারী। এরকম নারীদের বোধহয় কোনো নিবাস নেই। সেই হট ফেভারিট নীলাম্বরী! সময়ে অনেক জিনিষের দেখা মিলে যায়, অন্তত চোখে দেখা। পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। কোনো ভয়ানক আকাঙ্খা বুকে নিয়ে অনেক দূরে সরে যাওয়াই ভাল। সেই রমণীকে দেখেই নীলুদিকে বলেছিল--'তোমার চোখে নীল জল দেখে অনেক জাহাজ ভুল পথে বন্দর ছেড়ে চলে যায়।' নীলুদি অবাক চোখে বলেছে 'সেকি রে!' নীলুদি বোঝে না এত ঘোরপ্যাঁচ কথা। বোকার মত হেসে বলেছে, 'তোদের এই কবিতা-টবিতা আমার ভাল্লাগেনা।' সৈকত হাসতে হাসতে নীলুদির নাকে স্বল্প টোকা দিয়ে বলেছে, 'কবিতা নারে জীবন। জানিস, বড় খুবসুরৎ লেড়কী মাইরী।' চাপা হাসিতে মুখ ভরিযে নীলুদি বলেছে, 'তোর চোখে কে যে কখন কি!'

এইসব ব্যাপার হলেই সৈকত অর্থহীন হাসি হাসবে। নীলুদি মুখ ভেংচাবে। বলবে, 'চা খাবি বলছিলি না।' সৈকত গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলবে, 'থাক কষ্ট করে আর গরুর মুৎ......' কথা শেষ করার আগেই নীলুদির চোটো উঠে আসবে, ধমকাবে, 'এই দেখো আবার খারাপ কথা!' সৈকত ছিটকে সরে এলে নীলুদি এগিয়ে আসবে আবো। ঝাকড়া চুলেব ছায়ায কালো ক্লান্ত মুখের দুটো অস্থির চোখ নিরিখ করবে নীলুদিকে। নীলুদি বলবে, 'তুই কি বলতো? ঠাণ্ডা মাথায় কিছু করা তোর ঠিকুজিতে নেই, না?' এই সময় একটা শব্দাতিগ বিমান মগজের আকাশ চষে বেড়াবে। শব্দ হবে, সৈকত বিড়বিড় করবে—

'মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেলো দুপুর বেলায়'

বাহিত শব্দ নিয়ে বিমান আবার সবে যাবে। নীলুদি লক্ষ্য করে বলবে—'তোর কি হয়েছে?' বিহ্বল চোখ নিয়ে আড়ষ্ট গলায় বলবে তখন, 'জীবনানন্দ।' নীলুদি পরম মমতায় বলবে—'চা খাবি বলছিলি না?' 'না, জীবনানন্দ।' নীলুদির গোলাপী চাদরের উষ্ণ গহীন ছেড়ে পাখির ডানার মত পালকময় হাত নরম স্পর্শ দেবে সৈকতের ধুলোমাখা কপালে। ক্লান্ত চেতনা নিতান্ত আশ্রয়ের তাগিদে, প্রচণ্ড শংকায়

বলবে, 'তোর বিয়ের কি হলো?' 'দেখে গেছে ওরা।' নির্বিকার শোনাবে নীলুদির স্বর। এক ঝাঁক নীলপাখি এইমাত্র ফিরে যাবে নীলুদির ভরাট চোখে। সৈকতের মন টনটন করবে হঠাৎ। নীলুদি গোলাপী চাদরে আলতো দুচোখ ঢাকবে। অনেকক্ষণ। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলবে—'তোর কোনোদিন বিয়ে হবে না।' নীলুদি চোখ ঢেকে রাখবে আরো। কান্না। একসময় চোখ তুলে কান্না ভেজা মুখে সরল হাসি নিয়ে বলবে, 'সেই ভাল।' হঠাৎ ক্ষেপে উঠবে সৈকত। পাগলের মত গর্জে উঠবে—'আমি তোর বিয়ে দোবনা শ্লা! বরকে পিটিয়ে ফ্ল্যাট করে দোব। ওর টেকো মাথায় কাঁঠালের আঁঠা মাখাবো। এবারো বল, সেই ভাল!' নীলুদি নিঃশব্দে হাসবে। চোখে চোখ রেখে বলবে, 'আমি চলে গেলে তোর কি হবে রে।' বেমক্কা ধ্বস্ নামবে বুকে। সেই বিমান আবার উড়ে আসতে চাইবে। বাধা দেবে প্রাণপনে। অসহ্য সুখ হুমড়ি খেয়ে পড়বে গলায়। সৈকতের মত পুরুষের কান্নায় কোনো শব্দ নেই বা আড়ম্বর নেই। বোবার মত নীলুদির হাত নিজেই কপালে ঠেকিয়ে বলবে, 'বুলিয়ে দে।' 'কি!' 'দুঃখ।' নীলুদির মায়াময় শব্দ পাবে সৈকত, 'আজ ক'টা সিগ্রেট খেয়েছিস ঠিক করে বলতো?' 'একটিও না।' 'মিথ্যুক।' 'সত্যি, একটিও না, খেতেই মন চায়না তো!' 'থাক, থাক, ব্যাঙের আবার সর্দ্দি।' হু হু করে হাসবে দুজনে। শব্দহীন। যে হাসির অর্থ দুজনেরই জানা নেই।

নীলুদি এখন কেমন আছে? রেললাইনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে সৈকত। নীলুদি প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'আমি চলে গেলে তোর কি হবে?' জবাব যোগায় না। এর কোনো গুছানো জবাব নেই। তবু বলা যায়, 'মানুষ, তোমরা আমার জন্য একবিন্দু চিন্তা করোনা। নোনা জলের স্বাদ নিয়ে সমুদ্রেব পাশে থাকবো চিরকাল।'

মানুষের কথাবার্তা অতি সাধারণ, কিন্তু ইঙ্গিতবহ। অনেক অসাধারণ কথা বুকের গভীরে মরে যায়। যেমন, নীলুদি প্রায়ই বলে. 'পয়সা নিয়ে যাবি, বিকেলে যেন দাড়ি না দেখি মুখে, বুঝলি?' দাড়ি কাটা বা না কাটা সৈকতের কাছে কোন প্রবলেমই নয়। তবু গালে মুখে সজারুর কাঁটা জিইয়ে রাখবে, কারণ প্রতিটি মানুষের মন সেই অবিশ্বাস্য সুখের আস্বাদে লালায়িত।

প্রাণখোলা হাসির মত ট্রাংকরোড। ওর ভাললাগা জনপথ। এই রাস্তায় হাঁটতে ও অনাবিল আনন্দ পায়। জীবনে এখনো অনেক পথ আসে, যে পথে পথচলার কোনো ক্লান্তি নেই, কিন্তু মানুষ নেমে যায় আলপথে। এই পথেব বাঁদিকে পড়বে সরকারী হোমরাচোমরাদের কোয়ার্টার আর. এম. এস. ষ্টেশন আকাশবানী ভবন, ডানদিকে খোলা মাঠে মিলিটারীর অস্থায়ী শিবির, জ্যোৎস্না বাতে এদের যাযাবর নিবাস-গুলোকে উড়ন্ত পেঁজা তূলো মনে হয়। শিবিরের আরো পরে একেবারে গান্ধীবাগের ধার ঘেষে পাঁচিলঘেরা মাঠে নিহত গান্ধীমেলার কংকাল। বড় ভাল লাগে এই পথে হাঁটতে। এরপর বাঁদিকে বাঁক ঘুরলেই মালুগ্রামের রাস্তা।

বাঁহাতে বেশ ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁটছে সৈকত। ব্যাগে টুকিটাকি জিনিষপত্র, জামাকাপড়। কাল সকালেই সবকিছু ধুয়ে ফেলতে হবে। সোমবারে আবার ফিরে যাওয়ায় তাড়া আছে। মাটির বাঁধের ওপর ঘাসজমি রাস্তায় হাঁটছে সৈকত। পথের দুধারে স্থায়ী বস্তি, দুচালা ঘর, যেগুলো বন্যার জলে বরাকে নৌকোর মত ভাসে। খড়ের আচ্ছাদন, শুকনো বাঁশের বেড়া, এইসবের ফাঁকেফোকরে ধীর শান্ত গতিতে

ধোঁয়া বেশীদূর এগোতে পারে না, থমকে থাকে। বস্তির বউরা এখন তিন আধলা ইটের বুকে হাঁড়ি চাপাবে। ওদের মাতাল মানুষ ফিরে আসবে অন্ধকার হলেই। বস্তির ময়লা ন্যাংটো বাচ্চাগুলোর চেঁচামেচি; সবকিছু মিলেমিশে নির্মম টানাপোড়েনের স্টিলফটোগ্রাফি। কোনো শিল্পীরই উচিত নয় এমন ছবিতে জীবন দেয়া। দুঃসাহসে এদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুকটান করে বলতে ইচ্ছে করে, 'রোজরোজ তোমরা ভাত খাচ্ছ, না রুটি?'

এবার সোজাসুজি চোখে পড়ে বড়াইলের সীলকরা নীলাভা। দূর থেকে বিশ্বাস হয়না পাহাড়-পর্ব্বতে এত গাছগাছালি। দূর পাহাড়ের পাতার রঙও বোধহয় ঘননীল। এই শীতেব অবশ বিকেল, বস্তির ক্ষীণ চিৎকার, বরাকের বুকধোয়া স্বল্প কুয়াশা, ভীষণ দূর হাফলং হিলেব বৈকালিক শান্তশ্রী, এইসব মিলেমিশেই তো প্রকৃতি, তবে এত দুঃখ কেন, এত উদাসীন কেন, এত নির্লিপ্ত কেন? নির্লিপ্তিব মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে প্রমথদা কাব কবিতা বলে বলে কেন যে নিজের মেধায রক্ত ঝরায়—'এই মাটি, এই মেঘ, এই বনভূমি/আমাদেরে যত জানে, আমবা কি ততটুকু জানি/ এই বুক, বারবার মেধা ও মজ্জায যাবে ঘুরে-ফিরে খোঁজে, কে তাকে জেনেছে?'

এক মুহূর্ত দম নেয় সৈকত। এলোমেলো চিন্তা মাথায় হাঁটে, প্রকৃতি মানুষকে ভুলতে দেয়না কিছুই। অনেক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা স্থায়ীভাবে নিবাস গড়ে মনে। মানুষের চেয়ে প্রকৃতি বড়; আপাততঃ সেরকমই মনে হয় ওর।

এই তো কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে গন্তব্যে। পৌঁছেও যাবে একসময, কিন্তু সেই গন্তব্য বহুদূর, চলতে চলতেও যেখানে পৌঁছানো যায়না কোনোদিন। প্রকৃতির কাছে মানুষের সম্পর্ক ভুল। এই ভুল সম্পর্ক ধবে মানুষ পায়ে পায়ে হাঁটে, প্রকৃতি সবে যায়, মানুষ হয় উন্মাদ, লোকে বলে—মাথার গণ্ডগোল। এভাবে বেশ কয়েকবাব সৈকত হারিয়ে বসেছে সুস্থ মানসিকতা। বিশেষতঃ অসুখের ঘোরে, যখন চার দেয়ালে বন্দী, তখন। অসুস্থ শরীরের পাশে অনেক প্রিয় পবিচিত ভিড় করে দাঁড়ায়, একে একে সবাই চলেও যায়, তারপব একসময শান্ত পা ফেলে বাববাব কাছে আসে অনেকদিনেব অদেখা মেঘলা আকাশ, ধানের শীষে পাখির ক্রীড়া, হু-হু বাতাসের তাপাং বিল, বালুচর, এইসব। ওরা কপালে হাত রাখে, স্পর্শ দেয়, চুমু খায়, ফিসফিস করে, 'অকেনদিন দেখা নেই। অসুস্থ শরীর নিয়েই চলে এসো আমাদেব কাছে, আমরা অ-সুখী মানুষের সাথে সুখের সওদা করি, দাম নিই না।' ঠিকই, প্রকৃতির এত কাছে থেকেও মানুষ বড় দূবে সরে যায়। নীলুদির সাথে আজকের, এই মুহূর্তের সম্পর্কটা কি প্রাকৃতিক? নীলুদি কি ঠিকই অপেক্ষা করে? সৈকত ভেবে পায়না। দূরের কুয়াশাঘেরা অস্পষ্ট দিগন্ত সহসা অবিশ্বাস উসকে দেয় বুকের ভেতর। থাক, এই ভাল। সৈকত মাঝেমাঝে প্রিয় পরিজন উপেক্ষা করে। কারণ মানুষ আর প্রকৃতি কোনোদিন হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না বলেই।

—'নীলুদি, তোর ছেলের নাম আমি দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি, কি রাখবি জানিস, বলতো কি রাখবি?' নীলুদির মুখে সলজ্জ হাসি, বলবে—'কি নাম?' সৈকত হঠাৎ

উদাস হয়ে যাবে নীলুদির কৌতুকময় সরল চোখের সামনে। ম্লান স্বরে বলবে —'তোর ছেলের নাম হবে মৈনাক।' নীলুদি হাসবে। গোলাপী চাদর জড়াবে ভাল করে, গম্ভীর হবে আচমকা, নিরিখ করবে সৈকতকে। তারপর স্মিতকণ্ঠে বলবে —'আমার তো বিয়েই হবেনা।' চমকাবে সৈকত, বলবে—'কে বললো।' নবম জ্যোৎস্নার মত ঘনঘোর আবেশ নেমে আসবে নীলুদির শব্দে, বলবে—'বাঃ! তুই যে বলিস।'

নীলুদির সাথে আজ দেখা হলো না। গিয়েছিল, সদর দরজা বন্ধ, নাড়া দিয়ে প্রবেশের অধিকার আছে, তবু দরজার কড়ায় হাত আপসে থেমে গেছে, কেমন যেন শংকা, না সংকোচ। বাড়ীটা থমথমে, সবুজ পরদার আড়ালে ফ্লুয়োরেসেন্টের আলো নেই, বিবর্ণ হলুদ আলো, কি হয়েছে ঐ বাড়ীটায়। কেউ অসুস্থ? বিষণ্ন সৈকত ফিরে গেছে আড্ডায়। প্রমথদার সাথে দেখা হলেই নীলুদির খবব মিলবে।

আড্ডায কেউ নেই। ফাঁকা। এসময় থাকার কথাও না। এককাপ চা আব খুচরো কিছু চারমিনার নিয়ে অন্ধকারে বসে পড়ে। ঘরটায় আলো নেই। বাইরে হ্যাজাকের আলোর রেশ আসে কিছু কিছু। আবার আনমনা হয়ে পড়ে সৈকত। নীলুদিকে মনে পড়ে, কি হলো! বোধহয় বেড়াতে গেছে কোথাও। যাক যেখানে খুশি। মন অন্যদিকে বাঁক নেয়। মনে পড়ে, সেই বিকেল। শীতের মাস। ঝড়ঝনঝা বৃষ্টিপাত। শিলাবর্ষণ হয়ে গেছে আগের দিন রাতে। গ্রামীণ মানুষ বলছে, অলুক্ষুণে। মাঘমাসে ঝড়তুফান জন্মেও দেখেনি। সেদিনের বিকেল ছিল শান্তনীল, জলঝাপটায় ধোয়ামোছা। শুকনো ঘাস, একবাতের বৃষ্টি খেয়েই বেশ সজীব, ক্লান্ত পায়ে গরু চরেছে।

আজ হাল্কা বাতাসের মত আচমকা উড়ে আসে সেই বিকেলের স্মৃতি;—শাপুরের হাট, পথের দুধাবে হিজলের অন্ধকার, মোমিনপুবের সন্ধ্যা, আরামবনের মাতাল মানুষ, বিবিধ নারীপুরুষ, অবশেষে সেই বুড়ো লোকটার ঘড়ঘড়ে স্বর— 'হাটে হাটে মৌ বেচি। ওতে আর চলেনা মশাই।' লোকটা ওব চিন্তায় এখন প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়......

সামনেব লোকটা বেশ জোরেই হাঁটছে। শাপুরেব রাস্তায় লোক চলাচল এমনিতেই কম। তায আবার শীতকাল, গতরাতে বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সৈকত ফিরছিল শাপুরেব হপ্তার বাজার ঘুরে। এধার ওধার গ্রাম্য বাজাবে ঘোবা নেশার মত হয়ে গেছে। মোমিনপুরমুখো রাস্তায় চলাচল আরো কম। বাজার ফেরতা সবাই ফিরে যায ইটাখালি ঘুবে আরামবনেব দিকে। মোহনপুরের লোকজন যাতায়াত করে বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরে। সন্ধ্যার পর এসব রাস্তায় একা চলাচলে বিপদ আছে। হাতীর উৎপাত। অনেক আগেই বাজার ছেড়েছে সৈকত। মোমিনপুর অবশ্য বেশী দূব হয় না। সামনেব তিনটে বাঁক পেরোলেই জলবেড়ির কাঠের পুল, এরপরই মোমিনপুরের এলাকা। কাঠের পুলে উঠলেই মোমিনপুরের এবড়োথেবড়ো চালাঘর, দোকানপাট, ধানকোটার কলঘর সবই চোখে পড়ে। পাথর-ছড়ানো রাস্তায় হাঁটছে, ঠিক গজ দশেকের দূরত্বে এগোচ্ছে বুড়ো লোকটা। বুড়ো হলেও বেশ সমর্থ। হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। প্রথম বাঁকটা পেরোতেই জায়গাটা কেমন ছমছমে, একপাশে বাঁশঝাড়ের বড় বড় টিলা, অন্যধারে নীচু জায়গায় হিজলের ঘন বন; একধরণের অপার্থিব নিস্তব্ধতা। মনে হয়, এই পরিবেশ মানুষের নয়। জীবনের প্রতি বিন্দুতম মমতা যাদের নেই, তাবাই

এমন পথে আয়াসে চলে। তবু একলা পথিকের একটু শংকা হয়। শাপুরের নিতাই মণ্ডল বলেছিল, '—মাষ্টারবাবু একা যাইবেন না। উৎপাত আছে।'

বুড়ো লোকটা এবার আস্তে হাঁটে। একবার পেছন ফিরে তাকায়। সৈকতকে দেখতে পেয়ে হাঁটা বন্ধ করে। চড়া সুরে হাঁক দেয়, '—কোথায় যাবেন আজ্ঞে?' সৈকত লোকটাকে দেখে; লম্বাটে শক্তসমর্থ, চৌকো মুখে একটু কেমন যেন, নিতান্ত গোবেচারা চেহারার মানুষ। হাতে দুটো থলে, একটা বোতলে কেরোসিন। গায়ে ময়লা শার্ট, চাদর ভাল করে জড়ায়নি, গলায় জড়িয়ে রেখেছে মাফলারেব মত। ধুতি হাঁটু অবদি, এরপর দেখা যায়না, অন্ধকার। লোকটার গায়ের রং এখন বোঝার উপায় নেই। দৃঢ়স্বরে আবার জিজ্ঞেস করে,— 'কোথায় যাবেন?' জবাবে সৈকতের 'মোমিনপুর ছেড়ে আধ ক্রোশ।' জবাব পেয়ে লোকটা আবার বলে '—ভরসন্ধ্যায় এতটা পথ একা একা হাঁটতে পারবেন?' —কেন?' —'না, বলছিলাম জঙ্গুলে রাস্তা কিনা,তাই।' ততক্ষণে সৈকত লোকটার সাথে বেশ কিছু পথ পেরিয়েছে। আলাপ জমছে। সৈকত জিজ্ঞেস করে —'কেন, এই তো দুজন হলাম।' —'আমি তো মোমিনপুর তক যাচ্ছি।' ক্ষীণ হেসে সৈকত জানায় —'ওতেই হবে। আধক্রোশ বইতো নয়। তাছাড়া বনেজঙ্গলে ঘোবার অভ্যেস আছে।' লোকটা অবাক চোখে ওকে লক্ষ্য করে। দুজনায় হাঁটে নিশ্চুপে। পা আর পথের ঘর্ষণে শব্দ হয়। দুজন পথিক দূরত্ব অতিক্রম করে ক্রমাগত । লোকটা এদিক ওদিক তাকায়। আকাশের বুক আতিপাতি করে কি যেন খোঁজে। সৈকত আবাক হয়, 'কি হলো?' —'না মশাই, তারা খুঁজছি।' —'কেন!' —'বাঃ, জানেন না বুঝি? এক তারা দেখে ঘবে ফিরলে যে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়।' লোকটা জোরে জোরে বলে। নির্জন সন্ধ্যায় এত জোরে কথা বলা অর্থহীন। সৈকতেব অবাক লাগে। এক তারা দেখে ঘরে ফিরলে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়! একাকী জীবনযাপন লোকটার কাছে বোধহয় অসহনীয়। জীবনেব আব কতটুকুই বা বাকী আছে ওর। তবু প্রতিটি মানুষ আমৃত্যু সঙ্গ চায়, সহবাসে মানুষের কোনো ক্লান্তি নেই। ভরসন্ধ্যায় লোকটা সংসারে ফিবে যাবে মোলায়েম সাহচর্যের আশায়, সেখানে হয়তো সবাই আছে, তবু আদিম নিঃসঙ্গতা কাটেনা কিছুতেই। সংসারেই সন্ন্যাসীব ভিড বেশি।

সৈকত জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে কে কে আছে আপনার?' বৃদ্ধেব দৃষ্টি মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে আকাশের দিকে, তারপর শুকনো গলায় বলে, 'আছে সবাই, শুধু গিন্নী ঠাকরুণ নেই আর।' মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটে অসুখী বৃদ্ধ। দুঃখের কাছে জীবনেব সওদা বড় নির্মম। —'মশাই এখানে করেন কি, ফরেষ্টে চাকরী?' —'না, মাষ্টারী।' —'ও আচ্ছা আচ্ছা, তা একা একা হাটেঘাটে এত কি ঘোরেন, কি দেখেন এত! শহরে চাকরী নেননা মশাই?' —'শহবে কাজ কোথায়।' উৎসাহে লোকটা আবার বলে, —'আপনাকে প্রাযই দেখি, হাঁটছেন, বিড়বিড় করছেন। একা থাকতে আপনার ভাল লাগে তাই না?' সৈকত অবাক হয়। লোকটা তাকে চিনে তাহলে। জবাব দেয়না ওর কথার। চুপচাপ হাঁটে। একসময় অতি সাবধানে ফিসফিস করে, — 'ঠিক তা নয়।' লোকটা শুনতে পায় না।

—'আপনি কি করেন এখানে, চাষবাস?' —'তা অল্পবিস্তর, না থাকারই সামিল। খরাবন্যায় কিছু আর রাখেনা মশাই।' —'তো চলে কেমন করে?' —'আ-র চলা।

জঙ্গলের এটা ওটা বিক্রি করি। যেমন ধরুন, মৌ। এই এলাকার হপ্তার বাজারগুলোতে যাই, বেচি, এইতো। চলে না মশাই, ওতে আর চলে না।'

এখনো লোকটার রেশ বুকে লেগে আছে। সেই মেঘেজলে সাফসুতরো বিকেল, সন্ধ্যা, রাত, বিশাল আকাশে একটা তারা, বৃদ্ধের শংকাময় জীবনযাপন, সঙ্গীহীন। এখন লোকটাকে বুকে জড়িয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, 'হাটে হাটে মৌ বিলিয়ে আরো নির্বান্ধব হয়ে পড়বে বন্ধু!

ববিবারের সকাল, বেরোবার ইচ্ছে নেই তবু বেরিয়েছে। নীলুদির সাথে দেখা হয়নি। বাড়ীতে যেতে কেন যে মন চায় না। সৈকত লক্ষ্য করে, দোকানে ইয়ারদোস্তের আড্ডা। প্রত্যেকের সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। খোলা চারমিনার প্যাকেট, দেশলাই। জাপানী মডেলের আদুরে ট্রানজিষ্টার কাৎ হয়ে আছে। যন্ত্রটা সরগরম। সবাই তন্ময়। ওদের প্রাণপুরুষের শব্দ ভেসে আসছে ইথার কাঁপিয়ে। অনেকটা দীক্ষা নেবার ভঙ্গিতে উদগ্রীব ওরা, নিশ্চুপ। ইথারের প্রাণপুরুষ ওদের চিন্তিত আত্মাকে আশ্বাস দেয়— 'বিশওয়ানাথ প্লেড ডিফেনসিভলি।' সৈকত সরে যায় বড় রাস্তার দিকে।

টিউবে আলো ভবা, জ্বলছে, জ্বলে, রাত বাড়ে, ন'টা। নীলুদির সাথে আজো দেখা হয়নি। গেলো কোথায়। যাক যেখানে খুশি। প্রমথদার পাত্তা নেই। এখন দেখা না হলে আর একহপ্তা পর।

একটা বিক্সা গলিমুখে থামে। রিক্সার দুপাশে মাতাল চোখের মত স্তিমিত আলো। দুটো টলমলে পা নামছে, চিনতে ভুল হয়না। প্রমথদা। ভাড়া মিটিয়ে হাঁটছে গলিপথে একাকী। এলোমেলো চালচলন। নেশা করেছে। অন্ধকারেই বোঝা যায়, বুকে চেপে ধরা বাঁহাতে বই, পা টলমল চোখ ঢুলুঢুলু; আলোহীন পথে ওকে চিনতে ভুল হয় না। প্রমথদাকে চিনতে আলোর কোনো প্রয়োজন নেই। সৈকত ডাকে—'প্রমথদা'। চমকে ঘুরে তাকায় ও, জড়ানো গলায় সাড়া দেয়— 'আয়েম হিয়ার।' এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করে সৈকত—'পুরো একটা দিন তোর দেখা নেই, কোথায় ছিলি?' সেই চিরাচরিত জবাব প্রমথদার—'কোত্থাও না।' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেও ওর এই একই জবাব। সহসা সৈকতের কাঁধ চেপে ধরে ও, দৃঢ়গলায় বলার চেষ্টা করে,—'তুই গেছিলি কোন চুলোয়?' নির্ঘাৎ নেশা কবেছে। —'তোর নীলুদির কাছে গেছিলি?' —'যাইনি, কেন।' —'ঠিক আছে যাসনে আর।' —'কেন, কি হয়েছে?' হাসবার চেষ্টা কবে প্রমথদা, পাবেনা, জড়িয়ে যায় তবু বলে—'তুই কচি খোকারে।' —'কি বলছিস!' সৈকতের বিরক্তি বাড়ে। —'চল, চল।' একহাতে সৈকতের পিঠ জড়িয়ে প্রমথদা হাঁটে। কিছুটা কাহিল মনে হয়, জোরে বলে— 'তুই যাও পাখী পড়ছিস? শীর্ষেন্দু?' নেশায় বকছে এখনো। বেগে যায় সৈকত, প্রবল ঝাঁকুনি দেয় প্রমথদার শরীরে। ওর বুকে সেঁটে থাকা বইপত্তর ছিটকে পড়ে হাত থেকে। শিথিল শরীরে জাপটে ধরে সৈকতকে, নিতান্ত উদাসীন গলায় এক সরল অথচ বয়সহীন সত্য উচ্চারণ করে ও—'শী ইজ সিক্রেটলি ম্যারেড।'

·

আজ বর্ণী নদীর বুকে বোধহয় বেশি কুয়াশা। শীত। মোহনপুরের নীল টিলার আড়ালে দিনশেষের সূর্য ডুবছে। টিলার ঢালে বসতবাড়ীর তি-সন্ধ্যাপর্ব। খড়ছনের

ইতস্ততঃ এধারওধার কুঁড়েঘর। ছবির মত কুটির। টিলার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে জলা জায়গা, মাঝে মাঝে শুকনো ফালি ফালি জমি, ক্ষুদে দ্বীপ। ধোঁয়া উড়ছে অলসভাবে, কারা যেন পোয়ালে আগুন দিয়েছে, শীতকাতর কেউ হবে।

গতকাল সকালের বাসে শিলচর ছেড়ে চলে এসেছে এখানে। অরণ্যের সময় বড় অলস। বেলা আর যায় না।

পশ্চিমাকাশ লালচে, সূর্য ডুবেছে, বিকেলেব ক্লান্ত পথে থোকা থোকা নীলাভ সন্ধ্যা, সূর্যের আর অবকাশ নেই। তবু কথা দি‍ে গেলো —কাল সকালেই আবার আমাদের দেখা হবে। ঝিমন্ত হাত নেড়ে বিদায় জ'নায় বোরো ধানের কচি চারার ক্ষেত। পাথুরে রাস্তার পাশে ন্যাড়া শিমুলগাছের উঁচু মাথায় এখনো পাতলা বাদামী রোদ, অনেকটা আকুতির মত—শীতের রাত মাথায় করে রাতভর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবো। কাল আবার আসবে তো? কথা দাও। বিকেলেব ঝুলন্ত সূর্য প্রতিবার কথা ·রাখে।

আটপৌরে সাধারণ শাড়ী পরা ছোট্ট একটা মেয়ে পুল পেরিয়ে যায়। ছিপছিপে গড়ন, গ্রামীণ চাঞ্চল্য শরীরে। বেশ জোরে হাঁটছে মেয়েটা। সেবার শাপুরের বাজারে মেয়েটাকে দেখেছিল সৈকত। কতই বা বয়স হবে। আট-নয়। এর বেশী না। ডেকে কিছু বলতে ইচ্ছে হয় ওর। মেয়েটা বেশ দূর এগিয়ে গেছে। বাড়ী ফিরছে বোধহয়। সৈকত তবু জোবে ডাকে—'এই মেয়ে শোন তো।' মেয়েটা ঘুরে তাকায়। বয়েসী মেয়েদের মত আঁচলে বুকপিঠ ঢাকে। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দেয়—'ক্যানে?' —'শোন্ না, এদিকে আয়।' —'সাঁঝ হই গেলে যেতে ভই লাগবেক, হাত্তী বারাইছিল সিদিন।' মেয়েটা দেহাতী। কথা বলতে বলতেই সৈকতের দিকে এগোয়। কিছুটা লজ্জা পাওয়াব ভঙ্গীতে হেসে বলে–'ডাকলি ক্যানে বাবু?' সৈকত দেখে, মাথায় কোকড়ানো ঝাকড়া চুল, ক্লান্ত কচি মুখে কৌতূহল, মেয়েটা ঠিক কালো নয়, এই এখনকার মতো, রোদও নয় রাতও নয় যে রকম, ঠিক সেরকম গায়ের রং। —'তোর নাম কিরে?' —'শাঁওলী।' সৈকত বলেনা কিছুই। পলকহীন চেয়ে থাকে। মেয়েটা বলে— 'মুই যাই।' এবার চলে যায় শাঁওলী। ঐ দূর বাঁকের পেছনে হারিয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই বিজন প্রান্তর কাঁপিয়ে চিৎকার করে সৈকত —'না, তোর নাম ধূপছায়া।'

বর্ণীর জলে কোনো নৌকো নেই। ডিঙ্গিও নেই। অনেক নদীই নাব্য নয়। দূরে তাপাং বিল, যার জঠরে জন্মেছে বর্ণী, তারপর মিশেছে উত্তরের সেই বেনামী খালে। ভূগোলে এসবেব উল্লেখ নেই। অনেক খালবিল এখনো অগোচরে রয়ে গেছে। বিলের চারধার সবুজ, শীতের শস্য। পাশে ধানকাটা জমি, খাঁ-খাঁ। তাপাঙের বুক শুষে অবশ কুয়াশা দমধরা। বিলের স্তব্ধ কুয়াশা দেখে যে কেউ দু'দণ্ডের জন্যে ভাবলে ভাবতে পারে— সংসারে মানুষ বড় একাকী।

সৈকত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুলের ওপর। এইভাবে বহুবার বিকেল আসে, আর চূর্ণবিচূর্ণ হয় চেতনা। যে চেতনার নাম জীবন, আর যাকে ঘিরে ঘিরে ক্রমশঃ স্মৃতি আর স্মৃতি। বুকের ভেতর বেশ কয়েকটা মেঘলা আকাশ। বর্ষণহীন। নীলুদি চলে গেছে, ভালই।

বিলের বুক চিরে শাদা বকের দল উড়ে যায়। সবুজ প্রান্তরে উড়ন্ত শাদা

রঙ, এইভাবে অনেককিছু উড়ে যায়, বিলে কুয়াশা জমে সারারাত। সৈকত সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। জমেনা। শীতের প্রকোপ বেশী। এখন শব্দহীন অত্যাচার। রাতের শুরুতেই ঘাসে ঘাসে শিশির। হরিণ-চরা শান্ত ঘাস। না, এখানে, হরিণ চরেনি কোনোদিন।

দিগন্ত আর আকাশে মূলতঃ কোনো ভেদ নেই। এখানে যা আকাশ দূরে তাই আবার দিগন্ত। শুধু দূরত্বটাই অনেক। সেই নিশ্চিহ্ন দূরত্ব ডিঙ্গিযে ক্ষীণ তবঙ্গের মত ভেসে আসে বহু পুরনো শব্দাবলী—'আমি চলে গেলে তোর কি হবে রে ?'

—'কিসসুনা।' আশ্বাস দেয় সৈকত। বাতাসের মত অনেক অনেক শব্দাবলী নিজ নিজ খেয়াল খুশিতে জন্ম নেয়, আবার মরে যায়। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধকরে সৈকত। সিগারেটে জোর টান দেয়। কাশে, পাঁজরে কাঁপন হয়। অনেকদিনের অভ্যাসবশতঃ আলুথালু চুলে হাত বুলোয়। সেই অসহনীয় সুখটা এখন নির্লিপ্ত হয়ে দাঁড়ায়। —'কিস্‌সু হবেনা।' আশ্বস্ত হয় সৈকত।

এবার নিস্পলক তাকায় দূরে। চরাচরে দুহাত প্রসারিত করে জমেছে সন্ধ্যা। এখনো বেঁচে থাকার ক্ষীণ সাধ আছে বুকের গহীনে। ঐ মোহনপুরের মাঠ পেরোলেই জোড় শালিখের দেখা মেলে।

অরিজিৎ চৌধুরী

কাঁদিতে চায় তাহাও পারেনা

সাদা বেডকভারটা লালচে দাগে ভর্তি ছিল। ওষুধ এবং জামাইবাবুর পিঠের বেডসোর থেকে নির্গত রসের দাগ। সেই রসের গন্ধে পিলপিল করে আসছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ পিঁপড়ের দল। প্রকৃতই পিপিলিকা সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারণ ছবিদি বারবার পিঁপড়েদের সারটাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল, দূরদূর করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছিল, কিন্তু খানিক পরে প্রাচীন ক্ষয়ে যাওয়া খাটের পায়া বেয়ে আবার তারা বিরামহীন উঠে আসছিল। একটা নৃশংস গন্ধ রয়েছে ঘরটায়, বেডসোরের গন্ধই হবে। হাতলহীন ছারপোকাময় চেয়ারে বসে আমি উসখুস করছিলাম। আমি নিজে আসতে চাই নি। দুদিনের জন্য বাড়ী আসি, তার মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। তবু মা বলেছিলেন বলেই আসতে হল। প্রথমে মনে হয়েছিল মা বাড়িয়ে বলছেন, এসে দেখলাম মোটেও বাড়িয়ে বলা নয়। জামাইবাবুর হৃদরোগজনিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত চেহারাটা এখন দেখলেই ঝট করে শ্মশানেব কথা মনে পড়ে। কথা বলতে পারেন না। গলা দিয়ে শুধু ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয়। দুটো বেডসোর পিঠে, নীচে রবারের বিঙ। সাবা পাড়ায় একমাত্র ছবিদিদের বাড়ীতেই লাইট নেই। কানেকশন ছিল, বোধহয় বিল না দেযায কেটে দিয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় ঢাকা চাদব তুলে জামাইবাবুর শরীরটা বাঁকিয়ে পটু ও নির্লিপ্ত নার্সের মতো শয্যাক্ষত দেখায় আমাকে ছবিদি। একটু একটু মাংস ও হাড় দেখা যায় বাইরে থেকে। লণ্ঠনেব আলোটা ভাগ্যিস স্তিমিত।

আমাদের নিজেদের বোন নেই। ছোটবেলায় দিদি হিসেবে ওকেই পেয়েছি। আমাব দিদিমা আর ছবিদিব দিদিমা আপন বোন ছিলেন। সম্পর্ক একেবারে ফেলনা নয়। বিয়ে হবার পর ছবিদি করিমগঞ্জে এল। সেসময় ও মাঝেমধ্যে আমাদেব বাড়ীতে এসে থাকত। মা যখন দাদাকে পডাতেন, আমার চোখ তখন ঘুমে নেতিয়ে আসত, ছবিদি বলত, 'রেনুমাসী, আমি ওকে মাছ ভাজা করে খাইয়ে দিই।' কডকডে তেলে পেঁয়াজসহ ফুটন্ত সেই মাছ ভাজাব স্বাদ এখনো অম্লান। তখন সড়ক পথে সিলেট থেকে ট্রাকভর্তি মাছ আসত করিমগঞ্জে। ববফ কলে গিয়ে আমরা মাঝেমধ্যে দেখে আসতাম বিশাল সাইজের রুইকাতলার ডাই। একবার ভাইফোঁটায় ছবিদি মস্ত মাছের ছবিওলা একটা গল্পের বই কিনে দিয়েছিল। আমাদের পুকুরে ছিপ নিয়ে বসা জামাইবাবু বইটা দেখে বলেছিলেন, 'কানু, তোর দিদি মাছের ছবি দিয়েছে, আমি দেব তোকে জ্যান্ত মাছ।' সেদিন জামাইবাবুর বড়শিতে উঠেছিল মাঝারী সাইজের একটা কালবোস। মা বললেন 'তোর জামাইবাবু কথা রেখেছে। আমি খুশিতে মাথা নাড়তে ছবিদি বলেছিল, 'দূর বোকা, এটা হচ্ছে কালবোস, আর তোর বইয়ের মাছটা তো রুই, তাছাড়া কত বড়।'

ছবিদি আমাকে চা খাবার কথা বললে আমি প্রাণপনে বাধা দিই। হয়ত চিনি

কিংবা দুধ আনতে পাশের বাড়ীতে যেতে হবে। এরকম তীব্র দারিদ্র্য আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারিনা। কখন ওঠা যায় ভাবছিলাম। এ সময় কুন্তলা এল। প্রথমটায় চিনতে পারি নি। ছবিদি বলল 'প্রণাম কর। তোদের কানুমামা। এই হচ্ছে কুন্তলা। জানিস কানু, তিন বছর আগে বি, এ, পাশ করেছে, এখনো ওর একটা চাকরি বাকরী হলনা, ওই টিউশনি করে যা পায়। এই তো এখন টিউশন সেরে এল।'

কুন্তলা প্রণাম করতে কাছে এলে আমার মনে হলো একটা যুবতী মেয়ে এত কুৎসিত হয় কি করে। বেশ লম্বা বাঁকহীন শরীর, রঙ পেয়েছে বাবার কুচকুচে কালো, আর মুখশ্রী অনেকটাই আমাশাদীর্ণ ছবিদির মতো, এ মেয়ের তো বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। তবু মেয়েটা হাসি খুশি। প্রণাম সেরে বলল, তোমাব বিয়ের সময় আমি কিন্তু বরযাত্রী গিয়েছিলাম কানুমামা।

'সে তো একযুগ আগের কথা রে। তুই তখন এইটুকুন ছিলি।'

ছবিদি আমাকে বলল কুন্তলাকে চাকবী যোগাড় কবে দেবাব জন্য। অন্য কেউ হলে বলতাম আমি নিজে যদি এখন হঠাৎ বেকার হযে পড়ি তাহলে হাজার এক্স-রিলাক্সেশন দিলেও আব ইন্টাবভিউ দিয়ে কোথাও চাকরী পাবনা। এখানে সে ভাবে বলা যায় না। বললাম, 'চেষ্টা করব, তবে চাকবীব বাজার তো জানোই। তাছাডা আজকাল আবার নাগবিকত্ব নিয়ে সব জাযগায়ই ঝামেলা, আব শিলং-এ প্লেনসের লোকের থাকাই দায় এখন।

ছবিদি বলল, 'তবু তুই শিলং আছিস অনেকদিন, চেনাজানা আছে অনেক আর সেখানে বড় বড় অফিস প্রচুব, একবার গিয়েছিলাম তোব জামাইবাবুর সঙ্গে—'

কিছু পরে আসার সময় না জিজ্ঞেস কবে পারলাম না, 'তোমাদের চলে কি করে ছবিদি? কাজল কিছু পাঠায়?

কাজল আর কুন্তলা, এই দুই ছেলেমেয়ে ওদের। ছেলেটা চাকরী করে মরিয়ানীতে, সম্ভবত রেলে। ভালবাসাব বিযে করেছে বছর কয়েক আগে চাকরীতে ঢুকেই।

ছবিদি বলল, 'পাঠায়, প্রত্যেক মাসেই পাঠায। কিন্তু ওর-ও তো ঘর সংসার আছে, তাছাড়া কতই বা মাইনে পায়। গতবছব পুজোয এসেছিল, এবাব আর আসতে পারে নি। ওব পেনসনটা আছে, আর কুন্তলা টিউশনি করে যা পায। তোর জামাইবাবুব চাকরীতে অন্য যারা ছিল, সবাই তো ঘুষের পযসায দালান তুলে সুখে আছে, উনিই শুধু আদর্শ আদর্শ করলেন সারা জীবন, কি লাভ হল বল। ভগবান তো সততাব কোন দাম দিলেন না।'

এসব কথার কোন উত্তব হয না। ঘটনা সত্যিই তাই। জামাইবাবু সাপ্লাইতে চাকরী করতেন এবং ঘুষ নিতেন না। এসব এখন আর কেউ বিশ্বাস করবেনা। মনে হল বলি তবু তোমরা ভগবান ভগবান করো। শেষে ছবিদি আর কুন্তলার মুখেব দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এবকম কাটাকাটা কথা বলাটা এখানে নিষ্ঠুরতা বরং কিছু টাকা দিয়ে যাই। কিন্তু মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, আমার নাইট সুপারের ভাড়া, একদিনের হাতখরচা, ভাইঝির চুড়িদার পাঞ্জাবী আর দোলার বিয়েতে প্রেজেন্ট দেবার বাজেটে তাতে ঘাটতি হতে পারে। আমি করিমগঞ্জে এসেইছি সম্পর্কিত

শ্যালিকা দোলার বিয়ে উপলক্ষে, সেখানে কাটছাঁট করলে আমার বউ সুনন্দা কেলেংকারী করবে। নিজে আসতে পারে নি আমার শাশুরীর গুরুর উৎসব থাকায়।

ছবিদির বাড়ী থেকে বেরিয়ে পুরো করিমগঞ্জ শহরটাকে আমার এখন আধমরা মনে হল। আলোকোজ্জ্বল রাস্তাঘাট, সুসজ্জিত দোকান পাট। আধুনিক যুবক যুবতীরা, তবু আমার মনে হচ্ছিল সবাই যেন অর্ধমৃত, শ্মশানমুখী। কুশিয়ারার তীর ধরে আসছিলাম। পারে বাংলাদেশের জকিগঞ্জ, মধ্যিখানে নদী, দু একটা খেয়া চলাচল করছে বাংলাদেশ এলাকায়। একাত্তরে একদিন রাতে যুদ্ধ হল, দারুণভাবে করিমগঞ্জ থেকে অপারেশন চালিয়ে বিজয় গর্বে নদীটা পেরিয়েছিল সেদিন ভারতীয় সৈন্য। কিন্তু ঐদিন স্ট্র্যাটেজীতে একটু এদিকওদিক হলে এই শহরটা পাকিস্তানী সেনার দখলে চলে যেত। তবু সেই বিপদের মুখেও করিমগঞ্জের কোন লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দূরে পাড়ি দেয় নি। শিলং-এ বসে কাগজে সেই যুদ্ধের বিবরণ পড়ে আমার নিজের জায়গার লোকেদের মনে হয়েছিল অতিমানব। আর আজ মনে হচ্ছে সবাই যেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চামড়া পচিয়ে তিল তিল তিল তিল করে বাকরুদ্ধভাবে এগোচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুব দিকে জামাইবাবুর মতো। বেড়সোরের গন্ধটা লেগে থাকে আমার নাকে।

বাড়ী ফিরে দেখলাম মা, ছোটভাই নীলু, নীলুর বৌ সান্ত্বনা সবাই মিলে টিভিতে বাংলাদেশের নাটক দেখছে। কতবার ওরা ছবিদি ওদের কথা জিজ্ঞেস করে, আমি কথা ঘুরিয়ে নিই।

চলে যাব তিনদিন পরে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'শীতটা গেলে তুমি শিলং চলে এসো। মাস তিনেক থেকে আসবে। এই শীতটা টিকবে তো?' অন্য বুড়ীদের মতো মা কখনো বলেন না আমার দিন ফুরিয়ে এল। আমার কথার জবাবে মা বললেন, এই শীতটা কি বলছিস, আমি তোর ছেলের বিয়ে দেখে যাব।'

সবাই হেসে ওঠে। আস্তে আস্তে বেড়সোরের গন্ধটা মুছে যেতে থাকে। সান্ত্বনা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। 'এমমা, ভুলেই গিয়েছিলাম' বলে ফ্রীজ খুলে দুটো মস্ত মিষ্টি আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। নীলু বলল, আমার এক মক্কেল এনেছে কলকাতা থেকে, খেয়ে দ্যাখ্ সেজদা, ফ্যানটাসটিক টেস্ট।'

আমি বলি 'এগুলো খেলে রাতে আর ভাত খাব কি করে? আগের মতো রাক্ষস আর নেই রে আমি।' সান্ত্বনা হাসতে হাসতে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে গেল। হাসলে ওর ছোট ছোট চোখ দুটো বুজে যায়। তবু ভাল্লাগে দেখতে। সুগন্ধী মধুর, নীলুর মক্কেলের আনা কলকাতার মিষ্টির মতো। এরকমই চোখ ছিল মল্লিকাদির, প্রথম চাকরীতে ঢুকে অফিসে যাকে পেয়েছিলাম সবচেয়ে কাছাকাছি। 'তোমাকে আমি নিজের দিদির মতো দেখি' কতবার যে বলেছি মল্লিকাদিকে। কতবার ওকে সিনেমার টিকিট করে দিয়েছি। একবার ভাইফোঁটায় একটা নাগা চাদর-ও দিয়েছিলাম। ওর বর ব্যানার্জীদাও আমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু আজকাল আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না। সুনন্দা পছন্দ করে না ওদের। কুতকুতে চোখ সত্ত্বেও সুশ্রী ছিল মল্লিকাদি। বস্তুত আমি যতো মেয়েকে নিজের দিদির মতো ছোট বোনের মতো বৌদির মতো করে পেয়েছি বা পেতে চেয়েছি তাদের কেউই কুরূপা ছিল না। এরকমই একজন ছিল সুনন্দা। সে ছিল বন্ধুর বোন এবং যাকে সত্যি সত্যি বেশ কিছুদিন ছোটবোনের

মতো কেবল স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখার চেষ্টা করেছিলাম। একটা ঘটনায় সব বদলে যায়। পুলিশ বাজারের কাছে হঠাৎ একদিন দেখি উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে সুনন্দা। কাছে এসে বলল, 'আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে কানুদা। আমাকে আপনি বাড়ী পৌঁছে দিন।' বাড়ী ওদের অনেক দূর উম প্লিং-এ। ভাগ্যিস একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই তখনি। ট্যাক্সিতে সুনন্দা আর বসতে পারেনি, হাঁটু ভেঙ্গে শুয়ে পড়েছিল। আমি ওর পায়ের দিকে উঠব না মাথার দিকে স্থির করে উঠতে পারছিলাম না! শেষপর্যন্ত ঝটপট মাথার দিকে উঠে ওর নিরাপদ উর্ধাঙ্গ কোলে তুলে নিয়েছিলাম। পেটের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সুনন্দা। আমার ভয় হচ্ছিল ও না ট্যাক্সিতে জ্ঞান হারায়। আমি আমার খসখসে আঙ্গুল দিয়ে ওর কপালটা টিপতে থাকি। শুশ্রূষার অন্য কোন শালীন প্রকরণ আমার জানা ছিল না। একটু পবে ও আমাব কোলে অনর্গল বমি করে। বাঙ্গালী ট্যাক্সী ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে বলল, দিলেন তো সব বরবাদ করে। যাকগে, জল লাগবে?' আমি বলি 'তাড়াতাড়ি চলুন, ওকে নিয়ে বাড়ী তো পৌঁছুই আগে।' পাইনের কনকনে হাওয়াও গরম লাগছিল তখন, এর কয়েকদিন পরে সুস্থ সুনন্দা ওদের বাড়ীতে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'সেদিন যদি আপনাকে না পেতাম তাহলে আমার কি হত কানুদা?' আমি বললাম' 'কেউ না কেউ নিশ্চযই তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিত। এখন থেকে সাবধানে থেকো। ইনডাইজেশন হলে ওষুধ না খেয়ে কখনো বাড়ী থেকে বেরিওনা।' ও বলে, 'হ্যাঁ সবদিন তো আর আপনাকে কাছে পাব না।' উত্তরে আমি চিরাচবিত কাঁপাকাঁপা গলায় বললাম, 'সবদিন চি-র-দিন যদি তোমাব কাছাকাছি থাকতে পারতাম।' তখন প্রত্যাশিত নিপুণ চোখ তুলে সুনন্দা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার চোখের দিকে। আমি চোখ সরাই না। বিযের অনেকদিন পরে সুনন্দা বলেছিল সেদিন ও গাডীতেই একটুখানি ইভাকুয়েট-ও কবেছিল। আমি টের পাই নি।

মা হঠাৎ বললেন, 'এত কি চিন্তা করছিস?'

'তোমার কথাই ভাবছি, সান্ত্বনা বলল ওষুধ খাওনা নিয়মমতো। ওষুধ না খেলে আমার ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারবে?'

মা হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করলেন।

দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গিয়ে যাবার সময় হল। বুধবারের নাইট সুপাবে যাবার কথা ছিল, কিন্তু বৃহস্পতিবার খাসি স্টুডেন্টস যুনিয়ন বন্ধ ডাকায় বাস গেল না। এরপর দিন এতো রাশ ছিল টিকিটই পেলাম না। শেষটায রওনা হলাম শুক্রবারে, শৈল নগরীর শীতল জীবন শুরু হল ফের শনিবার ভোব থেকে। শিলং-এ রাতের কার্ফ্যু এখন প্রায় চারমাসের পুরনো। ছেলে তাতাই-এর স্কুল বন্ধ চার মাস ধরে ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের আন্দোলনের জন্য। রোজ বিকেলে অফিস ছুটিব পব কাগজে মোড়া ব্যাগ হাতে লাইমুখরা পয়েন্টে বাস থেকে নামি। তারপর বাজার সেরে তড়িঘড়ি বাড়ী ফিরি। কখন কি হয় ঠিক নেই। সুনন্দা শিলং-এর মেয়ে। তবু প্রায়ই বলে, 'এখান থেকে ট্রান্সফার নিতে পারো না? আমি ওকে বোঝাই, 'কি হবে ট্রান্সফার নিয়ে। বদলী করবে হয় আইজল বা কোহিমায় নইলে গৌহাটি বা ইমফলে। সেখানে এর চাইতে ভাল থাকবে?

আমাদের চিঠিপত্র বাড়ীর ঠিকানায়ই আসে। একদিন সন্ধ্যের সময বাড়ী গিয়ে

সবে চা রুটি শেষ করেছি, তখন সুনন্দা বলল 'একটা খারাপ খবর আছে, রান্নাঘর থেকে হলুদ রঙ-এর হলুদ মাখা থমথমে হাত বাড়িয়ে মার চিঠিটা দেয় ও। মার জড়ানো হাতের লেখা, 'শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে ছবি আর আমাদের মধ্যে নাই। সে গতকাল মারা গিয়াছে।'

বাঁ হাতে চিঠিটা ধরা ছিল, ডান হাতে প্লেট্। রুটির শূন্য প্লেটটা আচমকা মেঝেতে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সুনন্দা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। মা আরো লিখেছেন, 'ছবির সম্ভবত কলেরা হইয়াছিল। ঠিক সময়ে ঔষধ পড়ে নাই। নীলুকে কোর্টে পাড়ার লোক খবর দিয়াছিল, কিন্তু বণিকবাবুর কেস্ থাকায় তাহার যাইতে বৈকাল হইয়া যায়। সে গিয়া দেখে সব শেষ। জামাই-এর আগে ছবি নিজেই চলিয়া গেল। জামাইবাবাজীর অবস্থাও খারাপ, কথা বলিতে চায়, পারে না, কাঁদিতে চায়, তাহাও পারে না। কুন্তলার অবস্থা সর্বাধিক খারাপ। বারবার ফিট হইতেছে। ছবিকে নিজের মেয়ের মতো দেখিতাম, এই আঘাত আমার বড় বুকে লাগিয়াছে। আরো কত কি দেখিতে হইবে ভগবান জানে। ভগবান কেন আমাকে নেয় না এই বুড়া বয়সে কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাই ভাবি।'

এই প্রথম মাকে মৃত্যু কামনা করতে দেখলাম, আমি সুনন্দাকে বলি, 'আমাকে এক গ্লাস জল দাও। শরীরটা কেমন করছে। অনুভব করি, সেই বেড়সোরের গন্ধটা আবার এতদিন পর আমাকে ধাওয়া করছে। দূরে কোন একটা খাসিয়া বাড়ীতে ডিংডং মিউজিক বাজছে, সেইসঙ্গে হুল্লোড়। তাতাই ড্রইং রুমে একটা স্পোর্টস ম্যাগাজিন থেকে রবি শাস্ত্রী আর আজহারউদ্দিনের ছবি কেটে রাখছে। সুনন্দা জল নিয়ে এসে বলল, 'শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ।'

কয়েকদিন পরে মাইনে পেলাম। সন্ধ্যায় পাঁচটা একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে আমি সুনন্দাকে বলি, 'এই টাকাটা কুন্তলার কাছে পাঠিয়ে দিই। ছবিদির শ্রাদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে। এ মাসটা আমরা না হয় একটু হিসেব করে চলব। অবশ্য একটা এরিয়ার এমাসে পেতেও পারি।'

সুনন্দা উত্তর দেয় না। আমি জিজ্ঞেস করি 'কি, কিছু বলছ না যে?' ও বলল, 'তোমার টাকা তুমি খরচ করবে, আমি কি বলব?'

তখন দুশো টাকা সরিয়ে রেখে বললাম, 'ঠিক আছে, তাহলে এই তিনশো টাকা পাঠিয়ে দেব। কি বলো? সুনন্দা বলল, 'হ্যাঁ পাঠিয়ে দাও। বেচারাদের জন্য কষ্ট হয় সত্যি। আচ্ছা, এ মাসে কিন্তু তাতাই-এর জন্য একটা কোট্ বানাতে হবে মনে রেখো, ওর বন্ধুদের সবার দুটো তিনটে কোট্ আছে। ওর মোটে একটা তাও এখন এত ছোট হয়ে গেছে যে পরা যায় না। দাদা দিয়েছিল সেই কবে। একটা কোট বানাতে পাঁচ ছশ' টাকা তো লাগবেই। তুমি তো বেশ কিছু দিন আগে, একবার বলেছিলে দেবে টাকা। তারপর আর মুখেই তোলনা।'

সত্যিই। সেই দু মাস আগে তাতাই-এর জন্য কোট বানিয়ে দেব বলেছিলাম। তারপর ভুলেই গেছি। লজ্জাবোধ করলাম নিজের কাছেই। সংসারে হোক অফিসে হোক কথা দিলে আমি কথা রাখার চেষ্টা করি। তাছাড়া স্ত্রীপুত্রের দেখভাল করাটা আমার সবচাইতে বড় কর্তব্য এবং এ থেকে বিচ্যুত হওয়াটাকে আমি অপরাধ মনে করি। সুনন্দাকে বললাম, 'ভাল মনে করেছ। ওর কোটের টাকাটা এখনই রেখে

দাও। আমার কাছে থাকলে খরচ হয়ে যাবে। কুন্তলাকে না হয় এরিয়ারটা পেলে পর টাকা পাঠাব।'

সুনন্দা লক্ষীর আসনে ধূপধুনো দিচ্ছিল। না তাকিয়ে বলল, 'শিয়রের দিকে তোষকের তলায় রেখে দাও।' তারপর ধুনুচিটা লক্ষীমূর্ত্তির সামনে রেখে জোড়হাত ও নতজানু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সুনন্দা প্রণাম করল। ধুনোর পবিত্র পবিত্র গন্ধে আপ্লুত ঘরটা ধোয়ায় ভর্তি হয়ে গেলে আমার কেমন অস্বস্তি হতে থাকে।

সুভাষ কর্মকার

কাঠ

'আহ, কি মজা! পচবে মারোয়ারীর গুদামে এবার খুবসে আলু, পেঁয়াজ পচবে। এই বৃষ্টিতে সব পচবে। গুদাম থেকে একধারসে সব ফেলবে। বেছে বেছে অনেক আলু, পেঁয়াজ বের করা যাবে।' সকাল বেলা বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে গনা এসব ভাবছিলো আর আনন্দে আটখানা হচ্ছিলো। কদিন ধ'রে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। সারা রাত, সারা দিন। কখনো ঝঝর ঝঝর্ শব্দ করে, কখনো টিপির টিপির শব্দ করে। বৃষ্টি দেখতে দেখতে গনা ভাবছিলো, 'কি বৃষ্টিরে বাবা। আকাশে এত জলও আছে।' গনা দেখছিলো নদী ফুলতে ফুলতে একেবারে কোথায় এসে গেছে। আর একদিন এরকম বৃষ্টি হলে মহাত্মাগান্ধী রোডও ডুববে। বাজারে লোকজনদের বলাবলি করতে শুনেছে শহরের কয়েক জায়গা নাকি জলে ডুবে আছে। ডুবুকগা, ওর কি? বরং ভালো। নদীর জল বেড়ে চর কমে গেলে জল আনতে বা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দুনিয়ার গু বা মরা কুকুর বেড়ালের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে না। ওর শুধু ভয় করছিলো জলের ধাক্কায় পুরোনো বাঁশ-টাশ দিয়ে তৈরী ওদের ঘরটা না ধপাস করে ভেঙে পড়ে।

বছর তিনেক আগে রেল ষ্টেশন থেকে গনারা এখানে এই নদীর ধারে এসেছে। ষ্টেশনে খুব ঝামেলা হ'ত। মাঝে মাঝে পুলিশ আর রেলের লোকেরা ওদের জিনিষ-পত্র ফেলে দিতো, তাড়িয়ে দিতো। অবশ্য পুলিশ চলে যাবার পর ওরা জিনিষপত্র কুড়িয়ে আবার ষ্টেশনে ফিরে আসতো। এরকম একবার তাড়িয়ে দেবার পর বাপজী আর মাই আলোচনা করে নদীর পারে এসে আস্তানা গাড়ে। ঘর বানায়। কতোগুলো বাঁশের খুটির ওপর বাঁশের মাচা। তার ওপর বাস আর শন দিয়ে ছাউনি। তিন ধার চট দিয়ে ঘেরা। এই ওদের ঘর। ঘর বা ঝুপড়ি যা কিছু একটা বলা যায়। পায়খানা, পেচ্ছাপের জন্যে নদীর পার। ষ্টেশনে ওরা পায়খানা, পেচ্ছাপ করতো রেল লাইনের ধারে বা খালি রেল কামরায়। যখন যে ভাবে সুবিধা হতো। রান্না বান্না হতো ইঁটের উনান বানিয়ে রেল লাইনের ধারে। বৃষ্টি না থাকলে বা নদীর জল না বাড়লে এখানে রান্না বান্না হয় ঝুপড়ির নীচে। আর বৃষ্টির সময় বা নদীর জল বাড়লে কেরোসিন তেলের টিন কেটে চ্যাপ্টা করা পাতের ওপর ইঁট বসিয়ে ঝুপড়ির ভেতর। তবে এখান থেকেও নাকি সরতে হবে। জল কমলেই নাকি নদীর পারে পার্ক হবে। গনা ভাবে, 'নদীর পারে থাকতে পারলে কিন্তু খুব মজা। সামনেই বড় রাস্তা দিয়ে দিন রাত গাড়ী, রিক্সা, লোকজনের যাতায়াত'। রাস্তার ওপারেই সব বড় বড় দালান, গুদাম। কয়েকদিন পর পরই পাওয়া যায় গুদাম ঝাড়া আলু, পেঁয়াজ, গম, লঙ্কা। একটু ভালো করে বেছে টেছে এই কুড়িয়ে আনা আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা যখন বাজারে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, কেউ ধরতেই পারেনা যে এগুলো কুড়িয়ে আনা। তবে নদীর পারে থাকার আসল লাভ হলো নদী থেকে কাঠ ধরায়।

নদীতে জল বাড়লেই কাঠ আসতে থাকে। কাঠের চাহিদা বেশী, পয়সাও ভালো পাওয়া যায়। বৃষ্টি দেখতে দেখতে গনা ভাবে, না এবার দারুণ মওকা। প্রচুর কাঠ আসছে।

আশ্বিন মাসের প্রথম দিক। পুজো প্রায় এসে গেছে। গনা খুব খুশী। বড়বাজারে সন্ধেবেলা হাঁটাই যায়না এত ভিড়। চোদ্দ বছর বয়সী সাড়ে চার ফুট লম্বা গনা সন্ধেবেলা বড়বাজারে ঘুরে ঘুরে লোকের কেনা কাটা দেখে। আর মাঝে মাঝে যেন শুনতে পায় 'ডাড়ুমা ডাড়ুম্ ডাড় ড়ুম্ ড়ুম' ঢাকের শব্দ। গনার খুব ইচ্ছে এবার পুজোতে ও একটা লাল শার্ট আর চামড়া লাগানো প্যান্ট কিনবে। নদী থেকে কয়েকটা বড় কাঠ ধরতে পারলেই হয়ে যাবে। এবার কাঠ বিক্রীর কথা ও বাপজীকে বলবেনা। গনা যাকে বাবা বলে জানে তাকে ডাকে 'বাপজী' আর মাকে বলে 'মাই'। মাই ওর সাথে পরিস্কার বাংলা কথা বলে, বাপজীর কথা পরিস্কার বাংলা না, কেমন ধরনের যেন। বাপজী আর মাই নিজেরা কথা বলে বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে। এরকম কেন হয় গনা বুঝতে পারেনা। বাপজী ষ্টিমার ঘাটে মালপত্র বয়। তাও রোজ না। গনার দুটো ছোট ভাই আছে, ওদের জন্যে গনার কোন মাথা ব্যথা নেই। বাপজী ওর কাঠ বিক্রীর কিংবা কুড়িয়ে আনা জিনিষ বিক্রীর সব টাকা নিয়ে নেয়। গনা মনে মনে বলছিলো আউর নেহী দেগা। এবার পুজোর আগে ও জামাপ্যান্ট কিনবেই। চলতে ফিরতে অনবরত ও এখন কেবলি যেন শুনতে পায় 'ডাড়ুমা ডাড়ুম্ ডাড় ড়ুম ড়ুম' আওয়াজ। সেই খড় বাধার সময় থেকে প্রায়ই গনা বড়বাজারে মূর্ত্তি দেখতে যায়।

দু'দিন আগে বড় বাজারে বস্তা টেনে ও কিছু টাকা পেয়েছে। মাইকে টাকার কথা বলেছে। মাইর কাছে ও কিছু লুকোয় না। মাই মাঝে মাঝে ওর চুলে হাত বুলোয়, পিঠ চুলকে দেয়। আদর করে খাওয়ায়। তবে সন্ধেবেলা লাল ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে এই ঝুপড়ির ভেতর যখন অচেনা মানুষদের সাথে হাসাহাসি করে, তখন মাইর ওপর খুব বাগ হয়। রাগেব চোটে বাসন কোসনে লাথি মারে। বাপজী সন্ধেবেলা বড় রাস্তার পাশে গাছের নীচে বসে গাঁজা টানে। রাত্রে মাই প্রায়ই ওকে বড় রাস্তার ডান দিকের দালানের বাবান্দায় শুতে পাঠায়। বাপজীর শোয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। গনার একদম ভালো লাগেনা ঐ দালানের বারান্দায় শুতে। রাত্রে দুনিয়ার গরু, কুকুর, চোরটোর নানা ধরনেব লোক ওখানে জড়ো হয়। ঘুমের মধ্যে কেউ ওকে খোঁচাখুঁচি করে, গায়েব ওপর পা উঠিয়ে দেয়, মশা কামড়ায়। মাঝে মাঝে একটা পাগল এসে হাজির হয় আর 'ভোম ভোম ভোম হাঃ হাঃ হাঃ' এ ধরনের চিৎকার করে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। গনা ভাবে, এ জায়গাটায় ও আর থাকবেনা। খাটিয়ার নীচে লুকিয়ে রাখা কৌটোটায় অনেক টাকা জমাবে। তারপর বেলগাড়ীতে উঠে এখান থেকে সবে পড়বে। কলকাতা, বোম্বাই, যেখানে ইচ্ছে চলে যাবে। বাপজী, মাই কারো সাথেই সম্পর্ক রাখবেনা। তবে দুর্গাপুজোটা অব্দি সে এখানে থাকবে। এখানকাব মতো দুর্গাপুজো নিশ্চয় আব কোথাও হয় না। কতো লোক, কতো গাড়ী যে দেখা যায়। বড় বাজারে পুজোতে রোজ খিচুড়ি খাওয়ায়। রাত্রে বামলীলা হয়। খিচুড়ি খেতে ওর খুব ভালো লাগে। সঙ্গে শুটকি মাছ বাটা

হলে তো কথাই নেই। এ দুটোই মাই ভালো করে। গনা পূজোর ওখানে রোজ খিচুড়ি খাবে আর রাত্রে রামলীলা দেখবে। এসব ভাবতে ভাবতে গনা মনে মনে 'বাহা বাহা বাহা বাহা' করে গুন গুন করতে থাকে।

সকাল অনেকটা পেরিয়ে গেছে। বৃষ্টির বেগ আর নদীতে জলের তেজ বাড়ছেই। আর নদী দিয়ে কেবলি কাঠ ভেসে আসছে। গনা ভাবছে: এখনও দুপুর হয়নি। বিকাল অব্দি চেষ্টা করলে অনেক কাঠ ধরা যাবে। যত সময় যাচ্ছে, কত কাঠ ভেসে আসতে দেখা যাচ্ছে, গনার কাঠ ধরার আকাঙ্খাও ততো বাড়ছে। এই সুযোগ ছাড়া যায়না। এত বৃষ্টির জন্যে কেউই কাঠ ধরতে আসেনি। কাঠ নিয়ে ওদের মধ্যে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। ছোটখাটো গনা অন্যদের সাথে পেরে ওঠে না। গনা মহা সমস্যায় পড়েছে। কাঠ ধরবে তো বটে কিন্তু এত কাঠ রাখবে কোথায়? ওদের ঝুপড়ির নীচে জল, চারদিকেই জল। এক মাত্র উপায় হলো বড় রাস্তার ধারে জমা করে রাখা। কিন্তু এত কষ্ট করে ধরা কাঠ ওখানে রাখবে চুরি হবে না? মওকা পেলে কে ছাড়ে? ও নিজেও তো বাঁশ-অলাদের রাখা বাঁশের স্তূপ থেকে কম বাঁশ চুরি করেনি। তা, কোথায় বিক্রী করবে এত কাঠ? ঠিকাদারের লোকদের কাছে? না টুকরো টুকরো করে বাজাবে নিয়ে বিক্রী করবে? ও একা এত কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? গর্ভবতী রমণী যেমন তার প্রসব-না-হওয়া সন্তানকে নিয়ে অনেক রঙিন কল্পনার জাল বুনতে থাকে, গনাও তেমনি না-ধরা কাঠ নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে লাগলো কিন্তু স্থির কেথাও যেন পৌঁছুতে পারছিলো না। ফলে, বিরক্ত হয়ে মনে মনে বললো, 'ধুর্ পরে ভাবা যাবে। ধরাই হলো না একটাও। আগে ধরা তো হোক।'

সকাল প্রায় শেষ। দুপুর উঁকি দিচ্ছে। এদিকে ওর খুব ক্ষিদেও পেয়েছে। মাই রাধলো কিনা কে জানে। নাকি উকুনই বাছছে! ভাবলো, যাক্, লাগুক ক্ষিদে, খেলে সাঁতাব কাটতে কষ্ট হবে। বরং কাঠ ধরা শেষ করে বিকালে একবারে খাবে। খেয়ে আব একবাব ঐ সিনেমাটা দেখবে। কি মজার গান আছে একটা : 'উরি বাবা উরি বাবা উবি বাবা'। রাতে হোটেলে মাংস পরোটা খাবে। আহ্, কি মজা। কতো যে কাঠ ভেসে আসছে, না আর দেরী করা ঠিক নয়। তাহলে বেশী কাঠ ধরা যাবে না। আজকে ছোট কাঠ ও একটাও ধরবে না। সব বড় বড় কাঠ ধরবে। ইয়া বড়া বড়া। তারপর অনেক টাকা। লাল শার্ট। চামড়া লাগানো প্যান্ট। ডাড়ুমা ডাড়ুমা ডুম ডুম' ভাজতে ভাজতে গনা ঘাটে দাঁড়ানো জাহাজটার পাটাতনে গিয়ে উঠলো, তারপর জামা খুলে পাটাতনে রেখে 'দুর্গা মাইকি জয়' বলে নদীতে ঝাঁপ দিলো। গনা সাঁতাবে ওস্তাদ। এক একদিন ও চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে, কতো রকম কায়দা করে সাঁতার কাটে। কিন্তু আজকে ওর সময় নেই, তাই কাঠের জন্যে সাঁতরাতে লাগলো। ছোট কাঠ ধরবেনা ভাবা সত্ত্বেও অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক কটা ছোট ছোট কাঠ ধরে ও নদীর পারে রেখে এলো। ছোট কাঠ ধরতে ধরতে এক সময় বিরক্তি বোধ করলো। ভাবলো, ধুর সব ছোট ছোট। অনেকক্ষণ পর দূরে নদীর উত্তর পার দিয়ে ভাসতে ভাসতে আসা একটা খুব বড় কাঠ দেখতে পেয়ে গনা

খুশীতে উথলে উঠলো। ভাবলো, 'অব মিল গয়া। আরে অ্যায়সা মওকা ফির কঁহা মিলেগা। নদীমে কোই নেহী হ্যায়।' বড় একটা কাঠ ধরবার আশায় মাথার ওপরে প্রবল বর্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যেও ওর কোমর দোলাতে ইচ্ছে করছিলো। তারপরই বড় কাঠটা ধরার জন্যে জোরে জোরে সাঁতার দিতে লাগলো। জলের তেজে কাঠটা মাঝ নদীতে এসে গেলো। মাঝ নদীতে জলের স্রোত তেজী ও কুটিল। কাঠটা মাঝ নদীতে চপল ভাবে নৃত্য করছিলো। দামাল শিশুর মতো এদিক ওদিক যাচ্ছিলো। স্রোতের ঘূর্ণীর জন্যে গনা কাঠটার কাছে এগোতে পারছিলো না। গনা যাতোই এগোচ্ছিল কাঠটা ততোই সরে সবে যাচ্ছিলো। অবিরাম সাঁতার দিতে দিতে গনা অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছিলো। বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছিলো। বেলা ফুরিযে আসছিলো। আকাশ আবো মুখগোমবা করছিলো কিন্তু, গনা প্রতিজ্ঞা ছাডবেনা। কিছুতেই এই বড়ো কাঠটা ছাড়বোনা এই একটা কাঠেই অনেক টাকা এসে যাবে। এটা ধরে তবে জল থেকে উঠবো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো লাল চামডা লাগানো প্যান্ট, দুর্গা মূর্ত্তি। কাঠটার ওপর থেকে একটা কাক নির্বিকার ভাবে গনার কাণ্ড কারখানা দেখছিলো। গনা চোয়াল শক্ত কবলো। জোবে জোবে হাত চালাতে লাগলো। দেখতে দেখতে কাঠ আর গনার দূরত্ব কমে আসছিলো। এক সময় গনার কাছ থেকে মাত্র ছয় সাত হাত দূরত্বের মধ্যে এসে গেলো। গনা কাঠটার ওপবের দিকটা দেখতে পেলো। কাঠটার চাবদিকে জলের ফেনা আর কচুরি পানা। কাছাকাছি আসায় অনেকদিন ধরে জলে ভেজা কাঠটা থেকে কি রকম একটা বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছিলো। ক্ষিদের ক্লান্তিতে, কাঠেব ভেজা-পচা গন্ধে মিলে মিশে গনাব তীব্র বিবমিষা বোধ হচ্ছিলো। গনা ভাবলো, দু'এক দিন রোদে শুকোলেই কাঠের গন্ধ দূর হয়ে যাবে। হাতের এত কাছে এসে যাওয়া কাঠটা ছাড়া যায়না। কাঠটার সঙ্গে সাত হাত, ছয় হাত, পাঁচ হাত, ছয় হাত, সাত হাত কবে গনার ব্যবধান চলতে লাগলো। ওর শরীবের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছিলো। গনা উন্মত্তেব মতো এগোতে লাগলো। দেখলো. কাঠটা একেবাবে ওর হাতের আওতায় এসে গেছে। আঃ আঃ করে গনা ওর স্বপ্নেব কাঠটাকে পুরোপুবি আয়ত্তে আনাব জন্যে শবীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঠটাব গায়ে হাতের ঝাপটা মারতেই অনেক অনেকক্ষণ ধবে কাঠ বলে ভ্রম করা ফুলে ঢোল বিশাল মৃত মহিষেব পেটের ভেতর থেকে পচা নাড়ি ভুঁড়ি ফোয়ারার বেগে উদগিরণ হয়ে বেবোতে লাগলো আব আনাহারে, অবহেলায় কখনো বির্মষ না হওযা গনা জীবনে এই প্রথম হু হু করে কেঁদে উঠলো।

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী

কেচ্ছা

মোল্লাজী চুপ করে বসেছিলেন।

হাসান শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আরেকটা ধরালেন। মোল্লাজী দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়েছিলেন। ক্যালেণ্ডারে লম্বা দাড়িওলা এক শুভ্র মুখ। তাঁর নিজের থেকেও লম্বা দাড়ি। লোকটা নাকি কবিতা লিখতো। মোল্লাজী জেনেছেন তাঁর ছাত্রী লীলার কাছে। উৎসাহী লীলা গড়গড় করে কয়েকটা কবিতাও আবৃত্তি করেছিলো। মোল্লাজীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিলো না।

হাসানের একমাত্র সন্তান লীলা। ছ'সাত বয়েস। মাস দু'য়েক মোল্লাজী একে সন্ধ্যের পর একঘণ্টা করে আরবী পড়াচ্ছেন। শুধুমাত্র মসজিদে ইমামতী করে দিন গুজরাণ হয় না। তেল, পানিপড়া, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক এ'সবের দিন ফুরিয়ে আসছে। লোকের ঈমান নষ্ট। সেজন্যে দু'চার জায়গায় ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর কাজ রাখতেই হয়।

প্রথম দিনই ছাত্রীর নামটা শুনে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গিয়েছিলো।

লীলা চৌধুরী!

এ নামতো হিন্দুয়ানী!

আরবী নাম রাখতে পারলেন না তোমার বাবা?

তবু না হয় অন্ততঃ লীলাকোম চৌধুরী!

বাবা বলেন আমরা বাঙালী। আমাদের বাঙালী নাম হওয়া উচিত! ছ'সাতের লীলার উত্তর।

তোমাদের দেয়ালে এতো কিসের ছবি? ছবি রাখা তো না-জায়েজ! ওসব চোখে পড়লে অজু থাকবে না!

নিজের হাতে ছবি আর ছবির ক্যালেণ্ডারগুলো উল্টিয়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন অবাক।

সব যথাপূর্বং।

বসিরণ লম্বা ঘোমটা টেনে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। মোল্লাজীকে বললো, সাহেব বলে দিয়েছেন—ছবি-ক্যালেণ্ডাব আছে। ও'গুলো থাকবে।

মোল্লাজীর আর কিছু বলার ছিলো না।

টাকা আর বেদ্বীনি শিক্ষার গরবে লোকগুলোর ঈমান নষ্ট!

লীলা এসে জিজ্ঞেস করলো, আজ পড়বো বাবা?

হাসান মেয়ের চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আজ থাক। তেমার ওস্তাদজীর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

লীলা চলে যেতে যেতে থামলো।

মোল্লাজীব সামনে কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা।

হাসান মেয়েকে লক্ষ্য করছিলেন। চলে যেতে যেতে থেমে যেতে দেখে শুধোলেন, কিছু বলবে?

না। মানে—

লীলার সঙ্কোচের কারণটা খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো।

হাসান শুধোলেন, খুব লুকোনো কথা কিছু?

না। মানে বলছিলাম ও আবার কাঁদতে লেগেছে।

মাগরিবের নামাজ পড়েছেন?

হ্যাঁ। নামাজ পড়ে নামাজেব জায়গাতেই বসে আছে। মা চা নিয়ে গেলে বললো, খাবে না। ভালো লাগছে না।

হাসান মুহূর্তখানেক ভাবলেন। তারপর বললেন, তুমিতো অনেক গল্প জানো। সেই রাবেয়া-তাপসী-মহিলা—যার কাছে হরিণেরা আসতো। ওর গল্প শোনাও গিয়ে।

লীলা চলে গেলো।

মোল্লাজী লীলার চলে যাওয়া দেখলেন।

প্রত্যেক দিনের মতো আজও ছাত্র পড়াতে এসেছিলেন।

হাসান এ সময় বাইরে থাকেন।

আজ বাসায় ছিলেন।

মোল্লাজীকে বললেন, বসুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

বসিরণ চা দিয়ে গেলো।

মোল্লাজী একটু ভয় পাচ্ছিলেন।

ব্যাপার কি বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ?

পড়ানোর কাজটা যাবে?

কিন্তু মনে মনে অনেক খুঁজে পেতেও তিনি এমন কোন কারণ খুঁজে পেলেন না যাতে তাঁব কাজেব জবাব হতে পারে। শুনেছেন হাসান অনেক বড় অফিসার হলেও অফিসে অনেক ভদ্র, অত্যন্ত শালীন।

সেই তিনি বিনা কারণে মোল্লাজীকে কড়া কিছু বলবেন?

সত্যিই বুঝতে পারছিলেন না।

বিমূঢ়, কিছুটা বা ভীত— সে জন্য তিনি ধর্মীয় নিষেধ জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়েছিলেন।

বসিরণ চায়ের খালি কাপগুলো নিয়ে যাবার পর হাসান বললেন, একে আমি এক'শ করে দিচ্ছি। বৎসরে কাপড়-চোপড় বাবদ আরো তিনশ'। খাওয়া বাবদ ধরুন আরো পনেরো শ'। তা ছাড়া আরো বকশিস, হেন-তেন বলে বৎসরে দু'শ। সবশুদ্ধ বৎসরে হয়ে যাচ্ছে প্রায় তিন হাজার দু'শর মতো। দু'বৎসরে প্রায় সাড়ে ছ'হাজাব। নিজ বাড়িতে থাকে। সকাল সাতটায় আসে। সন্ধ্যে হলেই চলে যায়। মাসে দু'চারদিন ছুটি দিতে হয়।

হাসান মৃদু হাসলেন।

বললেন, আজকাল জানেন তো ভীষণ গণতন্ত্রেব জমানা! বসিরণের আগে যে মেয়েটা ছিলো তাকে আমার স্ত্রী একদিন চায়ের কাপ ভাঙায় কিছু কড়া কথা

বলেছিলেন। ফলে সে কাজ ছেড়ে চলে যায়। কিছুদিন আমার স্ত্রীকে নিজের হাতে সব কাজ করতে হয়েছে। তারপর বসিরণ আসে। আমাদের খুব হিসেব করে বসিরণের সঙ্গে চলতে হচ্ছে।

মোল্লাজী এখন আর রবীন্দ্রনাথকে দেখছিলেন না।

হাসানের প্রতিটি কথাই তাঁর কানে যাচ্ছিলো।

বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

প্রায় বছর খানেক মোল্লাজী এ'শহরে একটা মসজিদে ইমামতী করছেন। তাঁর আগের যিনি ইমাম, তিনি তাঁর দেশের মানুষ। বয়েস হয়ে যাওয়ায় মসজিদের কর্মকর্তাদের ধরে তাঁকে কাজ দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। মোল্লাজী আসার মাস দু'য়েক পরে হাসান এখানে বদলী হয়ে এসেছেন।

হাসানের দেশ-বাড়ী, পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ হয় নি মোল্লাজীর।

হাসান জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তো ধর্ম সম্বন্ধীয় বইপত্র ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ পড়েন না? আংকল টমস কেবিন নামে একখানা ইংরাজী বই, বাংলায় তার অনুবাদ আছে। পড়েছিলেন?

মোল্লাজীর বাংলায় পড়ালেখা খুব সীমাবদ্ধ।

বললেন, না।

সে বইতে আমেরিকাব ক্রীতদাসের দুঃখের কথা আছে। আমেরিকাতে এই সেদিন আইন করে ক্রীতদাস প্রথা রদ হয়েছে। আরবে আজ থেকে দেড়হাজার বৎসর আগে সে প্রথার বিরোধীতা করেছিলেন এক মহাপুরুষ।

মোল্লাজী তাঁর দাড়িতে আঙ্গুলের চিরুণী চালালেন।

হাসান আরেকটা সিগারেট ধরালেন। বসিবণ পানের থালা এনে মোল্লাজীর সামনে রাখলো। মোল্লাজীর সিগারেট চলে না। থালা থেকে পান হাতে নিয়ে চূণ ঘষতে লাগলেন।

হাসান সিগাবেটে পর পর কয়েকটা টান দিলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, সভ্য সমাজে এখন আর মানুষ কেনাবেচো হয় না। কেউ কারো গোলাম নয়, বাঁদী নয়। মানুষ মানুষকে এখনো খাটায়। শোষণ করে। অত্যাচার করে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধও হচ্ছে।

মোল্লাজী চূণ পান, সুপুরী, জর্দা পুটুলী করে মুখে পুরলেন।

গত তিনদিন থেকে এক মহিলা কাঁদছেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আমি তাঁকে অনেকবার বোঝাতে চেয়েছি। এ'সব নূতন কিছু নয়। দুঃখ অথবা বিদ্রোহের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বুঝতে চান না।

মোল্লাজী আসন ত্যাগ করে জানালা দিয়ে মুখ বড়িয়ে পানের পিক্ ফেললেন। তারপর এসে বসলেন। হাসান ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মোল্লাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমার বয়েস কতো অনুমান করতে পারেন?

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।

হাসলেন হাসান।

আমার বয়েস এখন ঠিক পঁয়ত্রিশ। আমার বাবা আমার জন্ম তারিখ লিখে

রেখেছিলেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাইরের দিকে তাকালেন হাসান। উঠে দাঁড়ালেন।

নারকেল গাছে কচি নারকেল ছড়ায় একটা ছোট্ট পাখী কি যেন খুঁটে খাচ্ছে। ওর বুকের আর্ধেক, পিঠের সম্পূর্ণটা ধূসর। অথচ গলা থেকে বুকের কিছুটা কি ভীষণ লাল। মনে হয় কেউ যেন খুঁচিয়ে ওখানে ঘা করে রেখেছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে কোমল বুক!

মোল্লাজীকে একবার দেখলেন হাসান।

বললেন, আমার বাবার তিন বিয়ে। প্রথম বিয়ের আমিই একমাত্র সন্তান। দ্বিতীয় তরফের একবোন।. একভাইকে জন্ম দিয়ে মহিলা মরে গেলেন। সে ভাইও ছ'মাস পর। বাবার তৃতীযার বেশ ক'টা ছেলেমেয়ে। মা-মবা বোনটা সৎমাব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়েছিলো। আমাকে দেখে কি সুখী মনে হয় আপনার?

মোল্লাজী কি উত্তর দেবেন খুঁজে পেলেন না।

চুপ কবে থাকলেন।

নিজের জায়গাব এসে বসলেন হাসান।

অথচ দেখুন আমার বযেস অনুমান করতে গিয়ে পুরো দশটা বৎসর বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাব অনুমানের ভুলই সাক্ষ্য দিচ্ছে পাঁচ বৎসর বয়েসে মাকে হারিয়ে যে বিষাদে আক্রান্ত হয়েছিলাম, এই পঁয়ত্রিশেও তার থেকে আমার মুক্তি নেই। অথচ মা হারানোতে আমার যে অসুবিধে তা' ষোলো বৎসব বযেসেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি বাবার কাছ থেকে চলে এসেছিলাম। একটা ছোটখাটো কাজ জোগাড করে নিয়ে। সেই কাজে থেকে থেকেই আমি পড়াশোনা চালিয়েছি। আমাব সৎবোন আমার কাছে চলে আসতে চেয়েছিলো। আমি আনিনি। চেয়েছিলাম ও কষ্ট পাক। ওর মা আমাকে কষ্ট দিয়েছিলো। বাবাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওর সব ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দিয়েছিলো। শুধুমাত্র পাশব প্রয়োজনে মানুষ কতোদূর নামতে পারে আমি তা' বাবাকে দেখে জেনেছি। এখন প্রায়ই মনে হয় আমি যদি ও'রকম প্রতিহিংসার বশ না হতাম তবে বেচারীকে মবতে হতো না।

আপনার মায়ের কি হয়েছিলো?

তখন আমার পাঁচ বৎসব। বাবা একদিন মাকে বললেন, তুমি আব আমাব স্ত্রী থাকছোনা। আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি।

বাবা পরিস্কার তিন তালাক দিয়েছিলেন।

সবচে আশ্চর্য মোল্লাসাহেব, কি দৈহিক, কি মানসিক—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক লৌকিক পারলৌকিক সময়ে সীমাহীন কালাকালকে অতিক্রম করে যায় আমাদের শেখানো বিশ্বাসে। অথচ মাত্র তিনটে কথা, তিন সেকেণ্ডও নয—তা' তাসেব প্রাসাদের মতো হুড়মুড় কবে ভেঙে পড়ে!

মোল্লাজী বিব্রত বোধ করলেন।

বললেন, ধর্মীয় বিধানকে ওভাবে বিচার করা ঠিক নয় হাসান সাহেব।

ঠিক। ধর্ম যেন আমাদেব সীতাব গণ্ডী। গণ্ডী অতিক্রম করা চলবে না। অথচ সেই গণ্ডী থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো রাবণেরা সীতাদের উঠিয়ে নিয়ে যায়।

আমার মামারা এসে মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর এগারো বৎসর আমি মাকে দেখি নি। অনুমতি ছিলো না বাবার। মায়ের কোন ছবি পর্যন্ত ছিলো না আমার কাছে। বাবা তাঁর সব স্মৃতিচিহ্ন সরিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু স্মৃতি কি শ্লেটের মতো কিছু?

দুঃখীনি সে মায়ের স্মৃতি আমি বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয়ে ধরে রেখেছি। চাকরী পেয়েই আমি মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

মা আমি এসেছি।

আর কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিঁনিয়ে নিতে পারবে না। আর কেউ তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

মামারা বললো, কোথায় ছিলে তুমি গত এগারো বৎসর?

তাছাড়া তোমার শরীরে তো তোমার বাবারই রক্ত!

আমি দেখলাম মাকে নিয়ে মামাদের কাড়াকাড়ি। মামাবা নিশ্চিন্তে তাঁদের স্ত্রীদের গর্ভে বীর্যপাত করছে। মা একের পর এক সঙ্গমসৃষ্ট শিশু কোলে তুলে নিচ্ছে। মায়ের কাপড় শুকোচ্ছে না।

ওরা ফিরিয়ে দিলো।

এরপর এক মামা মারা গেলো। এক মামাব স্ত্রী ছটা বাচ্ছা দেবার পর থেমে গেলো। এক মামার মেজো ছেলের স্ত্রী বললো বাডতি একটা মেয়েলোককে অনির্দিষ্টকাল খাওয়া-দাওয়া-পরা দেবার মতো বিলাসিতা না থাকাই ভালো।

মায়ের শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে।

রোগ দুঃখ, শোককাতরা। মামাদের সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমার স্ত্রী খবর পেয়ে আমাকে জানালেন। আমি তখন স্টেট্সে। ফিরে এসে গেলাম মামাদের কাছে। মামারা খবর শোনালো তোমার মার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আমরা।

বিয়ে?

ষোলো বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে মার বিয়ে। বাইশে তালাক। মাত্র ছবছর তাঁব বাবাব সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন। পঞ্চাশ বয়েসে কোন স্ত্রীলোকের হঠাৎ পুরুষের প্রযোজন পড়বে ভাবতে পারিনি। আর পুরষ? সত্তর বছরের একটা অথর্ব যার গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ে গেছে।

বসিবণ চা নিয়ে ঢুকলো। সঙ্গে কিছু খাবার।

মোল্লাজী সঙ্কোচ বোধ করলেন।

বললেন, এতো সবের দরকার ছিলে না।

হাসান বললেন, কেন অযথা লজ্জা পাচ্ছেন? জানি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। নিন, আরম্ভ করুন, হাত লাগান।

হাসান খাবার নিলেন না।

শুধু চায়ের কাপে ঠোঁট লাগালেন।

মোল্লাজীর খিদে পেয়েছিলো।

তা'ছাড়া তার যা' অ। তা'তে ভালোমন্দ খাবার মতো বিলাসিতা কবা চলে না। খেতে খেতে নিজের কথা ভাবলেন তিনি। বাবা তাঁকে আর তাঁর দু'বোনকে

রেখে মারা গেলে চাচাজী মাকে শাদী করে নেন। দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ের সঙ্গে বাবার ভিটেমাটি পর্যন্ত চাচা নিজের করে নেন। অবৈতনিক খারিজিয়া মাদ্রাসায় বছর কয়েক গিয়েছিলেন তিনি। তারপর বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে চলেছেন।

এতোদিন হাসানকে তাঁর মনে হয়েছিলো দাম্ভিক। আত্মসুখী। কারো সঙ্গে বিশেষ মেশেন না।

আজ মনে হলো সুখ কে পায়?

মানুষ যতো উঁচুতে ওঠে ততো কি দুঃখ নাগপাশে জড়ায়?

হাসান বলতে আরম্ভ করলেন, সেই বুড়োর একই ছেলে। উকিল। শহরে থাকে স্ত্রী, বাল-বাচ্চা আছে। গ্রামের বাড়ীতে বাপকে রাখতে হয় বাস্তু জমিমাটি শরিকানদের কবলমুক্ত রাখার জন্যে। তাকে দেখাশোনার জন্য বিয়ের অছিলায় সে জোগার করে নিয়ে গেলো মাকে। তিন মামা বিয়ের খরচের বাহানায় ছ'হাজার টাকা আদায় করলেন। মা'র পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হলো ছ'হাজার।

পণ্যমূল্য?

মোল্লাজী বুঝতে পারলেন না।

কাবিন। তাও দেয়া হলো এক হাজাব। এক হাজারের বিনিময়ে অসুস্থ মহিলাকে দিয়ে ওরা সব কিছুই করিয়েছে। শ্বাসনালীতে পুঁজভর্ত্তি ছিদ্র। তা'তে পোকার বাসা। মা পুঁজ-পোকা পরিষ্কার করেছে নিজ হাতে। গু-মুতের কাপড় ধুয়েছে। স্নান করিয়েছে। খাবার মুখে তুলে দিতে হয়েছে। বিছানার পাশে রাতের পর রাত নির্ঘুম। এর উপব পুরস্কার! উকিল মাকে লাথি মেরেছে। তার বাপের ভালো দেখাশোনা, সেবাযত্নের অভাব হচ্ছে। অথচ আমার করার কিছু ছিলো না। কোন অধিকার নেই। সব অধিকার ইহকাল, পরকালের, মায়ের সর্বস্বত্বের অধিকার স্বামী নামধারী ঐ বুড়ো লোকটার!

মোল্লাজী দেখলেন হাসান কাঁদছেন।

লীলা এসে ডাকলো বাবা--!

কি মা?

মা বলছিলো, তোমার শরীর ভালো নয়—

ভালো? কখনো আমার শরীর ভালো ছিল না মা। তুমি যাও। মাকে বলো গিয়ে আসছি।

চায়ের কাপে শেষ দু'তিন চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন। মোল্লাজীকে দেখলেন। বললেন, ভালো থাকা যায়, বলুন ভালো থাকা কিসে যায়? আমার সবল দু'টো হাত আছে। পা আছে চোখ, কান, মুখ সবকিছু। আমি পড়ালেখা করেছি। একটা ভালো চাকরী করি। কিন্তু এমনই অক্ষম। অনেক সময আমার মনে হয়েছে, একটা কিছু আমার করা উচিত, একটা প্রতিবাদ, একটা বিদ্রোহ অথবা একটা দু'টো খুন। কিছুই কবতে পারিনি। আমার ভেতর ফেটে যাচ্ছিলো। তাই শেষ পর্যন্ত আত্ম-প্রবঞ্চনার মতো একটা কিছু আমাকে করতে হচ্ছে। আপনাকে শুনিয়ে আমি নিজেকে বলতে চাইছি, এ' ছাড়া আমি আব কি করতে পারি। আব এই মহিলাও প্রতিবাদ করবেন না!

মোল্লাজী তাকালেন হাসানের চোখের ভেতর। সেখানে শুধু কি অশ্রু?

হয়তো বা পাশাপাশি স্থান করে আছে ঘৃণা, ক্রোধ?

মোটা করে একটা ঘৃণাবোধ অসন্তুষ্টি এতোদিন কাজ করছিলো মোল্লাজীর ভেতর ভেতর।

তিনি নাড়াচাড়া করেননি।

আজ কেন তা'তে নাড়া পড়ছে।

বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছুঁতে পারছিলো না চাচাও।

মারা যাওয়াতে তার দখল নিলো সে.

ভূমির মতো নিবিড়ে, গভীরে চাষ করে যাও।

মেয়েদের চিরকাল কেন এমন লুটের মাল করে রাখা হবে?

যে মোল্লাসাহেব এতোদিন পুরুষের একাধিপত্যেব ব্যাপারটা প্রচার করে এসেছেন, বিশ্বাসও করেছেন, আজ হাসানের থেকে বিষ তাতেও সংক্রামিত হতে থাকলো ধীরে ধীরে।

হাসান বলে গেলেন, তিরিশ বছর পর আমি মাকে ফিবে পেলাম মোল্লাসাহেব কিন্তু এ মা তিনি নন যাকে আমি হারিয়েছিলাম। বাহান্নটা গ্রীষ্মেব দাবদাহ তাকে ক্লান্ত, রিক্ত ছিবড়ে করে দিয়ে গেছে। তিনি আজ অশ্রুমুখী।

কেন কাঁদছেন, কেন তাঁর কান্না থামানো যায়না, কি হারানোর ব্যথায় অথবা কি তিনি পেতে পারতেন? এ'সবের কোন কিছু আমি জানি না!

আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। আপনারা শুনেছি কেউ মারা গেলে তার স্বর্গপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। এই লোকটার জন্যেও করবেন। মৃত্যুর সময় সে কলেমা জপ করেনি। ছেলে উকিল। জ্ঞানী। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তারই পরামর্শে তারই জোগাড় করা ক্রীতদাসীকে ছাড়পত্রের হুকুম নামায় সই দিয়ে যেতে হয়েছে। নচেৎ ধর্মের পরিহাস, বুড়োর ফেলে যাওয়া স্থাবব-অস্থাবরের একটা অংশের মালিকান হয়ে যেতো যে সেই ক্রীতদাসী!

আবার একটা সিগাবেট ধরালেন হাসান। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন?

কি?

লীলা কিছু পান-সুপুরী নিয়ে এলো।

হয়তো ওর মা'ব নির্দেশে।

হাসান সাহেব উঠলেন। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশ মেঘে মেঘে ঘন কালো। এক্ষুণি হয়তো ঝড় আসবে। বললেন, আরবে একসময় শিশুকন্যা জ্যান্ত পুতে ফেলা হতো। নারীকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারার চেযে--

লীলা বাবার কাছে গিযে গায়ে হাত রাখলো। পবম স্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে এবাব জোরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

বললেন, এই শিশুটির জীবনে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে বলতে পাবেন আপনি?

মোল্লাজীব কিছু বলাব ছিল না।

লীলা তাব দিকে চোখ ফেরালো।

দেখলেন ঐ ফেরেস্তার মতো সুন্দরী মেয়েটির চোখে একসমুদ্র জল।

অখিল দত্ত

মৃত্যু

ভোরের আলোর ভেতর দিয়ে মন্মথ বাগানের দিকে তাকিয়েছিল। তার নিজের হাতে বোনা জবা গাছটিতে বেশ কটি ফুল এসেছে। সারা রাতের শিশির ভেজা পাপড়িগুলি দেখলে মনে হবে— এইমাত্র স্নান করে আসা একদল কিশোরী। তৃপ্তিতে মন্মথর মুখে হাসি ফুটে এলো। তার এই দীর্ঘ জীবন শুধু গ্লানিতেই ভরা। অথচ ভোরের ক'টি ফুল তাকে বলে দিল— তুমি ব্যর্থ নও। ক্ষুদ্র হলেও একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমার আছে।

'তুমি একটা অকেজো, দুর্বল, অসফল মানুষ, না পরিবারের জন্যে, না নিজের জন্যে কিছুই করতে পার নি। আমরা সমস্ত জীবন অভাব অনটন ছাড়া কিছুই পাই নি। মাথার চুলের মত অগুনতিবার স্ত্রীর কাছে এরকম অনুযোগ শুনেছে।

'তুই একটা অপদার্থ। খেয়ে পড়িয়ে তোর মত কুলাঙ্গারদের কেন লোকে মানুষ করে? নিজের বাবার কাছে মাসে একশটি টাকা পাঠাবার মত অবস্থাও তোর নেই? তার বাবা আজ মৃত, কিন্তু সেই বিষ ঢালা চিঠি আজোও মর্মে বিঁধে আছে।

অথচ আশ্চর্য! তার অবস্থা কেউ বুঝতে চায় নি। সকলে শুধু দাবী করে গেছে। তাব মত একজন সামান্য ঠাকুরের পক্ষে সকলের দাবী মেটানো সম্ভব হয় নি। তাই বার বার শুধু ঘৃণা আর অবহেলা পেয়েছে। আজ ভোরেব প্রস্ফুটিত কয়েকটি ফুল তাকে এক নতুন অনুভূতির জন্ম দিল এই জীবন শুধু মরুভূমির মত শূন্য দিগন্তে বিস্তৃত নয়। হঠাৎ তার মন দুলে ওঠে। নিজের জীবনের সাফল্যের দু একটি ছবি সে ঘষে ঘষে উজ্জ্বল করে তোলে। খুশি হয। আনন্দে তাব চোখ চক চক করে ওঠে। সে ভাবতে থাকে আরো সুন্দব জীবনের কথা। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়? স্বপ্ন আর সাফল্যের দেশ থেকে ফিরে আসতে তার বেশী সময় লাগে না। আর তখন মাথাব ওপব ঝুলে থাকা অনিশ্চিত অন্ধকাবের কালো মেঘ চোখের সামনে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে দুলতে থাকবে। আর মাত্র দুটি বছব, যা দেখতে দেখতে চলে যাবে। তারপর? তারপর? রিটায়ারের পরের দিনই এই কোয়ার্টাব ছেড়ে দিতে হবে। তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এই সব কথা ভাবলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বুক ভেঙে কান্না আসে।

'এই শহরে বাসা ভাড়া পাওয়ার চাইতে লটারিতে টাকা পাওয়া সোজা।' কথাটি কেউ মজা করে বলে থাকবে। কিন্তু কি তীব্র সত্য নিহিত আছে এব মধ্যে সে ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানবে? প্রথমে ভেবেছিল রিটায়ারের পর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাসহ আর যে সব টাকা পাবে, তা নিয়ে কোন ছোট শহরে চলে যাবে। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলতে তুলতে এখন এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে এক ছটাক জমি কেনার সামর্থও নেই! সময় যত ঘনিয়ে আসছে, সমস্যা তত পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে! জীবনের জটিলতার

মুখোমুখি সে কৈশোর থেকেই হচ্ছে, কিন্তু আজ প্রান্তবেলায় এসে মনে হচ্ছে, সত্যি নিস্তার নেই। যতবার সে ওপরে উঠতে চেয়েছে, সাপ লুডোর ভুল চালের মত ততবার আবার প্রথম ঘরে ফিরে এসেছে।

'বাবা, কি এত ভাবছ?' ক্রাচে ভর দিয়ে অনুরাধা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মন্মথ খেয়াল করে নি।

'কিছু না মা। ফুলগুলি দেখছিলাম। কি সুন্দর হয়েছে না রে?'

'সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। গোলাপী রঙের এত বড় সাইজের জবা ফুল খুব একটা দেখা যায় না। আমি ঠিক করেছি প্রথম ফুলটি ঠাকুরের পায়ে দেব।'

'দিস মা।'

আরো কিছু কথা হয়ত হোত, তার আগেই স্ত্রী বেলা এক পেয়ালা চা আর খান কতক বাসি রুটি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমাকে চা খেয়ে উদ্ধার করবে না সারা সকাল মেয়েব সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলবে।' তারপর যেতে যেতে বলল, 'বিকলাঙ্গ এক মেয়েকে নিয়ে এত নাচানাচি কেন বুঝি না। ছোট মেয়ে ঘরে দু পয়সা আনছে অথচ তার দিকে সামান্য খেয়ালটুকু পর্যন্ত নেই।'

দু'জনেই শুদ্ধ হয়ে যায়। মন্মথ হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা অনুভব করে, যা লজ্জা আর ঘৃণা থেকে উঠে আসা হতে পারে। অনুরাধা তো বেলার নিজের মেয়ে— তাহলে এত নিষ্ঠুর হয় কি ভাবে? মন্মথ মরিয়া হয়ে কিছু একটা বলতে চায়, তার আগেই অনুরাধা মিনতি করে, 'দোহাই বাবা কিছু বল না, ওতে আমার কিছু হয় না।'

অক্ষম পিতার গ্লানিতে মন্মথ পুড়তে থাকে। সে জানে অগোচরে মেয়েটির দু'চোখে অশ্রু দুলে উঠছে।

মন্মথ বুঝতে পারে, সে যতদিন বেঁচে থাকবে, দু বেলা দু মুঠো ভাতের ব্যাবস্থা হবে অনুরাধার। কিন্তু সে চোখ বুজলে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এই সব মনে এলে মন্মথ পাগল হয়ে যায়, অথচ সমাধান খুঁজে পায় না।

চা-রুটি খেয়ে মন্মথ উঠোনে এসে স্ত্রী কিংবা ছোট মেয়ে মণীষাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, চুপিসারে অনুরাধাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বলল—

'দেখ, কাল আমি দুশো টাকা এরিয়ার ডি. এ. পেয়েছি। টাকাটা আলাদা করে রেখেছি তোকে একটা শাড়ি কিনে দেবো বলে। গেল মাসে তোর মা আর মণীষাকে দিয়েছি, এইবাব এটা তুই নে। তোর তো একদম শাড়ি নেই।'

'থাক বাবা, এখন আমার শাড়ির দরকাব নেই। যা আছে তাতে চলে যাবে। তুমি বরং মুদির দোকানের টাকাটা দিয়ে দাও।'

'দূর পাগলি, তোকে একটা শাড়ি কিনে দিলে কি আমার দোকানের টাকা দেয়া আটকাবে? আর দেখ চারদিকে এত ধার রয়েছে যে মরার আগে তা শোধ করতে পারব কি না কে জানে। তুই বরং একটা শাড়ি নে। আমার খুব ভাল লাগবে।'

ওদের কথার মাঝখানে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেলা ঘরে ঢুকে বলল, 'আগে বাজার করে আমাকে উদ্ধার কর, তারপর বাপ-মেয়ে যত খুশি আড্ডা মার।' তারপর হঠাৎ মেয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কিরে, তুই এখানে বসে আছিস কেন? চায়ের বাসনগুলো কে মাজবে? তোর বাপকে বল না একটা ঝি রেখে দিতে। সে মুরোদ তো নেই।'

মন্মথর আর সহ্য হল না, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'তুমি কি ভেবেছ? সবসময় মেয়েটাকে গালাগাল দেবে। সংসারে কোন কাজটি ও করে না।'

'চুপ কর, ঐতো এক বিকলাঙ্গ মেয়ে; ভবিষ্যতে ওর কি হবে ভেবেছ? ভাববে আর কি, যার নিজেরই কোন ভবিষ্যত নেই।'

মন্মথ আর কিছু বলার আগে দপ দপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনুরাধা হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মন্মথ মেয়ের দিকে তাকাতে পারল না। মাথা নিচু করে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাজার করে ফিরে এসে মন্মথ দেখল, ছোট মেয়ে মণীষা ঘুম থেকে উঠে এক মুখ ফেনা নিয়ে দাঁত মাজছে। মণীষার পায়ে সুন্দর লাল চটি। শাড়িটিও রঙ চঙে খুব সুন্দর। দুশ' টাকার মাষ্টারি করে এত খরচ করে কি ভাবে? মন্মথ একটু অপেক্ষা করল। বেলা অন্যদিকে তাকিয়ে হাত থেকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেল। কোন কথা বলল না। মন্মথ বুঝল এখন আর তার প্রয়োজন নেই। সে কাউকে কিছু না বলে, বাসা থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকে।

বাইরে এলে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। প্রতিদিনের নীচতা, ঘৃণা থেকে বেরিয়ে আসা যায় এক নতুন আলোয়। এখন শীতের শুরু। এরই মধ্যে কচি পাতার গায়ে গায়ে লেগে আছে নরম রোদ। হৃদয়ে কোমলতা অনুভব করে মন্মথ। এই ছাপান্ন বছর বয়সে তার নতুন করে কিছুই পাবার নেই। নেই কোন আকাঙ্ক্ষা। শুধু রৌদ্রের নীলিমায় জেগে থাকে ব্যর্থতার গ্লানি।

অথচ রুচিশীল, শিক্ষিত, সহানুভূতিপরায়ন মন্মথ মনেব দিক থেকে উদার। জীবনে অযথা কাউকে আঘাত দিযে কথা বলে নি। এই নম্র স্বভাবেব মন্মথকেও চরম অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, এক অশিক্ষিত উদ্ধত দারোগার। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে এবং প্রতিবাদহীন অপমান সহ্য কবার যন্ত্রণায় সেদিন সে পাগলেব মত কেঁদেছিল। যেহেতু অন্য কোন আশ্রয় তার জানা ছিল না। এই ভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, তার একমাত্র ছেলে হাইওয়েতে ডাকাতি কবতে গিয়ে পুলিশেব গুলিতে মারা যায়। থানার দারোগা মন্মথকে ডেকে নিযে লাস সনাক্ত করতে বলে চবম অপমান করেছিল। মন্মথ নীরবে সেই অপমান সহ্য কবেছিল। তারপর মর্গ থেকে মৃতদেহ নিয়ে, না জ্বালানো পর্যন্ত তাব জীবনে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এবং সে অভিজ্ঞতা যে কী কষ্টকর এবং বেদনা-দায়ক তার মর্ম সে প্রতিটি নিঃশ্বাসে অনুভব কবেছিল। অথচ মারা যাবার খবর পেযে, এমন কি শ্মশানে মুখাগ্নি করার সময়েও তার হাত কাঁপে নি। কান্নাতো নযই।

এই তো মন্মথের জীবন। ছেলে ডাকাত, ছোট মেয়ের চলা ফেরা শোভন নয। আর স্ত্রী থেকেও নেই। এখন বেঁচে থাকাই তার কাছে বিড়ম্বনা। তবু অনুরাধাই তাকে বার বাব পিছু টেনে ধবে। এখনো যে কখনো কখনো শান্তি পায়, সে তো

ঐ মেয়েটার জন্যই।

ছোট রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠে আসে। এই রাস্তার প্রায় ধার ঘেঁষে পাহাড় উঠে গেছে। মন্মথ চোখ ফেরাতেই পাহাড়ের গায়ে মিশনের মন্দির চোখে পড়ল। সেই ছোট্ট মন্দির আজ কত বড় হয়েছে। এমন কি মন্দিরের লাগোয়া কলেজটিও আর আগের মত নেই। আসলে পৃথিবীর সব কিছু বড় হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, শুধু তার জীবনই ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

'এই মন্মথ, কোথায় চললে?' হঠাৎডাক শুনে ফিরে দেখল, ওরই অফিসের সুরেশ সেন।

'কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে ঘুরছি।'

'ভালই হল, চল খানিকটা হাঁটা যাক।'

'পোর্টের দিকে যাবে? অনেকদিন যাই নি। শুনেছি খুব সুন্দর হয়েছে।'

'আমি অত দূর যাচ্ছি না। আমার অন্য কাজ আছে। তোমাকে ববং খানিকটা এগিয়ে দিই।'

হাঁটতে হাঁটতে সুবেশ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথম যখন আসি, এই পাহাড় কত গাছগাছালিতে ভরা আর কি সবুজ ছিল। এখন সব কেটে কুটে যেখানে সেখানে বাড়ি ঘর তুলে সব শূণ্য কবে ছেড়েছে।'

'হ্যাঁ ভাই আমাদেব জীবনের মতো।'

'বড় সুন্দর কথা বলেছ হে। এই যে হাঁটছি, কথা বলছি, কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় ঘুরছে রিটায়াবের সময ঘনিয়ে আসছে। অথচ একটা ছেলের চাকরি হল না, একটা মেয়েব বিয়ে দিতে পারলাম না। মাথা গোঁজার মত এক কাঠা জমিও নেই। চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে যাই।'

'আমারও তো একই অবস্থা। তবে আমার সমস্যা আরো গভীর। যখন আমি থাকবো না, কি হবে অনুবাধার? বিয়ে যে হবেনা ধরেই নিয়েছি। তাহলে কে দেখবে ওকে? ভাব আমার কথা?'

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে যায়, কথা হয় না। পথের দু ধারের কৃষ্ণচূড়ার ডাল ছাপিয়ে ফুল এসেছে। এক রত্তির এক পাখি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল। মাথার ওপর নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ জুড়ে সূর্যের আলোব ছটা যেন এক অনন্ত জীবনের বার্তা ঘোষণা করছে। আর সেই আলোকোজ্জ্বল আকাশের নীচে দুটি ভাঙ্গাচোরা মুখ একটু নিশ্চিন্তির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে মরছিল।

'বুঝলে মন্মথ, বাঁচার একটি মাত্র পথ আছে।'

গমগম করে সুরেশের কণ্ঠস্বর মন্মথর সামনে থমকে দাঁড়ায়।

'কি সেই পথ?' উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'মৃত্যু'। 'এই ধরো, এখন যদি হঠাৎ মারা যেতাম।' মন্মথ চমকে উঠে।

'কি বলছ পাগলের মত।'

'ঠিকই বলছি।'

'আমিতো জানি একমাত্র উপার্জনশীল মানুষের মৃত্যু হলে সমস্ত পরিবার পথে এসে দাঁড়ায়, তুমিতো ঠিক উল্টো কথা বলছ।'

'দেখ, যে কয়েক দিন চাকরিতে আছ, দু মুঠো ভাতের অভাব হচ্ছে না।

যেই রিটায়ারটি করলে অমনি এক রাশ সমস্যা লাফ দিয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে বসল। রাতারাতি তোমার আয় আদ্দেক হল অথচ তোমার খরচ কমল না। সব চাইতে বড় কথা, থাকবে কোথায়? এই শহরে হাজার টাকা দিলেও দু'কামরার ঘরও পাবে না।'

সুরেশ থামল। এক নাগারে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে হয়ত বিষাদও। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার বলল, 'আর দেখ, তুমি যদি চাকরিতে থাকতে থাকতে মারা যাও, সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, সঙ্গে গ্র্যাচুইটি, লিভ এনক্যাশমেন্ট অর্থাৎ সব মিলিয়ে দেড় লাখ, দু'লাখ পেয়ে যাচ্ছ। তার ওপব স্ত্রীর ফ্যামিলি পেনসন। তার চেয়েও বড় কথা কম্প্যাশনেট গ্রাউণ্ডে ছেলে বা মেয়ের কারো একজনের চাকরি হবে এবং তোমার কোয়ার্টার্স তার নামে হযে যাচ্ছে। অর্থাৎ তোমার মৃত্যু মানে একটি পরিবারেব নিশ্চিত বাঁচা।'

মন্মথ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে পড়ল। একটি পবিবারকে বাঁচাতে এরকম একটা সহজ পথ রয়েছে, সে কোনদিন কল্পনাও করেনি। এখন যদি তার মৃত্যু হয়,তাহলে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী থাকবে না, যে তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পবিবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আত্মীয় স্বজনেবা বলতে পারবে না— ও একট. মানুষ নাকি? কোন দায়িত্বই পালন কবল না। হারামজাদা গেছে ভালই হয়েছে।

'শোন মন্মথ, আমি মৃত্যুর জন্যে এত আকুল হয়ে আছি যে অফিসে নিজের টেবিলটা সরিয়ে সব থেকে পুরোনো ফ্যানের নিচে নিয়ে গেছি। হঠাৎ যদি পুরোনো ফ্যানটা মাথার ওপর ভেঙে পড়ে, আহ, আর জ্ঞান ফিরবে না। কোন কষ্ট অনুভব করব না। এক ঘুমের মধ্যে চিবকালের বিদায়। আর তখন মৃত্যু হবে কর্মরত অবস্থায়, মানে আরো সুবিধে। সবকিছু প্রায়বিটিতে হয়ে যাবে।'

সুরেশ থামল। ইতিমধ্যে রোদ তেতে উঠেছে। আরো এগিয়ে, রাস্তাটা রেল লাইনের গা ঘেঁষে চলে গেছে। একটা স্টীম এঞ্জিন প্রচুর ধোঁয়া তুলে লম্বা ফাঁকা রেক টেনে নিযে যাচ্ছে। স্টীম এঞ্জিনের শব্দ, রাস্তাব বাস, ট্রাক এবং মানুষেব কোলাহল, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ মন্মথব মাথায় ঢুকে যায়। সে অসহায় বোধ করে। সুরেশ ইতিমধ্যে আর কি কি ভেবে রেখেছে, এ সময়ে সেটিও জানা তার পক্ষে খুব জরুরী। আসলে এটা আবার প্রমাণিত হল, মন্মথ ঠিক এই সংসারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এমন কি মৃত্যুর দিক থেকেও তাব বন্ধুরা কত এগিযে আছে!

'আচ্ছা মন্মথ এবার আমি যাই, আর এগুবো না। তুমি বরং ঘুরে এসো।'

'ঠিক আছে। কাল অফিসে একবার যাব। কিছু জরুরী কাজ আছে।'

'কালতো ববিবার।'

'তাহলেও যেতে হবে। তুমি আসবে? নিরিবিলিতে কথা হবে।'

'দেখি, সময় করে উঠতে পারি কিনা।'

মন্মথ রেল লাইন পেরিয়ে, ঘিঞ্জি বাজারের ভেতর দিয়ে সর্টকাট করে পোর্টে পৌঁছে গেল। এরমধ্যে পোর্টের এত উন্নতি হয়েছে দেখে মন্মথ অবাক হল। বড ক্রেন বসেছে। সমস্ত পোর্ট জুড়ে সিমেন্ট কংক্রিট করা হয়েছে। আগের তুলনায় অনেক বেশী স্টীমার নোঙর করে আছে। মাল উঠছে, নামছে। কুলিদের চিৎকার।

অদূরের দীর্ঘ সেতুর ওপর দিয়ে অনবরত ট্রাক, বাস যাচ্ছে। মন্মথ পোর্টের একেবারে শেষে এসে, একটি গাছের ছায়ায় রুমাল পেতে বসল। নদীর খুব কাছাকাছি। বয়ে যাওয়া জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, সে নদীর সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পায়। উৎস থেকে এই জলরাশি যখন যাত্রা করে তখন তার বুকে অনেক স্বপ্ন থাকে, কোন একদিন এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে সাগরে মিশে যাবে। মিশে যাবে অসীম, অনন্তের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত! কতটুকু জলরাশি সেই অনন্তের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিশতে পারে। আর আটকে থাকা জমা জল ধীরে ধীরে পরে নোংরা হয়ে শুষ্ক মাটির বুকে অগোচরে বিলীন হয়ে যায়। মন্মথের জীবনও এই আটকে থাকা পচা, নোংরা জলের মত. গভীর অন্ধকারে প্রদীপ শিখার মত এই জীবন একদিনের জন্যও জ্বলে উঠবে না।

মৃত্যু ভাবনা মন্মথের মাথার মধ্যে ইষ্টনামের মত গেঁথে গেছে। এই একটি শব্দই এখন তার নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস। এই শব্দটি যেন তার আর এক সত্তা যে প্রতিমুহূর্তে বলে উঠছে, মন্মথ তোমার আর সময় নেই। আর মাত্র চব্বিশ মাস। এই সময়টুকু দেখতে দেখতে চলে যাবে। এই সময়ের পর মৃত্যু হলে সেটা বিষাক্ত সাপের দংশনের মত তীব্র জ্বালাময়। আর এখন যদি তোমার মৃত্যু হয় সেটি হবে বড় গৌরবের। আত্মীয় স্বজন, পাড়ার লোকেরা, খৈ ছড়াতে ছড়াতে তোমার মৃতদেহ নিয়ে যাবে। অসংখ্য ফুলের মাঝে মৃত্যুর দীপ্তিতে তোমার মুখ দেখে সঙ্গীরা বলবে, এক পুণ্যবান সার্থক মানুষ চলে গেল।

দিন যায়, মন্মথ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একটি প্রয়োজনীয় মৃত্যুর জন্য সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, ভিখিরিকে পয়সা দেয়। তবু মৃত্যু দূর থেকেই বিদায় নেয়। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে একদিন সুরেশকে বলে—

'আচ্ছা কত লোক তো নানা কারণে আত্মহত্যা করে। ওরাও কি এসব সুবিধে পায় ?'

'খেপেছ! তখন মৃত্যু হবে অস্বাভাবিক। আর আনন্যাচারাল ডেথ হলে কোন সুবিধেই পাবে না।'

ক্রমাগত মৃত্যু চিন্তায় মন্মথ মানসিক ভারসাম্য হারিযে ফেলে। তার ঘুম হয় না। খাওয়া খুব কমে গেছে। অফিস কামাই হচ্ছে। স্নায়ু ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে। পরিচিত মানুষের নাম ভুলে যায়। মধ্য রাতে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। চমকে বিছানায় উঠে বসে। লুমিনাস ডায়াল লাগন দেয়াল ঘড়িটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ভোরের প্রথম পাখিটা ডেকে ওঠে অজান্তে। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার জীবন থেকে আর একটি অমূল্য দিন চলে গেল, অথচ তার মৃত্যু হল না। একজন মানুষ আর কত সহ্য করবে ? এবার বুঝি সে সত্যি পাগল হয়ে যাবে।

অনুরাধা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছে, মন্মথ অসম্ভব শুকিয়ে যাচ্ছে। কথা খুব কম বলছে। একা একা ঘুরে বেড়ায়। কিছু বলতে গেলে এড়িয়ে যায়। সে বুঝেছে মন্মথর গুরুতর কিছু হয়েছে। কিন্তু সে কি করবে ? সেদিন রাতে মন্মথকে একলা পেয়ে বলল—

'বাবা সত্যি করে বলতো, তোমার কি হয়েছে ?'

'কি হবে, কিছুই হয় নি। ঠিকইতো আছি।'

'কেন অযথা আমায় ভোলাচ্ছ। আয়নায় একবার নিজের চেহারা দেখেছ, কি ছিলে আর কি হয়েছ? খাওয়া দাওয়া তো বন্ধই করেছ।'

'আমার কিছুই হয় নি। তুই শুধু শুধু ভাবছিস।'

'তুমি বিছানায় পড়লে আমাদের কি উপায় হবে একবার ভেবেছ? মরণ ছাড়া আর কোন রাস্তা আছে?'

'তোর ধারণা ভুল।' আমি মরলেই বরং তোরা বাঁচবি। একবার ভেবে দেখ। একবার ভেবে দেখ, আমি মরলে তোর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হবে, তোর মা পেনসন পাবে, এই কোয়ার্টার্স তোর নামে হবে আর অন্য টাকাতো পাবিই। এখনকার চাইতে আয় অনেক বাড়বে। আমি না থাকলে তোরা অনেক সুখে থাকতে পারবি।'

'কি বলছ বাবা? তুমি কি পাগল হলে?'

'না রে পাগল হই নি। ভেবে দেখিস, যা বললাম।'

আর কোন কথা হয় না। একটা দম বন্ধ হাওয়া আর অন্ধকার ওদের ঘিরে থাকে।

তন্দ্রা আর জাগরণের মাঝে শেষ রাতে মন্মথর ঘুম ভেঙে যায়। কোথাও সামান্য শব্দ নেই। নিশ্চুপ, নিশ্চল, অন্ধকারে ভরা পৃথিবী। মন্মথ সন্তর্পণে দুয়াব খুলে বাইরে আসে। রাস্তায় সোডিয়াম ভেপোরাবের উজ্জ্বল আলোয় নানা রকম পোকা সভা করছে। এ্যান্টেনার ওপর বসে থাকা একটা প্যাঁচা ঘাড় ঘুবিয়ে মন্মথকে দেখল।

মন্মথ ধীরে ধীরে, ছোট রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে এলো। শিশির ভেজা দূব্বো ঘাসে মন্মথ খালি পায়ে হাঁটতে থাকে। শেষ রাতের হাওয়া আর সিক্ত শিশিরে তার শরীরে এক প্রশান্তি নেমে আসে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের পৃথিবী বড় পবিত্র, বড় নির্মল। বীজাণুমুক্ত বাতাস সে ফুসফুস ভরে নেয়।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট গানের কলির মত তখন দিনের আলো ফুটবে বলে ভাবছে। ঠিক সেই সময়ে মন্মথ তার আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু পেয়ে যায়। তার টুকটুকে পায়ের তলা থেকে, বাঁশির মধুব সুর উপেক্ষা করে, সম্ভবত মন্মথকে মুক্তি দিতে, অপূর্ব চিক্কন শরীর নিয়ে রাজ মহিমায়, বিদ্যুতের মত চমকে উঠেছিল শুধু একবার। মন্মথ ঝাপিয়ে পাযের পাতা চেপে ধরে, সেই অমোঘ মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে, সে আৎকে উঠল। যে মৃত্যুর জন্য তার দীর্ঘ যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষা, আজ সেই মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে বাঁচার জন্য কি তীব্র আকুলতা। তার মনে একের পর এক কত সুখ দুঃখের ছবি এসে যায়। মেয়ে অনুরাধা, স্ত্রী, ছোট মেয়ে, এমন কি সেই ছেলেটির মুখও, যার মৃত্যুতে কখনো চোখের কোলে এক বিন্দু অশ্রুও জমা হয় নি। বড় ইচ্ছে জাগে, যদি তারা এখন তার পাশে এসে দাঁড়াত! যে মৃত্যুর জন্যে এত প্রার্থনা, তার চাইতে বাঁচা যে কত আনন্দের, কত আবেগেব, মৃত্যুর দুয়ারে পা দিয়ে, তা বুঝল।

চোখের জ্যোতি ক্রমশঃ নিভে আসছে। সে প্রাণপণে চিৎকার করে, সবাইকে ডাকতে চাইল, কিন্তু আতঙ্কে আর মৃত্যু ভয়ে গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরুল

না। সমস্ত শরীরে বিষের তীব্র জ্বালা। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। কিছু একটা আঁকড়ে ধরার আশায় অন্ধ চোখে হাওয়ায় হাতড়ে যায় কিন্তু কিছুই পায় না। উত্তোলিত হতে ভেঙে পড়া নৌকোর মাস্তুলের মত শূন্য থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে। আর তখন সূর্য তার আলোর কলসের মুখ খুলে দিকে দিকে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই আলোকিত মাঠের ভেতর থেকে তার ছোট্ট ফুসফুসের জন্য শেষ বাতাসটুকু উঠে এলো। আর তখন মিশন থেকে সমবেত কণ্ঠে গান ভেসে আসছে, 'প্রভু দয়া কর দীনজনে।' চিরকালের অবহেলিত মানুষটি, এই পৃথিবীর সমস্ত ঋণ চুকিয়ে ভেজা মাটির বুকে তার শেষ নিঃশ্বাস রাখল।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

আঁচল

মারা যাবার ক'দিন আগে থেকে যে ছেলেকে সামনে পাচ্ছিল বাবা, কাতর গলায় তাকেই অনুরোধ করছিল, ওবে, তোদের মাকে দেখিস।

মৃত্যুর আ-শোঁকা ঘ্রাণ এসে হয়তো নাকে লাগছিল বাবার, তাই অমন কাতব আবেদন জানাচ্ছিল ছেলেদের। বাবাব গলায ক্যানসাব হযেছিল। এই কালব্যাধির খবর প্রায় প্রথম থেকেই জানত বাবা; জানত সময় দ্রুত ফুবিযে আসছে, তাই বড্ড অধীব হয়ে পড়েছিল মা'র নিরাপত্তাব কথা ভেবে। তেরো বছব বয়সে এক গা গয়না আর লাল চেলি পরে মা বাবাব ঘর করতে আসে, বাবার তখন পঁচিশ চলছে। পঁচাত্তর পূর্ণ করে বাবা মাবা গেল। পুরো পঞ্চাশ বছর সময দু'জন একসঙ্গে কাটিয়েছে। তেরো বছরের কিশোরী এখন সত্তব পেরোনো থুত্থুরে বুড়ি। বাবা যখন মারা যায় তখন মা'র পরনে ছিল চওড়া লাল পাড়, কপালে মস্ত সিঁদুব গোলা ফোঁটা, বাবার পাঁজর বেরোনো শীর্ণ বুকের শাদা রোমলাঞ্ছিত এক খাবলা জমিতে অসহায় মাথা কুটছিল মা, যেন নিরেট পাষাণে মাথা কুটে রক্ত ঝবাবেই! সঙ্গে বুকফাটা,স্বরচেবা বিলম্বিত লযের আর্তনাদ, 'ওগো, আমাকে ফেলে কোথায গেলে -এ-এ-!'

চিনেমাটির ডিশ থেকে চামচে করে তেলেভাজা ফুলকো চিঁড়ে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে মেজো ছেলে একদৃষ্টে মা'ব দিকে তাকিয়ে পুরানো কথাগুলো ভাবছিল বা পবপর মনে করে যাচ্ছিল। কয়েক হাত ব্যবধানে বসা ছেলেব দিকে ছানিপড়া চোখে মাও স্থির তাকিয়ে আছে। প্রথম গ্রীষ্মের প্রখর রোদ ঠেঙিয়ে মাকে দেখতে এসে ছেলে যে আজ বিরক্তি না দেখিয়ে কিছু মুখে দিচ্ছে এতে মা'ব বড্ড তৃপ্তি। বলিরেখা কুঞ্চিত শুকনো মুখে দু'ঠোঁটের স্মিত তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে, দৃষ্টিটা শুধু কেমন ঘোলাটে। ছানি কেটে ওটাকে স্বচ্ছ করা সম্ভব হলো না। মা কোনোদিন ছানি কাটার কথা বলেও না, শবীরে বিষাক্ত হুলের মতো সূঁচ ফোটানো, কাটা-ছেঁড়া এসবকে ভীষণ ভয পায় মা।

ডিশের চিঁড়ে প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কীরে, আরেকটু নিবি?'

মায়ের প্রশ্নের জবাবে না-বোধক মাথা নাড়ে ছেলে। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস নিয়ে ঢক ঢক করে জল খায়, তৃপ্তিব ঢেকুর তোলে একটা। ছেলে বুঝতেও পারে না ওর খাওয়া দেখতে দেখতে মা'র মন চলে গেছে অতীতে। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই ছেলে হয়ে গেছে একরত্তি দুষ্টু খোকা, খাবার সামনে ধরলে যার অনীহার অবধি থাকে না, কাছে বসে শরীরে-মাথায় হাত বুলিযে কতো কী আবোল-তাবোল বকতে বকতে ওর মুখে গ্রাস তুলে দেওয়া। এখনও বাল্য-কৈশোরের স্বভাবটি রয়ে গেছে ছেলের, কিছু খেতে বললেই না না করে ওঠা, কিন্তু দেখ, আজ কেমন লক্ষ্মীটি

হয়ে ডিশ চেটেপুটে খাচ্ছে ছেলে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়ই! মায়ার কাজলে আচ্ছন্ন ছানিপড়া চোখদুটি পাকা ফলের মতো টসটসে হয়ে আসে মা'র!

বেশ কিছুদিন হলো মা'র আরেকটি নতুন ব্যামো দেখা দিয়েছে, কানে খাটো হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়, কখনও বা কানের কাছে মুখ নিতে হয় বা ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গোল বাধিয়েছে চোখদুটি। বইয়ের পোকা মা, সেই মা কিনা ভালো করে বই পড়তে পাচ্ছে না; পরিচিত কেউ এসে 'চিনতে পাচ্ছেন' বলে সামনে দাঁড়ালে ঝট করে চিনতে না পারায় কী দুরন্ত অসহায় মুখের রেখা!

জল-টল খেয়ে একটু ধাতস্থ হতেই মা জি'জ্ঞস করে, 'হ্যা রে আমার ওষুধ এনেছিস?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ছেলে। 'এহ্ হে, একেবারে মনে নেই যে! জিভে কামড় দেয় ছোট করে।'

'ভুলে গেছিস কী রে, এদিকে আমার চোখে যে সব কুয়াশা কুয়াশা লাগে, তোর মুখটাও ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না!' কাতর গলায় অনুযোগ করে মা।

আসলে ওষুধ আনতে প্রায়ই গা করে না মেজো। রোজই একবার ভাবে ওষুধ নেবে তারপর দিব্যি ভুলে যায়। শহরতলিতে মেজো নতুন বাড়ি করেছে, ডাক্তারের চেম্বার ঘেঁষেই তার আসা-যাওয়া, দু'বেলা চোখে পড়ে ডাক্তার রোগীপত্তর নিয়ে বসেছে, টেবিলে কাগজের টুকরো সাজিয়ে পাউডার ও গ্লোব মিশিয়ে পুরিয়া বাধছে, হাত পেতে টাকা নিচ্ছে; কিন্তু ওখানে ঢুকে আধঘণ্টা টাক বসে ওষুধ নেওয়া বিরক্তিকর ও একঘেয়ে ঠেকে, আজ-না-কাল করতে করতে দেরী করে ফেলে মেজো। মার দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি বলে, 'কাল বিকালে সিওর এনে দেবো, মিস হবে না।'

'দেখিস ভুলে না যাস আবার।'

'না, না ভুলবো না, ঠিক এনে দেব দেখো।'

পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসেছিল মা, ধীরে ধীরে পাটকাঠির মতো সরু আর পলকা পা দুখানা মেঝেতে নামিয়ে দু'কদম হেঁটে ছেলের কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'দেখতো কদিন থেকে আমার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে খুব ব্যথা, পা ফেলতে পারি না, কোথায় যে লাগলো বুঝতে পারিনি।'

একটু নুইয়ে বুড়োতে নজর দেয় ছেলে, 'সামান্য ফোলা মনে হচ্ছে।' ডানহাতের তর্জনী দিয়ে হালকা ছোঁয়ায় টিপে দিতেই মা আহ্ করে অস্ফুট শব্দ করে। 'লেগেছে মনে হচ্ছে।' মাথা তুলে ছেলে বলে, 'ডাক্তারকে তোমার আঙুলের কথাও বলবো না হয়।'

'বলিস তো, সেদিন গীতার মা কতখানি কাঁচা হলুদ বাটা আর চুন লাগিয়ে দিয়েছিল, কোনও কাজ হয়নি রে।'

দরজার ভেতর আবছা ছায়া ফেলে অফিস ফেরত বড় ছেলে এসে ঘরে ঢোকে। হাতে ঝোলানো ফোলিও ব্যাগের সঙ্গে হলদে রঙের পলিথিন ক্যারি ব্যাগ। মেজোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলে, 'তুই কখন এলি?'

'একটু আগে এসেছি।'

মা আর ভাইকে পাশ কাটিয়ে পাশের রুমে ঢোকে বড় ছেলে।

'ও বউ, খোকন এসেছে গো।' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বউকে ডাকে মা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে বউ বেরিয়ে আসে, মেজোর দিকে প্লেটশুদ্ধ কাপ বাড়িয়ে মৃদু অভিযোগের গলায় বলে, 'মা এতো তাড়া দেয় না!'

'বাবারওতো একই স্বভাব ছিল।' মেজো প্রশ্রয়ের সুরে স্মিত হেসে উত্তর করে।

'তবুও বাবা বুঝতো, মা একদম বোঝে না।' ঈষৎ বিরক্তির আভাস বৌদির কথায়।

পাশের রুম থেকে তোয়ালে কাঁধে ঝুলিয়ে বড় বেরিয়ে এসে বউকে বলে, 'আমার ছেলে কোথায় গো?'

'কেন? খেলতে বেরিয়েছে।'

'ওর জন্য আঙুর এনেছিলাম, আজ বেশ সস্তা যাচ্ছে।'

বউ ও ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মা ওদের কথা বোঝার চেষ্টা করে।

'এসে খাবে আর কি। তুমি মুখহাত ধোও, আমি তোমার খাবার রেডি করি।'

বড় শ্লথ পায়ে বাথরুমে ঢোকে, বউ রান্নাঘরের দিকে যায়।

দু'জন দু'দিকে চলে যেতেই মা পা টিপে টিপে হেঁটে এসে মেজোব সামনে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি গলায় জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাই, ওরা কীসেব কথা বলছিল রে?'

'দাদা রাখুর খোঁজ করছিল?'

'কেন?'

'ওর জন্য আঙুর এনেছে কিনা।'

'ও' উদাস ভঙ্গিতে মিয়ানো গলায় শব্দ করে মা। দুঠোঁট বেকিয়ে বলে, 'এবার আঙুর এতো টক, মুখে দেয়া যায় না।'

কথা শুনে মেজো মনে মনে এক চোট হাসে। ক'দিন আগে কিছু আঙুর এনে মাকে দিয়েছিল, তক্ষুণি কয়েকটা মুখে ফেলে মা বলেছিল, 'ইস, কী মিষ্টি রে!'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মাথা মুছতে মুছতে বড এসে সামনে দাঁড়ায়, মাকে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে মেজোকে বলে, 'আমার বদলিব খবর শুনে মা কী বলেছে জানিস?'

'কী বলেছে?' মেজো মুখে হাসি টেনে বলে।

'তুমি চলে গেলে আমাকে দেখবে কে শুনি, আমার একটা বন্দোবস্ত করে যাও, আমার চোখ দুটোরওতো কোনও ব্যবস্থা করনি!'

মার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসে মেজো। 'ছোট শুনলে কী ভাববে বলতো?'

'শুনলে কী রে, ওর সামনেই তো মা কথাগুলো আমাকে বলল।'

' রাগ করেনি?'

'না। শুধু বলেছে মার ভীমরতি ধরে মাথাটা নাকি খাবাপ হয়ে গেছে।'

দু'ভাইকে থেকে থেকে লক্ষ্য করছিল মা, ওদের কথা বোঝার চেষ্টা করছিল। কাঁধের দুপাশ বেয়ে শাদা পাটের মতো কিছু রুক্ষ চুল ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

পরনের সাদা থান এলোমেলো। চিমসে যাওয়া বুকজোড়া ফুটো বেলুনের মতো পেটের ওপর ঝুলছে। এই বুকের দুধ খেয়ে একে একে ওরা আটটি ভাইবোন বড় হয়েছে। ছোট তো অনেক বয়স অব্দি মার বুকের দুধের ন্যাওটা ছিল। কথাগুলো ভাবলে কেমন আশ্চর্য ঠেকে, ওই চিমসানো বুক দুটো একদিন দুধের ঝরণা ছিল। বিশ্বাস কবতে হয়! একসময় কত পরিপাটি, কত সুন্দর ছিল মা। এবড়ো থেবড়ো বলিবেখা আঁকা মুখে এখন শুধু অবিকৃত আছে টিকলো নাকটি। ভাইবোনের ভেতর দাদা-ই শুধু নাকটি পেয়েছে। এখন শরীরের দিকে, পোশাকেব দিকে ফিরেও তাকায় না মা। এখন শুধু মহাপ্রস্থানের চিন্তা, বোধহয ভেতবে ভেতরে বাসা বদলের ডাক শুনতে পেযেছে। তাই আক্ষেপ কবে, এত লোক মরে, ভগবান আমাকে কেন যে নেয় না। মাঝে মাঝে মেজোব মনে হয, নতুন একটা শরীরে রূপান্তরিত হবার অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনছে মা!

একহাতে বডর জন্য জলখাবাব, অন্য হাতে কাচেব গ্লাসে মার জন্য হালকা গোলাপী রঙের চা নিয়ে বউদি, দু'জনের হাতে দু'টো ধরিয়ে দিয়ে শাশুরিকে বলে, 'বিস্কুট দেব মা?'

'না না একটু চিঁড়ে ভাজা থাকলে দাও।'

বউ মুচকি হেসে দু'ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায, 'শুনলে তো কথা, সবসময বলবে পেট ব্যথা, এদিকে ভাজাভুজি খাবার লোভ ষোলআনা।'

হাতে চাযেব গ্লাস নিয়ে মা মেজোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওরে তোকে বলতে ভুলে গেছি, সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ মণি এসে হাজির, সঙ্গে নাতিন, বৈশাখে ওর বিয়ে। তোদেব যেমন করে হোক যেতে বলেছে।'

মণি জেঠতুতো বোন। থাকে ডিব্রুগড়ে। অনেক দিন হলো ওর সঙ্গে দেখা নেই। মাঝে মাঝে সবাইকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। পুবানো দিনগুলি ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইবোন সবাই মিলে ছোটবেলা একত্রে কাটিয়ে একসময এক এক করে একেকজন ছিটকে গেছে একেক দিকে। এখন আর কারো সঙ্গে কাবো দেখা হয় না, চিঠিপত্রেও যোগাযোগ থাকে না; এখন একেকজন একেকটা নির্জন দ্বীপে যেন স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। মণির মেয়ের বিয়েব কথা জানে মেজো। নেমন্তন্ন চিঠি পেয়েছে। খুড়তুতো ভাই নিলয়কে দিয়ে মণির জামাই চিঠি পাঠিয়েছে অফিসে। ভাগ্নীর বিয়ের চিঠি ভাইয়ের মারফত পেযে মোটেই খুশি হয়নি মেজো। মনে হয়েছে মণি দায সেরেছে। চিঠিটা ডাকে পেলে অবশ্যই এরকম মনে হতো না মেজোর।

মার কানের কাছে মুখ নিয়ে মেজো বলে, 'মণির চিঠি পেয়েছি।'

'কে দিয়ে গেল, জামাই?'

'না, নিলয় দিয়ে গেছে।'

বড় বলে, 'পারলে যাস, আমরা তো যেতে পারবো না।'

বড়র জন্য চা নিযে বউদি ঘরে ঢোকে, মেজোর দিকে ফিরে বলে, 'মণি কিন্তু খুব কবে বলে গেছে, তুমি পারলে যেও, তুমি তো ওদের গ্রামের বাড়ি চেনো, চাকরির খোঁজে নাকি একবাব গিয়েওছিলে!'

যেত। মেজো যেত। গাঁ-গঞ্জের খোলামেলায় শ্বাস নিতে খুব ভালোবাসে ও। কিন্তু নেমন্তন্নটা মেনে নিতে পারছে না। মণির সঙ্গে খুব ভাব ছিল তার। প্রায়

সমবয়সী দু'জন। দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই বলে মণি এরকম ব্যবহার করবে তার সঙ্গে! অভিমানাহত মেজো বউদির দিকে তাকিয়ে নিচু সুরে বলে, 'বুঝলে, হাতে ছুটি নেই, অফিসে অডিট, যাই কেমন করে বলতো?'

এমন সময় ছোটবোন ইতি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ করে ঘরে ঢোকে। ওর দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে মা। নিমেষে মার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মার প্রাণভোমরা ইতির মধ্যে লুকিয়ে আছে যেন! ক'দিন ইতি না এলেই মা সবাইকে জ্বালিয়ে মারে। 'ওরে অনেকদিন হলো মেয়েটা আসে না, জামাই এসেও একটা খোঁজ নেয় না, তোরা কেউ একটু খবর কর না।'

বেশি বয়সের সন্তান ইতি। মেজকা আর কাকিমা দু'জন মিলে ঠাট্টার ছলে ওর নাম রেখেছিল ইতি। 'এতোদিন পরে মাকে দেখতে এলি বুঝি?' ভীষণ অবাক গলায় মার প্রশ্ন।

'আর আসা, বাড়িতে একগাদা আত্মীয়। বউদিরা রোববারে চলে যাচ্ছে শুনে দেখতে এলাম।'

মার পাশে গুছিয়ে বসতে বসতে ইতি চেচিয়ে জবাব দেয়। ইতির মেয়ে নিতু গিয়ে মেজোমামার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। দেখতে বেশ ডাগর হয়েছে মেয়েটি। চেহারায় ইতির ছাপ বসানো। রং ফরসা।

মেজোমামার হাত নিজের তুলতুলে হাতের ভেতর নিয়ে নিতু বলে, 'মেজোমামা তুমি কিন্তু অনেকদিন আমাদে বাড়ি যাওনি, কেন বলতো?'

'তোর মেজোমামা আমাদের ভুলে গেছে রে, মাকে দেখতে আসি বলে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা হয়. মা চোখ বুজলে আর দেখাই হবে না। আমাদের কোনও সম্পর্কই থাকবে না।' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রাগের গলায় মেয়ের প্রশ্নের জবাব দেয় ইতি।

ছোটবোনের কথা শুনে মেজো হাসে, বলে, 'কী যে বলিস, কোথাও যাবার সময়ই পাই না।'

'ছুটির দিনেও বুঝি তোর সময় হয় না?'

'ছুটির দিনে আমার কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করে না।'

'রাখতো তোমাদের ঝগড়া, কী গো ননদাই, এতদিনে বুঝি বউদিকে মনে পড়লো?' মুখে অল্প হাসি টেনে ইতির চোখের দিকে তাকায় বউদি।

'আমার তো তবু মনে পড়ে, তোমার যে একেবারে সাড়া নেই' ঝটপট জবাব দেয় ইতি।

'কী করবো বলো, তোমার ভাইপো ম্যাট্রিক দেবে, ওর পেছনেই দিন কেটে যায় আমার, কোনোদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।' ক্লান্ত শোনায় বউদির গলা।

'এখন দেখছি সকলেরই একই অবস্থা এক-আধটা বাচ্চা নিয়ে এতো হিমসিম খাচ্ছে সবাই— মা ওরা তো আট-নটা বাচ্চা সামলেও দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিল।' শব্দ করে হাসে মেজো।

'তাইতো! একটা বলেই বোধ হয় আমাদের সব গুলিয়ে যায়, না ঠাকুরপো?' বউদি ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে দেবরের মুখের দিকে তাকায়।

মেজোর হঠাৎ করে কৃপাময়দার কথা মনে পড়ে। ভীষণ সুন্দর চেহারা বলে ওকে কেউ কেউ কার্তিকদা বলে ডাকে। একটি বা দুটির বেশি বাচ্চা হওয়া যেখানে সামাজিক অপরাধ সেখানে কৃপাময়দা ওরফে কার্তিকদার চার-চারটি বাচ্চা! চার নম্বর বাচ্চা জন্মানোর বেশ কিছুদিন পর মেজো ওর কৌতূহলী কজন বন্ধু মিলে গিয়েছিল কৃপাময়দার বাড়ি। ওদের দেখে কী নিদারুণ অস্বস্তি কৃপাময়দার, বাচ্চাটাকে দেখাতেই চায় না। ওর ভাবগতিক দেখে তপন হঠাৎ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন গম্ভীর সুরে আওড়াতে শুরু করে, 'দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, ব্যস/ সভ্যতার সায়ংকালীন এই শ্লোগানেব অর্থ বুঝে নিয়ে/ চতুর্থ সন্তান, তুমি ঘরের ভিতরে/ দেয়ালের দিকে মুখ রেখে/ গুম হয়ে বসে আছ....!' ওদিকে ফিচেল হাসি হেসে রঞ্জু তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে কাঁচির মুদ্রা করে বলেছিল, 'কৃপাময়দা, এক্ষুনি কাটার বন্দোবস্ত কর, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভালো টাকা দেয় শুনেছি।'

এসব ভাবতে নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে যাচ্ছিল মেজোর।

'বড় যে একা একা হসছ?' বউদি জানতে চায়।

'না-মানে-একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

'কী কথা?'

'সবার সামনে বলা যাবে না, তোমাকে একা বলবো।'

'অ্যাই ইতি, একটা খবর জানিস?' বউদি ননদাইকে বলে, 'মণির মেয়ের তো বিয়ে।'

'ও মা, মণিদি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নাকি, ইস্!' বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে ইতি। 'কতদিন হলো মণিদিকে দেখিনি। তোমরা জানলে কেমন করে বউদি?'

'মেয়েকে নিয়ে এলো যে, মাকে প্রণাম করে গেল তো।'

'একটা আশ্চর্যেব কথা কি জান, মণিদির মেয়েকে আমি দেখিইনি। একেকসময় যখন ভাবি তখন মনে হয় আমরা সবাই যে কত দূর দূর ছড়িয়ে গেছি!'

ঠিক এমন সময় মা জোরে জোরে কাশতে শুরু করে। কাশির দমকে চা ভর্তি গ্লাস ছিটকে যায় হাত থেকে। ভঙুর কাচের সর্বনাশা শব্দে সবাই বড্ড বেশি চমকে ওঠে। 'কী হলো, কী হলো' বলে বড়, মেজো দ্রুত ছুটে আসে মার দিকে। বিষম খাওয়া মার কোটরে পোরা ফ্যাকাসে চোখের তারাদুটি বাইরে বেরিয়ে আসে। শ্বাস ফেরাতে পারে না মা, বাঁকানো পিঠটা দুমড়ে যাচ্ছিল শুধু শুধু। ইতি মাকে জাপটে ধরে পিঠ মাজতে শুরু করে দেয়। বড় বউকে ত্রস্ত গলায় বলে, 'শিগগিরই এক গ্লাস জল নিয়ে এসো।' মেজো মার সামনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ করে পায়ের তলার দিগন্ত বিস্তৃত মাটি যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে টের পায় মেজো, হাঁটুজোরা দুর্বল মানুষের মতো থরথরিয়ে কাঁপে। ইতি কান্না ভেজা সুরে মেজোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'মেজদা, একজন ডাক্তার ডেকে আন না!'

এতসব হুলুস্থুলের মধ্যে পড়ে ছোট্ট নাতিনিটি 'দিম্মা দিম্মা' বলে হঠাৎভুকরে কেঁদে ওঠে।

সুব্রত কুমার রায়

দেওলা

রাত্রির পাতাঝড়ের অবশেষ নিয়ে জেগে উঠছে ভিটেমাটি-সহ তিনপোতার ঘর। তিনশো বছরের ইতিহাসের নিঃসঙ্গতার কোন সাক্ষী নেই, শুধু ভিটের খুটি চেপে ধরা সাধু আমগাছটা ছাড়া। তবু ক্ষয়ের চিহ্ন তিনপোতার ঘরগুলোয় বিধবার মতো প্রকাশ্য।

উত্তরপোতার ঘরের দরজার শেকল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ভুবনমোহন, যিনি বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ভাঙ্গনের কিছুটা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারেন। ভুবনমোহন এই বংশের শেষ সামন্ত ভূস্বামী। যদিও এখন একফালি বিচরাতে বেগুনের পোকা মারতে কীটনাশক ছেটাতে হয় তাকেই।

তামাকের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পুকুরের সাবেকি ঝামা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা' দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। শ্যাওলারঙ জলের উপর ভাসমান ছোট পানার মধ্যে থেকে একটা ফুলে ওঠা ইটলাল শাড়ির কিছুটা চোখে পড়লো তার। কোন দুর্ঘটনাস্থল থেকে মর্গে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পর মৃতদেহের চারদিকে চক দিয়ে আঁকা আউটলাইনটা হঠাৎ চোখে পড়ার মতো এই দৃশ্য। মৃতদেহ নেই, তবু অনেক অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া এরকমই একটা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে গেল ভুবনমোহন দাসের।

—অই ঘরটা তো পরে অয়। আসাম থাকি হাত্তির পিঠো করিয়া সোনার কাট আনাইয়া। তখন কাটোর দোতালা আচিল।

আয়তক্ষেত্র উঠোনটায় বসে কথাগুলো বলছিল পরানদাদী। পাশে তার বোন বাসন্তী। বসলে একটু দূর থেকে মনে হয় তিন মাথা—দুটো হাঁটু মাথার সাথে ঠক ঠক্ করে অবিরাম কাঁপে। এই ছয় মাথার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তিনঘরের পোলাপানরা।

—তোমার বয়স কতো পরানদাদী?

—বয়অস—তা কতো অইব। ছয় কুড়ি তো অয়বউ। হউ যুদ্ধোর বছর জন্মো। নেউলের গর্তের মতো মুখের ভেতর থেকে কথাগুলো অনেকটা থুতুর সাথে বেরিয়ে এলো।

—বড় ভইচালোর পরর বছঅর রেলোর লাইন বইলো। কতো লোআলক্কর আইলো ইতার ইসাব নাই। কোমপানী আপনারার জমির উফরোউ রেললাইন বয়াইলো। একটু থামলো পরানদাদী। একবার উপরের দিকে তাকিয়ে বেলা ঠাওর করলো। আরো কয়েকটা পাড়া ঘুরতে হবে। তারপর হয়তো শনের ঝুপড়িতে ফিরে গিয়ে কিছুটা ভাত চড়াতে পারবে। পরানদাদী এই বাড়িতে কাজ করেছে, মুনিষ খেটেছে। তার বোনও বড়বাড়িতে দাসীবান্দীগিরি করেছে।

—তকনো কিছু বদলাইচে না।

শুধু কাঁচা পয়সার ঝন্ ঝন্ শব্দ কমে আসায় দত্তপাড়ার লোকেরা ঘুমুতে পারতো। আর যে সব ভিটেগুলোয় একসময় পুকুর দিয়েছিলেন ভুবনমোহনের বাবা অনঙ্গমোহন সে সব জায়গায় আবার ভিটে উঠতে শুরু হয়েছিল। আর হাতির শুঁড়ের মতো বড়বাড়ির সিঁড়ির রোয়াকে শ্যাওলা জমতে শুরু হয়েছিল।

—ছোটকর্তাবে ঘোড়াত চড়া শিখাইতে একদিন শিউড়ার মাটে লই গেলাম। তকনো কৃষ্ণগোবিন্দ আইছইন না।

এই বাড়ির সব ছোটরা পরনদাদীব মুখে এই গল্প অনেকবার শুনেছে। পরানদাদী চোখে প্রায় দেখেই না তাই দেখতে পেলো না কখন তাব চারপাশ থেকে সব একে একে চলে গেছে। কেউ গেছে জঙ্গলবা়িতে—কাল রাতের ঝড়ে মাটিতে পড়ে থাকা অজস্র জামরুল তুলে আনতে, কেউ গেছে বিচরাতে কচি লাইপাতা তুলতে, কেউ সুব ধরে পড়তে। শুধু পবানদাদী আর তার বোন যে আমগাছটায় ঠেস দিয়ে বসেছিল সেই তাদের থেকেও বযেসী সাধু আমগাছটা শুনে যেতে থাকলো তরাইকান্দির বদলে যাবাব গল্পটা।

তরাইকান্দি হযতো একইরকম থাকতো। যদিনা তবাইকান্দি জাংসানে একটি মাত্র ট্রেন আসার শব্দের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়তো পুরো গ্রামে। ছড়িয়ে পড়া নয় শুধু, নড়িয়ে দেওয়া। এবং খবরটা ছড়ালোও বড় অদ্ভুতভাবে। বউটুনটুনির মুখ থেকে শাঁকচুন্নিব মুখ হয়ে রিটাগাছ থেকে মজা কুয়ো হয়ে বাঁজা রুবীর মুখ থেকে লাউড়া বৈষ্ণব হযে হুঁকোর জল থেকে সতীর মাঠ থেকে কলকলিঘাট খুব তাড়াতাড়ি বাতাসে আকাশে মাটিতে খুঁটিতে ছড়িয়ে গেল খবরটা। গ্রাম উজিয়ে সবাই সেদিন ছুটে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের পেল্লায বাতাসবাড়িতে।

বাতাসবাড়িই তো— সে-ই বাড়ি যার ঘবেব ভেতব সবসময বাতাসের আকাল। এ ছাডা বাড়িটার দক্ষিণপূর্ব কোন দিয়ে ঢুকে ঈশান কোণ হয়ে একটা শবের বাতাসও নাকি রোজ বযে যায় ঠিক ত্রিসন্ধ্যাকালে। বিষহরীঠাকুব জওযাপ নিয়ে জানিয়েছিলেন বাড়ির ঈশানকোণে ভৈরবীর থলা আছে। এই বাড়ির ভেতব দিয়েই ওনার যাতায়াতের পথ। সেদিন বিষহরীঠাকুরকেও দেখতে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ভিড় করে এসেছিল গ্রামের সব যুবতী বউ মেযেরা। বিষহরীঠাকুরকে ভর করাব পর তাদের ছুঁয়ে দিলে সব দোষটোষ কেটে যায়। তা বিষহবীঠাকুবকে দেখতে সেদিন হিড়িকই ছিল।

ল্যাংটা সাধু যেদিন এলেন সেদিন তবাইকান্দির জাতীয় উৎসবের দিন। সারা গায়ে ভূষি মাখা ল্যাংটা সাধু বসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ফটক ঘরের ময়ূরতোলা কাঠের পালঙ্কে। চারদিকে ভিড়। সেই ভিড় সত্যেন্দ্রনাথের কাঠের দাওয়া, বারান্দা, উঠোন, পুকুরপাড়, বাস্তা ট্রেনলাইন, তরাইকান্দির সীমান্তের পানের পুঞ্জী ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল বড়াইল পাহাড় পর্যন্ত, এই পর্যন্ত এসে ভিড় একটু কমেছিল কারণ তা না হলে সেই ভিড়ে বুনো হাতিরপালের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যেতো।

গাঁয়ের মুরব্বিরা নিজেদের মধ্যে নিচু স্ববে বলাবলি করছিলেন অনেক সাধু তারা দেখেছেন কিন্তু এরকম সাক্ষাৎ মহাপুরুষ তারা দেখেননি। শেকলবাঁধা পীর, শীর্ষাসনরত ঋষিঠাকুর, মুখ দিয়ে আগুন বেরোনো তান্ত্রিক, বড়শিগাঁথা সাধু, লিঙ্গহীন ব্রহ্মচাবী— এরকম অনেক অনেক পীবফকির সাধু আগে তরাইকান্দিতে এসেছেন। কিন্তু এই ল্যাংটা সাধু গ্রামের সীমানায় পা' রাখার সাথে সাথে যে কাকটা তিনপুরুষ

ধরে রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেল তলাতে অলুক্ষুণে সুরে ডেকে যেত তার ডাক থেমে গেছে, বেলুর আউলা ছেলে ভালো হযে গেছে, বাঁজা রুবীর পেট ভাবী হয়েছে আর সব চেয়ে বড় কথা ঠিক তখনই ভুনমোহনের মাথার ঠিক মাঝখানে একটা টিকটিকি পড়ে ডানদিক দিযে নেমে গেছে।

তরাইকান্দি যেন এই দিনটাবই অপেক্ষা কবছিল। গাঁয়ের মাথারা সেদিনই হঠাৎ উপলব্ধি করলেন অবশেষে তরাইকান্দিতে একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

ল্যাংটা সাধুকে একপলক দেখার পব সবার মুখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়। এরকম মহাপুরুষ তারা দেখেন নি। এক বিশাল মযদার দলাকে থেবড়ে থুবডে একটা বেঢপ আকার দেযা হয়েছে। যেন ব্রহ্মাব হাতে খুব একটা সময়ও ছিল না। কোমব, পেট, ঘাড় আলাদা কবে চেনা যায় না। ঘাড় মাথায এক, আর সে মাথা মাথা তো নয় কুমোরের চাকে ওঠা মাটিব ঘট। কামানো সেই মাথার পেছনে একগোছা চুল। মুখমণ্ডলে অদৃশ্যপ্রায় কুতকুতে চোখ আর সরু নাকেব ফুটো চর্বির দু'পবতেব নিচে। প্লাষ্টার-অব-প্যারিসেব-গোলারঙ শবীবে সাদা পৈতে টিবি-পেট আর ছিবড়ে ঘাসের মতো লোমশ বুকের উপত্যকা ডিঙিয়ে হারিযে গেছে। মুখে দিব্যভাব (এই দিব্য বা ভগবানে ঘোব আপত্তি বসন্ত পাগলেব। ভগবানেব দোহাই শুনলে সে না বলে পারেনা : ভগমান তো তোব বান্দা মাগী। পুন্দো ঘা। থু থু।) আর ল্যাংটা সাধুর শরীবের লক্ষণগুলো অনেকক্ষণ দেখার পব অন্নদা বেশ জোরেই বললেন— সাক্ষাৎ মহাপুরুষ, তাবপব চারপাশটা একবাব দেখে নিয়ে যেন আপনমনেই বললেন— ভগবানের অবতাব।

ল্যাংটা গোঁসাই এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট হয়ে অবশেষে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে। আব যে পথ দিযেই তিনি এসেছেন সেই পথের জনপদও উঠে এসেছে তার সাথে।

এ সেই সীমান্ত পারাপারেব কাহিনী। একটা দ্বিখণ্ডিত দেশেব মানুষেব এপার ওপার হবার গল্প, শেকড উপড়ে বৃক্ষেব জঙ্গম হবাব গল্প, যে গল্প ফুবোযনা, যে গল্প গুহামানুষ থেকে চোদ্দপুরুষ হয়ে আজ তবাইকান্দিতে এসেছে। আব এসেছে গোঁসাই-এর গাওয়া গানের এই কলিটা :

চলগো বইনারি
যাইগো হিন্দুস্থান
হিন্দুস্থানের চাম্পাকলা
খাইলে খাইমু আধাখান।

যখন এই গানের ঢেউটা আছড়ে পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাঠের দরজায় তখন তিনি দবজার হুড়কো খুলে দেখতে পেয়েছিলেন— একটা গল্প, দূবে বিন্দু থেকে বিন্দু বিন্দু মানুষের পাবদ বিন্দু এগিয়ে আসছে— ক্রমশ দিগন্তে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, একফালি সূর্যের আলোর ক্ষীণ কোলাজে হযতো দাঙ্গাব গল্প জমে উঠেছিল তার শেষ রাতভোর চোখে, যেহেতু তখন দাঙ্গাব গল্পে রূপকথা জমে উঠেছে লণ্ঠনের চাবদিকে পোকার মতো। কিন্তু না, একটু পরেই ভুল ভেঙ্গেছিল তাব। বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসে দোদুল্যমান তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এগিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসেব পৃষ্ঠাব দিকে। হয়তো ধূলিধূসবিত সেইসব পায়ে

আর্যদের চকিত আক্রমনে দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডাদের তৃণাচ্ছাদিত গৃহকোণ থেকে নির্গত বিসর্পিল রক্তাক্ত আলপনার চিহ্ন ছিল, যে চিহ্ন কোন প্রাক্ ইতিহাসে ঈজিপ্ট থেকে ইহুদিদের সেই উদ্বাস্তু পরিভ্রমণে লোহিত সাগর পেরোনোর লবনাক্ত অশ্রুসিক্ত নাব্যতা নিয়ে হ্রেষাধ্বনি, বলাৎকার, শিশুহত্যায় রক্তস্রোত শতশত সূর্যোদয় শেষে থমকে দাঁড়িয়েছিল আউসভিৎজ, ট্রেবেলিংকা, ডাচাউ, সবিবর হয়ে এই পৃথিবীর উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমায়, যেখানে ক্ষুধার্ত, লজ্জাহীন, শেকড়হীন মানুষ, কুকুর আর ইঁদুরে ভরে উঠেছিল দীর্ঘ হা হা প্ল্যাটফর্ম, ভরে উঠেছিল দুই দুইটি দেশের স্বাধীনতার গু'মুতে —এবং তরাইকান্দি সেই নিরাশ্রয়ের একটা আশ্রিত নাম দিয়েছিল—কৃষ্ণগোবিন্দ। গোঁসাই কখন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দিয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ হলেন তা বোধহয় তরাইকান্দির বৃদ্ধ পিতামহ পেঁচাও জানেন না। তো সেটাও হলো একটি মাত্র বাক্যের উচ্চারণে। সেই গো গো ভিড়ময় নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মৌন ভেঙ্গে যখন কৃষ্ণগোবিন্দ বললেন, 'হারু, তোর ছিকায় একটা পাকা আম আছে নিয়ে আয়, আমি খাবো।' হারু করজোড়ে সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কার্তিক মাসে পাকা আম! হারু প্রথমে ভাবলো, এ দিব্যজ্ঞ মানুষের রহস্য, ইঙ্গিত।

সে বললো, 'আজ্ঞে, আমের চটি আছে, আনবো?'

আমের কথায় যে ভিড় গুঞ্জন তুলেছিল তা এবার একটু নীরব হলো, আর লীলা শব্দটা আমের বদলে ছড়িয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

একটু পরে আবার মুখ খুললেন কৃষ্ণগোবিন্দ, 'হারু, আমটা নিয়ে আয়, আমি তো বলছি ছিকায় পাকা আমই আছে।'

হারু পইটার জট খুলতে পারছিল না। সে হাত কচলে বললো, 'ঠাকুর, অন্য কিছু যদি বলেন তাহলে আপনার সেবায়।' কথাটা শেষ হবার আগেই হারুর কথার পিঠে কৃষ্ণেগোবিন্দের আদেশের চাবুক আছড়ে পড়লো। 'যা, ঘরে গিয়ে দ্যাখ, তুই আমই পাবি।'

সত্যেন্দ্রনাথ হারুকে আস্তে আস্তে বললেন, 'যাওনা, গুরুদের যখন বলছেন তখন গিয়ে দেখোনা।'

ডাক্তারকাকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে 'ঠাকুরের লীলা' বলে লীলা শব্দটাকে আরো খেলিয়ে দিলেন বাতাসে। শুধু পর্দার আড়াল থেকে ভুবনমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুলতা একটা ছোট্ট ঢিল ছুঁড়লো ভুবনমোহনের একনিষ্ঠতায় লীলার গাছ—কথাটা শুধু শুধু কৃষ্ণগোবিন্দ এবং ভুবনমোহন শুনতে পেলেন।

হারু একা গেলনা, সঙ্গে সাক্ষীও নিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো একটা পাকা আম হাতে।

অনেকেই পরে বলেছে এ আম গ্রামের কোন গাছের নয়। অনেকে এও বলেছে এরকম আম তারা দেশের কোন জায়গায় দেখেনি। দুধ আলতা রংএর সেই আম, যার রসে ডুমো মাছি বসলে আটকে যাচ্ছিল আর যার বিচিটা ছিল সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো, একবিঘা আমে তিন বিঘা আঁটি। গ্রামের অনেকে বলেছে যে আমটা নাকি নন্দনকানন থেকে পেড়ে আনা (অনেকেই এর আগে স্বর্গের বাগানটার নাম পর্যন্ত জানতো না)।

আমটা খেয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ হাত ধুয়ে আমের আঁটিটা পুঁতে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথের

বাড়ির সিঁড়ির ডানদিকে। সেই সিন্দুরী আমের অবশেষে একদিন খেং বেরোলো, খেং খেকে চারা হলো, চারা থেকে গাছ। সে গাছে শেষ পর্যন্ত আমও ধরলো। তরাইকান্দি গ্রামের পরিবর্তনের আরেক জীবন্ত সাক্ষী হচ্ছে এই সিন্দুরী আমগাছটা। এ গাছের গাছ হয়ে ওঠা আর ল্যাংটা গোঁসাই ঠাকুরের একটুকরো মার্গিন কাপড়ে লজ্জা ঢেকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর হয়ে ওঠার গল্প একই।

ভুবনমোহন এখনও ভাবেন যে সবকিছুর মূলে সেই আম বা আমের মতো কোন না কোন লোভনীয় ফল। বাইবেলে নাকি বলেছে কোন এক নিষিদ্ধ ফল খেয়ে এই যতো আদমের পাল; এমনকি রামায়ণেও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বলেছিলেন, "সেই ফল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ/সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন।।/মর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবানী/নারীর ছলনে ভুলে ঋশ্যশৃঙ্গ মুনি।।" পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক নিউটন আর সেই আপেলের গল্পও ভুবনমোহন জানেন। এ ছাড়াও ইংরেজরা তো ওই আমগাছের তলায় বাঙালীকে হারিয়ে ভারতবর্ষের রাজা হয়েছিল। ভুবনমোহন ভেবে দেখেছেন তরাইকান্দির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য ঘুরেফিরে সেই আমই দায়ী।

কিছুদিন আগেও ভুবনমোহন জানতেন না যে আম পেতনীদেরও প্রিয়। কিন্তু যেদিন সুলতার দূর সম্পর্কের ভাই (যে শহর থেকে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে এসেছিল) বিভুর মুখ থেকে জলজ্যান্ত ঘটনাটা শুনলেন তিনি, সেদিনই আমের মাহাত্ম সম্বন্ধে আরও বেশী স্থির নিশ্চিন্ত হলেন।

ঘটনাটা এরকম : গতরাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। বিভু এর অপেক্ষায়ই ছিল। সে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল, আমগাছের তলায় অনেক অনেক আম পড়ে আছে আর সে কুড়িয়েও শেষ করতে পারছে না। সারারাত একরকম ঘুমোয় নি সে। একটা এডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছিল।

আকাশ ফর্সা হবার আগেই বিছানা থেকে চুপিসাড়ে উঠে গিয়েছিল বিভু। রান্নাঘর থেকে সঙ্গে নিয়েছিল টুকরিটা। তারপর দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। সময় যাকে বলে তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। একটু ভয় পেলো সে। গ্রামের পরিবেশ। সবকিছুই খুব অপরিচিত তার কাছে। কিন্তু যখন ভুবনমোহনের সযত্নলালিত বিচরাটা পেরিয়ে তার চোখ খালিবাড়িটার দিকে গেল তখনই যেন তার চোখে ভেসে উঠলো দৃশ্যটা।

কাল বিকেলেই বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছগুলো দেখে রেখেছে সে। কয়েকটা ঝাঁকড়া বিশাল আমগাছ ঝাঁপিয়ে আম, শুধু আম, যেন পাতা থেকেও বেশি। আধা কাঁচা পাকা আমগুলোর ফাঁক দিয়ে আকাশটাকেও তার মনে হয়েছিল মুখ লুকিয়ে আছে। শুনেছে বেড়াটেড়া হীন জায়গাটা পরিত্যক্ত—পোড়ো। সুতরাং চুরিরও প্রশ্ন ওঠে না। প্ল্যানটা তৈরী হয়েছিল তখনই। বাড়ির কেউ জাগবার আগেই ঝুড়ি ঝুড়ি আম এনে চমকে দেবে সবাইকে। সুযোগ যে এতো তাড়াতাড়ি জুটে যাবে ভাবেনি বিভু।

থরে থরে মাটিতে পড়ে থাকা আমের ছবিটা চোখে ভেসে উঠতেই তার চোখ থেকে একই সাথে ঘুম আর ভয়ের রেশটাও হারিয়ে গেল। টুকরিটা নিয়ে বাড়ির সদর রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে এক পাক ঘুরে খালিবাড়িতে চলে এলো সে।

একটু শীত শীত লাগছে। ভেজা পাতা, জায়গায় জমা জল, ভাঙ্গা ডাল, পাতা সমান ভেজা ঘাস—এর মধ্যেও লুকিয়ে পড়েনি আমগুলো। এতো আম এক জায়গায় জীবন দেখেনি বিভু। যেন আমের গালিচা—পা' রাখলেই উড়ে যাবে। পাশে টুকরিটা রেখে আর সময় নষ্ট না করে কুড়োতে বসে গিয়েছিল বিভু। উবু হয়েই আম কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখছিল ঝুড়িতে। ঘোরের মধ্যে ছিল সে, আম কুড়োনোর ঘোর। একটু পরেই সে যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলো তার পেছনে অনেকগুলো মানুষ ছায়ার মতো নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে। আর তারপরই হু হু করে উত্তুরে হাওয়ার মতো ভয় তার শরীরের রোমকূপে ঢুকে গেল। মাথাটা প্যাণ্ডুলাম মোশনে মাটির দিকে নামানোর সময়—তাকাবে না—এরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃষ্টি দু'পায়ের ফাঁক গলে পেছনে গেল তার। অন্তত পনরোটা কালো কালো লিকলিকে হাড্ডিসার পেতনী হাত চালিয়ে দিব্যি তার আমে ভর্তি ঝুড়িটা ফাঁকা করে দিচ্ছে। পেতনীগুলোর হাতে লম্বা লম্বা কালো নোখ, লম্বা ময়লা রিটেঘষা লালচে চুল।

বিভুর মনে হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ড যে কোন সময় থেমে যেতে পারে। তবু, নীরবে একই এ্যাকশনে অবিরাম সে আম কুড়িয়ে যেতেই থাকলো। কতক্ষণ তার খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হলো তখন আকাশ ভরে গেছে ভোরে। সে টের পেলো তার পেছন থেকে কখন যেন নিঃশব্দে ছায়া-পেতনীরা সরে গেছে আর তার টুকরিতে একটাও আম নেই।

সেদিন ভোরে বিভুর গল্পটা শোনার পর ভুবনমোহন শুধু বলেছিলেন : এ কি তুই জানিস না, ওখানে ছোট বাচ্চাদের কবর দেওয়া হয়। আর এই কথা বলেই ভুবনমোহনের মনে পড়ে গিয়েছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ে শিমুকে ওখানেই গোর দেওয়া হয়েছে। বিভু যাদের দেখেছে শিমুও তাদের মধ্যে ছিল না তো! ভুনবমোহন একবার ভেবেছিলেন বিভুকে কথাটা জিজ্ঞেস করেন কিন্তু পর মুহূর্তেই তার খেয়াল হয়েছিল বিভু শিমুকে জীবনেও দেখেনি। এবং তখন, তখনই সেই টনটনে ব্যথার সঙ্গে ভুবনমোহন উপলব্ধি করেছিলেন তার একমাত্র সন্তানের স্মৃতির সাথে সেই আমই জড়িয়ে রয়েছে।

তা সেই আমের আঁটি গ্রামের মাটিতে পোঁতার সাথে সাথে তরাইকান্দির ঘরে ঘরে ঘটে ঘটে আম্রপল্লব হয়ে গেলেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

যে গোপালের আখড়ায় দু'একজন ভিখিরি বৈষ্ণবের নেড়া বাঁধা ছিল সেখানে কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর আসার পর তার নাটমন্দির দালান হলো। এতদিন যে নাড়ু গোপাল তবাইকান্দির গ্রামবাসীদের মতো খড়ের দো-চালা ঘরে ছিলেন এবার তার জায়গা হলো পাকা ঘরে।

এতদিন একটা ধন্দ ছিল তরাইকান্দির সবার। সেটা হচ্ছে—কৃষ্ণগোবিন্দই গোপাল না গোপালই কৃষ্ণগোবিন্দ। গত ঝুলনে তা-ই নাটুকে ঢং-এ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণগোবিন্দ। মাথায় চূড়ো, হাতে বালা, মুখে মোহনবাঁশী লিয়ে বারবার গোপিকা মোহন—রাধাবল্লব-কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মূর্ছা গেলে তরাইকান্দির মানুষের বুঝতে বাকি থকেনি যে কৃষ্ণগোবিন্দের লীলা স্বয়ং গোপালেরই লীলা। এবং তা আরো দৃঢ় হল বসন্ত পাগলের আকস্মিক মৃত্যুতে।

ভুবনমোহনের ঘরের পেছনে যে ডোবাটা ছিল সেখানে পড়ে গিয়ে হাঁসফাঁস করছিল

বসন্ত পাগল—শুধু সেই থু-থু-থু-থু—যেন থুতু ছিটিয়ে নোংরা করতে চাইছিল বড়বাড়ির ডোবার পচা জল। সারারাত ভুবনমোহন আর সুলতা শুনেছেন সেই ঝাপুর ঝুপুর-গোঙানি-কাতরানোর শব্দ। সুলতা অধীর হলে ভুবনমোহন শুধু তার যুবতী বউ-এর আমের মতো স্তন ছুঁয়ে বলেছিলেন: ও কিছু না, বসন্ত হয়তো পড়ে গেছে-একটু পরে ঠিক উঠে চলে যাবে।

পরদিন ভোরে আখড়াতে বসন্ত পাগলের লাশটা ঘিরে ভুবনমোহনরা দাঁড়িয়েছিলেন। উপুড় করা মৃতদেহের পিঠে পাঁচটা আঙুলেব দাগ নীল হয়ে ফুটে উঠেছিল। ভূতের হাতের ছাপ দেখে শিউরে উঠেছিলেন ভুবনমোহন। কৃষ্ণগোবিন্দ সিঁড়িতে বসে তামাক খেতে খেতে বলেছিলেন : ভগবানে বিশ্বাস যার নেই তাকে ভূতের হাতেই মরতে হয়। পাগলের আবার ভগবানে বিশ্বাস—এই প্রবাদটা তখন থেকেই তবাইকান্দিতে চলে আসছে।

কৃষ্ণগোবিন্দের শিষ্যদল বাড়ছিল ভাটিগাছের মতো। উৎসবে যখন দূরদূরান্ত থেকে শিষ্যরা সব দল বেধে আসতো সে দৃশ্য হতো দেখার মতো। ঘন্টাবাধা বলদের পিঠে মানুষ, গাধার পিঠে মাথামুড়োনো সঙ, গলা থেকে আয়না ঝুলানো ক্ষৌরকাব, বাঁশের মাচায় ঘাটের মড়া, সাপ-নাচানো বেদে আব সাপের মতো হিলহিলে বেদেনী, হিজড়ে ও বেশ্যা, গিলিগিলি বকা জাদুকব, উটের পিঠে বাঁদর নিযে চিড়িয়াখানার মালিক, ভাগ্যগনক, গ্রেট মুড়মুড়ে সার্কাস, জড়িবুটির কবরেজ, গর্ভবতী বউ, জিলিপির দোকানি, বত্রিশভাজা, বায়োস্কোপ আবও কত কি। সে শোভাযাত্রা শুরু হতো কিন্তু শেষ হতো না, তার আগে উৎসব শেষ হয়ে যেতো। মূল মন্দিরে উৎসবের এই ক'দিন বাঁদরছাপ কেতন উড়তো। আব ছেলেবুড়ো বাচ্চার দল সারি বেধে খিচুড়ি লাবড়া খেয়ে সারি বেধে ওই জায়গাতেই হাগতো। চারদিন নাটমন্দিরে বেদম অষ্টপ্রহর সংকীর্তন চলতো। মাঝে মাঝে যখন ভাবের ঘোরে নাচিয়েরা নাচতে নাচতে ভাবাবিষ্ট শ্রোতাদর্শকের লাথালাথি শুরু করতো তখন বউ ঝিরা জোকার দিয়ে তাদের থামাতেন। ভুবনমোহনের বিশাল জমিদারীর যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল অর্দ্ধশতাব্দী আগে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে এখন অন্য পাট শুরু হয়েছে। জমির অবশিষ্ট টুকবোগুলো তার মুষ্ঠিবদ্ধ আঙুলের ফাঁক গলে জলেব মতো বেরিয়ে যাচ্ছিল। শুধু বাগা দেওয়া খেত থেকে ভুবনমোহনের বছরের চাল কোনমতে জুটে যেতো। ভুবনমোহন এখন জীবনের মধ্যাহ্ন পেরিয়ে সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। নীলরক্ত পরিশ্রুত হতে হতে কখন লাল থেকে জিরের রক্তের মতো সাদা হয়ে গেছে ভুবনমোহন খেয়াল করেননি। কৃষ্ণগোবিন্দের আগমনে রাতারাতি তরাইকান্দির যে এরকম আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটবে ভুনমোহন তা স্বপ্নেও ভাবেননি। ভুনবমোহন নিজেও কোনকালে ধার্মিক ছিলেন না কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর আগমনের পব নিজের পরিবর্তনে তিনি সবচেযে আশ্চর্য হলেন। তিনি জানেন তার এই বিড়ালতপস্যা অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। সন্তানহীনতার যে বিষ ক্রমশ তাকে বিষাক্ত করে তুলছিল, কৃষ্ণগোবিন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণের পর এ থেকে তিনি কিছুটা মুক্তি পেয়েছেন। ভুবনমোহন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি গ্রামের সবার এই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে ওঠার পেছনে ভগবানের অপার লীলা ছাড়াও এই কোন না কোন 'অপূর্ণতা পূরণের সহজ পথের' তত্ত্বটা মোটামুটি মেনে নিলেন। অর্থাৎ তিনি ভেবে খুশি হলেন, তার মতোই গ্রামের একটি লোকও

সম্পূর্ণ সুখী নয়।

বংশরক্ষার কথা মনে হলেই মাঝে মাঝে ভুবনমোহন কুলুঙ্গি থেকে বের করে জীর্ণ বংশলতিকাটার উপর চোখ বোলান। চোখ বোলাতে বোলাতে তিনি বংশের লতায়পাতায় খেই হারিয়ে ফেলেন। এ যেন নামের জঙ্গল। কতো নাম : দ্বিজমোহন দাস, গিরিবালা দাসী, খিলি (আতুরগৃহে মৃতা), প্রেমময়ী, তীর্থমোহন দাস—তিনি নামের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পৌঁছে যান তারও চারপুরুষ আগে, যখন কোন এক খাঁ-এর কাছ থেকে তার প্রপিতামহ কতো কেদার কতো গণ্ডা নিষ্কর জমি লাভ করে ছিলেন। ভুবনমোহন সেই বাদশাহী শিলমোহর করা পাট্টা খুলে এখনও চোখ বোলান যদিও অপরিচিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ সেই পাট্টার কোন অর্থ তিনি উদ্ধার করতে পারেন না।

ভুবনমোহন কল্পনা করেন—এই পতিত, আকর্ষিত, জনমানবহীন ভূমির কোন এক সুউচ্চ ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে তার সেই পূর্বপুরুষ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন দূরে—আরও দূরে, যতোদূর দৃষ্টি যায় ততোটুকু জমিই তার দৃষ্টির ত্রিসীমানায় অগ্নি, মরুৎ, তেজ, গগন তার—যেন তিনি শুনতে পান তার পূর্বপুরুষের সেই বজ্রনির্ঘোষ—জীবান্ বিসসর্জ ভূম্যাম্—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—সেই শব্দে ধীরে গ্রাম জেগে উঠছে—বর্তনের শব্দ, ঘূর্ণায়মান চাকার শব্দ, কুমোরের হাতে মৃত্তিকার শব্দ, দহনের শব্দ, শিৎকারের শব্দ, জন্ম এবং মৃত্যুর শব্দ, কলসের গুব গুব্ শব্দ, হলকর্ষণের শব্দ—যেন এক বিশাল নৈঃশব্দের মাঝে আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু শব্দে পূর্ণ হচ্ছে মহাশূন্যতা—যেভাবে গভীর গভীরতর খননের পর ক্রমে পুকুরের হাঁ ভরে ওঠে জলে, ভরে ওঠে মীনমৎস্যে, শম্বুকে পদ্মপত্রে—যেন সেই খনিজ ইতিহাসের প্রত্নগর্ভে ভুবনমোহন এক অপরিজ্ঞাত অন্ধকারে, ভ্রূণের স্মৃতিবিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে যান আর ক্রমশ উত্তরাধিকার রক্তের ছলাৎ ছলাৎ, প্রবল জোয়ারে স্ফীত রক্তমুখী প্রাবল্যে পূর্বপুরুষের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হন ভুবনমোহন।

ভুবনমোহন তার চোদ্দপুরুষকে খুঁজে বেড়ান বংশলতিকায়, কিন্তু পিছিয়ে যেতে যেতে চারপুরুষের নামে এসে থমকে দাঁড়ান, আর পেছনে যেতে পারেন না। তিনি শুধু কল্পনায় লতাটাকে বাঁশের ঝিপুইর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তুলে ধরেন। কিন্তু চোদ্দপুরুষ বংশরক্ষার এই কাল্পনিক আঁককষাকে হাতে কলমে রূপায়নের কোন পথ তিনি খুঁজে পান না। শুধু মনের সেলেটে আঁকা পরবর্তী সেই কাল্পনিক নয় পুরুষের নাম যেন কোন অদৃশ্য হাত এসে বারবার মুছে দেয়। এক অদ্ভুত অক্ষম রাগ চুলের মধ্যে জল ঢালার মতো তার প্রায় সাদা হয়ে যাওয়া রক্তকে ছলকে দেয়। যদিও দশরথের মতো এক অলৌকিক যজ্ঞ থেকে 'তপ্তকাঞ্চনগঠিত বজতাবরনযুক্ত দিব্য পায়সে পরিপূর্ণ এক বৃহৎ পাত্রীর' অপেক্ষা করেন ভুবনমোহন, যে পুত্রীয়েষ্টি অশ্বমেধযজ্ঞের হোতা হবেন স্বয়ং শ্রী শ্রী কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর।

ভুবনমোহন জানেন বীর্জধারণের বয়েস তার পেরিয়ে গেছে। তিনি তার নিস্তেজ যৌনতাকে ক্লীবত্ব বলেই জানেন। অথচ সুলতা যুবতী, তার যৌবনের আঁচে এই সেদিনই তিনি বিচরার লকলকে কুমড়ো গাছটাও ঝলসে যেতে দেখেছেন। (ঘটনাটার পরই তিনি সেই ঝলসে যাওয়া কুমড়ো গাছটার উপর বাঁশ পুঁতে একটা মাটির পাতিলে চূণ দিয়ে সুলতার মতো একটা খান্নস মুখ এঁকে ঝুলিয়ে রেখেছেন—যেন

আর কোন গাছের উপর সুলতার কুনজর না পড়ে) মাঝে মধ্যে একটা সন্দেহের পোকা ভুবনমোহনের ভেতরে নড়ে চড়ে। বেশী বয়সের কমবয়েসী স্ত্রীর ব্যভিচারের গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। সুলতা এখন ভীষণ একবোখা আর বদমেজাজীও হয়ে উঠেছে। যে ভয়ের পর্দায় তার যৌবন আগে ঢাকা থাকতো এখন যে সেটা সরে গেছে। ভুবনমোহনকে এখন সে প্রকাশ্যেই আঁটকুড়া বলে।

তবুও, কৃষ্ণগোবিন্দ জিউব আসার পর থেকে ভুবনমোহন সেই অলৌকিকের অপেক্ষা করেন। সেই কার্তিক মাসে পাকা আমের মতো কিছু একটা। ভুবনমোহন মাঝে মধ্যে আখড়াতে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে করজোড়ে বলেন, "আমার ছিকায় আম কবে ধরবে গুরুদেব?"

কৃষ্ণগোবিন্দ তামাক টেনে টেনে উত্তব দেন, 'আম তো গাছে ধবে রে ভুবন, গাছে। ছিকায তো আমসত্ত্ব থাকে। গাছে বউল ধরলে সেটা এমনি খবর হবে। ঝড় আসবে, গাছের সারা অঙ্গে রস হবে, ডেয়ো পিঁপড়ে বাসা বাধবে। সময় হলে সব হবে।'

ভুবনমোহন সেই সমযেব অপেক্ষা কবেন। কিন্তু সময় ভুবনমোহনের অপেক্ষা করেনা। —হিবার গেরামোর সব পাকা ধানো মই দিছলো বইন্যা। থই থই করছিল জগৎসংসাব- –বড বাড়ীর মাঠাম ছুইছলা মা গঙ্গায—গোঁসাই পবে জওযাব দিছলা গঙ্গাপূজা ঠিকমতন আইছে না—আগুথবামোব পূজাও ঠিকমতোন না অইলে মড়ক লাগবো। ইটা আরেক গল্প। আগুথরামোর গল্প—ঠাকুব।

পবানদাদীর গলার স্বর তরাইকান্দিব প্রত্যেক ঘর থেকে ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তরাইকান্দিব শিশু জন্ম থেকেই—যে গল্প শুনে আসছে, বৃদ্ধ হওযা পর্যন্ত যে গল্প সে শুনে যায় আর তার মৃত্যুর পরও শ্যাওডাগাছে, ছাতিমতলায বসে বসে যে গল্প সে শুনে যাবে।

তা সেদিন চোতমাসের রোদ তখনও ততো তেতে উঠেনি। বাগাইলা সবে সূর্যকে নিয়ে চরতে বেরিয়েছে। কৃষ্ণগোবিন্দ স্নান করে তরু বৈরাগীকে তামাক সাজতে বলেছেন। ডাক্তাব কাকা, সত্যেন্দ্রনাথ, ভুবনমোহন আব ধূর্জটি চক্রবর্তী প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে আখড়ায় এলেন।

—বড় বাস্তা থেকে একটা ছাগল দেখলাম প্রথমে। ভাবলাম নিশিব সব ধানের হালি খেয়ে নেবে।

তখন নিশুথ রাত। বমেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা চারজন গিয়েছিলেন মোহনপুর। দাহ শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত গভীর। বড রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা রাস্তায় পা দেবার সাথে সাথে প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথেরই চোখে পড়লো ছাগলটা। বেশ বড় নধর বামছাগল। নিশিব জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই মিলে হেই হেই —কার ছাগল এত রাতে ছেড়ে রেখেছে—বলতে না বলতেই ছাগলটা একটা গরু হয়ে গেল। ভুবনমোহন ভাবলেন চোখে ভুল দেখেছেন। কিন্তু সঙ্গের সবাইও প্রথমে ছাগল তারপর গরু দেখেছেন। ভাবলেন আগে তারা চোখের ভুলে গরুটাকেই ছাগল দেখেছেন জোছনা রাতে। সাদা গরুটা নিশির জমি ছেড়ে আখড়ার রাস্তাতেই উঠে এলো। আখড়ার এই রাস্তাটাই গ্রামের সিংহদ্বার। যাহোক, সবাই মিলে একটু দূর থেকে দু'একটা ঢিল পাটকেল ছুঁড়ে-হেট্ হেট বলতেই গরুটা তাদের চোখের সামনেই

একটা লম্বা কালো মানুষ হয়ে গেল। আর লম্বা—এতো লম্বা মানুষও হতে পারে? মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে কালপুরুষের কাছাকাছি। কালো উদলা মানুষটা বুকের পৈতে সেই জোছনার মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সূতোর মতো লাগছিল।

—ও—তোরা আমার আগুথরামকে দেখেছিস। গল্পটা শুনে নাদুস, আদুল শরীরে ছোট্ট একটা নিঃশব্দ হাসির ঢেউ তুলে কথাটা বললেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

—আমার ভুবনরা আগুথরামকে দেখেছে গো। তোরা কে কোথায় আছিস রে শুনে যা—আমার সত্যেনরা আগুথরামকে দেখেছে গো।

প্রথমে আখড়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, মোহন্তরা ভিড় করে এলো। তারপর গ্রামের একজন দু'জন করে সবাই আসতে থাকলো খবরটা শুনে।

কৃষ্ণগোবিন্দ যা বললেন তা মোটামুটি এই: আগুথরাম তরাইকান্দির গ্রামদেবতা। ধর্মঠাকুর। সমস্ত বিপদ আপদ থেকে তরাইকান্দিকে এতদিন—আগুথরামই রক্ষা করেছেন। কিন্তু এখন তিনি কোন কারণে কোপাবিষ্ট—এ কোপ না কমলে এবার গ্রামে মড়ক হবে। আগুথরাম নাকি কাল রাতেই কৃষ্ণগোবিন্দকে দেখা দিয়ে বলেছেন আখড়ায় প্রবেশের মুখে যে হেতাল গাছটার নীচে তার থলা আছে সেখানে বছরে একবার ষোড়শোপচারে পুজোও দিতে হবে।

গ্রামদেবতা বলে কথা। বলা যায় রাতারাতিই গাছের তলাটা পাকা বেদি করে পাথর বসানো হয়েছিল। তারপর গ্রামের সব আওয়া দুধ আর স্তন্যদুধ দিয়ে সে জায়গা ধুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সাদা দুধের ছোট স্রোত আস্তে আস্তে বড় হতে হতে মিশে গিয়েছিল ঘাঘরার জলে আর ঘাঘরার জল হয়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গায়, গঙ্গা থেকে পবিত্রতোয়া যজ্ঞময়তীরশালিনী সরস্বতীতে, সরস্বতী থেকে বঙ্গোপসাগরে। সমস্ত নদী নালা খাল বিল সমুদ্র মহাসমুদ্র ছাপিয়ে সে সাদা দুধ ভাসিয়ে দিয়েছিল সমগ্র পৃথিবী। শুধু তরাইকান্দি ভাসছিল সেদিন কচ্ছপের পিঠের মতন। এ সেই দ্বিতীয় মহাপ্লাবন। সে প্লাবনে পৃথিবী অনেক অনেকদিন দুধমগ্ন ছিল।

আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতার সংজ্ঞাটা সত্যেন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই গুলিয়ে ফেলেন। একদিন ল্যাংটা গোঁসাইকে এই গ্রাম আশ্রয় দিয়েছিল, এখন তারই আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম। কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর মনের গতিবিধিও তারা ধরতে পারেন না। কোনটা যে কারণ আর কোনটা যে তার ফল এটা একটা রহস্যই।

ভুবনমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আখড়াতেই বেশির ভাগ সময় কাটান। ভুবনমোহন চেষ্টা করেন গুরুদেবের কার্যকারণের রহস্যটা ভেদ করতে আর সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন গাছ পরগাছার রহস্যটা বুঝতে।

অনেক অনেকদিন পর আজ প্রাচীন পুকুরের ঝামা সিঁড়িতে পা' রেখে ভুবনমোহন ঠাকুরের লীলার কার্যকারণ রহস্যটা যেন কিছুটা আবছাভাবে বুঝতে পারছিলেন। ঘটনাটার সূত্রপাত কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর জওয়াপ থেকে। এরকমই কোন একদিন ভোরে কৃষ্ণগোবিন্দ নিমীলিত চক্ষু খুলে জওয়াপ দিলেন, শুক্লপক্ষে অষ্টমীতিথিতে নক্ষত্রের তারাশুদ্ধির পর যোগীনি ঈশানে বড়বাড়ির প্রাচীন দেওলা পুকুর থেকে মা মনসার বাসনকোসন উঠে আসবে। দুধকলা দিয়ে নাগপুজো ওই দিনই দিতে হবে।

সারারাত দুঃস্বপ্নে কেটেছিল ভুবনমোহনের। সারারাত একই স্বপ্ন তিনি ত্রিবিংশবার দেখলেন। পুকুর পারের চারিদিকে শত শত প্রদীপের আলো। সেই আলোর রেখা

পুকুরের জলে দুলে দুলে উঠছিল—আর শাঁখ ঘণ্টা জোকারের শব্দে শব্দে নাগের মাথায় পুকুরের জলেব তলা থেকে উঠে আসছিল ঝিক ঝিক কাঁসাব বাসন। তাবপর সেই কাঁসার বাসন পুকুরের ঝামা সিঁড়ি বেয়ে ঝমঝম শব্দে এগিয়ে আসছিল ঘুমন্ত এই উত্তরপোতাব ঘবের দিকে।

বড়বাড়ির ভেতর-পুকুরটা অতিপ্রাচীন এটা ভুবনমোহন জানতেন। এ বাড়ির কেউই পুকুরটায় মুখ ধুতে বা স্নান কবতে নামতো না। পুকুবটা নাকি দেওলা, মানুষ খেযে ফেলে। অনেকদিন আগে তীর্থমোহনেব ভাই-এর একমাত্র ছেলে চলে গিয়েছিল এই পুকুরেব পেটে। গ্রামের লোকের কাছে এটা শুধু পুকুবই ছিল না। মাঝে মধ্যে নাকি গভীব বাতে পুকুবের অতল থেকে পদ্মপুরাণের সুবে ওঝাগান ভেসে আসে। ভুবনমোহন জন্মেব পব থেকে এসব শুধু শুনে আসছেন।

একবাব তিনি জেদ কবে পুকুবে ছিপ ফেলেছিলেন। পুকুবটাতে তিনি সব-সময়ই ঘাই শুনেন কিন্তু মাছ দেখেন না, তাই পুকুবটাতে মাছ ধবা তাব কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল।

অনঙ্গমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও সেদিন যুবক ভুবনমোহন পুকুরটাতে ছিপ ফেলেছিলেন। সাবাদিন কিছুই লাগেনি ছিপে। নাওযাখাওযা ভুলে ভুবনমোহনও বসেছিলেন। যখন প্রায আশা ছেড়ে দিয়েছেন, হঠাৎ খেযাল হলো ফাতনা ডুবে যাচ্ছে। বড়শিটা শক্ত হাতে ধবে ভুবনমোহন মাছটাকে কিছুক্ষণ খেলতে দিলেন। মিনিট কয়েক। কখনও সুতো টেনে ধবেন, কখনও ছাড়েন। ভুবনমোহন পাকা বডশি বাইযে—মাছের নাড়িনক্ষত্র জানেন। বডশিটা পুরোপুবি গাঁথতে যতোটুকু সময় ততোটুকুই দিয়েছিলেন তিনি, তাবপর কেৎবানো একটা হেঁচকি টানে বডশিটা তুলতে গিয়েই টেব পেলেন তার থেকেও অন্তত কযেকগুণ বড শক্তির একটা কিছু তাকে টেনে নিচ্ছে পুকুরে। ভুবনমোহনেব মনে হলো মাছ যেন তাকেই বডশিতে গেঁথে ফেলেছে। পুকুরেব জলটা খুব জোবে নড়ে উঠেছিল আব তখনই ভুবনমোহন বুঝতে পাবলেন একটা আঁশটে গন্ধে তাব শবীব অবশ হযে যাচ্ছে।

অনঙ্গমোহন সেদিন তাকে ধবে নেওযায পুকুবে তলিযে যাননি ভুবনমোহন। তাবপর তিনদিন ধুম জ্বরের মধ্যে ভুল বকেছিল ভুবনমোহন। তিনদিন পর অনঙ্গমোহন ঘটা করে মনসাপূজোব মানত কবলে সে জ্বর ছেড়েছিল।

ভুবনমোহন শুনেছেন সিলেটেব শাহজালালেব দরজায এবকম একটা দেওলা পুকুব আছে। সেখানে হাজাব বছবের প্রাচীন সুবর্ণ আঁশ গজাব মাছ ভেসে বেড়ায। ওই মাছগুলোব বযেস বাড়তে বাড়তে দেওলা হয়ে গিয়েছিল। ভুবনমোহন তার ঠাকুমাব মুখ থেকে শুনেছেন সব কিছুই দেওলা হয়ে যেতে পারে—চেয়ার, টেবিল, গাছ, মানুষ সব! আব দেওলা কোন কিছুর পাশে খুব বেশিদিন কিছু থাকলে তাও দেওলা হয়ে যায়। ঠাকুমার গ্রামে চড়ক পূজার আগেব রাতে একটা পুকুর থেকে দেওলা গাছ উঠে—যুগ যুগ থেকে সেটাই তাদের গ্রামের চড়কগাছ।

এসব শুনলে ভুবনমোহনের গা' শিরশির কবে। জান্তব একটা পুকুরের ভয় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

কৃষ্ণগোবিন্দেব সেই জওয়াপ ফলেছিল। ঝিকঝিক ঝকঝকে কাঁসার বাসনে সেদিন ভরে গিয়েছিল বডবাড়ির দেওলা পুকুরটার পার।

মনসাপুজো ভুবনমোহনের বাড়িতে আগেও হতো। গত কয়েকবছর থেকে বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল কারণ সেই দেওলা পুকুরটা আবার যেন পুকুর হয়ে উঠছিল—ছোট ছোট পানা ভাটফুল আর ফড়িং নুয়ে আসা গাছের ছায়ায় মায়া ধরছিল রাক্ষুসী পুকুরটার আয়নার মতো জলে। যে মাছরাঙা আগে ছোঁ মারতো না, পুকুরের জলে, সে এখন ছোঁ মেরে ধরতে চাইছিল রূপোরঙের মাছ। আর তরাইকান্দি ভুলতে বসেছিল একটা পুকুরের দেওলা হবার ইতিহাস।

কৃষ্ণগোবিন্দ শুধু সেই প্রাচীন গা' ছমছম ইতিহাসটাকে আবার জাগিয়ে দিলেন। সেদিন তরাইকান্দির এ মাথা থেকে ও মাথায় ছড়িয়ে গেল কথাটা: দেওলা পুকুর জাগি উঠছে গো—দেওলা পুকুর মানুষ খাইবো গো—হো হো—তোমরা শুনছো নি গো—দেওলা পুকুর আবার ঘুম থাকি জাগি উঠছে গো—হো হো—ও রে বা—ও-—ও। আর সেই ডাকে একটা করাল জান্তব ছায়া তার ডানা গুটিয়ে আনছিল বড়বাড়ির উপর।

সেবার বড়বাড়ির মনসাপুজোর প্রায় নয়মাস পর ছিল আখড়ার উৎসব আর উৎসবের পরেই ঘটলো ঘটনাটা। তা ঘটনার আগেও তো ঘটনা থাকে।

ভুবনমোহনের কাছে বিশ্বাস হচ্ছে সেই জিনিস যা একবার হারিয়ে গেলে ফিরে আসে না, অনেকটা বংশগৌরবের মতো। ভুবনমোহনের বংশগৌরব যেরকম হারিয়ে যাচ্ছিল সেরকমই সুলতার উপর তার বিশ্বাসও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণগোবিন্দের উপর ভুবনমোহনের বিশ্বাস যেরকম শক্ত হচ্ছিল, সেরকমই কৃষ্ণগোবিন্দের উপর তার স্ত্রীর বিশ্বাসও হারিয়ে যাচ্ছিল, হারিয়ে যাচ্ছিল না, বলা উচিত হারিয়ে গিয়েছিল। কেন, সেটা একমাত্র সুলতাই জানে।

সুলতাকে একটা ব্যাপার খুবই ভাবাতো। কৃষ্ণগোবিন্দ আসার পরই তরাইকান্দির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সে বেশ সন্দেহের চোখেই দেখে। তার প্রায়ই মনে হয় সমস্ত গ্রামটা যেন গড় গড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে দেওলা হয়ে যাচ্ছে আর সে, সেই দেওলার হাত থেকে পালাতে চাইলেও পালাতে পারছে না। একটা ভয় তার যুবতী শরীরে দোষী বাতাসের মতো ঘুরে ওঠে। কৃষ্ণগোবিন্দের লীলাখেলার সেই প্রথম দিনে সুলতার মুখ ফস্কে বেরোনো 'লীলার গাছের বিষফল ততদিনে ধরে গেছে গোঁসাই আর ভুনমোহনের মনে। সবচেয়ে বড় কথা ভুবনমোহনের মনও তখন সন্দেহের বাঘে খাচ্ছিল—গাছকোমর দিয়ে রোয়াকে সুলতার এক্কা দোক্কা খেলা, তার প্রকট ঢলাঢলি. তার গতর ভরা যৌবন। তার উপর ভুবনমোহনের সামনেই তার পরমআরাধ্য গুরুদেব কৃষ্ণগোবিন্দকে সুলতা প্রায়ই বিদ্রূপ করতো। ভুবনমোহনের মনে হতো সুলতা তাকেই বিদ্রুপ করছে। আর তখনই ধমনীতে নীলরক্তের জোয়ারের শব্দ তিনি শুনতে পেতেন।

যেদিন কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর সুলতাকে আখড়ায় ডেকে পাঠালেন সেদিন ভুবনমোহন বুঝতে পারলেন অবশেষে ছিকায় আম ধরবে। কিন্তু সেদিনই লীলার গাছের বিষফল নিয়ে যখন সুলতা ফিরে এলো এবং ভুবনমোহনের প্রশ্নে যখন নিঃশব্দ কান্নায় ভাসানের মাটির পুত্তলির মতোই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো, ভুবনমোহন শুধু অনুমান করতে পারলে এই—আমগাছে কোনদিনও বউল আসবে না।

অথচ তারই কয়েকমাস পর যখন জোয়াল-বাঁধা-মুখে-ফোপা-আঁটা বলদ ঘুরে ঘুরে

উঠানে ধান মাড়াই কবছিল আর সেই শব্দের তালে তালে ভুবনমোহন যখন ১০৮ বীজমন্ত্র জপ করছিলেন, তখন সুলতার গর্ভ ভরে ওঠার চাপা অথচ দুঃসহ শব্দে তিনি টের পেলেন, অদ্ভুত উচাটনে কোন ভূতেধরা নারীর শরীর থেকে আমগাছের একটি ডাল ভেঙ্গে পুরুষভূতের চলে যাওয়ার পরেকার অদ্ভুত নিস্তব্ধতা তাব সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

ঘরের সোনারু কাঠের খুঁটিগুলিতে এবপর ক্রমশ নীলরক্তবাহী শিরাগুলো স্পষ্ট হতে থাকলো। উত্তরপোতার ঘরের নিচে স্তিমিত জলেব কল্লোল হাপুব হাপুর করতে শুরু কবলো। লণ্ঠনের ছায়ার নিচে। এবং ভুবনমোহন অনুভব কবলেন দেওলা পুকুরটার মতো তিনিও জেগে উঠছেন। একটি জান্তব ইতিহাসেব সরিসৃপ ক্রমে গা' মোচড় দিয়ে উঠছিল ভুবনমোহনেব গভীরে।

ভুবনমোহন এতদিন যে অলৌকিকের কামনা করছিলেন তা-ই সত্যি সত্যি ঘটে যাবার পর তাব মনে হলো এই অলৌকিকও অনেকটা কচ্ছপেব পিঠে পৃথিবীব মতো ব্যাপাব। তিনি অনুভব কবলেন যে আমগাছটিতে অলৌকিক আমটা ধরেছে তাব শেকড কখন যেন ছড়িযে গেছে সন্দেহেব মাটিতে। অতএব আবাবও মাছশিকাবেব সময়কাব অনুভূতিটা ফিবে এলো তাব। ভুবনমোহনেব মনে হলো সুলতাব শবীবের আঁশটে গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাবে দেওলাব দিকে।

সুলতা ঘুমিয়ে যাবাব পব প্রাযবাতেই তাব পেটে কান পাতেন ভুবনমোহন। যেন শুনতে চেষ্টা করেন ভ্রূণেব বক্তের কোলাহলেব শব্দ—বক্তেব কথামালা। ঘবেব সেই ঘন অন্ধকারে দৃষ্টির বঞ্জনরশ্মিতে চিনতে চেষ্টা করেন ভ্রূণেব রক্তেব রঙ।

সেদিন বাইরে ছিল ঝড়েব ওঝানৃত্য। গভীর রাত্রে ভুবনমোহন ডাকিনী অন্ধকারে একা বংশলতিকা খুলে বসেছিলেন মেহগেনিকাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা চেয়ারটাতে। কাঠের আঁশের নিচে চেয়ারেব মাংসপেশীব সংকোচন ও প্রসারণে এক প্রগাঢ় জৈববোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন করছিল তাকে। বাত্রির সেই তন্দ্রপ্রহরে তার মনে হচ্ছিল তিনশো বছরের পাথরের মানুষটা আজ, এতদিন পব, জীবন্ত ও জান্তব ভুবনমোহনে বদলে যাচ্ছেন। ঝড়ের মধ্যে সেদিন তার ভেতবে তিনশো বছবেব ইতিহাসের নৈঃশব্দ গম গম করে বেজে উঠছিল, যেন শূন্য কুয়োতে মুখ দিয়ে তিনি নীববে চিৎকাব করে উঠলেন—ভুবনমোহন—ভুবনমোহন—আর সেই শব্দই যেন বা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হযে, একটি গ্রাম্য কুযোব আত্মহত্যাব স্মৃতিতে—কুয়োব জলজ অন্ধকারে, তাকে ডেকে নিচ্ছিল।

ভুবনমোহন মনে মনে বংশলতিকায় অনঙ্গমোহনেব নামের নিচে তাব নিজেব নামটা লিখলেন। তাবপর ভাবতে চেষ্টা করলেন পবেব জাবজ নামটি। হয়তো বা কল্পনা দিয়ে স্পর্শ করতে চাইলেন অভূমিষ্ট সেই নবজাতককে। আব তার পরই এক অদৃষ্ট গাঢ় ঘন তাজা লাল বক্তেব গভীর আবর্তে তিনি ডুবে যেতে দেখলেন তার সমস্ত পূর্বপুরুষকে। তাব কানে ভেসে এলো তিনশো বছরেব খাঁজে খাঁজে হারিয়ে যাওয়া চাবুকের শব্দ—ভেসে এলো কালান্তরের কান্নার শব্দ—তিনি যেন সেই বিপুল যন্ত্রণাদীর্ণ শব্দেব মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলেন ইতিহাসের অভিশপ্ত বক্তেব কবাল মুখবিবরের ছবি। দেখতে পেলেন এক লালরক্তের পিণ্ড তার শতভুজায় পেঁচিয়ে ধরেছে উত্তরপোতার সমগ্র ঘরটাকে তিনশো বছরের প্রাচীন রক্তচক্ষু এক খড়গের নিচে

এই রক্তস্নান—ভুবনমোহনের বুকে মন্দির—মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি আর বীভৎস কলতান জেগে উঠলো।

ভুবনমোহন অনুভব করছিলেন তার রূপান্তব ঘটছে। তিনি যেন প্রজাপতি থেকে গুটিয়ে গিয়ে শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছিলেন। বংশলতিকায় পূর্বপুরুষদের নামের উপর হাত বোলাতে বেলাতে চারপুরুষের নীলরক্তের জোয়ারে তার সমস্ত সত্তা প্লাবিত হচ্ছিল। ভুবনমোহন যেন কখন দ্বিজমোহন-তীর্থমোহন-কামদামোহন-অনঙ্গমোহনে বদলে গিয়েছিলেন।

—ইটা এক আশ্চবিৎ দিশ্য—শয়তানেব চে'ারা বদলাইবার মতন। ক্ষণে হাসেন-ক্ষণে কান্দেন—ক্ষণে চোক ঠিকরাইয়া বারই যায়।

পবানদাদী বাসন্তীকে কনুই দিযে একটা খোঁচা দিল।

—ও বইন—ঘুমাই গেলায় নি।

পরানদাদীর চাবদিকে আবারও ভিড জমে উঠেছে। তরাইকান্দির বদলে যাবার গল্প শুনতে।

সুলতা জেগে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্প—কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলো সমস্ত ঘরটাব কড়িকাঠ, খুঁটি, বর্গা, এমনকি তার কাঠের খাটটাও একটা জান্তব গোঙানি নিয়ে জেগে উঠছে। সেই অমানুষিক গোঙানি ও জান্তব হা হা হা শব্দের মাঝে সুলতা দেখলো ভুবনমোহন অথবা ঠিক ভুবনমোহন না—সাদাকালো ফটোতে দেখা অনঙ্গমোহন অথবা ঠিক অনঙ্গমোহনও নন—এরকম বীভৎস বহুরূপী এক অ-মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সুলতা আধো তন্দ্রার মাঝে, বিমূঢ়, বিস্ময়ে পবিচিত ও অপিরিচিতের মাঝে রঙ বদলানো সেই অ-মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু, একটু পরই, সুলতা কিছু বুঝবার আগেই একটা শ্বাপদ নখদন্ত নিয়ে সুলতার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুলতা সমস্ত শক্তিতে ঠেলে উঠতে চাইলো কিন্তু একটা পশুশক্তি তার বাঁ হাত দিয়ে ততক্ষণে সুলতাকে জীবন্ত খাটটায় চেপে ধরেছে আর অন্য হাত ছিঁড়ে ফেলছে তাব ব্লাউজ-সায়া সব।

সুলতার মনে হলো সে একটা জীবন্ত বনরুই বা কাউ্রয়াব পিঠে শুয়ে আছে আর তার শরীরের উপব একটা অপরিচিত বীভৎস জন্তু চরে বেড়াচ্ছে। চেনা ঘাম আর অচেনা শ্বেদের গন্ধের ভেতর এক খসখসে সরীসৃপ তপ্ত শ্বাস আর লকলকে জিহ্বা নিযে সুলতাব শরীরেব বাস্তুভিটায় বাস্তুসাপের মতো ঘুবে বেড়াচ্ছিল। একটা আঁশটে পিচ্ছিল হাতেব মুঠোয় তার দু'টো স্তনের নিস্পেষণের ধ্বনিগুলো নিয়ে লোফালুফি করছিল সমগ্র ঘরটা।

উরু আর জঙ্ঘার উপব প্রচণ্ড পাথরের মতো চাপে যখন যোনিতে একটা কইমাছ সুলতার শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে ঢুকে পড়ছিল, যখন সমস্ত ঘরটা গণধর্ষণের শীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তখন সুলতা চোখ খুলে জীবনে প্রথবারের মতো দেওলা দেখলো।

তারপর পাঁচ দশে পঞ্চাশটা আঙুলের দাগ নিয়ে ঝড়বৃষ্টি ধোয়া সুলতার ছিন্ন ভিন্ন শরীরটা গড়িয়ে গেল সেই দেওলা পুকুরটায়।

সুলতার শরীরটা পুকুরে গড়িয়ে দেওয়ার পরই ভুবনমোহন দেখলেন পুকুরের চারদিকে

শতপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য, দেখলেন শাঁখ ঘণ্টা জোকারের শব্দে শব্দে গর্ভবতী সুলতার শরীর বুরবুরি তুলে পুকুরটায় আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। ভুবনমোহনের মনে হলো তিনি কোন দুঃস্বপ্নের শেষটা দেখলেন।

পরদিন ভোরে শুধু একটা লাল শাড়ির অংশ সবুজ পানার মধ্যে ভেসে উঠেছিল।

—গলফো এখনও শেষ অইছে না।

পরানদাদী একনাগাড়ে বলে হাঁপিয়ে উঠেছে। আরেকবার চোখে হাত দিয়ে দেখলো বেলা কয় দণ্ড হলো। একদলা কফ এ্যাঁক থু বলে ছুঁড়ে দিল বড়বাড়ির মাটিতে। ভুবনমোহন তখন ওই পুকুরটার পাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ভেসে ওঠা লাল শাড়িটার দিকে আবারও চোখ গেল তার। মাঝখানে এতকাল কেটে গেছে তিনি যেন ভুলেই গেলেন। একবার শুধু অস্ফুটে কী যেন বললেন। তাবপব ঝামা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে গেলেন দেওলা পুকুরটায়।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্ত্তী

ক্ষণ মেঘ

'ক্লান্ত ভীষণ ক্লান্ত আমি—' ভাবতে ভাবতে বরেন একটু দার্শনিক হয়ে উঠল, 'বেঁচে থেকে কি লাভ?' রৌদ্রে উত্তপ্ত মাঠটার উপর গরম হাওয়ার নাচ দেখল কতক্ষণ— 'আমাদের চিন্তাগুলোও বোধহয় এইভাবে তাপ ছড়াতে ছড়াতে হারিয়ে যায়,' ভাবল বরেন। ঘরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতেই সামনের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের উদ্দাম যৌবনবতীর দিকে চোখ দুটো আটকে রইল। একটা প্রাকৃতিক ইচ্ছা মনের মধ্যে গুনগুন করল কতক্ষণ। 'টেকে না, ও রঙও ধুয়ে মুছে ভেতরের খড়গুলো বেরিয়ে যায়, দো দিন মে ছুট যায নেশা যোওয়ানিকা—' গাড়ীর মধ্যে গান-গাওয়া ইরাণী যুবতীর লাইনটি মনে হ'ল তার। অথচ নিজের যৌবন দেখিয়েই পয়সা রোজগার করছে মেয়েটিও।

'এমন একটা কিছু কি অঞ্জনাও চেয়েছিল আমার কাছে?'' স্মৃতি হাতড়াতে লাগল বরেন, 'শুধু একটা দেহ নিয়ে আমি কি করব? দুবছর, চার বছর—তারপর —একঘেয়ে আরোহন ও অবরোহন। মাফ করবে অঞ্জনা, তোমার ঐ সুন্দর শরীরটায় আমার যে লোভ হয়নি তা নয়, কিন্তু শুধুমাত্র একটা শরীর, আর কিছুই নয়? নাঃ খুব আকর্ষণ বোধ করছি না।' বরেন জানলা দিয়ে দেখতে পেল মাঠ-গাছপালাগুলোকে গ্রাস করে অন্ধকারটা গুটিগুটি এগুচ্ছে—'the knell of a day.' নিজের চারদিকে তাকিয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করল সে। 'একটা তথাকথিত সুন্দর জীবন পেয়েছি—অবশ্য চলনসই মাইনের চাকরী, মোটামুটি সুঠাম একটা দেহ, নিশ্চিন্ত আরামে কাটাবার মত কিছুটা সময়' নিজের একটা ছোটখাট বাড়ি—হ্যাঁ এগুলোর সম্মিলিত ফল যদি সুন্দর জীবন হয়— তবে আমি তা পেয়েছি—কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবে যে এ জীবনটাতে এমন কিছুই আমি পাইনি যাতে বেঁচে থাকার জন্য আমি আকর্ষণ অনুভব করব। সত্যি বলছি অঞ্জনা আমি তোমার কাছে এইটুকুই চেয়েছিলাম যে তুমি আমাকে অনুভব করিয়ে দেবে আমি বেঁচে আছি —একটা তাজা জীবন নিয়ে। বিশ্বাস কর শুধু এই অনুভূতিটুকু পাওয়ার জন্য বার বার তোমার কাছে ছুটে যাই।'

ঘরের মধ্যে ততক্ষণে অন্ধকার নিজেকে কায়েম করে নিয়েছে। বরেন একবার এ পকেট ও পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই খুঁজল, তারপর মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে শেষ কাঠিটি দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। উঠব উঠব করেও অনায়াস আলস্যে চেয়ারটায় গা ঢেলে দিল। 'না তোমার কোন দোষ নেই অঞ্জনা, তোমরা চিরদিনই একটা নিবিড় নীড় রচার স্বপ্ন দেখ, হয়ত একটা গৃহের আশ্রয় তোমাকে আমি দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে তুমি সুখী হতে পারতে কি? জানি এ যুগে—শুধু এ যুগে কেন—কোন যুগেই কেউ সুখী ছিল না। কারণ সুখের সংজ্ঞা আমরা নিজেরা বুঝি না—অন্যের দ্বারা আরোপিত ওটা একটা বিশেষণ, যে বিশেষণটি কোন ক্ষেত্রেই

সফল প্রয়োগ হয় না। যাকে আমি সুখী মনে করছি—সে নিজে কতকগুলি অদৃশ্য দুঃখে ভুগছে—যেগুলো বাইরে দেখে আমরা বুঝতে পারি না। সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল মানুষের চাওয়ার কোন সীমারেখা নেই।' একটা সিগেরেট ধরাবার ইচ্ছে হোল বরেনের, ঠোঁটে সিগেরেট গুঁজে মনে পড়ল দেয়াশলাই নেই। অগত্যা চেয়ার ছাডতে হ'ল। দরজায় তালা দিয়ে অগ্নিবিহীন সিগেরেট ছোঁটে চেপে কাছের পানের দোকানাটার উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল সে।

সিগেরেটটা ধরাতে ধরাতে ভাবল বরেন, 'জীবনটা জ্বলে জ্বলে মিশে যায়, না আমরা জ্বালিযে দেই প্রতি মুহূর্তে? জ্বলতে না পারলেই আমাদের কষ্ট। তবে কি আমিও কোন কষ্টে ভুগছি? এই দুঃসংবাদ আমাব জীবনে এল কেন?' বরেন গা ঝাড়া দিয়ে চিন্তাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল। ভিডের মধ্যে হাঁটতে শুরু কবল। চাবিদিকেব আলোর সমারোহ, নিযনেব বিজ্ঞাপন, মোটবের গতি আর এই ভিড়ে গুঞ্জন— 'নাঃ এইতো বেশ বেঁচে আছি মনে হচ্ছে।' পবিচিত রেস্তোবাব কাছে আসতেই তৃষ্ণা অনুভব করল। ঢুকতেই মালিক ধীবেনবাবুব টুথপেষ্ট মার্কা হাসিব আপ্যায়নে বরেন একটু হকচকিয়ে গেল। 'মাস শেষ হ'তে এখনও তো দিন সাতেক বাকি—তা হলে ঐ হাসি কোন সর্বনাশের ইশাবা কে জানে।' ভাবতে ভাবতে ববেন কোণের চেয়াবটায় গিয়ে বসল। কিছু বলাব আগেই ধীরেনবাবুর গলা শোনা গেল, 'এ্যাই পঞ্চু, বরেনবাবুর জন্য এক কাপ স্পেশ্যাল নিযে আয।' ববেন এ ধবণেব ভূমিকায় সচকিত হ'ল। কারণ না বুঝতে পেরে নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগল।

কাউন্টার ছেড়ে ধীরেনবাবু ববেনের পাশের চেযাবটা টেনে নিয়ে বসলেন। 'আমাব একটু উপকার করতে হবে ববেনবাবু।' 'তা তো বুঝতেই পাবছি,' মনে মনে ভাবল বরেন। 'আমার ছোট্ট কাপডেব দোকানটা আপনি চেনেন নিশ্চযই? অতটুকু দোকানে আয়ই বা কি হয় বলুন, অথচ দেখুন ইনকাম ট্যাক্সের জ্বালায আর পারছি না। অখিলেশবাবুব সঙ্গে তো আপনার বিশেষ জানাশোনা, আপনি একটু যদি ব্যাপারটা বুঝিযে বলেন আমাব বড উপকার হয়। দরকাব হলে না হয় কিছু...' বলে ধীরেনবাবু বিশেষ ইঙ্গিতে কথা শেষ করলেন। বরেন মনে মনে হাসল। 'আবে ঠিক আছে ও আমি ব্যবস্থা কবে দেব, আপনি চিন্তা কববেন না।'

রেস্তোরা থেকে বেরিযে নজবে পড়ল ঝকঝকে তারা ভবা আকাশ। যেন এই মাত্র কেউ ধুযে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল নিশ্চিন্তে নিজের মুখোমুখি বসার কোন জায়গা নেই সমস্ত শহরটাতে, যেখানেই যাওয়া যাক পরিচিত বা অর্ধ পরিচিতের বাজে বকবকানিব যন্ত্রণা। কতকগুলো অনর্থক ব্যাপার নিয়ে মানুষ যে কেন এত উত্তেজিত তর্কে মেতে উঠে সে ভেবে পায় না। এখন তার হাসি পেল এই ভেবে যে, সে নিজেও বন্ধুমহলে এ ধবণেব তর্কে মেতে উঠে। 'আসলে আমরা প্রত্যেকেই চাই নিজেব চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে। প্রত্যেকেরই মনে মনে মৌলিক কোন চিন্তা করার আত্মতৃপ্তির সমর্থন বা অনেক কিছু জানি এ অহমিকার তৃপ্তি পাওয়াব আকাঙ্খা—যার ফলে তুচ্ছ ব্যাপাবেও আমরা দারুণ ভাবে যুদ্ধোন্মাদ।' ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কামিনী ফুলের গন্ধ এসে লাগতেই চিন্তার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হল বরেন। দেখল নদীর ধার দিয়ে অনেকটা পথই সে আনমনা চলে এসেছে, প্রায় অঞ্জনাব বাসার কাছাকাছি। অথচ অঞ্জনার ওখানে

যাওয়ার কোন চিন্তাই তার মনে ছিল না। যাব না, যাব না করেও পা বাড়াল ওদিকেই। 'যতই কিছু করি না কেন, মহাযুদ্ধই হোক আর জীবনযুদ্ধই হোক— একটা শান্তির আশ্রয় আমাদের চাই। যেখানে দুদণ্ড জিরিয়ে নিয়ে আবার ছুটতে থাকব।' ভাবতে ভাবতে বরেন অঞ্জনার দরজায় কড়া নাড়ল।

বার তিনেক কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। 'তুমি', ঠিক অবাক না প্রশ্ন বরেন বুঝতে পাবল না। একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ আমি।' 'এস' অঞ্জনা চেয়ারটা জানালার ধারে টেনে নিতে নিতে বলল, 'হঠাৎ মনে পডল বোধহয়?' বরেন এতক্ষণ অঞ্জনাকে দেখছিল, অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, 'না, কেমন আছ?' এক টুকরো হাসি অঞ্জনার চোখেমুখে টল টল করছিল, বলল, 'ভাল, তা তোমার কি হয়েছে বলতো? সেদিন আসার জন্য বারবাব বললাম অথচ কোন পাত্তাই নেই।' বরেন মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ভিড় আমাব ভাল লাগে না অঞ্জনা।' 'ভিড় পেলে কোথায়? তোমাকে বলে এলাম না যে আজ রাত্রে এখানে খাবে? আজকাল এত অন্যমনস্ক থাক কেন? এমন চিন্তার ব্যাপার কি ঘটল?' বরেন একদৃষ্টে চেয়ে রইল কোনো উত্তর দিল না।

অঞ্জনা চেয়াবেব পেছনে বরেনের মাথা ঘেষে দাঁড়াল, একটু ঝুকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে?' অঞ্জনার চুল থেকে, সারা গা থেকে যেন একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছিল, বরেন আচ্ছন্নের মত দুহাত দিয়ে অঞ্জনার মুখটাকে আর একটু সামনে টেনে আনল, দু চোখেব দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। অঞ্জনা আলগোছে বরেনের মাথায় নিজের গাল ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এ্যাই, কথা বলছ না কেন? আবার বুঝি মন খারাপ হয়েছে?' মিষ্টি গন্ধটা যেন বরেনকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছিল, সে দুচোখ বুঁজে শুধু বলল, 'হুঁ'। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। অঞ্জনা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমার যে কি হয় মাঝে মাঝে বুঝি না। সব খুলে বলতে পাব না বরেন? তোমাকে এমন দেখলে আমাব খুব খারাপ লাগে।'

'কি করে বলি, আমি নিজেই কি জানি আমার কি হয়?' এইটুকু বলেই বরেন চুপ করে গেল। মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি হয়েছে?....হয়ত প্রতিফলন দেখতে চাই কারও মধ্যে, তা না পেলেই দুঃখ জন্মায। অথচ অঞ্জনা যেমন আছে তেমনি থাকাটাই স্বাভাবিক। একজন স্বভাবচ্যুত হযে আমার মনের মত হতে গিয়ে কৃত্রিম একটা কিছু হয়ে থাক, এ চাওয়াটাই ত অবাস্তব। নাঃ, বেশী কল্পনাবিলাসী হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।' বরেন চোখ মেলে চেয়ে দেখল, অঞ্জনা তার দিকেই চেয়ে আছে। সে হেসে বলল, 'কি চা খাওয়াবে না?' 'ও হ্যাঁ, তুমি একটু বস জলটা চাপিয়ে আসি।' অঞ্জনার চলে যাওয়াব দিকে চেয়ে রইল বরেন। 'সত্যই সুন্দর ফিগার' সে মনে মনে আবার স্বীকার করল। 'সত্যি বলছি অঞ্জনা তোমার কাছে এলে যেন অভাব বোধটোধগুলো হারিযে যায়,' বরেন নিজের মনে মনেই অঞ্জনাকে কথাগুলো শোনাচ্ছিল।

চেযার ছেড়ে রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল, 'আসলে কোন জিনিসকে বিচার করার সময় আমরা দুইভাবে তাকে দেখি। আমি কি প্রথম ভাবে বিচার শুরু করেছি? তা হলে তোমার প্রতি আমি কি অবিচার করছি না, অঞ্জনা?' ধীরে ধীরে অঞ্জনার পেছনে দাঁড়িয়ে দুই কাঁধে হাত রাখল বরেন। 'জল প্রায় ফুটে এসেছে,' মুখ না ঘুরিয়েই অঞ্জনা বলল। বরেনের খুব ইচ্ছে করছিল অঞ্জনাকে একটা চুমু

খায়, কিন্তু কেমন যেন এক অন্যমনস্কতায় ইচ্ছাটুকু আলগা হয়ে পড়ল। 'দেবদারু গাছ দেখেছ অঞ্জনা?' বরেন মনে মনে জিজ্ঞেস করল। 'তোমার চারিদিকেও যেন তেমনি স্নিগ্ধ সবুজিমার আভাস পাই আমি। আমার নিজেকে তখন মনে হয ঝাউয়ের মত। ক্ষ্যাপা হাওয়া যেন হু হু করে বয়ে শুধু কান্নার গান শোনাচ্ছে আমাকে।' চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে অঞ্জনা বলল 'চল ওঘরে যাই।' এক হাতে কাপ আর অন্য হাতে বন্ধুর মত গলা জড়িয়ে ধরে বরেন এ ঘরে ফিবে এল।

'কি হয়েছে বললে না?' অঞ্জনা জানতে চাইল। 'সেদিন ফোনেও হু-হা কবে উত্তব সারলে, আসতে বললাম কোন পাত্তা নেই,' এক নিঃশ্বাসে অনুযোগ জানিয়ে গেল সে, 'আচ্ছা সত্যি কবে একটা কথা বলবে?' ববেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 'তুমি কি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও? তাব জন্য কিন্তু লুকোচুরিব দবকাব নেই,' বলতে বলতে অঞ্জনাব গলা কেমন যেন ভাবি হয়ে এল। ববেনের দুচোখে হাসি ফুটফুট কবছিল, 'আমাকে বিয়ে কববে অঞ্জনা?' বলেই বালিশ টেনে নিযে অঞ্জনার বিছানায় সটান শুয়ে পডল সে। প্রথমটায অঞ্জনা কেমন যেন হকচকিযে গেল, বরেনকে চোখ বন্ধ কবতে দেখেই মেঘ সবে দুচোখে রৌদ্র দেখা দিল। 'তুমি একটা গাড়োল। রাত্রে খাওয়া-দাওযা সেবে এখান থেকে যাবে,' বান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে কথা কযটা ছুঁড়ে দিল অঞ্জনা।

কুমার অজিত দত্ত

কলাবতীর বারমাস্যা

পা। শুধু পা। রাশি রাশি পা। এগিয়ে যায়। কারো কারো পা হঠাৎ হঠাৎ একটু থামে। পয়সা পড়ে। আবাব চলতে থাকে। পা—পায়ের জুতো—শব্দ—কত রকমের—কত ঢংয়ের। পাগুলো হাঁটেও কেমন। 'কুনোটা কুইল্যাব বলদার মতন, কুনোটা গাই-বাছুবের, আবাব কুনোটা ঘোড়াব মতন ঠকঠক কইবা ছুটে।' এভাবেই চলমান পায়েব মিছিলে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দুটো পা। পা-দুটোকে একেবারে অন্য ধরনেব ঠেকছে। পুরুষ্ট—ধবধবে। জুতোটাও অচেনা। পুরনো এ্যানিমিয়াগ্রস্থ দুচোখে দিনেব চড়া আলো পড়লেই খচখচিযে ওঠে। বাঁ হাতের চেটোটাকে চোখেব ওপর আড়াল দিয়ে চোখ দুটোকে আকাশেব দিকে তুলল সে। দেখে 'পাকা-কুমড়ার' মতো একটা বড মুখ চোখের সামনে বাক্সের মতো কি একটা ধবে নিযে ওব দিকে তাক করে সাট সাট শব্দ তুলছে। বেশিক্ষণ তাকিযে থাকতেও পাবে না—চোখে জল এসে পড়ে। আবাব পা-দুটোব উপর চোখটা নামিয়ে নেয়। পা-দুটো ছটফট করে বেশ কিছুক্ষণ ওর এপাশে-ওপাশে। অবশেষে একটু স্থিব হয়। তারপরই ওর তোবড়ানো এনামেলে বাটির হাঁ-এব ভেতর একটা ঝকঝকে নোট এসে পড়ে। আর বিদঘুটে কতগুলো কথা ওর দিকে একনাগাড়ে আছড়ে পড়তে থাকে। বিহ্বল দুটি চোখ উপরে তুলতে-না-তুলতেই পাকা কুমড়ামুখো হাওয়া। নিশ্চিত হওযার জন্য দৃষ্টি নামিয়ে দেখে সেই পা-ও আর নেই। পায়ের ভিড়ে হারিয়ে গেছে সেই পা। আবার সেই পাযের মিছিল। টাকাটা হাতে নিয়ে ধীবে ধীরে চোখের সামনে নাড়াচাড়া করে—ভাল করে দেখে, কত টাকা ঠাহর করতে পারে না, তবে টাকাব আকাব দেখে বোঝে বেশি অঙ্কের। এ-ধরনের বড টাকা এই প্রথম সে ধবে দেখছে। নোটটাকে খুব মন দিযে নিরীক্ষণ করতে করতে তার দুপাশে বসে থাকা সহজীবীদের একবাব আড়চোখে দেখল, ওদেব দুচোখে সমীহভরা বিস্ময়। তারপব পায়ের মিছিলের চঞ্চল অবকাশ পেবিয়ে বাস্তায় ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া গাড়ির স্রোতের ভেতর দিয়ে দৃষ্টিটাকে পৌঁছে দিল বিপরীত ফুটপাতে। ফুটপাতে দৃষ্টিটা ঠেকতেই ধক করে উঠল বুকটা তার—একটা কুকুব তার জনম খোঁড়া বাপটার মুখের বাইরে ঝুলে আসা সাদা জিভটাকে এক মনে চাটছে। 'বাপটা মইরা গেল নাকি?' তাজা নোটটা কড কড় করে দলে মুচড়ে হাতের মুঠোয় বন্ধ হল তার। গত দুদিন বাপটা তো ওখানে ঐভাবেই শুয়ে ছিল। হাতের মুঠো আরো শক্ত হল। বৃষ্টিহীন আকাল দুচোখে তার বহুদিন পর জল এল। জলের আস্তবণ ছাপিয়ে বাপের হাঁ-মুখের ঝুলে থাকা বীভৎস জিভটা স্পষ্ট স্থিরদৃশ্য হয়ে আটকে রইল চোখে।

উজ্জ্বল রশ্মিটা নেগেটিভ কেরিয়ারে শুযে থাকা স্নিগ্ধ সেলুলয়েডের পাতটাকে তীব্রভাবে ভেদ করে একটা আলোর-ছবি হয়ে, আছড়ে পড়ল ব্রোমাইডের বুকে।

কয়েক সেকেণ্ড। রশ্মি নিভে গেল। ইজেলের খাপ থেকে ব্রোমাইড গিয়ে পড়ল কেমিক্যাল ডিস্‌কে। একটু অপেক্ষা। আলোর ক্ষত আর রসায়নের মৃদু সংঘাতে ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে আমাদের কলায়তি অর্থাৎ কলাবতী। ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে। ফ্যাকাশে বিস্ফারিত দুটি চোখ উপরের দিকে তাকিয়ে। শুকনো পানার মূলগুচ্ছের মতো চুলগুলো মুখের দুপাশ দিয়ে নেমে এসেছে। দুচোখের কোল বেয়ে নেমে গেছে ক্ষুধা আর অপুষ্টির উপত্যকা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পাথর। ফেঁসে যাওয়া মরা কেঁচোর মতো ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করা—ভেতরে এবড়ো-খেবড়ো দাঁত ব্লো-আপ সাইজের ব্রোমাইড-পেপার জুড়েই কলাবতীর মুখচ্ছবির সূক্ষ্ম আলোছায়ার ডিটেলস। খুশি আর তৃপ্তির প্রশান্তি শিল্পীর বাদামী দুচোখে। যশ। অর্থ। ক্ষুধাও যে শিল্প হতে পারে এ-পরীক্ষায় আজ উত্তীর্ণ হয়েছে সে।

ব্রোমাইড ছেড়ে কলাবতীব স্থান এখন শহবের ব্যস্ততম ফ্লাই-ওভারের পরিত্যক্ত একটি সাবওয়ে, তাব বাতের আস্তানায়। সাবওযেব ভিজে-স্যাঁতসেতে পরিসরে শুয়োবেব খোঁয়াড়ের মতো গাদাগাদি হয়ে পডে আছে কয়েকটা ছিন্নমূল জীবন্ত পরিবার। সারাদিন, শহবময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে একে একে সবাই ফিবছে নিজ আশ্রযে। সাবওয়ে বাসিন্দাদের সংসাব ধর্ম তো রাতেব বেলাতেই শুরু। সম্মিলিত উনুনের কালো ধোঁযায সাবওয়ে ভবে উঠেছে। ওদেব সুখদুঃখেব চিৎকার, কান্না, কলহ সব মিলেমিশে হযে উঠেছে, কর্মচঞ্চল। ক্ষুধাচঞ্চল বললেও বেশ হয। দুটো পোড়া ইট পাশাপাশি শুইয়ে, উনুন বানিয়ে, তাতে টায়াবের এক মাথায আগুন ধবিয়ে, তোবড়ানো এনামেলেব হাঁ-মুখে চাল চডিয়েছে কলাবতীও। টাযাব পোড়ার কুৎসিত কালো ধোঁয়ায় এনামেলের বাটিটা আব চোখে পড়ে না। প্রতিদিন এই বিষ-ধোঁযা ফুসফুসে টেনে নেয কলাবতী। বোধহয তেলচিটে পডে গেছে ওর ফুসফুসে। খক খক কাশে...।

টায়ারটা ধোঁযা ছাডতে ছাডতে হঠাৎ দপ কবে জ্বলে ওঠে। জলে ছোট ছোট বুদবুদ ওঠা শুরু কবে। কলাবতীব ঢেউ-খেলানো হাডেব প্রোফাইলে উনুনের আলো এসে পডে। সে প্রোফাইলে বিমর্ষতা। 'বাপটা মনেব মদ্যে আহে আব যায়। বাপটা তাইলে এদ্দিন আছিল কই। এ পিথিবিতে আমার খুজ লওনেব আব তো কেও লাই।' বাপ বলে যে তার কেউ একজন ছিল ইদানীং বেশি কবে টের পাচ্ছে কলাবতী। মনে ভেসে আসে সে-ধূসব অতীত। সেবার যেন, 'আগুন-দেবতার কোপ পড়ছিল' পলাশনন্দী গ্রামে। 'বিষ্টি নাই, আকাশে য্যান আগুন লাগছিল, জল শুকাইতে শুকাইতে এক্কেবাবে পাতালে গিয়া ঠেকছিল, গরু-বাছুর-বলদগুলা একটার পর একটা প্যাট ফুইল্যা মত্তে আরম্ব কল্ল, মুনিষ আর চাষাভুষো লোকজন দলে দলে শহরমুখী হতে শুরু করল। ক্ষুধার ধাক্কায় কলাবতীও বাপের হাত ধরে একদিন চলে এল শহরে। মা তখন কোথায় ছিল মনে পড়ে না আজ। বাপটা ভেবেছিল শহরে এলেই বুঝি সব ক্ষুধার অবসান। কলাবতীর শরীরে তখন 'বিয়া হওনের জৈবন।' বাপটা স্বপ্ন দেখতেও শিখিয়েছিল কলাবতীকে—'শহৈরা মদ্দার লগে বিয়া দিমু তর।' কিন্তু পরে ভুল ভেঙেছিল ওদের। মুনিষ আর মুনিষবেটির জন্য ভাববার সময় নেই এ-শহরের। 'শহৈরা মদ্দার' বদলে আসে 'শহৈরা রাইকখস'। ভিক্ষার বাটি হাতে

নিতে হল ওদের। ঠাঁই হল এই পরিত্যক্ত সাবওয়েতে। কোন ফাঁকে তিল-তিল ক্ষুধা, কেড়ে নিল কলাবতীর 'জৈবন।' বাপটাও অকালে বুড়িয়ে গেল, চোখের আলো গেল নিভে, পা-দুটো হয়ে গেল পঙ্গু।

বাদলা দিনের ছোট ছোট চ্যাংড়া ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ফুটছে ভাত। গরম ভাপ বাতাসে ছড়িয়েছে সেদ্ধ ভাতের গন্ধ। সে গন্ধের ভেতর কলাবতীর পুরু জং ধরা কোমল বৃত্তিতে ঝলকে ওঠে অদ্ভুত একটা বিষণ্নতা। একাকীত্বের বিষণ্নতা।... ঠক—ঠক... চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকায় কলাবতী। পরে বুঝলো মনের ভ্রম। বাপটা এমন সময় লাঠিতে ভর দিতে দিতে আস্তানায় ফিবত। আজ বোঝে, বাপের অস্তিত্বটাই তাকে এতদিন মনের অগোচরে একটা অবলম্বন দিয়ে এসেছিল।... চোখের ওপর ভেসে ওঠে বাপের মৃতদেহটা। 'মুনসিপুলিটির' জমাদাররা বাপটাকে যখন মরা গরুব মতো একটা বড় লাঠিতে দুপা বেঁধে ঝুলোতে ঝুলোতে নিয়ে যাচ্ছিল, পেছনে পেছনে অনেক দূব অনুসরণ করেছিল কলাবতী। যখন ওরা বাপের মড়াটাকে নিয়ে দ্রুত লোকের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল মন-আকুল-করা একটা ব্যথা বুকের ভেতর মোচড়াতে মোচড়াতে গলার কাছে এসে আটকে গিয়েছিল। কলাবতী সেদিন খুব কেঁদেছিল এবং জেনেছিল স্বজন-হারানো-ব্যথা কেমন হতে পারে। উনুনেব আঁচে চোখদুটো বাষ্পীভূত হয়ে ওঠে কলাবতীর।...

...সাবওয়ে বাসিন্দাদের হৈ-হট্টগোলের ভেতর দূর থেকে ভেসে আসা সেই পরিচিত ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধাতব আওয়াজে নিজেব মধ্যে ফিরে আসে কলাবতী। ছোট ছোট লোহার চাকা লাগানো কাঠের টানা গাড়িটায় অসুস্থ ছেলেকে নিযে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে মেগে আস্তানায় ফিরছে লোচন খুড়ি। 'কোন দেবতার কোপ য্যান' —লোচন খুড়ির ছেলেটার হাত-পাগুলোকে হাড়ে মাংসে চিবিয়ে খেতে খেতে ক্রমশঃ ছোট করে দিচ্ছে। মুখটা বিকৃত হযে এমন হয়েছে যেন চোখ দুটো ঠেলে বেরোবে এখনি। আওযাজটা ক্রমশঃ প্রকট হতে হতে একেবাবে এসে থামে কলাবতীর পাশে। প্রতিদিনই এমন করে থামে। লোচনখুড়ি কলাবতীর পাশেব পরিবার। কলাবতী উঠে দাঁড়িযে বলে—'কিগো খুড়ি, আউজগা ক্যামন জুটলো?' হাঁপিযে হাঁপিয়ে লোচন খুডির জবাব, 'না লো, জুটে নাই ত্যামন আইজকাইল মানুষগুলি য্যান ক্যামন হইয়া গেছে...' কথাটা শুনে কলাবতী বলে, 'কাউলকা তো তাও পাওন যাইব না, কোন দ্যাশেব লাটের বাটরা সব আইতাছে টাওনে, রাস্তাঘাট এক্কেবারে পটের বিবি। ইদিকে আমাগো বিক্কা দেওনেব বেলায় জিব্বা বাইরইয়া যায়, হালা।' কলাবতী অদৃশ্য কারো প্রতি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, কিন্তু চোখ রাখে খুড়ির দিকেই। বুড়ি ঘরকন্নায় মন দিতে দিতে স্বগতোক্তি কবে, 'হঁ, হগগল সময়েই ত আমার পোলাডারে দেইখ্যা লুকে নাক চাপা দ্যায, কাউলকা তো দ্যাশ ছাড়া কবব...।' খুড়িব এই কথায় কলাবতী আবার ঝাঁজিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করে লোচন খুড়ির জোয়ান মদ্দ ছেলেটা ওর দিকে ড্যাবড্যাব কবে তাকিয়ে। ছেলেটা সব সময় ওর দিকে ঐ চোখে এরকম তাকিয়ে থাকে। সে-চোখেব ভাষা তার কাছে একেবারে নতুন নয়। নিজের যৌবন সম্পর্কে সচেতন হয় কলাবতী। শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ইদানীং সে নিশ্চিত হয়েছে, তার এই অস্তমিত যৌবনও, কোনো বিশেষ পুরুষকে এখনও প্রলুব্ধ করতে পারে। তাই, পরনের কাপড়টা দিয়ে তাড়াতাড়ি শরীরে অনাবৃত

অংশগুলোকে ঢেকে দেয় সে। আর সাথে সাথে, মনের জগতে তার কেউ এসে, তোলপাড় শুরু করে।... জল টানতে টানতে গরম ভাতগুলো এখন ভারি ফেনের ভেতর গায়ে-গা-লাগিয়ে কলাবতীকে ডেকে বলছে, 'হেই কলায়তি, আমাগো অখন খাইয়া ফেল, তর প্যাটের চুলায় বাকি যা সিদ্দ হওনের হইয়া লমু নে।'

একটু লবন মিশিয়ে গরম গরম ফেন ভাতগুলোকে এক টুকরো কাঁচা-লঙ্কার সঙ্গে গোগ্রাসে মুখে তুলতে থাকে কলাবতী। গবম ভাতগুলো তার চুপসানো পাকস্থলীর ভূগোলে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তেই ভুখা পেটের নবম পেশিগুলো কাঠের মতো শক্ত হযে যায়। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকিযে ওঠে, শ্বাসরুদ্ধ করে লাঙলেব ফলার মতো বেঁকে গিয়ে মাথাটাকে দু হাঁটুব মাঝখানে এনে রাখে। কিছুক্ষণ জবাই পাঁঠার মতো থির থির কাঁপল শরীরটা তাব। তাবপব আবার স্বাভাবিক হযে মাথাটা খাড়া করে গ্রাসেব পব গ্রাস চালান দিতে থাকে পেটে। আর সাথে সাথে মনে মনে কোনো একজনকে হন্যে হযে খুঁজতে থাকে। খোঁজাব ভ্রমণপথে হঠাৎ কি মনে কবে কলাবতী পাশেই পড়ে থাকা নাবকেলের উডকি মালাটায, যেটাতে করে বাপটা ভাত খেত প্রতিদিন, সামান্য ভাত আলাদা কবে বাখে। ...খাওয়া শেষে, এঁটো বাটিটা নিয়ে কলাবতী এগিয়ে যায় একটু দূরে ইয়ার্ডের 'উচাকলটা'ব দিকে।

কলটার সামনে এসে ভাঙাচোবা এঁটো বাটিটাতে জল ভবে নিযে গলায ঢালতে ঢালতে ঢক ঢক শব্দ তুলতে থাকে কলাবতী। জলগুলো নিচেব দিকে নেমে যায। তৃপ্তি—অপাব তৃপ্তি। এক পেট ফ্যান-ভাত খেলেই যেন মনেব মধ্যে একটা সুখ জড়িযে যায। স্বপ্নগুলো খৈ-এব দানাব মতো পট পট করে ফুটতে থাকে। একবার চোখ তুলে চারদিক দেখতে ইচ্ছে কবে কলাবতীর। তাই সে দৃষ্টিটাকে বৃত্তাকাবে ঘুরিয়ে মরচে ধরা চোখেব তারায় টেনে নিতে চেষ্টা করে চারিদিকেব দৃশ্যাবলী। দেখে, শহবের রাস্তাগুলো আলোয আলোময়। এতো আলো সে কোনদিন দেখে নি এ শহরে। দেখতে দেখতে খুশিতে মন ভরে ওঠে তার, 'সোন্দব লাগতাছে দেখতে। খুব সোন্দর। কাউলকা যে ব্যাটারা আইব এ টাওনে হে ব্যাটাবা আমাব মতোই এক প্যাট খাইয়াই এই সোন্দর দেখব'।

ক্ষুন্নিবৃত্তিব পালা চুকিযে সাবওযে বাসিন্দাবা ঘুমে সব গোবর গাদা, পোড়া টায়ার থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কলাবতী টাযারটাকে মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে দাহ্যের আশংকায সেটাতে একটা ন্যাকড়া পেঁচিয়ে রাখল। বালিশেব মতো কবে গুটিয়ে বাখা বস্তাটাকে বিছিয়ে নিয়ে শবীবটাকে কুকুবেব মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ধপ করে শুয়ে পড়ল। শুতে শুতেই এক ঝাঁক নিঃসঙ্গতা 'বুতেব হাওযাব' মতো আঁকড়ে ধবে। বাপটা থাকতে এ নিঃসঙ্গতা কোনোদিন বোধ কবে নি সে। নিঃসঙ্গতার এ অস্থির অনুভূতি গত কযেকদিন ধরে। মনে মনে সে আবার কোনো একজনকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। খুঁজতে থাকে, যাকে সে এখনো চেনে না—জানে না। খুঁজতে খুঁজতেই এক সময়ে ঘুমিযে পড়ে কলাবতী।

লাঠির এক নির্মম খোঁচায় গাঢ় ঘুম ছিটকে যায় কলাবতীব। ঘুম চোখে প্রথম প্রথম কিছু বুঝে উঠতে পারে না সে। শুধু একটা ভয়ার্ত চিৎকার অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঘোর কাটলেই মালুম হয় সাবওয়ের ভেতর একটা লঙ্কাকাণ্ড চলছে। ধস্তাধস্তি, বাঁচাও-বাঁচাও আর্ত চিৎকারে সাবওয়ের ঠাণ্ডা জীবন ওলট-পালট

হয়ে যাচ্ছে। একদল পুলিশ সাবওয়ে-বাসিন্দাদের জোর করে টেনে হিঁচড়ে জাল ঘেরা একটা কালো গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। এ-দৃশ্যে স্তম্ভিত কলাবতী সাপের ফণা তোলার মতো উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত এ-দিক ও-দিক কাকে যেন খোঁজে। পায় না। পরিচিত অনেকেরই আর্তকণ্ঠ কানে আসছে। আচমকা একটা টর্চের আলো ওর মুখের ওপর এসে থামে। ভাবনার গতি হোঁচট খায়। পড়ি কি মরি চাবুকের মতো ছুট লাগায় কলাবতী। হৈ হৈ করে ওঠে পুলিশের দল। পিছু ধাওয়া কবে। 'হেই ছোকড়ি হেই ছোকড়ি।' কাছেই রেলওয়ে ইয়ার্ড। 'গাড়ির ডাব্বাগুলার বিতর লুকাইতে পাল্লে বাঁচন যাইব।' উর্দ্ধশ্বাসে মুখ হাঁ করে সেদিক পানে দৌড়য় কলাবতী। দৌড়-ঝাপটার তোড়ে অপরিপাটি কাপড়ের শিথিল বাঁধন খুলে যাওয়ার জোগাড়। তবুও থামে না—দুহাতে কোনো রকমে কাপড়টাকে সামলে সমান বেগেই দৌড়তে থাকে। কিন্তু বেশি দূব আর যাওয়া হয় না কলাবতীর। ঝুপ কবে একটা জাল এসে পড়ে। আপাদমস্তক ওকে জড়িয়ে ধরে। গতি রুদ্ধ হয়। পুবো জালটাই ওর শরীরে পেঁচিয়ে লেপটে আছে। টর্চলাইট হাতে একটা পুলিশ হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। তাবপব কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, 'শালা রাণ্ডি কি আওলাদ হামলোগোকো পবেসান কিয়া থা'—বলতে বলতে প্রচণ্ড বেগে একটা লাঠির ঘা চালিযে দেয় কলাবতীর হাড্ডিসার পিঠে। কলাবতী 'মাগো' বলে কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে অর্ধশয়ান। পুলিশটা বিরক্তিতে একটা জোর লাথি ঝেড়ে দেয় কলাবতীর তলপেটে। কলাবতী বিকট একটা আওযাজ করে জালসুদ্ধ শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে একপাক ঘুবিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। আর পুলিশটার মাথায় তখন গরম গরম ভাজা হতে থাকে—'ইয়ে শহর সাফ রাখনা হোগা'।

'দ্যাশের' এই নিষ্ঠুব ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার কবে, কলাবতীকে এখন সযত্নে তুলে আনা হযেছে মাউন্ট-ফ্রেমে, বিভিন্ন প্রোফাইলে। প্রদর্শনীর মজলিস। শিল্পীর চোখে জল. সাথে যুক্ত—'ফর সেল।'

অফসেটেও ঘুরছে কলাবতী। কভারেজ—'আর্ট অফ হাঙ্গার।'

কলাবতী এখন শিল্প।।

দেবব্রত চৌধুরী

আব্বাজানের হাড়

রাতশেষের কুমড়ো-ফালি মরা চাঁদটা টুক করে পানসি মেঘের আড়ালে ডুবে গেল। এখন শীতমরা নদী আর তার বিস্তর চরখানা জুড়ে আবছায়া অন্ধকার। সময়ের সঙ্গে ক্রমশ পানসে হয়ে আসছে। ঘণ্টা দুই কাটলেই ভোরের দিকে আলো ফুটবে চরাচরে।

বর্ডার জায়গা। নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। সটান লম্বা কাঁটাতারের বেড়া সীমানা বরাবর। নদীর চরের ওপর সীমানা অবধি বিশাল অ-ফসলি মাঠটা নাঙা ফকিরের মত হা হা উদাম। কোন বড় বা মাঝারি গড়নেরও গাছপালা নেই শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্যাকাস আর শরঘাসের একেকটা বেয়াদপ ঝোপ। আমিরুদ্দি এরকম একটা প্যাকাস ঝোপের অন্ধকারে আব্বাজানেব মাসহীন কাঠামটা পাহারা দিয়ে ঠায় বসে ছিল মাঝরাত অবধি।

সীমানা টহলদারের চৌকিটা এখান থেকে অনেক দূর। টহলদার জোয়ানরা কচিৎই এদিকটা মাড়ায়। তাও দিনের বেলা। আমিরুদ্দি তাই মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। কিন্তু ঝোপের ভেতর কিন কিনে মশা আর উদাম আকাশেব হিমে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। খাটো আর হ্যালহ্যালে উড়নি দিয়ে পা থেকে মাথা ঢেকে বসার কসরৎ করেই যাচ্ছিল শুধু। কিন্তু কাজটা আদৌ সম্ভব হয়ে উঠছিল না বরং বেশি বেশি হাত পা নাড়া চাড়ার ফলে অন্ধকারে ঝোপটা হাওয়া বাতাস ছাড়াই রহস্যময় হয়ে দুলছিল। ফলে সে চেষ্টাতেও ক্ষান্তি দিতে হলো তাকে।

অন্ধকারের ছানি চুইয়ে ক্রমশই ভোর গলছিল চরাচরে। হালকা হাওয়ায় মিহিন কুয়াশা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে ভাসাভাসি করছিল মাথার ওপর। প্যাকাসের পাতায় পাতায় হিমের টুপটাপ বাড়ছিল অবিরাম। ভোরের আগমনে মশারা রক্তের নেশা ছেড়ে আরেকটি রাত্রি বিদায়ের গুঞ্জনে মেতে উঠছিল সব। ঘুম নয়—জাগা নয় এমন একটা ঝিমুনি ভাব চলে বেড়াচ্ছিল আমিরুদ্দির সারা শরীর জুড়ে।

ঘু-উ-ম, বড্ড ঘুম পায় হে। আজ কতদিন আমিরুদ্দির ঘুম নেই। সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদ, দুটি চোখ ভারি হয়ে আসে তবু ঘুম আসে না। এই যেমন এখন, এত ভার শরীর কিন্তু একটু যে বস্তাবন্দি বাপের কাঠামে হেলে শরীরের ক্লান্তি জুড়োবে তারও কোন সুযোগ নেই। হঠাৎ কখন নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ হয় এই প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ। কখন জানি শামাদের কথামত ছই ঢাকা নৌকোর লোকেরা আসে, বস্তাবন্দি বাপকে সমঝে নেয় এই অপেক্ষায় বসে আছে আমিরুদ্দি।

কিন্তু এ নীরব অপেক্ষার ঘড়ি বড় অস্বস্তিব। সারাক্ষণ একটা শঙ্কা—একটা ত্রাস হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি চালায়। একটু নীরবতার ফোঁকরেই ভূতের মত আতঙ্কটা বুকের ভেতর ভর করে। ভাবনা আর আশঙ্কার ঝড়ে বিধ্বস্ত হয় আমিরুদ্দি। অন্ধকার

বেয়ে চোখের সামনে উঠে আসে সেই মৃত্যুর পরোয়ানা। ধূসর সাদা কাগজের ওপর একেকটা ছাপা হরফের তীর। নোটিশ—বিদেশী সন্দেহের সমন। মাঝে নীল কালিতে লেখা তার নিজের, তার পরিবাবের নাম। তলায় সরকারি ওপরে সীলমোহরের তলায় অফিসারের সই।

"যদিও ভোটার তালিকায় (১৯৮৯) আপনার/আপনার পরিবারেব নাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তবুও আপনি কিম্বা আপনার পরিবার ভারতীয় নাগরিক নন বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। সুতরাং..."

এই এতটা অবধি পড়ার পরই তো চোখের ওপর জমাট অন্ধকার নেমে এসেছিল আমিরুদ্দির। পায়ের তলার মাটি সরে যেতে যেতে শূন্য গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছিল। অতল খাদের চূড়া থেকে ঝটকায় কেউ যেন তাকে নিচে ঠেলে দিযেছে। শরীরের রক্ত সব এখন হিম, শূন্য হয়ে যাওয়া এক অসাড় অনুভূতি।

মানুষের মুখে মুখে ফেরা এতদিনের একটা চালু আতঙ্ক বা ভয়—যা আমিরুদ্দি গুরুত্ব দেয়নি কোনদিন শুধু শুনে এসেছে, ভেবেছে শুধু এসবে আমাব তো কিছু যাবার নেই। (আর যাবেই বা কেন? আমি তো জানি—এ মাটি আমার—এই দেশেরই মানুষ আমি, কবে কোন আদ্যিকালে বাপের সঙ্গে এপারে আসা। ওপার তো কবেই তামাদি হয়ে গেছে স্মৃতির খাতায়।) আমার জন্য এসব সমস্যা আসারও কোন কারণ নেই। তবে কেন মিছিমিছি...। এটা সেই সব মানুষেরই ভয়—যাদের সত্যিকারের এমন দুর্বলতা আছে। যারা বাতেব চোরা অন্ধকাবে সীমানা পার হয়ে এখন...। নয়ত এসব গুজব গুঞ্জন সময় গুজবানের, নিষ্কর্ম্মা মানুষের একটা কিছু উত্তেজক আলাপে ওম পোহানোর স্বভাব। অন্যকে ভূত কিভাবে ধবল গল্প শুনিয়ে শিহবণ পাবার আনন্দ যেমন। কিন্তু অন্যের ঘাড়ের ভূত আজ একেবারে সত্যি হয়ে, জ্যান্ত হযে তার ঘাড়েরই ওপব...

শুক্রবাব, ২৭ তারিখে সদর এজলাসে তাব শুনানীর দিন। সে দিনই তাকে প্রমাণ দিতে হবে নাগরিকত্বের। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। না হলে সরকাবেব আদালত একতবফা সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্তটা যে কি হবে সেটা ভাবতে গিয়ে শিউবে ওঠে আমিরুদ্দি। এপার না ওপার, মাঝখানে এক ত্রিশঙ্কু জীবন না আবো কোন শাস্তি।

আমিরুদ্দি শুনেছে, প্রমাণ না দিলে হয়ত তাকে দশ বছরের জন্য দেশের সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। তখন তো একদম বেওযাবিশ কুকুব বেড়ালের জীবন। বেওয়ারিশ কুকুর বেডাল তবু এটা তার দেশ বলে দাবি করতে পারে। কারণ বেড়াল কুকুরের বেলায় তো কোন শুনানী, কোন নোটিশ জারি চলে না। পথেঘাটে কত চালচুলোহীন মানুষ দেখেছে আমিরুদ্দি। সব বেওয়ারিশ তবুও তারা সরকারি খাতায নাম ওঠা বেওয়ারিশ নয়। তাদেবই শালা কুকুব বেড়াল জীবন। সেখানে সরকারি খাতায় একটা স্বীকৃত বেওয়ারিশের জীবনে আরো কি ঘটতে পারে ভাবতে পারে না আমিরুদ্দি। অন্ততঃ সুস্থ সক্ষম মানুষের পক্ষে ভাবা সম্ভব না। হায় আব্বাজান, নিভৃত রাতে অন্ধকার বাঁশবনে যখন কোকিলের ডাক শুনে শরীর আর মন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, একটা মানবী শরীরে সে উত্তাপ পরিশোধ করার মুহূর্ত আগে কেন যে এই ফলটুকু ভাবলে না?

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিঃশব্দে মাচার কাঁথা ছেড়ে উঠে বিড়ি ধরায় আমিরুদ্দি। দেশলাই কাঠির আগুনে অন্য মাচায় বউ আর বাচ্চাদেব জড়াজড়ি করে ঘুম দেখে। বউয়ের মুখটা ঈষৎ হা করা। ভারি পাছা এগিয়ে আছে মাচাব সীমানায়। কষে লাথি ঝেড়ে ঘুম ভাঙ্গানোর ইচ্ছে হয় অদম্য। ইচ্ছে হয় শরীরটা ঝাঁকিয়ে বলে, তুই যে এত নিশ্চিন্তে হা মুখো হযে ঘুমোচ্ছিস, তুই তো মাগী জানিসনা তোর শিযরে মরণ। তুই কি চোখে দেখিসনা—এ যাবৎ আমাব হাল, আমার রক্তহীন মুখ, আমার অনিদ্রা, আমার উচাটন, আমার যন্ত্রণা? হাঁদা হলেও তো তুই আমাব বউ, অংশীদার। আমার সঙ্গে তোর আর এই ছানা দুটোবও যে অসহায় জীবন। পবক্ষণেই মনে হয়, কী-ই বা হবে এসব বলে? মেযেমানুষটা যদি মূর্খও হতো তবু বোঝানো যেত—এটা হলো নোটিশ। এব মর্ম এই, আমাব সঙ্গে ছানা পোনা নিয়ে এবাব তোবও ভাসার জীবন, ওঠবে মাগী, তৈবি হ—ভাসবি বলে চল।

কিন্তু নিজেব কাছেই এখনো যা আশা-নিবাশাব ধোঁযাশা—সেখানে একটি অপরিণত মস্তিষ্ককে সে কি করে বোঝাবে এত জটিল সমস্যাব কথা। হাজাব বাব বলে বলে যদিও বা একটা কিছু বোঝানো যায়, তখন তো শালী, ডাক ছেড়ে কান্না ছাড়া নিজেব কর্তব্য বলে যে আবো কিছু আছে তা বুঝবে না।

ভালোবে বউ, একটা পশুব মত জীবনেব যে এবকম সমযটাতে বড় প্রয়োজন।

দুয়ার খুলে বাইবে আসে আমিরুদ্দি, নিঃশব্দেই। এখন আঘনেব শেষ। শীতেব দাঁত তবু আগাম। গাছেব পাতায় পাতায় শিশিবেব শব্দ। পানসে মেঘেব তলায আডাল হযে আছে চাঁদ। জবর দখল বসতি এখন শুনশান। দূবে বাঁশঝাড়ে ডাকছে একটা প্যাঁচা। বজবালীব লোম-পডা নেডি এই আগাম শীতেই কষ্ট পাচ্ছে। কোথাও একটা নড়াচড়ার শব্দ হয। আমিরুদ্দি একচিলতে উঠোনে পা বাখে। কান সজাগ কবলে ঘনঘন শ্বাসের শব্দ শোনা যায়। বমন মুহূর্তেব শ্বাস মাধবেব ছাপবা থেকে দশমাস পর মাধব তিন নম্বব সন্তানেব বাপ হবে। তাই এত ব্যস্ততা। হাসি আসে আমিরুদ্দিব। মজা পাওয়া কিম্বা ব্যথা বোধেব জন্য নয়। চাবপাশেব এত ক্ষণিক আনন্দ জগতে উটকো সংকটেবা আসে বলে।

আচ্ছা, এই হাঁদা বউ, হাভাতে ছানাপোনা, ছেঁডা কাঁথা বালিস কি প্রমাণ হতে পারে না এই দেশেব নাগরিকত্বেব?

নিদেন কোন দলিলই তো নেই ঘরে। বোজগাবেব ধান্ধায এখানে ওখানে কবেই তো কেটে যাচ্ছিল জীবনটা। শেষটায় জবরদখল কলোনীতে শিবদাঁড়া সোজা না করেও থাকতে পারার মত আস্তানা। দিন আট টাকা ভাড়াব বিকশা নিয়ে পেট চালানোর মত ব্যবস্থা। এতসব হিচডে হিচড়েও আমিরুদ্দিব জীবন যখন পাব হয়ে যাচ্ছিল তখনই শালা খাড়াব ঘাযেব মত উটকো নোটিশ।

দশজনের পরামর্শে শেষটায় আলম সাহেবের কাছে আসা। চেনাজানাই একজন নিয়ে এলো আলম সাহেবের কাছে। আমিরুদ্দিব বুক ভযে কাঁপছিল। তিনি তো মস্ত লোক। সরকাবি দলের এখানকার রাজনৈতিক নেতা। ক্ষমতাব বহর তাঁব অনেক। এদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস আমিরুদ্দিব কেমন কবে হবে? গলা তাই শুকিয়ে যাচ্ছিল—কি দিযে কথা শুরু করবে ভেবে।

সকাল ন'টায় ব্রাশে তিনি দাঁত ঘষছিলেন। তাদের দেখে বললেন, বসো।

তারা বসল তাঁর টানা বারান্দায়। আমিরুদ্দির বুক কাঁপছিল মুরগী ছানার মত। ভীতু চোখ ফিরে বেড়াচ্ছিল তাঁর পৈত্রিক বাসস্থানে। নারিকেল আর সুপুরী গাছের ঘন পরিখা। বাহারি ফুলের বাগান। ঘাসমোড়া বিশাল উঠোন। তাঁর দুটি মাখন ছেলে সেখানে ব্যাটবল খেলছিল। ঘরের সুন্দর নকসা আঁকা পর্দা সরিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দার আরাম চেয়ারে এসে শোবার মত করে বসলেন আলম সাহেব। বললেন, বলো।

ঘটনা জানলেন তিনি হালকা চুমুকে চুমুকে। ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আজ আমার জরুরী কাজ চার দিন পরে এসো। সময় বলে দিলেন।

আমিরুদ্দি একটু স্বস্তি পেলো।

চারদিন পর একাই এলো আমিরুদ্দি। বসল বারান্দায় সেই সেদিনের জায়গায়। কাচের গ্লাসে চা দিয়ে গেল একজন। দুহাতের থাবায় গ্লাসটা আঁকড়ে ধরে চা খাচ্ছিল আমিরুদ্দি। আলম সাহেব তখন আরাম চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, তোমার কেসটা জটিল হে, কোন ডকুমেন্টই তো তুমি দেখাতে পারছো না। ডকুমেন্ট শব্দটায় খটকা লাগবে আমিরুদ্দির বুঝতে পেরে বললেন, দলিল।

'যা কিছু কাগজ ছিল বাবু বছর বিয়ানী বান সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ছানাপোনা নিয়ে উঁচা বাঁধে উঠতে পেরেছিলাম খোদার দোয়ায়, ঘরদোর সব ভাসি হয়ে গেল।

আগের বছর ভোট কোথায় দিয়েছিলে?

তখন চাঁদমারিতে থাকতাম সাহেব, জায়গা বেদখলের, নোটিশ দিয়ে গোটা বসতি উচ্ছেদ করে দিল। তখনকার ইলেকশন নম্বর টম্বর মনে আছে কিছু? 'না সাহেব, ওসব নম্বর যে জীবনে এত জরুরী হবে ভাবতে পারি নাই।'

'হুম এবারে বোঝ মজাটা' আলম সাহেব সিগারেট থেকে ছুঁচোলো ধোঁয়া ছাড়লেন—নোটিশ ফেরাতে গেলে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে তোমার।'

'কত সাহেব? অধীর আগ্রহে আমিরুদ্দি উন্মুখ হয়। 'হুঁ...' ঠোঁট পিছলে একটা শব্দ বেরোয় আলম সাহেবের। অনিচ্ছাকৃত শ্লেষ কিংবা কৃপার শব্দ। এই আমিরুদ্দি নামক লোকটার মুখে চকিতে 'কত' শব্দটির প্রয়োগ আর উন্মুখ হওয়ার ধরণটা যে কতখানি বিসদৃশ তা সে হয়ত একটু আত্মসচেতন হলে নিজেই বুঝতে পারত। আসলে মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ কোন চোরাবালিতে পা ঠেকলে বাঁচার জমি বলে ভাবার তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস যে মানুষের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা ভেবে আলম সাহেবের লোকটার জন্য কষ্ট বোধ হচ্ছিল।

তিনি নীরব। তাঁর এই ধোঁয়া উদগীরনী নিরবতার প্রতিটি পল আমিরুদ্দির কাছে অসহ্য যুগ হয়ে উঠছিল। বুকের কাছে হাতদুটো জড়োসড়ো হয়ে আছে। উঠোন জুড়ে মুরগীছানাদের চিউক চিউক শব্দ উঠে আসছে কানে। আমিরুদ্দির মনে হচ্ছিল বুকের খাঁচায় বন্দি ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটার হাফরের মত চুপসে যাওয়া আর ফুলে ওঠা থেকে শব্দ উঠে আসছিল। ঘরের রঙিন নক্সার পর্দা বাতাসে দুলছিল তিরতির করে। সময় ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছিল আমিরুদ্দির।

প্রায় হাজার দু-তিন লাগবে এ বাবদে, একরাশ ধোঁয়ার সঙ্গে হিসেবটা উগরালেন আলম।

উঠোনে কোন মুরগীছানা চাপা পড়ে চি-উ-ক রবে করুণ দীর্ঘস্বর ছাড়ল।

'এতো!... সাহেব, আমার তেমন মুরোদ নেই সাহেব, বুকের কাছ থেকে জড়ো করা হাতদুটো শিথিল নেমে গোলো নিচে।

'আমি তোমার সঙ্গে রেট করার মানুষ নই আমিরুদ্দি, খোদা জানেন, এ কেমন কঠিন ফাঁদ হে, কত ঘাটে ফেরি যে দিতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু সাহেব—দু' তিন হাজার একসঙ্গে আমার মত... তার চোখে মুখে এমন করুণ আর্তি যে আহত আলম সাহেবের মুখ খসে প্রাচীন প্রবাদটা বেরিয়ে এলো, অভাগা যেদিকে যায়—সাগর শুকিয়ে যায়। একটা আক্ষেপের স্বরে তিনি বললেন, ওহে আমিরুদ্দি, তুমি এটা কেন বোঝ না, তোমার যে দলিল পত্র কিছুই নেই। কি দিয়ে 'দেশীর' প্রমাণ দেবে তুমি?'

এটাই তো চরম প্রশ্ন। সে কি করে দেখাতে পারে, দেশটা তার, এই আলো হাওয়া রোদ্র, এই ফসল, এই জলে তার বৃদ্ধি, তার বেঁচে থাকা ভালবাসা জড়ানো আছে রক্তের টান। একটা সার্টিফিকেটের অভাবে কি এসব কিছু মিথ্যে অস্তিত্বহীন! হাসপাতালের পাওযা সার্টিফিকেটই মা ও সন্তানের চরম সাবুদ? অথচ তোমরা, যারা নিজেদের সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাগরিকত্ব নয় মনুষ্যত্ব পর্যন্ত ভুলে যাও ভোটে জয়ী হতে দাঙ্গায় ইন্ধন দাও দেশের উন্নয়নের টাকা নিজের কোষে, ভরো, তারাই এক একটা সার্টিফিকেটের দৌলতে মহান দেশীয় ব্যক্তি হয়ে যাও।

আমার যে অনেক কাজ আমিরুদ্দি, বাইরে বেরোব, কিছু ভাবলে জানিও, আমি উঠছি...। তিনি আরাম চেয়ার ছেড়ে টান হয়ে দাঁড়িযে আড়মোড়া ভাঙলেন বললেন আচ্ছা তুমি আপাততঃ নাহয় হাজার দেড জোগাড় করো বাকি আমি ম্যানেজ করবো।

ববফ গলছে দেখে আমিরুদ্দির আশা বাড়ল। নিজেব অবস্থাব বের্গতিকটা আরেকটু ভালো করে বুঝাতে যেয়ে গলায় আকুতি এনে কি একটা বলতে যেতেই আলম সাহেব পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতব চলে গেলেন। অগত্যা আমিরুদ্দিকে উঠতে হল।

দেড় হাজারের জন্যে আমিরুদ্দি যখন পাগলেব মত হন্যে, শামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তখনই, এই দিন সাতেক আগে। শামাদ লোকটার নামধাম অনেক, কিন্তু সেটা সুখা হাতে নয় মোটেই। তাবৎ বদকর্ম নাকি সামাদের হাতের মুঠোয়। জবর দখল কলোনিতে আসার পর থেকেই আমিরুদ্দি এসব কথা শুনে আসছিল এই অদেখা শামাদের নামে। মাঝখানে কতদিন নিরুদ্দেশ কাটিয়ে হঠাৎ ফের কোত্থেকে উড়ে এলো যেন। কেমন এক রহস্যময় চরিত্র। সর্বক্ষণ একটা ধান্ধা ধান্ধা ভাব। আমিরুদ্দি এড়িয়ে চলত এতদিন, কিন্তু হঠাৎ একদিন গায়ে পড়েই আলাপে এগিয়ে এল শামাদ। এই শামাদই চকিতে দেড়-দুহাজারের অতি কাঙ্খিত প্রস্তাব পাড়ল আমিরুদ্দিকে। (সম্ভবত জেনে থাকতে পারে যে এই আমিরুদ্দি নামক লোকটার ঠিক দেড়-দুহাজারেরই চরম প্রয়োজন।) উটকো সন্দেহজনক মানুষের উটকো প্রস্তাবে আমিরুদ্দি ভর করতে পারছিল না। কিন্তু পেছনে ভূত তাড়া করলে সব হয়। নাস্তিক আস্তিক হয়, নেতা মন্ত্রীরা যেমন ভোট এলে খালি পায়ে গ্রাম ঘোরে। আমিরুদ্দি তো সেখানে ছার। যেতেই হলো শামাদের আকর্ষণে। 'কি কাজটা বলেছিলে,' আমিরুদ্দির এই বিনীত প্রশ্নে বিকালবেলা চায়ের দোকানের বেঞ্চে পায়ে পা তুলে

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল শামাদ। অবিকল আলম সাহেবের মত।

তোমার কেসের দিনটা যেন কবে?

বিস্ময় আর সন্দেহেব জটিল রেখা ফুটল আমিরুদ্দির মুখমণ্ডলে। লোকটা সত্যিকারের ঘোড়েল।

তাব জিজ্ঞাসাকে অবহেলায় ঠেলে উল্টে তাকেই এমনভাবে প্রশ্ন করছে যে আমিরুদ্দি নিজেই ভাবতে পারছে না এটাই তাদেব প্রথম সাক্ষাতের প্রথম সংলাপ। তাছাড়া এমন বিষয়ে তার জিজ্ঞাসা যেটা শুধু আমিরুদ্দি, আলম সাহেব ও সেই তৃতীয় বিশ্বস্ত লোকটি ছাড়া সবার কাছে গোপনী ় হবার কথা। অন্তত আমিরুদ্দির ধাবণায় তা ছিল।

শুক্রবার... মিয়ানো দাযসারা প্রত্যুত্তবে পাশ কাটাতে চাইল আমিরুদ্দি। লোকটার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে তাব একদম ইচ্ছে কবছেনা। প্রাসঙ্গিক কথা শেষ কবে চটপট উঠে যাওযা ভাল। ...কাজটা কি, ডাকলে তখন?

আলম সাহেব কত খাবেন?

'মানে?' শালা ছিনে জোঁক। বিরক্তি পবিষ্কার হযে উঠল আমিরুদ্দিব চোখে মুখে।

হো হো করে হাসতে শুরু করল শামাদ। পাক্কা শযতানের মত। দোকানিকে দু কাপ চাযের অর্ডার লাগিয়ে বলল, আবেকটু রেট করলে আরো সস্তা হতো।

বেট!

'ভাইজান, একটু ব্যবসা শেখো।'

চা এলো।

'নাও—' তার দিকে ঠেলে দিল গ্লাসটা। মোহাবিষ্টেব মত আমিরুদ্দি গ্লাস তুলল হাতে। অজান্তেই যেন লোকটা তাকে আয়ত্তে বেঁধে নিযেছে। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগল আমিরুদ্দি।

শামাদ চটুল শব্দে।

'দ্যাখো ভাইসাব, আমি এখন যা-যা বলব খুব জরুবী। আখেবে তোমাব লাভেব কথা—খাঁটি ব্যবসার কথা। সুতরাং চাবকান না হবাব কথাটা খেযাল বাখবে।

লোকটা কি তার সাথে ঠাট্টা করছে। 'চাবকান' না হবাব কথাটা কি নিজেই লোকটা বিশ্বাস করে। এই তো একমুহূর্ত আগেই আমিরুদ্দি একান্ত গোপন বলে যা পুষে বেখেছিল নিজের মধ্যে কেমন ঠাট্টামি কবার মত হড় হড কবে বলে দিল লোকটা।

'চল, বাইবে হাঁটি—' চাযেব দাম চুকিযে দোকানেব দাওয়া থেকে নামল শামাদ। পেছনে আমিরুদ্দি।

হেঁটে চলল দুজনে। কলোনীব পশ্চিমদিক ধরে সূর্য নামছে। শীতের বিকালে পাকা মাকুন্দার বঙ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। দুজনে হেঁটে এলো গোরস্থান পর্যন্ত।

'তুমি নিশ্চয় জানো আমাব সম্বন্ধে?'

'কী জানব?' বোকা হবার ভান করল আমিরুদ্দি।

হালকা হাসল শামাদ, 'এই আমার কাজকাম, গতিবিধি। চলন ধরণ, আর এসব সত্যি কথা, আমি অন্ধকারের মানুষ।

বদসাহস কি লোকটার মজ্জায়, বেপরোয়ার মত নিজের বদকর্মে যেন ওম পোহায় শালা। তবু সহজ হবার কঠিন হাসি হাসতে চেষ্টা করল আমিরুদ্দি—না না, কি যে বলো—

হাত তুলে থামাল তাকে শামাদ, 'আসলে গুনাহ্ টুনাহ্ আলো অন্ধকারের ধার আমি থোরাই ধারি, বেঁচে থাকাটা আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী, হাতমে মাল তো দুনিয়া কামাল।'

নীববতা মানা ছাড়া আমিরুদ্দি নিজের কর্তব্য বুঝতে পারছিল না।

'আমি এখানে একটা ব্যবসা চালু কবছি... একটু অন্যরকম, তোমাকে তাই ডাকলাম, তোমার এখন ঠেকা। কাজে হাত দিলে মাল কামাবে, আবার একটা সিগারেট ধবাল শামাদ, আমিরুদ্দিকে দিল একটা। লম্বা শ্বাসে ধোঁয়া উড়িযে বলল, পার কেস হাজার কি তারও ওপব, তিবিশ তোমাব সত্তর আমাব।

কি কাজ কি ব্যবসা কিছুই বুঝতে পারছে না আমিরুদ্দি। তাব মতামতের কোন প্রযোজনও ভাবছে না। একতবফাই যেন মোক্ষম চুক্তি স্বাক্ষবিত হ্যে যাচ্ছে এই অদম্য লোকটার কথায় কথায়।

কিসেব ব্যবসা...

'মানুষেব হাডগোড় কংকাল, এসবেব...

'কংকাল...!' আর্তনাদেব মত শব্দ তুলে ফাঁক হয়ে গেল আমিরুদ্দিব মুখ। শালা কি সাক্ষাৎ দোজখ থেকে উঠে এসেছে?

একটু বিস্কি ব্যবসা, কারণ তো বুঝতেই পারছ, বেআইনী, তবে ইনকাম ভাল, ক্যাপিটেলেব দবকার নেই, শুধু মাল সাপ্লাই বাখতে হবে সবসময, গোটা কংকাল হলে বেট বেশি।

এতটা পডিয়ে নেবাব পবও গর্দভ ছাত্রেব মত আমিরুদ্দি জিজ্ঞেস কবে, 'কংকালেও ব্যবসা হয?'

হয়... গলায আমিরুদ্দিব মতই সুব ফুটিয়ে বিদ্রুপ কবে শামাদ, বিরক্তি মুখে প্রকট। বলে, এসব এখানে নতুন, পশ্চিম বাংলাব দিকে এসব জলভাত, বস্তায প্যাকিং হয়ে মাল যাবে বাংলাদেশ ওখান থেকে লণ্ডন আমেবিকা জাপান সব বড় বড় দেশে। ওসব জাযগায মেডিকেল পড়ুযা সাহেববা এক্সপেরিমেণ্ট কবে, তাই গবীব দেশ থেকে খবিদ কবে ওবা। আগে আমাদের দেশে এসব সবকাবি সাপ্লাই হতো, গবমেণ্ট এখন বেআইনী কবে দিয়েছে এ ব্যবসা। বনগাঁ থাকতে এ ব্যাবসায় ছিলাম।

গড়গড় কংকাল ব্যবসার ইতিহাস শোনায শামাদ। আমিরুদ্দি তাক লেগে শোনে। শীত শীত করে শরীর। অসাড়েই কখন দিন পাটে চলে যায়। তিল তিল অন্ধকাব নামে পৃথিবীতে। গোরস্থানের গাছে গাছে নিশাচর পাখিদের ওড়াওড়ি শুরু হয। জড়বৎ আমিরুদ্দি আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক অলৌকিক মানুষের মুখে শোনে আলৌকিক কাহিনী।

পাগলা কুকুরে কাটা এরচেয়ে ঢের ভালো। আমিরুদ্দিব এখন যেমন অবস্থা, শক্ত কটকটে খাবারের একটা ঢেলা বুকে আটকালে যেমন হয়। না যায় ওগরানো, না যায় গেলা। হাঁদা বউ পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছে। শরীর একদম ঝরে গেছে। চোখ

গর্তে, চোয়াল আরো নেমে এসেছে বুকের ওপর।

আগাম টাকা পাঁচশ নেবার পর থেকেই শামাদ তার মাথায় পুরোপুরি ভর করেছে। নাছোড় জিন যেমন। কাজের তাগাদা নিয়ে এখন ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করছে তার। ওপারের পার্টি নাকি শ্বাস ছাড়তে দিচ্ছে না। দুদিনের মধ্যে মাল নামাতে হবে। শক্ত চোয়ালে শামাদ গত রাতে বলে গেছে একথা।

কিন্তু আমিরুদ্দি তো বউকে পেটানো, সুযোগে আনমনা সহযাত্রীর মাল সরানো, আর শহর থেকে হাওয়া খেতে আসা রিকসা সওয়ারী বাবু-দিদিদের বেলেল্লাপনার ট্যাকসো ধরা ছাড়া আর বড় কোন বদসাহসী কাজের সাহসের সঞ্চয় করতে পারেনি। সেখানে শামাদের মত ভয়ঙ্কর মানুষের ভয়ঙ্কর কাজের সঙ্গী হওয়ার তেমন বুকের পাটা তো আব্বাজান দিয়ে যেতে পারেনি।

খক খক কাশি ওঠে। বিড়িটা আজকাল বেড়েছে মারাত্মক। প্যাকাসের পাতার ফোঁকরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। নদীর ওপর কুয়াশা ভারি পর্দার মত। এখন আর ওপারটা দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু পরই সূর্য উঠবে। শালা শামাদের মানুষগুলোর যে কি হলো? উটকো একটা নোটিশ আজ তাকে কত ঘাটের জল যে খাইয়ে ছাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল আমিরুদ্দি, একটা কিছু এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শামাদের সঙ্গে ধান আর ঘুঘুর খেলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতম হওয়া উচিত। ওদিকে শুনানীর দিন এগোচ্ছে দাঁত খিঁচানো কুকুরের মত। আলম সাহেবের সময় তারও আগে, নাকের ডগায়। এক দু'দিন দেরি হয়ে গেলে শেষটায় হয়ত বলে দিতে পারেন, 'না হে, তোমার বড় দেরি হয়ে গেল।' এদের মর্জিতো হাতের ধরানো বিড়ির মত। চুমুক ছাড়লেই ব্যস। এত পথ ইঁদুরের মত দৌড়ের শেষে মাথা চাপড়ে কাঁদবারও জো থাকবে না।

মধ্যরাতে তাই আব্বাজান বদ্দিরুদ্দিকে গোর থেকে টেনে তুলল আমিরুদ্দি। এক পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার মত। মাটির তলায় সাত বছর ফেরারী জীবন কাটিয়ে আব্বাজান এখন শুধু হাড়ের কাঠামো।

তোমার যে ঠিক এই অবস্থাটাই আমার চাই আব্বা। অন্তত জীবনে একটিবার তুমি গ্রেপ্তার স্বীকার করো। অন্তত একবার আমাকে পৃথিবীতে কষ্ট দিতে আনার কষ্ট তুমি ভোগ করে দেখো। সেই ছোট বেলায় অভুক্ত পেটে চায়ের দোকানে খাটতে পাঠানো থেকে আজকের এই নোটিশ তাড়া করা জীবনের স্বাদ একবার ভোগ করে দেখো। আমার হৃদ-আদালতে তুমি যে গুরুতর অপরাধী আব্বা। তোমার শাস্তি হোক। তাই তোমাকে মরণোত্তর দীপান্তরে পাঠাচ্ছি। তুমি যাও, এই দেশ, কাল বীর্য জাত সন্তান-পৌত্রের মায়া ছাড়িয়ে—বিভূঁই দীপান্তরে সেই স্বপ্নেও অদেখা লণ্ডন, আমেরিকা, জাপানে যাও... তোমার মরণ পূর্ব-জীবনের এই চরম শাস্তি হোক...

হু-হু করে বুক ভাঙ্গা কান্না আসে আমিরুদ্দির—এক অসহায় জান্তব কান্না। তার কান্নার এই গমকে দু'হাতের পাঁজায় আব্বাজানও যেন হাড়ে হিল হিলে শব্দ তুলে কাঁদে। সাতবছর লোকোত্তর জীবনের পর পুত্রের যন্ত্রণার সমব্যাথী হয়।

কে যেন গুমড়ে ওঠে পেছনে। চমকে ঘাড় ফেরাতেই আমিরুদ্দি বোবা। বস্তায় নিজের মোড়কে বসে তার দিকে অপবাধী দৃষ্টিতে বিহ্বল। অবিকল আগের মত

ভাঙ্গা চোয়াল, গর্তে বসা চোখ, ছোট করে ছাঁটা চুল আর শাদা দাঁড়িতে জন্মদাতা আব্বাজান আবার জীবন্ত।

দায়িত্বজ্ঞানহীন জন্মদাতা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার আগে একটিবারও যে তার জন্যে একটি সার্টিফিকেট তৈরী রাখার কথা মনে করল না, শুধু অন্ধকামে তাড়িত হয়ে গেল—যার জন্যে পুঞ্জিত হয়েছিল আপন ঔরসজাতের একরাশ মোক্ষম কৈফিয়ত, ঘৃণা, ক্ষোভ আর বুক উজার করা ধিক্কার, এখন তা একদমকা হু-হু করা কান্না হয়ে বেরিয়ে এলো শুধু। সবেগে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আব্বার বুকে।

অনুতাপে প্রত্যুত্তর দিতে পারল না আব্বাজান। ঘড় ড় ড় ড় শব্দে কঁকিয়ে মাটিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। সব দায় সব গ্লানি মাথায় তুলে নিয়ে দ্বিতীয়বার এবং শেষ বারের মত শুয়ে পড়ল। পাঁশুটে মুখ, শাদা চুল, শাদা দাড়ি চকিতে বিলীন হলো আবার। পড়ে রইল বস্তাবন্দি হাড়ের কাঠাম।

দূরে, নদী পারে নৌকা থামার শব্দে সজাগ হলো আমিরুদ্দি। কারা যেন লাফ দিয়ে নামল পাড়ে।

দেবরাজ ভট্টাচার্য

ঝিনুক ফেটে মুক্তো এবার

রাতে ঝিনুকের ঘুম আসে না কিছুতেই। ক'রাত ধরেই এই ব্যমো। এলোমেলো ভাবনায় কেটে যায় সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা। তারপর ভোররাতে বিছানা ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে সূর্য ওঠা অব্দি। বোজকার মতো আজও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে দখিনা বারান্দায়। পাশেই মা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল হাত-পা ছড়িয়ে। মা জানতে পাবলে বকুনি দেবে। তাই চুপিচুপি বাইরে এসে দোর ভেজিয়ে দিয়েছে। বাইরে আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা। ভোর ভোব বাত এখন, কাক ডাকার সময হয়নি। পাতলা অন্ধকাব ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে সবখানে। নীরব নিঃস্তব্ধ আশ পাশ মাটি আকাশ। সবাই রঙ হাবিযে আধার কালো, কাবো শরীব দেখা যায না স্পষ্ট। গাঢনীল আকাশ হলুদ ধানক্ষেত, সবুজ গাছগাছালি,—সবকিছুর ওপর পাতলা পরত ঢেকে বেখেছে তাদেব নিজস্ব সমুদ্রে। ঠাণ্ডাবাতাস শুধু আলতো হাত বুলায় সারা গাযে। একটা ভাললাগার আবেশ ছড়ায় দেহে, মনে। ডাইনে-বায়ে আলসে চোখ বুলায় ঝিনুক। অন্ধকারের মসৃণ গায়ে বাধা পেয়ে দৃষ্টি ফিরে আসে নিজের কাছেই আবার। তাই একসময আবছা আকাশেব দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সে।

কদিন ধরেই কেমন যেন অন্যরকম লাগছে সবকিছু। অসময়ে ঠোঁট কাঁপে থরথর, স্বত্বা জুড়ে শাদা ধোঁযা স্বপ্নেব মতো। মাথার মধ্যে রিমঝিম আব বুকের ভিতর স্বরগম। হৃদপিণ্ডে সুখসুখ অনুভূতি সারাদিন সারারাত এই তো সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম-বার বুক কেঁপে উঠেছিল পায়রা নরম আতঙ্কে। ভীষণ অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। এমা, কি লজ্জা, কি লজ্জা! কি হবে এখন। শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিল দু'হাতে মুখ ঢেকে। কান্না শুনে মা ছুটে এসেছিল। সব দেখে কিন্তু মা একটুও ভয় পায়নি। মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেছিল, 'ও কিছু না, এরকম হযই।' আর তখনই একবাশ লজ্জা জড়িযে ধবেছিল তাব মুখ-বুক-নাভী-নিতম্ব। তাই মার কাছ থেকে পালিযে এসে আড়াল খুঁজেছিল সেদিন। মাখনের মতো নরম মুখে আবীরের বঙ ছড়ায এই প্রথমবাব, মাংসল বুকের কালো বোটায় চিনচিন ব্যথা, গোল নাভীতে মাকডসা চক্কর খায় বেসামাল, আর ঊরুসন্ধি জুড়ে শুধু লজ্জা, লজ্জা আর লজ্জা। ঠিক তখন থেকেই ভাললাগার শিথিল শিহরণ মুখ-বুক-শরীর বেয়ে।

দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। বিনুদেব বাড়ির মোরগের ডাকে চমক ভাঙ্গে ঝিনুকেব। চাবদিকে তাকায় সচেতন দৃষ্টি নিয়ে। ঈশান কোণে ঘন সবুজ পাতার খোপে খোপে সাজানো গন্ধরাজ গন্ধ বিলোয অমায়িক। দাওয়ার কাছেই মালঞ্চ রঙ ছড়ায় চারদিকে। ডান দিকের চাঁপা গাছ থেকে ভেসে আসছে মন মাতানো মিষ্টি গন্ধ। উঠোনের একপাশে শিউলি গাছের পায়ের কাছে অনন্তশয্যায় শুয়ে আছে শিউলি ফুল, আর নিস্পাপ হাসছে সমবেত। পুবের কাঁঠাল গাছে জোড়াশালিকের ঘুম ভেঙ্গেছে। ওদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়বে জোরকদমে জোড়শালিক, আর ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসবে খাবার নিয়ে গোধুলিবেলায়। পুবের আকাশে রক্তলাল বর্ণছটা,—চিরন্তন সূর্যোদয় এবার, তবু চিরনতুন, চিরবিস্ময়। মনে হয় এমন করে দেখা হয়নি কখনও। বনস্পতির মগডালে সোনালী সূর্যালোক এলোমেলো খেলা করে অবুঝ শিশুব মতো। পাখীদের প্রভাতী কলকাকলি মনের মধ্যে স্বপ্নীল সুব ছড়ায়। বড় ভাল লাগে তাব। তারিয়ে তারিয়ে নিংড়ে নেয় এই উষালগ্নের রূপ-রস-স্বাদ গন্ধ। কিন্তু না, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মা জেগে উঠবে এবাব। ত্রস্ত হাতে ঠাকুরঘব থেকে সাঁজি এনে শিউলিতলায় ফুল কুড়োয় ঝিনুক। কচিকচি দুর্বাঘাসের নরম বুকেব উপর শুযে আছে মুক্তোর মতো শিউলি। খুব সতর্কতায ফুলের গায়ে হাত বুলায় সে, যেন একটার গায়েও কোন আঁচড না লাগে। কি সুন্দব হাসি ফুলগুলোব। মালা গাঁথবে সে, শিউলির মালা,—মুক্তোর মালা।

বারান্দায় দাঁডিয়ে মা দেখছে খুকুব অবাক কাণ্ড। এমন কবে ফুল কুডোতে দেখেনি কখনও। মডাব মতো ঘুমোত হাত-পা ছডিযে অনেক বেলা অব্দি। আব ঘুম থেকে উঠেই অকাবণ চেঁচামেচি, উল্টোপাল্টা বায়না, পডাশুনাব নাম নেই, কাজকর্ম্মের বালাই নেই। গাযে বিটকেল গন্ধ আর মুখে আটপল মযলা নিযে চরকিব মতো ঘুরত এপাড়া-ওপাডা সব পাড়া। কাপড জামাব ছিবিছাদ ভিখিরিব মতো। দিন রাত দুষ্টুমি আর দস্যিপনায অতিষ্ট কবত সবাইকে। কিন্তু কদিন থেকেই কেমন শান্ত হয়ে গেছে মেযেটা, বদলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ছিমছাম বেশবাস, মার্জিত চলন বলন, আব ফিসফিস লজ্জা এখন সাবা গাযে। এভাবেই পাল্টে যায সবাই সমযেব সাথে তাল মিলিযে। মাযেব কোন ভাবনা হযনা বা কোন দুশ্চিন্তা, শুধু দুচোখ দিয়ে জরিপ করে মেযেব দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা। সময এগোচ্ছে, বেলা বাডছে। ঝিনুক আর ঝিনুক কুডোতে যাবে না গোমতীব বালুচরে, বালিযাডী পেবিযে মুক্তো খুঁজতেও যাবে না। দলবেঁধে হৈ হৈ কববে না বেপাডায বাস্তায বা ফুলবাগানে, কোঁচডে ভরা আম নিযে ঝগডা করবে না ছেলেবন্ধুব সাথে। পাগল-কাকাকে ভেংচাবে না আব, বেলা-অবেলায দৌড়ঝাঁপ কববে না বনেবাদাডে। একবাশ অচেনা সঙ্কোচ, লজ্জা, জডতা একযোগে জড়িযে ধবে অক্টোপাসেব মতো। কিছুতেই আগেব মত সহজ হতে পাবেনা। কথা বলতে ঠোঁট কাঁপে, চোখের কোণে যাদুকবী খেলা। হাঁটাব সময কোমব দোলে অপরূপ ছন্দে, বুক কাঁপে এপাশ-ওপাশ, আব মনেব মধ্যে সুব-তান-লয়ের মীড়-গমক মূর্চ্ছনা।

আজ ছুটিব দিন, সময কাটেনা কিছুতেই। খাওযা-দাওযা সেবে মা মহাভারত নিযে বসেছে। ঝিনুকের হাতে এখন কাজ নেই। তাই দক্ষিণ বাবান্দায মাদুব বিছিযে শুয়ে পড়ে। বাইবে কাঠফাটা রোদ্দুর, আব দামাল হাওযাব বেসামাল জডাজডি। বেশ লাগে এই রোদ-হাওযাব মেজাজী মিশ্রণ। গাছেব ডাল নুইয়ে পড়ে বারবার, ফুলগুলো ছিটকে বেবিযে যেতে চাইছে বৃন্ত ছিঁড়ে দিগন্তে। ঘননীল আকাশে একটা চিল চক্কর খাচ্ছে বারবার। কাঁঠাল গাছে একটা হলুদপাখী এসে বসেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আচমকা ডেকে উঠল, 'বৌ-কথা কও'। কি অসভ্য পাখীটা! বৌ নাকি সে? বৌ তো তার মা। কিন্তু পাখীটা বেহাযাব মতো আবার ডেকে উঠল, 'বৌ কথা কও'। লজ্জা পায ঝিনুক আর ভয হয়, কেউ যদি শুনে ফেলে? পাখীটাকে

তাড়াতেই হবে। হাত দিয়ে ঢিল ছোড়ার ভঙ্গি করে সে, 'যা যা পাখী কানা বৈরাগী, দুর, যা পাখী কানা বৈরাগী।' সুড়ুৎ করে উড়ে যায় হলুদপাখী। আর তখনই আয়নায় মুখ দেখার ইচ্ছে হয় তার। ঘর থেকে আয়না এনে অপলক চেয়ে থাকে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে, জরিপ করে মুখ চোখ ঠোঁট চিবুক আলতো হাত বুলায় গালে, ঠোঁটে। আর ফর্সা চিবুকের ডগায় ছোট্ট তিলটার দিকে চেয়েই থাকে অনেকক্ষণ। কাল বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে পাশ থেকে একটা ছেলে বলেছিল, 'বা, ভারী সুন্দর ঐ তিলটা!' কি অসভ্য ছেলেটা, তবু ভাল লেগেছিল ওর কথা। তিলটা কি সত্যিই সুন্দর? কাঁঠাল গাছের সেই ডালে চোখ ফেরায় ঝিনুক, হলুদপাখী আসেনি আর। ওকে না তাড়ালেই হতো। হলোই বা একটু বেহায়া—একটু অসভ্য,—ঝিনুকের গায়ে তো আর আঁচড় কাটেনি।

বেলা বয়ে যায়। একটু পরেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসবে সোনালী বিকেল। ঐ পশ্চিম দিগন্ত থেকে ভেসে আসবে বিদায়ী সুর। হাত-মুখ ধুয়ে নিলেই দুপুরের আলসে ভাবটা কেটে যাবে। তারপর একটু সেজেগুজে বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকবে ঝিনুক,—আর মেজাজী দৃষ্টি নিয়ে দেখবে রাস্তাঘাট, লোকজন, দলবাঁধা ছেলেমেয়ে, আলো, গাড়ী, টুংটাং আওয়াজ। বেশ লাগে এসব। ডানপিটে ভাবটা ভাল লাগে না আর। হট্টগোলের মধ্যমণি হতে চায় না সে, দূর থেকেই ভাল লাগে গুঞ্জন, কোলাহল। ঝিনুক এবার বদলে যাবে। ঝিনুক আর ঝিনুক কুড়োবে না, ঝিনুক আর মুক্তো খুঁজবে না। লাভার মতো গরম বালিয়াড়ীর নোংরা পায়ের তলায় হেলাফেলায় পড়েই ছিল ঝিনুক কাদামাটি গায়ে মেখে। কেউ খোঁজ করেনি, নরম হাতের গোপন পরশ বুলায়নি কেউ এতদিন। সবার দৃষ্টি অন্যখানে, অন্যকোন সবুজ প্রান্তরের রূপালী বুকের মধ্যেই আটকে ছিল। আর এবার ঝিনুকের ঢাকনা একটু ফাঁক হতেই ঝলমলে মুক্তোর চিকমিক রোশনি। ঢাকনা পুরো খুলে গেলেই দৃশ্যপট বদলে যাবে সম্পূর্ণ, মুক্তোর মোহিনী মায়া কাজ করবে যাদুকরী। গরম হাওয়া নরম হবে, বালিয়াড়ী বদলে যাবে। রুক্ষতায় পালিশ পড়বে, মাথা উঁচিয়ে সবুজ আসবে। তাই ঝিনুক আর ঝিনুক কুড়োবে না। ঝিনুক এবার গান গাইবে, সুর খুঁজবে, মালা গাঁথবে।

দীপঙ্কর কর

হুমকির পরে

অভ্রের হাতে চিঠিটি দিয়ে সুজাতা বললো, দেখতো কে দিয়েছে, টাইটেলটা ভুল করেছে; অবশ্য নতুন পিওন ঠিক পৌঁছে দিয়েছে 'ঠিক পৌঁছে দিয়েছে' বলার সময় ওর মুখে এমন একটা অস্ফুট হাসি—অভ্র লক্ষ্য করে, ফলে ঠোঁটে সামান্য ভাঁজ, ডান গালে টোলের আলতো আভাস, যার মধ্যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনার প্রতি একটা স্থির প্রত্যয়, নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রতি আস্থাও থাকে এবং সেই হাসি মুখমণ্ডলে সকালের নরম রোদের মত ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়লে সুজাতা সরাসরি তার পটলচেরা চোখ দুটি নিয়ে, চিরাচরিত এই উপমাটা দেওয়া যায়; এমনভাবে অভ্রের দিকে তাকায় যেখানে খানিক ভৎর্সনা, করুণা এবং সামান্য আপশোসও মেঘরৌদ্রের মত সহাবস্থান করছে। দেখলে, পাঁচটি টাকা পিওনকে দিলে কী হয়? চিঠি মিস্ হবে না, নাম ঠিকানা ভুল থাকলেও ঠিক পৌঁছে দেবে। আর এই পাঁচটি টাকা পিওনকে দেওয়া নিয়ে কী হ্যাংলামিই না তুমি করলে; দেখলে কী ইমপ্র্যাকটিক্যাল তুমি —এসব কথা সুজাতার দু চোখে ভাসছে, ডুবছে, খেলা করছে অভ্র দ্বিধাহীন বুঝতে পারে।

আসলে অভ্রর যুক্তি সাদামাটা। চিঠি সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া পিওনের কাজ, ডিউটি; আর এজন্য অভ্র দাসগুপ্ত সরকারি আপিসেব আপার ডিভিশন ক্লার্ক, নিপাট ভালোমানুষ, ভদ্রলোক, আপিসের লোকজন, আত্মীয়স্বজন মায় পাড়ার লোকেরা, যারা তাকে চেনে, তার এই পরিচয় একবাক্যে স্বীকার করে নেবে এ সম্পর্কে অভ্রের তেমন একটা সংশয়ও নেই, সে নতুন পিওন গনেশকে, সুজাতার কাছেই নামটা জেনেছে, কেন খামোকা পাঁচ টাকা 'তুমি চা-সিগ্রেট খেয়ে নিও' অছিলায় ঘুষ দিতে যাবে?

সেই নীলবর্ণ ইনল্যাণ্ডলেটারটি বা চিঠিটি অভ্র খুলতে যাবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে তিন্নি পড়ার মধ্যেই 'বাবা আমার জিনিসটা এনেছো' বলে চেঁচিয়ে ওঠে এবং এতে সুজাতার মুখে ভাবান্তর হওয়া, মেয়েকে শাসাবার জন্য পাশের ঘরে যাওয়ার উদ্যোগ, অভ্রের 'আহা, থাক না' গোছের চাউনিকে উপেক্ষা করে সুজাতার সশব্দ পাশের ঘরে প্রস্থানে সে অবধারিতভাবে চিঠি পড়ার মুড হারিয়ে ফেলে।

চিঠি পড়ার জন্যও প্রস্তুত হতে হয় অভ্রকে। চিঠি পেলাম, পড়লাম, ফেলে রেখে দিলাম এমন তার ধাতে সয় না বরং ধীরে সুস্থে গভীর মনোযোগ দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রয়োজনীয় বা ভাল লেগে যাওয়া লাইনগুলি দুবার, তিনবার পড়ে; অবশ্যই এটা বাড়াবাড়ি মনে করে সুজাতা; তাই, 'চিঠি মুখস্থ কর নাকি'—এমন খোঁচা দিতেও ছাড়েনি অভ্রকে, যা স্বাভাব অনুযায়ী অভ্র আলতো করে ময়লা ঝাড়ার মত সহজে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছে, আর সেজন্যেই চিঠি পড়ার ষ্টাইল তার পাল্টায়নি। মুড হারিয়ে ফেলার জন্য চিঠি খুললো না অভ্র, ঠিকানাটার দিকে চেয়ে

রইল। পদবীটা ভুল করেছে, দাশগুপ্তের জায়গায় লিখেছে দত্ত—কার হাতের লেখা, একটা খেলার ছলেই যেন সে তার পরিচিত হস্তাক্ষরগুলি মনের পর্দায় এক এক করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল, বাতিল করতে লাগল, ফুটিয়ে তুলতে লাগল বাতিল করতে লাগল—নাহ এই হ্যাণ্ডরাইটিং তার পরিচিত নয়।

২

সু—এই শব্দটিই এত অস্থির, বিকৃত, ঠিক চিৎকার নয়, সামান্য জোরে অভ্র উচ্চারণ করার ফলে তাব স্ত্রী, হাইস্কুলের শিক্ষিকা, স্বাভাবিকভাবে চলনে বলনে একটা মাষ্টারানি গোছের ভাব, সুজাতা প্রায় ছি˚কে আসায় তাব পরনের ম্যাক্সিতে একটা ছন্দহীন দোলা লাগে এবং কী হয়েছে ে˚" বলার মধ্যে স্বাভাবিকতা থাকে না। সে দেখে অভ্র ইজিচেয়ারে প্রায় গা এলিযে দিয়েছে, মুখমণ্ডল পাংশু, বিবর্ণ তাকে ঘিরে ভস্মের আবরণ পরতের পর পবত জমছে। স্তব্ধ অভ্র চোখের ইসারায় টেবিলের ওপব ডানা ছড়িয়ে পড়ে থাকা সদ্য উন্মুক্ত সেই ইনল্যাণ্ডলেটারটিকে এমনভাবে দেখায়, যেন চিঠি নয়, সমুদ্যত মৃত্যু তার ক্রূর পেশল দুহাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে। চিঠিটি পড়ে তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্তব্ধ, বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সুজাতা, হওয়াবই কথা, ধারণাতীত দুটো বাক্যমাত্র 'কুত্তার বাচ্চা তোকে খুন করা হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না'—তার কণ্ঠনালী পিষে ফেলাব পক্ষে যথেষ্ঠ, তাই বিহ্বল, শুধু দুচোখ বিস্ফারিত কবে সে অভ্রের দিকে চেয়ে থাকে, মস্তিষ্ক বিলকুল ফাঁকা, যেন খটখটে করোটি, ফাঁকফোঁকব দিয়ে ধূ ধূ হাওয়া ছুটোছুটি কবছে।

ঘরের এই সরীসৃপ শীতলতা ভেঙে তিন্নির 'বাবা'—অভ্রকে কী একটা বলতে এসে থমকে দাঁড়ায়, কেননা এইটুকু মেয়ে তার সহজাত বুদ্ধিতেই অশুভ কিছুর গন্ধ নির্ভুল চিনে নিতে পাবে' ফলে শঙ্কাতুর ভীরু উচ্চাবণে সে বলে 'মা কী হয়েছ গো?' কিন্তু এহেন স্বাভাবিক প্রশ্নে, সুজাতা অভ্রের সাজানো সংসার যেন থবথর কেঁপে ওঠে। অভ্র মেয়ের হাত ধরে ডুবন্ত তরীকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, তার হাত মেয়ের কোমল হাতে কিছুটা বেমক্কা চাপই দিয়ে ফেলেছে বোধ হয়; কেননা, তিন্নি 'বাবা লাগছে' বলে কঁকিয়ে ওঠে এবং চাপা শব্দে কেঁদে ফেলে, আসলে হাতেব ব্যথায় নয়, স্পষ্ট বিপদের গন্ধ, ভাঙনের গন্ধ, ওদের একমাত্র সন্তানটি পাচ্ছে। কিন্তু তা মুহূর্ত মাত্র, সুজাতা সম্বিৎ ফিবে পেয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে, মেয়ের প্রতি তাই শাসনের একটু সুর থাকে, পড়তে পডতে উঠে এলে কেন? কী হবে? কিছুই হয়নি। হোম টাস্ক করেছো, পড়া শেখা হয়েছে—এই সমস্ত টানা প্রশ্নে তিন্নি এই অচেনা রেশ কাটিয়ে উঠতে না পারায় অদ্ভুত চাউনিতে মাকে লক্ষ্য কবে শুধু ঘাড় নেড়ে যায়। নিজেকেই আরো সামলে নিতে সুজাতা 'খাবে এসো' বলে রান্না ঘরের দিকে যায়। পেছনে অতি বাধ্য পোষা বেড়াল ছানার মত

অভ্র যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি বসে থাকে, যদিও প্রাথমিক ঝাঁকুনি সে কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু চিঠিটি দ্বিতীয়বাব পডার সাহস তাব নেই, শুধু আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা, ফলে অসংলগ্ন কত দৃশ্যপট, সংলাপ যে ভেতরে ভেতবে পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে এগিয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে, যার লাগাম তার হাতে নেই। তাই 'খেতে

এসো, রাত অনেক হলো,' সুজাতার কথা সে প্রথমে শুনতেই পায় না; সামান্য চাপ দিয়ে কেটে কেটে সুজাতাকে আবারও বলতে হয়— কী হল, খাবে না? অভ্রের শরীরের রোমগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘামছে সে, হাতের চেটো দিয়ে গালের ঘাম মুছতে মুছতে অভ্র বলে 'না' এবং 'না' শব্দটি এত স্পষ্ট বেসুবো উচ্চারণ করায় সুজাতা, 'কেন খাবে না, এত ঘাবড়ালে চলে নাকি? আমার তো মনে হয় পিওন ভুল করে দিয়ে গেছে; তুমি তো কারো ক্ষতি করনি'—এই সমস্ত বাক্য আলগা আলগাভাবে বলতে থাকায় অভ্র খাবার টেবিলে এসে বসে, মুখোমুখি সুজাতা। খেতে বসে, বলা ভাল থালায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে সুজাতা বলে, 'তুমি কলেজে পড়ার সময় কোন একটা বামপন্থী সংগঠনে ছিলে বলেছিলে না?'

অভ্র স্মৃতির অতলে ডুব দিযে বলে, ও, সে তো সেই কবে! দুবছর সংগঠনে ছিলাম রাতুলের পাল্লায় পড়ে। এরপরই বিলম্বিত শ্বাস ফেলে সে বলে—জানো, বাতুল ছাত্র সংগঠন ছেড়েছুড়ে দিযে বেরিযে আসার পর একদিন পুলিশের সঙ্গে সেই যে গেল আর ফিরে এল না।

— তোমার বিশেষ বন্ধু ছিল? কই কোন দিন বলনি তো।

— না বন্ধু নয়, একই পাড়ায় আমবা থাকতাম।

— পরে আর কোনদিন রাজনীতি বা ইউনিযন টিউনিযন কবোনি।

— উহুঁ।

— নিশ্চয় করেছো। আমার কাছে লুকোচ্ছ তুমি।

— না, এর মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই।

সুজাতা অভ্রকে পর্যবেক্ষণ করে, খুঁটিযে খুঁটিযে, বলে, আমাব বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে।

— বিশ্বাস না করলে আমার কী করার আছে, ঈষৎ কর্কশ গলায় হাল ছেড়ে বলে অভ্র।

— তা অবশ্য ঠিক, তোমার আব কী করার আছে? ঝড় ঝাপটা তো সামলাতে হবে আমাকেই, সে আমি জানি, যে ভীতু তুমি।

সুজাতার দু চোখে যে অবজ্ঞা রয়েছে অভ্রের নজর এডায না। সে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাব মুখ ফসকে বেরিযে যায, আমি ভীতু হই আর যাই হই তোমার মত স্বার্থপব তো নই।

— কী বললে? স্বার্থপব, আমি স্বার্থপর? সুজাতা প্রতিটি শব্দ দাঁতে চেপে চেপে বলে, তোমাব স্বার্থপরতার আমি হাজার উদাহরণ দিতে পাবি কিন্তু আমি কথা বাড়াতে—তিন্নিকে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ ও থেমে যায়, মেয়ের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, এখনো ঘুমোওনি কেন? সাড়ে দশটা বাজে।

তিন্নি ঘাবড়ে গিয়ে বললো, মা বাথরুমে যাব।

— বাথরুমে একা যেতে পার না? দিন দিন ন্যাকামি বাড়ছে তোমার? সুজাতা হিস হিস কবে, একেবারে বাপেব নেচার পেয়েছে। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে কথা গিলছে। অভ্র জবাবে কি একটা বলতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে বাথরুমে ছুটে যায়। হড়হড় করে বমি করে ফেলে সে।

সকালে সুজাতা অভ্রের ঘরে এল; বললো, তিন্নিকে মা'র ওখানে রেখে আসি। ও খুব ঘাবড়ে গেছে। কিছু যে একটা হয়েছে ও সেটা ভালই বুঝতে পারছে। আর দেখি অজয় বা দাদা কিছু সুরাহা করতে পারে কিনা। তুমিও একটু খোঁজখবর নাও। অভ্র শুয়ে শুয়ে দেখলো সুজাতাকে কেমন উদভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে, সারারাত ঘুমোয়নি নাকি আমারই মত? ভাবলো সে এবং একটা সিগ্রেট ধরালো, তার শীত শীত করছে, জ্বর আসবে নাকি?

৩

সুজাতা ওর ছোটভাই অজয়, বড়দা বিজয়ের সঙ্গে চিঠি নিয়ে কথা বললে, অজয় তার স্বভাব অনুযায়ী ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, অভ্রদা নটোরিয়াসও নয় ফেমাসও নয়, একটা অর্ডিনারি মানুষ। 'লাইফ ইন ডেঞ্জার'—ব্যাপারটা অর্ডিনারি মানুষের জন্য নয়। হেগেমুতে কঁকিয়ে কঁকিয়ে মৃত্যু তাদের জন্য অবধাবিত, অবশ্য দুর্ঘটনায় যদি টেঁসে না যায়।

বড়দা অভয় দিয়ে সুজাতাকে বলে, আমার বিশ্বাস হয় না, কেউ ওকে এমন চিঠি দিতে পারে; পাড়ায় খোঁজখবর করে দেখ অভ্র দত্ত বলে কেউ আছে কিনা। তোদের তো আবার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেস নেই। পিওনটাই বোধহয় এর চিঠি ওর ঘাড়ে চাপিয়েছে। অভ্রকে থানায় একটা এফ আই আর করতে বল। দেখি আমি এদিকে কি করতে পারি। মা'র কাছে বিষয়টি গোপন রাখে সুজাতা। মা কাঁদবে, কিন্তু চোখের জলে কি বিপদের সুরাহা হয়? সুজাতা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চায়।

অতিশয় নিরুপায়, সুজাতা আস্থা হারিয়ে বান্ধবী মল্লিকার কাছে ছুটে গেছে। চোখ কপালে তুলে মল্লিকা বলেছে, মাই গড, দিনকাল কি পড়েছে। তুমি ভাল বলেই ছাড় পাবে না। না'লে তোর হাজব্যাণ্ডের মতো মাটির মানুষ এমন চিঠি পাবে কেন? 'মাটির মানুষ' উচ্চারণের সময় একটু অবজ্ঞা থাকে মল্লিকার গলায়, সুজাতার নজর এড়ায় না; তবু যেন সে পাল ছেঁড়া তরণী মল্লিকা নামক বন্দরে নোঙর করতে চায়, ফলে তাকে বলতেই হয়—একটা উপায় বল, আমি এখন কি করি?

মল্লিকা ভেবেচিন্তে বলে, তোকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি এটা নিয়ে তুই শ্রী শ্রী সিদ্ধযোগী তান্ত্রিকাচার্যের কাছে চলে যা, দেখিস গুণে ঠিক বলে দেবে চিঠিটি আসলে কে দিয়েছে আর কাকেই বা দিয়েছে। অসাধরণ ক্ষমতা বাবার। থানা পুলিশ করিস না, ওতে বিপদ আরও বাড়তে পারে। সুজাতা তান্ত্রিকের কাছে ছুটে গেছে, শুধু কি তান্ত্রিক, ছুটেছে যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব খড়কুটো ধরার আশায়, জিইয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টায় অভ্রও সাবধানে, গোপনে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না।

তিন তিনটে দিন গড়িয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ দিন সুজাতা ও অভ্রের মাথা ছুঁয়ে, গোছানো সংসারের মধ্য দিয়ে বোশেখের চণ্ড ঝড়ো হাওয়া তুমুল ভাঙচুর করার পর পতনের ভাবি শব্দে দিশেহারা সুজাতা, বাড়িতে ঠাকুর দেবতার আসন না থাকায়, স্টোর রুমে লাড্ডুভোজী গনেশের ক্যালেণ্ডারের সামনেই মেঝেতে দুহাত ছড়িয়ে সে 'আমি আর পারছি না' বলে কেঁদে ফেলে এবং ক্রন্দনের চাপা ধ্বনি,

সঙ্গে সুজাতার গালে নাকে অশ্রুধারার মাখামাখির দৃশ্য দেখেও অভ্র একচুল নড়ে না, কেননা ধ্বংসের বিলাপগাথা হাতুড়ির-আঘাতে ওর মস্তিষ্ক চৌচির করে দেয়, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টেনে যাওয়া ছাড়া তার কিছুই করার থাকে না এবং সুজাতার ক্রন্দন থেমে গেলে এক অলৌকিক ধূ ধূ শূন্যতা বাড়ির মধ্যে ঘুরপাক খায়, খেতে থাকে।

এই শূন্যতা ভেঙে একসময় ভর দুপুরে অভ্র সুজাতা খবর পেল এক উটকো চ্যাংড়া মারফৎ, যেন দেবদূত সে, জীবনের বার্তা নিয়ে এসেছে, তাদের গলির চারটে গলির পেছনে কচুরিপানা থেকে আজ দুপুরে ভেসে উঠেছে খোকন দত্ত ওরফে অভ্র দত্তের লাশ। গতকাল রাতে লোকটি খুন হয়েছে।

৪

সন্ধ্যা নেমে আসছিল তবতব করে। গত ক'দিন নিরন্তর ধস্তাধস্তির পর নিজের নেতিয়ে পড়া মুণ্ডু, আর কোনদিনই তোলা সম্ভব হবে না—এমন প্রাণঘাতী শীতল ধারণা, যাতে ধিক্কারের হিস হিস ধ্বনি থাকে, যখন বুকের মধ্যে—কতদিন পরে মনে পড়ে গেল সেই উন্মাদের নিজের বুকেই দমাদম উন্মাদ চড়চাপড়, পাড়ার রাতুলকে দেশদ্রোহী কাজেব অভিযোগে পুলিশ যখন জালে ঢাকা কালো গাড়িতে তুললো তখন পাড়ার জগা পাগলা পুলিশকে দূর থেকে উন্মুক্ত লিঙ্গ দেখিয়ে বলেছিল, ও আমার প্রাণধন যাও কোথায়?—এরপরই গাড়িটি গাডলের মত চলে গেলে তার সে কি আমর্ষে বুকে চাপড় এবং সেই সঙ্গে যাত্রাপালার বিবেকের মত গান, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—ঘুরে আসি......., সত্যি রাতুল আব ফিবে আসেনি, বুক দুমড়ে উঠেছিল তার? হয়তো, মনে নেই—তো, সেই বুকে ক্রমে ক্রমে প্রোথিত হচ্ছিল, ঘাড় মটকে যাওয়ার শব্দ; এমন একটা দারুণ ঘনঘোর মুহূর্তে অভ্রকে ইজিচেয়ার থেকে টেনে তুললো সুজাতা এবং বলতে গেলে হিঁচড়েই ছাদে নিয়ে গেল, তখন আকাশে একটা আবিল চাঁদ উঠে এসেছে। মেদুর আলো ছড়াচ্ছে চরাচরে।

বস্তুত দুপুবে খববটি জেনে যাওয়ার পর সুজাতা ছিল একেবাবেই টেনশনমুক্ত এবং বুকেব ওপর খামচে বসা জগদ্দল শিলাখণ্ড ক্রমাগত গলে— গলে, গলে— জল হয়ে যাবার ফলে ও একটা ছন্দময় লঘুতা যেন পেয়ে যায়, যে লঘুতা নৃত্যপাটিয়সীব থাকে। তাই, একান্ত নিজস্ব, ছাদে আসাব পব চলনে বলনে সংযত সুজাতা খুকি প্রেমিকার মত হঠাৎই অভ্রকে জড়িয়ে ধরে। অথচ এতদিন পব স্ত্রীব বাঁধনহীন আবেগে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভ্র কী অবলীলায়ই না সুজাতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, যেন সে ঝর্ণার মুখেব শান্ত উপলখণ্ড, তার কিছু করার নেই এমনভাবে রেলিং-এর ধারে দাঁড়ায় এবং পাঞ্জাবির পকেট থেকে দেশলাই সিগ্রেট বের করে ফসফস করে সিগ্রেট ধরায়।

এই ঘটনায় সুজাতাব প্রতিক্রিয়া হতে পারতো নানাভাবে, যা স্বাভাবিক ছিল সুজাতার পক্ষে, কিন্তু টেনশনহীন সুজাতার ছন্দময় লঘুতা, আসলে অভ্রকে মৃত্যুর কালো গহ্বর থেকে অক্ষত, জীবিত ফিবে পাওয়া, ফলে নিরাপত্তার যে বলয়টি ঠুনকো কাঁচের মত প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল, অক্ষত ফিরে পাওয়ার আনন্দে সে অভ্রকে সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারলো, যেমন মাতার ক্ষমা থাকে অবুঝ ছেলের প্রতি।

কাজেই ছাদের দৃশ্যপট এখন এমন : রেলিং-এর এক পাশে দাঁড়িয়ে অভ্র শব্দহীন সিগ্রেট টেনে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে রেলিং ধরে সুজাতা দূরে তাকিয়ে আছে, বিশেষ কিছুর প্রতি নয়, কেননা দূরত্ব সমগ্রতা আনে, ফলে ছাদে এক নিটোল নীরবতা, এবং আবিল চাঁদের আলো জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে রয়েছে।

নিঃশব্দতার ডানায় ভর করেই এক সময় থোকন দত্ত ওরফে অভ্র দত্ত দুহাতে মেদুর আলো সরাতে সরাতে অভ্রর মুখোমুখি দাঁড়ালো, ফলে কালরাতেই খুন হয়ে যাওয়া, আজ দুপুরে যার লাশ পুকুরের কচুরিপানার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সে এখন অভ্র দাশগুপ্তের হাত দশেক দূরে সহজ ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে এবং এমন পরিস্থিতির জন্য পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় ওর দু আঙুলের ফাঁক গলে সিগ্রেট পড়ে যায়, ভূমিকম্প হয় মাথায়, দুহাতে কোনো প্রকারে রেলিং ধরে সে শীররে ভারসাম্য রাখে এবং গলা দিয়ে একটা কঁ-কঁ জাতীয় গোঙানি বেরিয়ে যাচ্ছিল যা অতিকষ্টে সে গিলে ফেলে, কাজেই অভ্রেব গলা শুকিয়ে খটখটে, বাক্যালাপের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সে। আর কি আশ্চর্য বেঁটে শ্যামলা, মাথার চুল পাতলা অভ্র দত্তকে সে নিখুঁত চিনে ফেলেছে যাকে কোনদিন সে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। না পারারই কথা, একজন অভ্র দাশগুপ্তের জীবনের বৃত্ত আর কত বড় হয়? প্রশ্ন করে অভ্র নিজেকে।

অভ্র দত্তই কথা শুরু করে। দেখুন, তিন তিনটে গুলি চালিয়েছে—এখানে, এখানে আর এখানটায়, বলে সে উরু, তলপেট ও বুকে তিনটি ফুটো দেখায়, যেখানে মরা জ্যোৎস্নার আলো অবলীলায় বাধাহীন ঢুকে যাচ্ছে অভ্র দেখতে পায়।

গুলি করার পর রক্ত বেরিয়েছিল খুব। লোকটি বলে, এখনো শুকোয়নি, দেখুন শার্ট প্যান্টের কিছু জায়গায় ভিজে জবজবে হয়ে আছে। হাত দিয়ে ছুঁলেই বুঝতে পারবেন।

অভ্র কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এর আগেই অভ্র দত্ত পটাপট শার্ট প্যান্ট খুলে সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং তা ভাসতে ভাসতে অভ্রের সামনে এসে পড়ে। তার সারা শরীর একসঙ্গে শিরশির করে ওঠে, মাথায় আবার ভূকম্পন শুরু হয়. শরীরের রোমকূপগুলি ঘাসের ডগার মত দাঁড়িয়ে। অভ্র বোঝে সে গলগল করে ঘামছে—উফ এত বক্ত, এত রক্ত...এত জিঘাংসা—সে বিড়বিড় করে।

অভ্রেব অবস্থা দেখে অভ্র দত্ত হেসে ফেলে, সে হাসিতে কোন গোপন তিক্ততা, ধিক্কাব নেই;—বলে, কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে ঘাবড়ে গেছেন? খুন হলে এমন হয়েই থাকে। আপনি বড় ভালমানুষ, সাতে নেই, পাঁচে নেই, মিছিমিছি আপনার ও আপনার স্ত্রীব দু তিনদিন বড্ড যন্ত্রণা গেল চিঠির ভুল ঠিকানার জন্য; আমি দুঃখিত।

অভ্র যৎপরোনাস্তি চমকে ওঠে। মানুষ মরে গেলে, খুন হয়ে গেলে সব মানুষের হাঁড়ির খবর জেনে ফেলে নাকি? অভ্র দেখল, লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, শরীরে এক টুকরো সুতো অব্দি নেই, অভ্রের দিকে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মহাশক্তির বন্দনার প্রস্তুতিপর্ব—এরপরই লোকটি ভাসতে ভাসতে নাকি উড়তে উড়তে, পেছনে পেছনে অনুগত গৃহপালিতের মত তার কাপড চোপড়ও কোথায় যে চলে গেল অভ্র আর দেখতে পেল না।

অভ্রের শীরর কাঁপছে, গেঞ্জি ঘামে ভিজে থিকথিকে, পাঞ্জাবি শরীরে সেঁটে যাওয়ায় যখন তা খোলার জন্য কম্পিত হাতে চেষ্টা করছে ঠিক তখনই সুজাতা রেলিং ছেড়ে সরে এল এবং অভ্রকে বলল, চল নিচে যাই, বাত ভালই হয়েছে, এদিকের দোকান পাটগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

গরম লাগছে, অভ্র বলল, গেঞ্জি-পাঞ্জাবি ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। অভ্র দত্তের আগমন ও প্রস্থান সুজাতাকে জানানোর তার সাহস হলো না।

তোমার বোধ হয প্রেসাব বেড়েছে। কাল ডাক্তারবাবুব কাছে যাবে, আমিও সঙ্গে যাব। ফেরার পথে তিন্নিকে নিযে আসব, সুজাতা নরম গলায় বললো।

অভ্র ঘাড় কাৎ করে। এবপরই সুজাতা আচমকা নাটকীয ভঙ্গিতে অভ্রের হাত নিজেব মাথার ওপর চেপে আদুবে গলায বলল, কথা দাও, তুমি কোনদিন রাজনীতি টাজনীতি বা ইউনিয়নে যাবে না, অন্যেব ব্যাপাবে নিজেকে জড়াবে না।

সুজাতার এমন কাণ্ডকারাখানায় বিমূঢ় অভ্র ভাষা হাবিয়ে ফেলে, ফলে বাধ্য ছেলের মত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া ছাড়া তার গত্যন্তব থাকে না।

জানি, তুমি যাবে না, সুজাতা বলে, আজ যে লোকটি খুন হল বোধহয বাজনীতি করতো। আর বাজনীতি করতে গিযেই লোকটি খুন হল। তুমি তো এসবে নেই। কাজেই আমাব বিশ্বাস ছিল পিওন ভুল করে চিঠিটা দিযে গেছে।

অভ্র নিরুত্তব। গুলিব শব্দ ছেঁকে ধবেছে তাকে, সশব্দে ঢুকে পডছে সারা শরীরে।

বনমালী গোস্বামী

বিঙ ও মুরগিছানা

একটা তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ ছেড়ে জীপগাড়িটা থমকে দাঁড়াতেই ড্রাইভার সত্রাসে এদিক ওদিক তাকাল। মুরগির বাচ্চাগুলো রাস্তা বরাবর ছুট লাগাতেই লোকগুলো হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর এখন পাশের ছোট্ট বাজার উজাড় করে দলে দলে সবাই ছুটে এসে গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাদবাকি মুরগিরা সকলরবে এধার ওধার ডানা ঝাপটে পালাতে সুরু করল। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষন্ন চোখে মরা মুরগির বাচ্চাটাকে দেখল খানিকক্ষণ, এরপর ধীরে ধীরে শূন্যদৃষ্টিতে তার চারপাশের থমথমে মুখগুলো পরখ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"বেশ। আমি এর দাম দিয়ে দিচ্ছি। কত লাগবে?"

গরীব, ছেঁড়া পোষাকপরা গাঁয়ের লোকগুলো মাঝবয়েসী দেশোয়ালী লোকটাকে গম্ভীরভাবে পরখ করতে লাগল শুধু। একটা জোয়ান ছোকরা ভিড় ঠেলে অপরাধীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। "আমার এতো আদরের পাখিটাকে থেতলে ফেলেছেন একেবারে। অ্যাঁ? ঝটপট পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিয়ে পালান দেখি।" শক্ত মাংসল হাতটা বাড়িয়ে সে বিদেশীটির চোখে তার ঠাণ্ডা ধারালো দৃষ্টি রেখে টান হয়ে দাঁড়াল।

"পঞ্চাশ"! ড্রাইভারের চোখদুটো কপালে উঠল, মনে হল সে যেন আচমকা চড় খেয়েছে একটা।

"হুঁ, পঞ্চাশ।" ছোকরা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তার চোখ মুখ কঠিন, গলার সুর চড়া। বাদবাকিরা সায় দিল। "হে হেঁ।"

"আচ্ছা?" লোকটা কঁকিয়ে উঠল, "আমিতো শুধু একটা মুরগির বাচ্চা মেরেছি। আর দাম দিতে হবে পনেরোটার?"

সব চুপ মেরে গেল। ভিড় বেড়েই চলল। লোকগুলো ভাবলেশহীন থমথমে মুখে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল শুধু। কিছু লোক গাড়ির সামনে রাস্তার উপরেই বসে পড়ে কাছের মাঠে ছেলেদের কাঁচা কমলালেবু নিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে লাগল মন দিয়ে। ড্রাইভার গাড়িতে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট জ্বালতেই লোকগুলো মুচকি হেসে তার ম্লান মুখে তাকিয়ে পাইপ ধরাল। গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ঘোড়া অস্বস্তিকর নির্জ্জনতায় সাড়া জাগিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। অসংখ্য পাইপ থেকে ঘন ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠতে লাগল। সকালের রোদে পাইন বন ও সবুজ ধানের ক্ষেত ঝলমল। মধুর নিরালায় পাখির ক্লান্ত কলরব। খেলার মাঠ থেকে বাচ্চাদের হাসিখুসি চিৎকার ভেসে আসছে। সবাই ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। কোন মন্ত্রবলে যেন হঠাৎ পাশের বাজারটা আঁতুড় হয়ে গেছে।

গুড়ুম। হঠাৎ কাছে পিঠেই বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। আর এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝাঁপটে চেঁচিয়ে মাথার ওপর ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগল। নীরব লোকগুলো মুচকি হেসে মাথা দোলাল। খানিক বাদে একজন বুড়োমতন লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে

হাঁক ছাড়ল: "এ্যাই বিঙ!"

সোনামাখা জংগল থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে ধীর শান্ত পায়ে ভিড়ের দিকে এগোল। লোকগুলো অস্ফুট গুঞ্জন তুলে খুশিচোখে গম্ভীর ড্রাইভারের দিকে তাকাল। "এ্যাই বিঙ!" তারা খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল।

বন্দুক হাতে বুড়োটা নবাবী চালে হেঁটে গোমড়ামুখ বিদেশীর সামনে এসে সেলাম করল। সবিনয় হাসিতে সে যেন গলে পড়ছিল। তার পরনে ছেঁড়া পাজামা ও গায়ে আঁটো সাঁটো জ্যাকেট। সাদা মাথা ঝাঁকিয়ে সে মহা তৃপ্তিতে হেসে উঠল। পান ও তামাক চিবিয়ে তার দাঁত কালো কুচকুচে কিন্তু সজাগ চোখ দুটো দুষ্টবুদ্ধিতে ঝলমল। তার নুয়েপড়া পিঠে বন্দুক ঝোলানো আর ডান হাতে অবহেলাভরে ধরা ছিল একটা রক্তাক্ত পাখিব পা।

"ঘাবড়াবার কিছু নেই, সাহেব। আমবা আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে বাখব না। টাকাটা দিয়ে আপনার পথে আপনি চলে যান। ব্যাস।" বন্দুকওলা বুড়োটা সসম্ভ্রমে খুব সাবলীল ভঙ্গিমায় হেসে হেসে বলে উঠল।

লোকগুলো নীরবে মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে সায় দিল। ভদ্রবেশী ড্রাইভারটার চোখ ঝক ঝক করে উঠল। সে রাগে ফেটে পড়ল।

"আমি কিচ্ছু শুনতে চাইনা। চলো, পুলিশের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।"

"পুলিশ?" বন্দুকওলা বুড়ো—যার নাম বিঙ—হেসে গড়িয়ে পড়ল। লোকগুলোও হেসে অস্থির। "ও সবের পাট এখানে নেই। আমাদের গায়ের আইন কানুন মানা ছাড়া গতি নেই কারো।" নাটুকে হাসি হেসে সে চারপাশেব লোকদেব মুখে মুখে চেয়ে চোখ টিপল।

"কিন্তু আমিতো শুধু একটা মুরগি বাচ্চা মারলাম।" অপরাধী লোকটা সক্রোধে ওকালতি সুরু কবল।

"সে আপনাব খু-উ-ব ভাগ্য বলতে হবে।" বিঙ চোখ ঘুরিয়ে দু'পাটি কালো দাঁত মেলে হেসে উঠল। "ভাগ্যি ভাল আপনি একটা ছাগল মেবে বসেননি। তাহলে একশোটি টাকা দিতে হত। আর বাছুরেব জন্যে পুবো দুশো টাকা। হায়রে, ওই ছোট্ট সোনালী মুরগিটা থেকে কত শত না ডিম আর মুরগি বেরিয়ে আসতে পারত! ভেবেই দেখুন কী কাণ্ডটা আপনি করে বসেছেন।" মরা, দলাপাকানো মুরগি বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সে মুখভঙ্গি করল। "ইস। কী ক্ষতিটাই যে হল। একটা গোটা মোরগেব বংশকেই আপনি লোপাট করে দিয়েছেন এককেবারে। পঞ্চাশ টাকাতো নামমাত্র দাম। বুঝলেন তো আমার কথাটা?"

"আচ্ছা—আমি যদি একজন মানুষকে মারতাম? তাহলে?" দোষীলোকটা কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধমকে শুধাল এবার।

"মানুষ?" বিঙ চিন্তিত ভাবে দু আঙ্গুলে তার নাকটা ধরে মোচড়াতে লাগল। ইতস্ততঃ করে হঠাৎ সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। "তাহলে আপনাকে কুড়িটাকা দিয়ে দিলেই হয়ে যেত। হ্যাঁ।"

"বাঃ, তোমরা মুরগিবাচ্চার চাইতেও সস্তা দরে বিকোও দেখছি।" দুচোখে সবিদ্রুপ খুশির ঝিলিক ছিটিয়ে বিদেশীটি সবিস্ময়ে বলে উঠলো।

বিঙকে বিরক্ত দেখালো। তার অশান্ত চোখে বিব্রত দৃষ্টি ঘনিয়ে এল। লোকগুলি

নির্বিকার দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। সগর্বে মাথা তুলে বিঙ ব্যাখ্যা সুরু করল।

"আমি মরলে ভারিতো বয়ে গেল। আমার খাবার পোষাক আর তামাক তখন অন্য কোন ভাল কাজে লাগবে। আমরা এই সবগুলো লোক মরে গেলে দুনিয়ার কী সর্ব্বনাশটা হবে, শুনি?" বুড়োর কুঁচকানো মুখ উত্তেজনায় ঝলসে উঠল। রোগাটে হাত দুলিয়ে সে চেচাল। "কিচ্ছু ক্ষতি হবেনা। উহুঁ। কিন্তু একটা গরুর বাচ্চা কিংবা মুরগির বাচ্চা—ওঃ বাপস! যাকে বলে সাত রাজার ধন। তাই না? চিকেন ফ্রাই খেতে কেমন লাগে আপনার? বলতে গেলে আপনি একটা গোটা মুরগির বংশকে দফা রফা করে ছেড়েছেন। ভেবে দেখেছেন ব্যাপারটা?" সে থেমে হাঁপাতে লাগল।

"খুব ভালভাবে দেখলাম।" ড্রাইভার বিদ্রূপের হাসি হাসতেই লাগল। পকেটে হাত পুরে একতাড়া নোট টেনে এনে গুণতে গুণতে সে তর্জন ছাড়ল, "এই নাও, খুসীতো!" লাফ দিয়ে সে গাড়িতে উঠে বসল। মনে হচ্ছে একটা মানুষ মরলেই বুঝি ভাল করতাম। তিরিশটা টাকা অন্ততঃ বাঁচত।"

লোকগুলো হাত তুলে বিজয়গর্বে নাচতে শুরু করে দিল। তাদের চড়া গলার হাসি ও চীৎকারে অপরাধীর গলার স্বর হারিয়ে গেল। পর মুহূর্তে গাড়ির ইঞ্জিনটা ফুঁসে উঠতেই বিঙ ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের হাত চেপে ধরল। বিনয়ে সে যেন গলে পড়ছে।

"যাবেন না, সাহেব। এ নিছক ঠাট্টা। দোহাই আপনার। আসুন না, আমরা সবাই একসাথে একটু নাচগান ফূর্তি করি।"

ড্রাইভার রাগে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। —"ঠাট্টা! নিছক ঠাট্টা! চমৎকার!"

"বাঃ, আপনার খরচ করবার মত কত টাকা! তবু খরচতো এমনি করবেন না। আসুন, একটু ফূর্তি করা যাক। রাগ করলেন সাহেব?" তার চোখে মুখে আহত, অবাক দৃষ্টি ফুটে বেরোল।

"আমার অনেক কাজ।" সাহেবটি শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন। একটু বাদে : "কা মেরিলিবনের বাড়ি কোন দিকে বলতে পার?" "ওখানে আপনার কিসের দরকার?" বুড়ো ভয়ানক চমকে গেল। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল।

"সে তোমার মাথা ঘামিয়ে কি হবে?" অপমানে অসহায় রাগে সে মুখিয়ে উঠল। "এই গ্রামেই ওর বাড়ি, নয়?"

বুড়ো যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল। তার সহসা ম্লান চোখে মুখে একটা আহত পশুর অবুঝ দৃষ্টি। কাঁপা কাঁপা দ্রুত গলায় সে মিনতি জানাল। "আশ্চর্য, এটাকে আপনি ঠাট্টা বলে মেনে নিতে পারছেন না? শিলঙ থেকে আর যারা আসে এরকম অবস্থায় তারা সবাই দিব্যি আমাদের সাথে মদ খেয়ে নাচে। দেখুন না, ওরা আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

সে হাত দিয়ে দেখাল। ড্রাইভার বিতৃষ্ণার চোখে অদূরের অপেক্ষমান লোকগুলোকে দেখে নিল। বুড়োর ভিখিরিগলা তার কানে বাজল। "আসুন। ওই টাকা দিয়ে এক সাথে সবাই খুব ফূর্তি করব। এরপর—"

ইঞ্জিনের গর্জনে বুড়োর সকরুণ স্বর ডুবে গেল। মুখ হাঁ করে কেমন ভয়ার্ত

দৃষ্টিতে সে ছুটন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ, এরপর গাড়িটা ধূলোর ঝড় তুলে রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে যেতেই কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে যতো দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। থুতু ফেলল। লোকগুলো হৈ হৈ করে উঠল : "এ্যাই বিঙ!"

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে খাসিয়া পাহাড়ের সুদূর প্রান্তে ছোট্ট গ্রামটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছিল। কা মেরিলিবনের বাড়িতে সম্মানিত অতিথিটি অনেক আগেই শুতে গেছেন চিন্তিত ভাবে সিগারেট টানতে টানতে। হঠাৎ সে কান খাড়া করে বাইরের উঠানে একটা চাপা গোঙানি শুনতে লাগল। অন্ধকার উঠান বেয়ে ভারি পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ নাটুকে হাসি শোনা গেল। আগন্তুক হিক্কা তুলে কাঠের সিড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। দড়াম কবে দরজা খুলে কা মেরিলিবন দেখা দিল। হাতে ধরা লণ্ঠনের আলোয় তাব রুক্ষ বডসড ঘৃণা-বিষাক্ত মুখখানা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

"বেরোও। আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। আমাব অতিথিকে অপমান! এতো সাহস! বেরোও আমার বাডি থেকে—হাড়-হাভাতে অকর্মা মাতাল কোথাকার। শুনতে পাচ্ছনা?"

রহস্যময় আগন্তুক আবার হিককা তুলল। তার অস্ফুট জড়ানো স্বরে আর্তি ঝড়ে পড়ল। "কী হযেছে তোমাব? তোমার সোয়ামীকে এসব কথা। আঃ, বিয়ের দিনটা তোমার মনে পড়ছে না? সে কি মাতলামি করেছিল সবাই। ইস, এতো নিষ্ঠুর হয়োনা গো!"

সে ভুতুড়ে গলায় খিল-খিলিয়ে হেসে উঠতেই আচমকা থেমে গেল। মোটা সোটা বেঁটে স্ত্রীলোকটা ততক্ষণে ফুঁসে উঠেছে। "চুপ। আমাব অতিথিকে তোমবা হতচ্ছাড়া অকর্মার দল সকালবেলা এমন অপমানটাই কবেছো যে আমি ওকে মুখ দেখাতে পাবছিনা। ছিঃ, ছিঃ।"

"আজ সকালে? আমবা হতচ্ছাড়া অকর্মাব দল সকাল বেলা আবার কী কবলাম গো?" মাতালটা খুব কবে ভাবতে চেষ্টা করল, পরমুহূর্তেই তাব উচ্ছসিত কথাব তোড ছুটল। "ওঃ, মুরগির বাচ্চা চাপা দিয়েছিল একটা গাডি। ওই ব্যাপাব। শিলঙেব দবাজ দিল সাহেবটা পঞ্চাশ টাকা দিল, জানো? আব এই গাঁয়ে যা হযে থাকে, আমাকেই সব কথাবার্তা চালাতে হল। এবপর বেদম খাওয়া দাওযা হল, বুঝলে? আর, ও হ্যাঁ, ওই ব্যাটা ও বাডিটা কোথায তা জানতে চেযেছিল।" তাব ভীরু গলা একটা আসন্ন আশংকায় কেঁপে কেঁপে উঠল।

"হুঁ। বাড়িটা তিনি ঠিকই খুঁজে পেয়েছেন।" বুডি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। তার স্বরে তিক্ত তিবস্কাব ঝবল। "চেঁচিয়োনা। উনি ওই ঘবে ঘুমুচ্ছেন। ওর মত বড় অতিথি এ বাড়িতে এর আগে আসেন নি, আর ওকেই কিনা তুমি অপমান কবে বসলে। ওর দয়াতেই আমি কোনরকমে ব্যবসা চালিয়ে তোমার মত অসভোর পেট ভবাচ্ছি দুবেলা। বুঝলে এবাব? এবারে কেটে পডো। জলদি। কাল ভোরে উঠে যেন আর তোমাব মুখ-দেখতে না হয়—না, না, না!" এক ঝটকায় ভারি শরীরটা ঘুরিয়ে দডাম করে দরজা বন্ধ করে দিল বুডি।

সারা বাড়িটা থরথরিয়ে উঠল। এর পর সব কিছু আবার চুপ-চাপ। হালকা

পায়ের শব্দ দূরে মিলালো। বিছানায় শুয়ে শ্বাস চেপে সিংজি নিকষ কালো অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। লজ্জা ও অনুতাপে সে অস্থির হয়ে উঠছিল। সে নিজেকে ঘৃণা করতে লাগল। ধুত্তোর! গোটা ব্যাপারটাকেই একটা স্থানীয় ঠাট্টা অথবা নিয়ম হিসেবে মেনে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। ওই গর্বিতা দর্পিতা বুড়িটার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গাইবার দরকারটাই বা কি ছিল? বুড়ির বিষমাখা ফণাগুলো তার মাথার ভিতরে পাক খেয়ে ঘরে তাকে অস্থির করে তুলল। সে ভেবে ঠিক করল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বিঙের কাছে মাপ চাওয়া দরকার।

অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ার শব্দ শুনে সে উঠে বসল। একটা চাপা সংকুচিত কণ্ঠস্বর দরজার ওপারে শোনা গেল : "সিংজি জেগে আছেন? ও সিংজি!"

সিংজি লাফিয়ে উঠে অন্ধকারে হাতড়ে স্যাণ্ডেল পরে পা টিপে সেই কণ্ঠস্বরের দিকে এগোল। চকিতে সে সব বুঝে নিয়েছে। অন্ধের মত দ্রুত হাতড়ে হাতড়ে সে দরজার খিল পেয়ে দরজাটা খুলেই সামনেব বারান্দায় একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পেল। হুঁ হুঁ, ও-ই কা মেরিলিবনের স্বামী। নিশ্চয়। কিন্তু, ও কে? দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িযে ভাবতে লাগল কে আগে কথা বলবে। আগন্তুক একটা আর্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা নোয়াতেই সিংজি তার পিঠে ঝোলানো বন্দুকের কুঁদো দেখতে পেল।

"এই যে বিঙ!" সে ডুকরে উঠল।

"ভিতরে ঢুকতে দিন আগে। কী ঠাণ্ডা বাইরে। আর আমিও তো জোয়ান নই।" বিঙ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হ'ল। "আপনাকে তুষ্ট না করা পর্যন্ত আমার দজ্জাল বউ আর বাড়ি ঢুকতে দিচ্ছেনা। বুঝলেন সাহেব মশাই?"

সিংজি পিছু হটে দেশলাই খুঁজে বেব করে লণ্ঠন জ্বালল, ঘুরে দাড়িয়ে হেসে তাকাল। বিঙ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেমন বোবা দৃষ্টি মেলে ঠোঁট চাটছে। চমকে উঠে দুহাত ঘষতে লাগল এবার। "মাপ করবেন, সিংজি। বিশ্বেস করুন আপনাকে আমি জানতাম না। এ নিছক ঠাট্টা, বুঝলেন, আমাদের কোন বদ মতলব ছিল না।" কথা শেষ করে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

সিংজি বিছানার কিনারে বসে বুড়োর দিকে তাকিয়ে চেযাবেব দিকে নির্দেশ করল। "বসো।"

বিঙ লণ্ঠনের কাছাকাছি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে হাত কচলাতে লাগল। তার মাতলামি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেলেও সিংজির নাকে যেন কেমন একটা দিশী মদের গন্ধ সুড়সুড়ি দিতে লাগল। হতশ্রী চেহারার বুড়োটা হঠাৎ মাথা তুলে কালো দাঁত দেখিয়ে মুখ ভরে হাসল। লণ্ঠনের আলোয় তার সজাগ চোখ দুটি ঝিকিয়ে উঠল।

"আমার বৌটিকে কেমন মালুম হ'ল, সিংজি?"

"তা—" সিংজি পিঠ চুলকে সাবধানে শুরু করল, "তা ব্যবসা উনি খুব ভালই বোঝেন। আমি হলাম গিয়ে তরকারি ও কমলা লেবুর পাইকারী কারবারী। আমার তো মনে হয় উনিই আমাকে সব চাইতে ভাল জোগান দিয়ে থাকেন। ভারি সৎ, বুদ্ধিমতী আর—" সে উপযুক্ত কথার জন্যে হাতড়াতে লাগল।

"আর ভীষণ দজ্জাল।" বিঙ কথাটি জুগিয়ে দিয়ে হাসল। "খুব দজ্জাল ও

নিষ্ঠুর। কেমন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। হ্যাঁ।"

সিংজি বিব্রত হাসিতে মাথা নাড়ল। "সিগারেট চলবে?" নতুন জাগা অস্বস্তিতে সে ঘেমে উঠল। বেচারা নিরাশ্রয় বুড়োর সজাগ, অপাপবিদ্ধ চোখে তাকাতে পারছিল না সে।

"না, দরকার নেই, ওই দামি জিনিসের চাইতে আমরা খাসিয়া পাহাড়ের তামাকই ভাল।" মাথায় লাল টুপিটা চেপে বসিয়ে সে পাইপ জ্বালল। "ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন?" তার বৌ'র সম্মানিত অতিথিকে চোখ টিপে বিঙ বিছনার উপর ঝুঁকে পড়ল। "শুনুন, আমি বুড়ো, কোন কর্ম্মের নই। এই রাত দুপুরে যাবই বা কোথায়? আব ও কিনা আমার বৌ! ছোঃ! আমি যখন জোয়ান, দুটি চমৎকার ছেলেমেয়ের বাপ ছিলাম তখন ও আমায় কী ভালই না বাসতো -যদি দেখতেন!" ঘরের তপ্ত আরামে মুখোমুখি এমন উদার, ধৈর্যবান শ্রোতা পেয়ে সে আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেল। তার ভরাট-স্বরে রাগ ঘনাল। "আর এখন কিনা আমাকে ঘেন্না করে। আমি অকর্ম্মা। আরে, সেকি আমার দোষ? এই দেখুন আমার বন্দুকটা দেখুন! হুঁ, আমার মেয়েজামাই দিয়েছে ওটা।" গর্বে তার চোখদুটো ঝলসে উঠল। "এ তল্লাটে একমাত্র আমিই সরকারী লাইসেনসওয়ালা শিকারী, জানেন?"

"তাই নাকি?" সিংজি হাই তুলে প্রসন্ন হাসিতে তাব মুখে তাকাল। যেন শিশুকে বাহবা দিচ্ছে—এমনি ভাবখানা।

"কিন্তু তা হলে কি হ'বে? এমন দুর্ভাগ্য আমার! লাইসেনসটা পাওয়ার পব থেকে একটা হাতিও পাগলা হলনা। একটা খ্যাপা হাতিকে মারলেও অনেক টাকা পেয়ে যেতাম। কিন্তু, হায়রে"—বিশ্রী মুখভঙ্গি করে হতাশ ভঙ্গিতে বাববার বুড়ো মাথা নাড়তে লাগল। এরপর ধীরে ধীবে মাথা তুলল। লালচে আলোয় তার চোখে কান্না চিকিয়ে উঠছে।

"এ কী, কান্না কিসের! ছিঃ, ছিঃ।" সিংজি খপ কবে তাব শুকনো ঠাণ্ডা হাত জাপটে ধরল। তার গলায় নবম আদুরে স্বর ঝবে পড়ল। "ওই মুবগিব বাচ্চার কেচ্ছাটা ওকে বলাব জন্য আমার আপশোষেব শেষ নেই, জানো? আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা এতদূব গড়াবে। বুঝলে? নাও, মন খারাপ করো না। এখন কী করা যায় তাই বলো।" সিংজি তার কর্কশ হাতটা সস্নেহে বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিঙ তার কাঁপন-লাগা চোখ দুটি নামিয়ে নিঝুম বসে বইল কিছুক্ষণ, এব পর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলে উঠল। "উহুঁ, আপনাব কিচ্ছু কববাব নেই। আমি জীবনে একটি পয়সাও রোজগাব করতে পাবিনি। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। যেদিন আমি লাইসেনস পেলাম—ব্যাস, অমনি যেন ভোজবাজিতে সবকটা হাতি সাধুবাবা বনে গেল। ষড়যন্ত্র ছাড়া এ আর কি? কী ভাগ্যি একখানা। ছোঃ! আপনাকে যদি ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু দিতে পারতাম!"

"আরে, ও কিছু না। যেতে দাও, যেতে দাও।" সিংজি তার হাঁটু চাপড়ে দিল। ঘুমে ও ওই হতভাগা বুড়োটার দুর্গতি থেকে রেহাই পাওয়ার ভাবনায় সে মুষড়ে পড়ছিল।

"উহুঁ, আপনাকে খুশি করা আমার চাইই চাই।" বুড়োর কণ্ঠস্বর এবার ঝাঁঝালো, রীতিমত উদ্ধত। লণ্ঠনে চোখ রেখে সে স্বগতোক্তি করে চলল : "যখন ও জানতে

পারবে ওর বড় অতিথিকে আমি খুশি করতে পেরেছি, সত্যি সত্যি খুশি করতে পেরেছি, ও তখন খু-উ-ব খুশি হবে আর সব কিছু আগের মত ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবেনা। বুড়ো মানুষ আমি খাবার দাবার গরম আব তামাক ছাড়া বেশিদিন টিকতেই পারবনা—”

ভিজে স্বপ্নালু চোখে সে সোজাসুজি সিংজির মুখে তাকিয়ে শুকনো ঠোঁট বেঁকিয়ে কেমন রহস্যের হাসি ছড়াল। শরীর একটু তুলে ধরে খুশি-জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে উত্তেজনায় সে ফিসফিসিযে উঠল : “ঠিক আছে, চলে আসুন। আপনার বরাত জোরে কে জানে আজ রাত্তিরে দু-একটা হরিণ মরে ফেলতেও পারি। সে সব আপনাকে দিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি। চলুন, চলুন!” ে উত্তেজনায় পা ঠুকল কেমন এক বন্য উন্মাদনায় যেন তার ভাবনা উচ্ছল, কুঁচকানো মুখ কম্পমান।

“আঃ, চুপ!” সিংজি তাব ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল। “তুমি সারা বাড়ি জাগিয়ে ছাড়বে।”

“আপনাকে যেতেই হ’বে। কী ভাগ্যবান আপনি। একগাদা রোজগার, এমন গাড়ি হাঁকাচ্ছেন। ইস!” কেমন এক অজানা সুখের আবেশে সে কেঁপে কেঁপে উঠল, তার চোখে আলো ঠিকবালো। “আপনি দিব্যি একটা হরিণ গাড়িতে করে শিলঙে নিয়ে যেতে পারবেন। আর ও যখন জানতে পারবে আপনার আর রাগ নেই, আঃ, যা খুশি হবে!”

“কে বললে আমি বেগে আছি?” সিংজি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল। “আমি শুধু একা থাকতে চাইছি। ভারি ঘুম পাচ্ছে। ভোর বেলা বেরিয়ে পড়তে হবে। সব কাজও শেষ, আর তোমার বৌ’র কাছে বিদায়ও নিয়ে নিয়েছি।”

“চমৎকাব।” বিঙ উঠে দাঁড়িয়ে সদর্পে বন্দুকটা ঘোরাল। “তাহলে তো শিকারে বেরিযে পড়তে আব কোন বাধা নেই। চটপট করুন। এই যে নিন, আপনার জুতো।” ঝুঁকে পডে সিংজির জুতো জোড়া সে তুলে নিল। “আপনি চান আর নাই চান, আপনাকে আমার খুশি করতেই হ’বে। বৌ এদিকে খেপে গেছে আর আমাব ঘবদোব নেই। বাপরে! বুঝলেন ব্যাপারখানা?”

সিংজি বালিশের কাছে বাখা ঘড়িটা দেখল। ভোব হতে আবো দুই ঘণ্টা বাকি। চোখ কুঁচকে সে মজাদাব বুড়োটাকে খুঁটিয়ে দেখল। “এ কী ছেলে মানুষি হচ্ছে?”

“কিচ্ছু হচ্ছেনা। এই যে নিন।” জুতো জোডা সে সিংজির পায়ের কাছে রাখল। “এমনি রাত্তিবেই পাহাড়ি হবিণগুলো ধানক্ষেতে নেমে আসে। আমি দুর্ভাগা। কিন্তু আপনার কথাই আলাদা। ইস. শীগগির করুন।”

শান্ত ঘুমন্ত গাঁযে সাড়া জাগিয়ে কুকুবদেব খেপিয়ে জীপ গাড়িটা নিশুতি রাতে ছুটল। কা মেরিলিবন সচমকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে জানালা দিয়ে একবার উঁকি মাবল, দ্রুত অপসৃয়মান গাড়ির-শব্দ কান পেতে শুনে বিরক্ত ভাবে বিড বিড় কবে উঠে আবাব গরম বিছানার আশ্রয়ে ফিরে এল। আঁকা-বাঁকা মাটির রাস্তায় দুধারের পাহাড জংগলে হলদে আলো ছিটিয়ে গাড়িটা ধেয়ে চলল। বিঙ ঠাণ্ডায কেঁপে উঠে দক্ষিণে নির্দেশ করল। নরম তাবাব আলোয় সিংজি অনেক দূরে দুটো খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে

সরু উপত্যকার আভাস দেখতে পেল। কিছু পরে সেখানে পৌঁছুল দু'জনে। ধানের ক্ষেতের ভিতরে সরু খালের পাশে পাশে উঁচু আলপথ দিয়ে তারা এগোল, আধপাকা ধানের শিষের আদুরে ছোঁয়ায় শিউরে উঠল। ঝির ঝির হাওয়া বনে বনে শিস জাগিয়ে চলেছে। খালেব জলে কেমন অবুঝ কানাকানি, হাসাহাসি। তারাভরা সুন্দর আকাশে সাদা টুকরো মেঘগুলো দ্রুত চেহারা পাল্টাতে লাগল। সিংজি আঁৎকে উঠে আতুড় হয়ে দাঁড়াল।

"সাপ!"

"এত্তো ভয়!" বিঙ বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল। পব মুহূর্তেই দারুণ উত্তেজনায় সে লাফাল। "আঃ, ওই যে!" সে হাত তুলে দেখাল। দূরে, একটা নেড়া টিলার মাথায় ফিকে নীল আকাশেব পটভূমিকায় দাঁড়িযে দুটো ছায়ামূর্ত্তি। ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে আঁকাবাঁকা শিং দিযে পরস্পরকে সোহাগ করল, এব পব ধীরে ধীরে টিলাব ঢালু গা বেয়ে নেমে অন্ধকাব ধানক্ষেতে মিলিয়ে গেল।

"হরিণ! আপনি ভাগ্যবান, সিংজি! আমি জানতাম, জানতাম!" চোখ গোল করে বিড়-বিডিযে উঠে সে সিংজির হাত ধবে জোরে ঝাঁকুনি লাগাল। "কী হল আপনার? এ্যাঁ? চলে আসুন। এমনি"—সে নুয়ে বন্দুক হাতে তেড়ে গেল।

সিংজি অনড় দাঁড়িয়ে তার ধাবমান মূর্ত্তিব দিকে তাকিয়ে রইল, কেঁপে উঠল। কেমন একটা অসহায ভাব ও অদ্ভুত ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একছুটে পালিয়ে গাড়িতে ফিরে যেতে চাইল সিংজি। কিন্তু একটু আগে দেখা সাপেব কথাটা মনে পড়তেই স্থাণুর মত দাঁডিয়ে রইল আবাব। নীবব তাবাজ্বলা আকাশের নিঃসীমতা, পাইনের মর্মব, জলেব ও ধানের ফিসফিসানিব সাথে চার পাশের দুঃসহ নির্জনতা মিলে তাকে যেন সম্বিৎ-হাবা কবে ছাডল। ত্রাসে প্রায় চেঁচিযেই উঠতে যাচ্ছিল সিংজি। সময় যেন আর কাটতেই চায়না। জানোয়ার-তাড়ানোর জন্যে বাখা ক্ষেতের মাঝখানের ভুতুড়ে খড়েব মূর্ত্তির মত নিথব নিস্পন্দ সে দাঁডিয়েই থাকল। তারপব একসময বহুদূর থেকে ভেসে আসা মোবগেব ডাক শুনে যেন সে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। পুব আকাশে প্রভাতী তাবা দপদপ কবছে। পাহাডেব চূড়া ঘিবে অরুণাভার বিস্তাব। কাছে পিঠেই হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠল। আবার। আবাব। গম্ভীর ধ্বনি পাক খেযে পাহাডের গা বেয়ে উঠছে। সিংজি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেডে বাঁচল। আঃ, আব একা নয সে।

মাঠেব ওপার থেকে দরাজ খুশিগলাব ডাক ছুটে এল। এক ঝটকায যতো দুর্ভাবনা ঝেডে ফেলে দিযে সিংজি শিশিবভেজা ধান গাছ ভেঙ্গে ছুটল। "বিঙ!" তাব খুশিঝরা স্বব ফিকে অন্ধকারকে কাঁপিযে তুলল।

বিঙ জোবালো শিস দিয়ে সাড়া জানাল। ততক্ষণে মাথার উপবে পাখিবা পাক খেতে সুরু করেছে। একটা মস্ত হবিণের ফোলা ফোলা পেটেব ওপর পা চড়িয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে খুশিখুশি চোখে সে এগিয়ে আসা লোকটাকে দেখতে লাগল। চোখ কুঁচকে হাসল।

"আর ভয় নেইতো, সিংজি?"

সিংজি তাব পেছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে দুটো মরা জানোয়ারকে দেখতে লাগল। "সাবাস বুড়ো। সাবাস।"

"সব আপনার দয়া, সিংজি। আপনাকে দেখামাত্রই মনে হয়েছিল বেজায় ভাগ্যবান লোক আপনি। নিন, আমি খুশি এখন। এ দুটোর জন্যে আপনি শিলঙে কম সে কম একশো টাকা পাবেন।

"সত্যি? তা তুমিই বিক্রি করলে পারো!"

"এখানে? কেউ কিনবার নেই। আর শিলঙে নিয়ে যাওয়ার উপায় কই? আমার বউ অবিশ্যি পারত। কিন্তু করবেনা।" বিঙ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাঁটু চাপড়াল। "তাছাড়া, আমি এমন দুর্ভাগা। এই প্রথমবার একসঙ্গে দু দুটো হরিণ মারলাম! হা হা, বরকনে দুটোকেই খতম করেছি!" ভোরের প্রথম আলো' ধোয়া তার কুঁচকানো মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়াল। "এইবার আপনার সব দেনা শোধ য়ে গেল। কেমন, যান, আমার বৌকে গিয়ে সব বলুন। আমিও বাড়িতে গিয়ে ঢুকি এবার। আঃ।"

"নিশ্চয় বলব।" সিংজি সস্নেহ চোখে বুড়োর দিকে তাকাল। "কেন, আমার তো মনে হয় দেনার চাইতে বেশি শোধ হয়ে গেছে। তোমার বউকে বলতে হচ্ছে কেমন আচ্ছা মজাদার বুড়ো পেয়েছে সে।"

"হেঁ, যদিও সাবাজীবনে আমি একটা কাণাকড়িও রোজগাব করতে পারিনি।" বিঙ মাথা তুলে অট্টহাসি হাসল। "কী মজা, না?"

"ঘাবড়াচ্ছো কেন, তোমার রোজগার করবার দিন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। কী বল?" সিংজি তাকে বৃথাই সান্ত্বনা দিতে সচেষ্ট হল।

"শালা বদমাস হাতির পাল!" হঠাৎ দারুণ রোষে দাঁত পিষে বুড়োটা থুতু ফেলল। হিংস্র ভঙ্গিতে দুচোখে আগুনের হলকা ছুটিয়ে খ্যাপার মত সে চেঁচিয়ে উঠল। "শুধু একটা, যদি একটা মাত্র হাতি খেঁপে উঠে ভগবানের অভিশাপের মত এই মাঠ বাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সবকিছু চুরমার কবে গুড়িয়ে সবাইকে খুন করে ফেলত—আঃ! শালা বদমাস, বদমাস!" নিজের ভিতরের আক্রোশের সাথে লড়াই করে থরথরিয়ে উঠল বিঙ। "ভগবান আমাকে, এমন দুর্ভাগা কবেছেন! ছোঃ —ভগবান!" সে কী গজর্ন বুড়োর। সকালের রোদে তার চোখ জ্বলছিল। আর মুখে সে কী হৃদয় নিঙড়ানো বেদনাব ছাযা।

নির্বাক, বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে সিংজি বুড়োর যন্ত্রণাদগ্ধ মুখে তাকাল। বিঙ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল. মুখ ভবে হেসে উঠল, যেন কিচ্ছুই হযনি। শরীর দুলিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "হবিণ, হরিণ। ইস,কী মজা। চলুন, সিংজি।" ঝুঁকে পড়ে একটা জানোয়াবেব শিং মুঠোয় ধরল বুড়ো। "আপনি বরকে ধরুন, কেমন? শীগগির ওদের গাড়িতে তুলে ফেলি, চলুন।"

বুড়োর ছেলেমানুষি চিৎকার ও প্রাণখোলা হাসিতে নিরালা সকাল চঞ্চল হয়ে উঠল। ততক্ষণে পৃথিবী জেগে উঠেছে। চারধারের প্রকৃতি সজীব, উজ্জ্বল। জানোয়ার দুটোর শিং ধরে টেনে হিঁচড়ে ভেজা ধানগাছের ভিতর দিয়ে পোয়া মাইল দূবে সবুজ টিলার পাশে দাঁড়ানো জীপ গাড়িটাব দিকে তারা এগোল। বিঙ হরিণটাকে টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে যেন দৌড়ুচ্ছে। মরা প্রাণীদুটোকে তুলে গাড়ির পিছনে শুইয়ে দিল তারা। সিংজি রাঙা ঘামভেজা মুখ ঘুরিয়ে বুড়োর দিকে ম্লান হেসে তাকাল।

"এর একটা তুমি নিও, বুঝলে? তোমার বউ বেজায় খুশি হবে।"

বিঙ দরাজভঙ্গিতে দুহাত মেলে ধরল। তার ভিতরে কী যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেমন একটা অভূতপূর্ব্ব সুখানুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করেছে। "আঃ ভাগ্যবান হওয়াটা কী চমৎকার। খুব ভাল।" সে যেন নিজেকেই শোনাতে লাগল।—"কই, আপনি আমার সঙ্গে আসছেন তো?" চকচকে একজোড়া চোখ সিংজির মুখে রেখে সে দাঁত মেলে হাসল। বাঁধভাঙ্গা খুশির ঢেউ সে যেন আর আটকাতে পারবেনা। "বউ বিশ্বাসই করতে চাইবেনা আমি এমনটি করেছি। হুঁ, আপনি ওকে চেনেন না তো! ও কিছুতেই বিশ্বাস করবেনা।"

"উহুঁ, আমায় এক্ষুণি চলে যেতে হবে।" আব কোন কথা না বলে সিংজি গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিল। বিঙ তার পাশে বসে পাইপ জ্বেলে মুচকি হাসতে লাগল।

দূবের পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্য উঠল। সোনালী আলোর ছোপ সবুজ টিলার গায়ে বনে বনে ছড়িয়ে পড়ল। সোনাঝিলমিল পাইনের ঝালর খুশিতে নাচতে সুরু করে দিল। উঁচু নিচু সর্পিল পথে গাড়ি ছুটে চলেছে। ততক্ষণে সকালের রোদে উচ্ছল বন, সবুজ মাঠ ও পাহাড়ি নদী খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে। ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠের ওপারে টিন ছাওয়া ঘরবাড়ি বাজার যেন নীল আকাশের পটে আঁকা উজ্জ্বল বঙীন ছবি। সিংজি তার সামনের কাচের ভিতব দিয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল কেমন ছেলেমানুষি খেলায় মেতে উঠে সে রাতভর মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে অবাক মানল, মনে মনে হেসে হাই তুলল। আঃ, এখন দরকার এক কাপ চা আর একটানা ঘুম। তাব পাশে বসা বুড়োর অবিশ্রান্ত বকবকানি আব মোটেই ভাল লাগছিল না।

সহসা চাপাগলায় ধমকে উঠে বিঙ তার হাত চেপে ধরল। ছুটন্ত গাড়িটা টলমলিয়ে উঠল। "থামুন, শীগগিব থামুন বলছি। আঃ, হতচ্ছাড়া গাড়িটা থামান না!" সে খ্যাপার মত আবাব শাসাল।

সিংজি ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। পবমুহূর্তেই তাব বিস্ময় হিংস্র বাগে রূপান্তরিত হল, তাব গোল চোখ বিতৃষ্ণায় ঝলসে উঠল। শক্ত হাতে ষ্টিয়াবিং চেপে গর্জ্জে উঠল সিংজি।" বোকার মত লাফাচ্ছ কি। গাড়ি থেকে পড়ে যাবে সে হুঁস আছে?

বিঙ তাব কাঁপা কাঁপা হাত সরিয়ে নিল। তাব শুকনো মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনা মাখানো। জোবে জোবে শ্বাস ফেলে ভুতুড়ে গলায় সে আর্ত মিনতি জানাল : দোহাই, গাড়িটা থামান। দোহাই আপনাব। ইস, একটা ভাগ্যবান লোক বটে আপনি। দেখুননা, একটিবাব শুধু তাকিয়ে দেখুন!" সে হাঁপাতে হাঁপাতে হাত দিয়ে দেখাল। "বরাতের দিন জীবনে শুধু একটিবাবই আছে। একটি বার!"

সিংজি মাথা ঘুরিযে সবুজ ঢেউজাগা মাঠেব ওপরে জলা জংগলেব দিকে দেখল। ভারি সুন্দব একটা বাচ্চা হরিণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সন্ত্রস্তভাবে জলো ঝোপঝাড় পেবিয়ে ঘন জংগলের দিকে ছুটে চলেছে। সোনালী রোদ ওব ঘন বাদামি চামড়ায় ঠিকরে পড়ছে। বমণীয় প্রান্তর বেযে ছুটে চলা ওই হরিণশিশুব দিকে তাকিয়ে থাকা সে কী এক অপূর্ব মনভোলানো, নয়নলোভন অভিজ্ঞতা।

চামড়াব সে কী ঝিলিক, মাথার সে কী শোভা। গাড়ির শব্দে হরিণশিশু সভযে

মুহূর্তের জন্যে ঘুরে তাকাল। সিংজি ডুকরে উঠল : "আহা, কী চোখ! সুন্দর অপরূপ বিঙ বন্দুক তুলে তাক করল। সিংজি চকিতে বাঁ হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা চেপে ধরল, তিক্ত বিরক্তিতে ঝংকার দিল। "না বুড়ো, ওকে মারতে নেই। ও দেখার জিনিস। দুচোখ ভরে ওকে শুধু দেখে নাও। আহারে!" গাড়ির গতি কমে এল। হরিণটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে জংগলেব দিকে চলেছে। বিঙ বন্দুক নামিয়ে চাপা রাগে ফুলে উঠে সিংজির মুখে কটমট করে তাকাল, মাথা ঝাকানি দিল। "এমন বরাতের দিন আমার কক্ষনো ফিরে আসবেনা। এই আমার প্রথম আর শেষ সুযোগ।" অকারণে মার খাওয়া শিশুর মত সে চিৎকার করে উঠল. "আমি মারব ওকে! থামান গাড়ি। থামান বলছি!"

মনোহরণ হরিণী ততক্ষণে প্রায় জংগলের কাছে এসে পড়েছে। বিঙ চেঁচিয়ে বন্দুক নিয়ে গাড়ি থেকে লাফ মারল, হোঁচট ও ঘুরপাক খেয়ে তার শরীরটা গড়িয়ে একেবারে গাড়ির পিছনের চাকারতলায় পড়ল। কয়েক ফুট সামনে গিয়ে জীপগাড়িটা থামল। সিংজি নামল। হরিণশিশুটা শেষবারের মত চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড় বেকিয়ে তাকে দেখল, এর পর মিলিয়ে গেল।

সিংজি হাঁটু গেড়ে বুড়োর পাশে বসে মাংসল হাতটা তাব শরীরে ধীরে ধীরে ঝুলিয়ে দিল। বিঙ লাল পাথরকুচির রাস্তায় চুপ চাপ চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ঘুমুচ্ছে যেন।

"বিঙ!" সিংজি ফিসফিসিয়ে উঠল। ভাবল, "আমার কী দোষ?" স্থির বিষাদ মাখা চোখে সে বুড়োর প্রশান্ত বোদেভাসা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওই যে মুরগির বাচ্চাটা আমার গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরল সেও আমার দোষ নয়। মহাবিরক্তিতে সিংজি কব্জি ঝাকুনি দিল। হঠাৎ একটা চিন্তা তার বিষণ্ন মনে ঝিলিক মারল। ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন কী করা দরকার তাতো জানাই আছে। আচ্ছা?

ঝিমানো চোখ তুলে সহাস প্রান্তরের ওপারে গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকল সিংজি। লোকদের ছোট মূর্ত্তিগুলি কুটির থেকে বেরিযে এধার ওধার মাঠে ঘুবছে, কাজ করছে। সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সিংজি। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর সে বন্দুকটা তুলে নিয়ে বুডোর বুকের উপর আড়াআড়ি রেখে দিল, এরপর গাড়ি থেকে হরিণটাকে নামিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল।

রোদঢালা পথে বুড়ো আর হরিণী পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। বিঙের মুখে তাকিয়ে সিংজির মুখখানা কেমন আর্ত হাসিতে কুচকে কুৎসিত হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল : ওরা সবাই কাণ্ডখানা ঠিক বুঝে নেবে। এ পথেতো হামেশাই গাড়ি যাচ্ছে না।"

সে যাক। মুবগি চাপা দিলে পঞ্চাশ টাকা। ছাগল একশো টাকা। আর মানুষ চাপা দিলে? মোটে কুড়ি টাকা। ভারি সস্তা। খুব ন্যায়সঙ্গত দাম বলতে হবে।

সোনার সবুজে মাখামাখি প্রান্তর বেয়ে বহুদূরের মিলিত কলরব ও হাসাহাসির রেশ ভেসে আসছে। বাজার সরগরম। সিংজি তার পটেক থেকে দুটো দশ টাকার নোট টেনে তুলে নিটোল ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়ল।

"শেষ পর্যন্ত তুমি কিছু রোজগাব করতে পারলে—বুড়োর দিকে তাকিয়ে সে

হেসে উঠল। কান্নায় তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। "আমি দুঃখিত, বিঙ, এই যে, নাও।" ভাজ করা নোট দুটি মরা মানুষটার পকেটে গুঁজে সিংজি উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে গাড়ির ইঞ্জিন গর্জ্জে উঠল, জীপটা শান্ত গ্রাম ছাড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে শিলঙের দিকে ছুটে চলল।

সন্ত্রস্ত মুরগির পাল আবার সকলরবে ঝাপটে চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে। ছেলেরা আনন্দে চেঁচিয়ে ছুটন্ত গাড়ির দিকে হাত ছুঁড়ছে। শান্ত লোকগুলো ধীরে চোখ তুলে আপন মনে হাসছে। সব কিছুই ঠিকঠাক সুন্দর।

পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

আলতা

'আপনার মেয়েও নিশ্চয় আলতা পরতে চায়, এখন?' প্রশ্নটা হঠাৎ আমাকে একঘা চাবুক মারলো যেন।

আমি তখন ছোট। বছর তেরো চৌদ্দর বেশি নয় বয়স। বাড়িতে বাসন্তী পুজো হচ্ছে। আমাদের সঙ্গতির বিচারে বিরাট আয়োজন। রামনবমীর দিন দুপুরবেলা পাঠাবলি হবে। মানৎ ছিলো বোধহয়। তাই জোড় পাঠা পড়েছে সেদিন। চণ্ডীমণ্ডপে বেশ ভিড়। প্রথম বলির সঙ্গে সঙ্গেই 'জয় মা ভবানী' ধ্বনি আর সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা গান ধবলেন, 'দেখো, কার মাইয়া রণে নাচে ল্যাংটা'। রণের গান। কালীপুজো দুর্গাপুজো সব সময়ই বলির সময়কার বাঁধাধরা গান এটা। ততোক্ষণে দ্বিতীয় বলির আয়োজন। কাসর ঘন্টা দ্রুতলয়ে বেজে চলেছে। উলূধ্বনির রোল শেষ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কে-যেন গান ধরলো, 'সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে'।

পুরুতমশাই বাধা দিয়ে উঠলেন, 'আহা-হা, করছিস কী? সরে দাঁড়া।'

বাবা লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে প্রণাম করছিলেন। বলির সময় সব বারেই তাই করেন তিনি। জয়ধ্বনি শুনে ওঠেন। জয়ধ্বনি হলো এবারে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেনা যেন গান ধরেছিলো, থামলেন কেন?'

পুরুতমশাই বুঝিয়ে বললেন, 'ওই মুসলমান ছেলেটি। ইদ্রিসের ছেলে রসুল। প্রায় ছুঁয়েই দিয়েছিলো বলির রুধির।'

এদিকে নিয়মের গানটিও ওতে বাদ পড়ে গিয়েছিলো। বাবার ইচ্ছেয় রসুলই গান ধরলো—

'সে কি এমনি মেয়েব মেয়ে
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন
হলাহল খেয়ে...।'

যখন সে শেষ কলি গাইল—

'প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে।'

তখন বাবাব চোখে জল। বাবা আদর কবে ডাকলেন ওকে। বহস্যটা পরিষ্কার হলো এবারে। রসুল ছিলো আসলে রসিকলাল চক্রবর্তী। ফরিদপুরের এক বাড়ি পালানো ছেলে। ইদ্রিস শেখ কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসেছিলো—নতুন নাম দিয়েছিলো 'রসুল'। সেদিন থেকে আজ অব্দি দুটো গানই হয় আমাদের বাড়িতে রণের গান হিসেবে।

তাবপর থেকে রসুল প্রায়ই আসতো আমাদের বাড়িতে। দাওয়ায় বসে মাতৃসঙ্গীত শুনিয়ে যেতো অনেকগুলো। বলির মাংস খেতে বারণ থাকলেও ও তা মানেনি কোনদিন। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসতে ইদ্রিসও তাকে বাধা দেয়নি কখনো।

সেই ঘটনার পর বেশি দিন যায়নি। দেশবিভাগ হলো। বাবা সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিলেন। ওদের দেশে থাকা হবে না স্থায়ীভাবে। ভদ্রাসন বিক্রি করেন নি, অস্থাবর সম্পত্তি যা তিনি করেছিলেন তারই পুষ্পমূল্য নিয়ে চলে এলেন এদেশে। আর গাঁয়ের মুখ দেখিনি আমরা দীর্ঘ পঁচিশ বছর। আমাদেরকে মোটামুটি মানুষ করে বাবাও চোখ বুজেছেন। আমরাও সংসার সাজিয়ে বেশ আছি। মধ্যে মধ্যে আমার ছেলেমেয়েদের কাছে আমার পুরনো গাঁয়ের বাড়ির গল্প করি। ওরা হাঁ করে শোনে, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জন্মভূমি দেখবার সাড়া পড়ে গেলো দেশ জুড়ে। আমারো প্রাণ কেঁদে উঠলো। ঠিক কবলুম, আমিও যাবো একদিন। দেখে আসবো পুরনো বাড়িটা। কয়েক পুরুষ ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক বাড়ি। দশবিঘে জমির উপব টিলে বাড়ি। সামনে ছোটখাটো একটা দীঘি, ডানপাশে এঁদো পুকুর, দীঘির পাড়ে মোটব গ্যারেজ। একটু ওপবেই চণ্ডীমণ্ডপ আর কাছাবী ঘর। একেবারে ওপরে পাকা ঠাকুরঘর আব টিনেব অন্যান্য ঘর। চারপাশে আম, কাঁঠাল, সুপুরী আর অন্যান্য ফলের গাছ আর সব্জীবাগান। কী দেখলো আর কী না এনিয়ে বেশ একটা শিহবণ জাগছিলো মনে।

একদিন সত্যি সত্যিই পাড়ি দিলুম সিলেট শহবে। পাকিস্তানী অত্যাচারেব চিহ্ন সর্বত্র। সবাই বলছিলো, গ্রামাঞ্চল খুব একটা নিরাপদ নয় এখনো। তবুতো ফিবে যাওয়া যায় না। মোটরে কবে আলিপুব গিয়ে চৌধুবী বাড়িতেই উঠলুম। কী বিরাট প্রাসাদ ছিলো একদিন—ইয়াহিযাব গুলিতে ঝাঁঝরা হযে গেছে সব। সাধনদার বাড়িতে গিয়ে দেখা কবলুম। ওঁব ছোট ভাই সামু আমাব সাথেই পড়তো। পরিচয পেয়ে জড়িয়ে ধবলেন—এসেছো যখন, ছাড়ছিনে বেশ কিছুদিন। আমার ফিরে যাবাব তাড়ার কথা বললুম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুদিন থেকেও ছিলুম। তবে তক্ষুনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমাব গাঁযেব দিকে। আগেই শুনেছিলুম যে সেখানে হিন্দু বলতে আছে বোধহয় নাপিত অধর আর বিলেব ধারে ধাবে কয়েক ঘর পাটনী। মাত্র মাইলখানেক দূর, কিছু পরিচিত পবিবেশের নতুন চেহাবা দেখে পুলক অনুভব কবছিলুম। দুঃখ হচ্ছিলো, মানবজাতির পক্ষে এ কী অপমান। নিজেব জন্মভূমি আর অতি তীর্থ নিজেব গাঁয়ে যাচ্ছি এক পরদেশীর মতো। সোজা গিয়ে উঠলুম অধরদেব বাড়ি। বাড়ির চেহাবা অনেক উন্নত এখন। গ্রামেব অনেক পলাতক পবিবারেব সম্পত্তিব তদারকেব ভাব পেয়েছিলো সে, আর তারই দৌলতে মোটামুটি এক ক্ষুদে জমিদার। বাড়িতে একা অধবই আছে। গোলমালের সময পরিবাবকে 'হিন্দুস্তানে' নিয়ে গিয়েছিলো। ওবা এখনো ফেবেনি। গ্রামেব সব খববই নিলুম ওব কাছ থেকে। দেখবাব কিছু নেই। আমাব নিজের বাড়িটা এখন পবের সম্পত্তি। এক বিলিতি জাহাজেব খালাসী মুসলমান লণ্ডনেব টাকায় আর আযুবখানেব অনুমতিতে দালান তুলেছে। গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে হয়তো বিপদও হতে পাবে। বাড়িতে ঘরগুলো দেখলুম শুধু দূব থেকে। দুটো পুকুরেব জল জলজ গাছ আব পানাতে ছেয়ে আছে।

হঠাৎ মনে পড়লো রসুলেব কথা। ইদ্রিসের বাড়ির দিকে গেলে কেমন হয়? প্রায় আমার অজান্তেই সাইকেল সেদিকে চললো। 'রসুল, ও রসুল শেখ, বাড়ি আছিস?' ঘর থেকে বেরোল এক অবগুণ্ঠনবতী, পরনে সবুজ শাড়ী, গাঢ় সবুজ পাড়।

উনিতো ক্ষেতে গেছেন।

কখন ফিরবে?

এই একটু পরেই খেতে আসবেন।

বসলেও পারি, তবে বসতে বলছে নাতো ও।

বুঝলুম ও রসুলের স্ত্রী।

একটু এদিক সেদিক ঘুরে, ঘন্টাখানেক বাদে এসে আবার ডাকতেই সাড়া পেলাম। এবারে রসুলের। একটু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, মিঞাসাবকে তো চিনতে পারছিনে।'

হেসে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরলুম, 'চিনতে পারবি কী করে ভাই! আজ তো পঁচিশ বছর পরে দেখা।

পবিচয় দিতেই হলো। ঘরের ভেতরেও উসখুশের আভাস পাওয়া গেলো। চাটাই এসেছে আমাব বসবাব জন্য। দেখলুম, অবগুণ্ঠনবতী ঘোমটার ফাঁকে আমাকে দেখচে। রসুল বললো, 'আমার বিবি। ওকেও আপনি চিনতেন। নাম পাল্টায়নি, মনি মনিই রয়ে গেছে। স্মৃতির গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছি, কোন সাড়া নেই।

আপনাদের রায়ত হরি নাপিতের মেয়ে।

আকাশ থেকে পড়লুম। মনি শেষ পর্যন্ত এখানে! বললুম, 'বেশ তো, কেমন আছো তোমরা?'

হঠাৎ মনে হলো, ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু? জিজ্ঞেস করলুম, তোর খাওয়া হয়নি রসুল?

আর আপনার?

আমি আলিপুরে চৌধুরী বাড়িতে খেয়ে তবেই বেরিয়েছি। তোমরা এবার খাও গিয়ে। তোমাদেব ছেলেপিলে?

দুই ছেলে সালাম আর মাতলু। কুড়ি আর আঠারো বয়েস। ওরা পালা রাখতে গেছে। সেই সন্ধ্যেবেলা ফিরবে।

আচ্ছা আমি তাহলে বসি। মনি, তোমবা খেয়ে এসো, তখন আরো গল্প হবে'খন।

ছেলে দুটো 'পালা' রাখতে গেছে। অনেকদিন পর কথাটা শুনলুম। গাঁয়ের সব বাড়ির গরু নিয়ে মাঠে চরাতে যায় কোন এক বাড়ির ছেলে রাখাল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব বাড়িরই পালা রাখার সময় হয়।

একা বসে আছি আর স্মৃতির কোঠা থেকে হাওয়ায় মিষ্টি ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আমরা কিন্তু জমিদার ছিলুম না কোনদিন। তবে আমাদেরো কয়েক ঘর রায়ত ছিলো। ওরা বিনি খাজনার জমিতে বাড়ি বানিয়ে থাকতো আর প্রয়োজন মতো আমাদের সেবা করতো। আমাদের রায়তরা বৃত্তিতে ছিলো নাপিত, ধোপা, তেলি (যারা ঘানি চালাতো), মালি আর দিনমজুর। সে নাপিত হরিরামের মেয়ে মনি, আমার সমবয়সী। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করেছিলুম মনির শরীরে কোন কারিগরের অদৃশ্য হাত পড়েছে। পুজোর আগে যেমন কারিগর এসে খড় বিচালি আর মাটি দিয়ে ঠাকুর প্রতিমা গড়তো, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গের নিটোল রূপ দিতো, তেমনি কেউ যেন মনির শরীরেও করে যাচ্ছে। একদিন বললুম, 'মনি তুই দিনে দিনে কী সুন্দর হচ্ছিস রে।'

মনির মুখ লাল হয়েছিলো সেদিন, 'কী যে বলেন ছোটবাবু।'

অপরূপ দেখাচ্ছিলো মনিকে তখন। চুপ করে তাই দেখছিলুম অনেকক্ষণ। ও বললো, 'সবাই এই এক কথা বলে আজকাল। ভীষণ লজ্জা করে।'

—কে কে বলে রে?

—না আমি যাই এখন।

আবার একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলুম, কে কে বলেরে তুই সুন্দর?

আবার লাল সে। 'ওই রাণা ঠাকুর।'

রাণা ঠাকুর? হঠাৎ রাণাকে ভীষণ অসৎ আর কুৎসিৎ মনে হলো আমাব। বরু ঠাকুরেব ছেলে রাণা। বছর কুড়ি হবে বযস। বাবার বৃত্তি পুরুত-গিবিতে সাহায্য করতো মাঝে সাঝে। টোলে পডতো আর সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফিরা করতো গ্রামে।

আর কী বলেরে সে?

আমাকে নাকি আদর করতে ইচ্ছে কবে ওর।

ভীষণ বাগ ধরলো আমাব। এ কী ভীষণ অন্যায়। রাণাব সম্বন্ধে কানাঘুষা যা শুনি তার সবই যেন বুঝতে পাবি এখন।

আর কিছু?

আমাকে মধ্যে মধ্যে এটা-সেটা দেনও। বলেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে গেলো মনি। হঠাৎ চোখে পড়লো ওর পায়ে আলতার দাগ। নিশ্চয় ওই বেটার কাজ। আমাব মাথায তখন আলতা বঙের রক্ত গলগলিয়ে উঠছে।

বাসন্তী দুর্গার ঠাকুর তৈরী হচ্ছে বাড়িতে। পুজোর আর দুদিন বাকি। ঠাকুবের গাযে হরিতালের হলুদ রঙেব পোছ পড়েছে। অন্যান্য রঙও তৈরী। কারিগরকে বলে একটু কড়া লাল খুনি রঙ সংগ্রহ করলুম। দুপুরের নির্জনতাব সুযোগে সেটা নিয়ে মনির বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। মনি মুহূর্তে আমাকে বাতিল করে দিলো। ওঘব থেকে এনে দেখালো 'গৃহলক্ষ্মী তরল আলতা'র শিশি। বাণা ঠাকুব দিয়েছে। কয়েকদিন আগে বিয়ে হওয়া বৌদির কাছ থেকে চুরি করা। লজ্জায় আমাব মুখেই বোধহয় আলতা বঙ ছড়িয়ে দিল সেদিন। মনি ঠিকই বলেছিলো। খুনি বঙে ঠকবে কেনো সে।

বাসন্তীপুজো গাঁযে কেবল আমাদেব বাড়িতেই হয়। বরু ঠাকুর পুজো করেন, রাণা ওর সহকারী। প্রায় সবসময়ই আছেন ওরা। আমাদের রায়তবাও এই ক'দিন আমাদের বাড়িতেই থাকতো, খাওয়াদাওয়া করতো। আমি যেন অনেকবারই লক্ষ্য করেছি, বাতের অবছা অন্ধকারে মনি আর রাণা বেশ ঘনিষ্ট হযে যায়। ব্যাপাবটা বুঝতে না পারলেও কিছু-একটা আঁচ করতুম।

অনেকদিন পর কখন যেন, শুনেছিলুম, মনি একটা ভীষণ অসৎ মেয়ে। এমন মেয়ের এরকম সর্বনাশ তো হবেই। ওর মা-ই নাকি দিশি গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ করিয়ে ওকে জাতে তুলেছিলো। আমি শুধু দেখছিলুম, অদৃশ্য কারিগরের দেওয়া সব রঙ ওর গা থেকে কে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়লো। 'আমরা তো খেয়ে এলাম। আপনার পেটে যে অনেকক্ষণ কিছু পড়েনি।'

হ্যাঁ সত্যিই বলছে ওরা। সাধনদা নিশ্চয় আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন এখন। 'বললাম, কী খাওয়াতে চাও তোমরা?'

আমাদের ছোঁওয়া খাবেন কেন আপনি?

তোমারা যা দেবে তাই খাবো। তোমরা যে আমাব আপনজন। আর আজকাল আমরা এসব মানিনে। আমরা তো সবাই মানুষ।

ওরা বিশ্বাস করেনি। বললো, গাছে পাকা কাঁঠাল আছে একটা। যদি খান খুব খুশি হবো আমরা। এই মাটির ঘটিটা নিয়ে পুকুব থেকে জল এনে খেয়ে নেবেন। আমরা ছোব না।

মনিব কথাটা মাথায় চেপেছিলো আমাব। শুনলুম দেশবিভাগের পর আরো তিন হাত ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত বসুলের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলো সে। এখন ওদেব সুখের সংসাব। ছেলেবা মক্তবে পড়ে আর ক্ষেতের কাজকর্ম কবে।

তোমাব পূর্ব জীবনেব কথা মনে হয না?

হ্যাঁ, আমি বোধহয মুসলমান হতে পাববো না কোনদিন। কালীব গানের কথা মনে হলে এখনো পাগল হয়ে যাই আমি। বললো রসুল।

আব তোমাদেব ছেলেরা?

ওরা তো গোড়া মুসলমান। ওদের কাছে আমরা দুজনেই কমজাত কাফের!

রসুল গান শুনিয়েছিলো কযেকটা। 'সেকি এমনি মেযেব মেযে,' 'মায়ের মূর্তি গডাতে যাই মনে ভ্রমে মাটি দিযে,' আর আবো কযেকটা, আমবা দুজনে শ্রোতা।

আমাব খবব জিজ্ঞেস করায় সংক্ষেপে সব প্রশ্নের উত্তব দিযেছি। বাবা নেই শুনে মনিব চোখে জল এসেছিলো। আমার ছেলেমেয়ে? মেয়ে কতো বড়ো?

সে-ই তোমাকে যখন শেষ দেখি তখন তুমি যতো বড়ো ছিলে।

আপনার মেযেও নিশ্চয আলতা পবতে চায, এখন?

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

কাক্য রচনা

কোলকাতা পৌঁছেই খবর পেলাম, ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া থেকে কাকীর আগমন হয়ে গেছে। দেখতে গেলাম। রূপে মুগ্ধ। শ্বেতশুভ্রবর্ণা। ঠোঁট দুখানি দুধে-আলতা। এতদিন রূপ নেই বলে কত কথা শুনেছি। রঙ কালো। কৃষ্ণকালো।

কাকী মানে—কাক কন্যা। অষ্ট্রেলিয়াব সাদা কাক।

কাক কালো—কলঙ্ক কালো। দিস্তে দিস্তে কাগজ লিখা হয়েছে—। অষ্ট্রেলিয়ার যে এত সুন্দর কাক কাকী আছে—তার কথা নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই কাকদের মনে দুঃখ। রূপ নেই। কাকদের দুর্বলতাব ফাযদা তুলেছিল শেয়াল। কি ভুবনমোহন রূপ। আ—হযা। না জানি কত মধুব তোমার গান। তারপব জিলেপি পড়ে যাওযা।

কাক চালাক—কিন্তু গল্পের চালাক শিরোমণি শিযাল তাকে ঠকিযেছে। সত্যিকাব ঠকানোব ঘটনা হচ্ছে—কাকেব বাসায কোকিল সুন্দরীব ডিম পেড়ে আসা। কোকিল দম্পতি সংসাব টংসাবের বিশেষ ধাব ধাবে না। শিল্প-সঙ্গীতের জলসায় দিনেব পব দিন—রাতের পর বাত কাটায়। দালান কোঠা রঙ্গীন করে বানানোর ধার ধাবে না। শিল্প-সঙ্গীতের জলসায় দিনেব পর দিন—বাতেব পর রাত কাটায। দালান কোঠা বঙীন করে বানানোর ধাব ধারে না।

কাক আমাদেব নিত্যসঙ্গী। গ্রীষ্ম-বর্ষায কা—কা—। কোকিল বসন্তের। বসন্ত জাগ্রত হলেই মিস্টার কোকিল মিস--বা মিসেসেব উদ্দেশে কুহু—কুহু ধ্বনিতে গাইতে শুরু কবেন—"তোমারি সাথে বাঁধিব—আমাব জিন্দেগী গানের বাঁধনে।"

নিজেব রূপ কৃষ্ণকান্ত। প্রেয়সী রূপ মনোহর। বাদামী রঙ্গের সাথে বিচিত্র রঙ্গের ছোপ। পববর্তী স্তবে—সুন্দবী মা বননেওয়ালী হলে, প্রসূতি সদন রূপে—কাকের বাসার অন্বেষণ। মিস্টার কোকিল কপট ঝগড়ায়—কাককে দূবে সরিযে নিলে—ঝুপ করে কোকিলসুন্দবী কাকেব বাসায একটি ডিম প্রসব কবে ফেলেন। তবে ফেবার কালে কাকের একটি ডিম ঠোঁটে কবে নিয়ে আসতে ভুলেন না। কাবণ কাক যোগ-বিয়োগ অঙ্ক জানে। কোকিল সুন্দবী প্রতি বসন্তে তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়েন। কৃষ্ণকান্ত ও সুন্দরীকে বেশকটা কাকেব গৃহস্থালীতে হানা দিতে হয়।

ডিমফুটে বাচ্চার রূপ প্রকাশ পেলে,—কাক, শিল্পীদম্পতির শাবককে আচ্ছা ধোলাই দিয়ে তাড়িযে দেয়। তবে এই শিল্পীদম্পতির ভালবাসাব ফসল সন্তানটিও কম নয়। কাকের বাসায় যদি বড় হবাব একটু সুযোগ পায়—মানে অন্ততঃ তার গায়ে দাঁড়ি-গোঁফ উঠতে শুরু করে, তখন তার বাল্য সঙ্গী অর্থাৎ গৃহস্বামীব সন্তানদের দু-একটাকে ঠেলে ফেলে দেয়। কোকিলের এমনি স্বভাবে মুগ্ধ কোন মহাকবি লিখেছেন—"কাকেব বাসায় কোকিলের ছা/জাত স্বভাবে রূাড়ে রা" রা অর্থ রব।

মনে আছে বাল্যে মগডালে চড়ে—কাকের বাসায় অভিযান কবেছিলাম। কাকের

ডিমের রঙ নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। দেখলাম। কী সে সুন্দর। নীলাভ সবুজ রঙ—এর মাঝে ছিটানো কিছু লাল বিন্দু।

ডিম নিয়ে প্রশ্ন জাগার আংশিক দায়িত্ব ঠাকুরপিসির। বৈশাখ জষ্ঠির কালো মেঘে আকাশ কেঁপে উঠলে তিনি ডান হাতে আকাশে কিছু ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে বলতেন—"যাঃ—যাঃ—কাউয়ার ডিম ভোলা, কাউয়ার ডিম ভোলা।" এমনি ভয়ঙ্কর কথা শুনতে পেলে তুফান নামতে সাহস পায় না।

কাকের বাচ্চা নিয়ে আমাদের হেলা ফেলা।... কিছুদিন আগের কথা। বিকেলে বন্ধুর বাড়িতে গল্প করছি। বাজার থেকে বন্ধুর কিশোর পুত্র—প্যাকেট হাতে ঢুকলো। জবাবে বল্লো—এ হচ্ছে হাল ফ্যাসনের জিনসের গান-শট প্যান্ট। বন্ধু রেগে বল্লেন —"তুমি—আর তোমার মা—। হাতে পয়সা পেলেই তোমাদের স্বভাব, কাকের বাচ্চা কেনা।" সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পর্দ্দার অন্তরালে বামাকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ কা-কা-কার। ফলতঃ আমার একশ লক্ষ বছরের সুপ্রাচীন লেজে শিহরন অনুভব—এবং লেজ গুটিয়ে পলায়ন।

কাকের বাচ্চা কেনা নিয়ে গল্প শুনেছিলাম। জনৈক ভাগ্নে—দুটি কাকের বাচ্চা বাসা থেকে পেড়ে আলাদা খাঁচায় রাখে। এক কাকভোরে একটি খাঁচা সহ সাত কিলোমিটার দূরে—মামার বাড়িতে হাজির হয়। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে তিরিশ টাকায় খাঁচাসহ এই বাচ্চাটি কিনেছে। তবে আর একটি খাঁচা ফাউ দিয়েছে। ফাউ খাঁচা বাড়িতে রেখে এসেছে। তবে বাচ্চাটি কিন্তু সাধারণ নয়—যাকে বলে "আছাবুয়ার ছাও"। মানুষের কথা বোঝে। মামা ভাগ্নের তর্ক। স্থির হয় পরীক্ষা হবে। ভাগ্নে খাঁচায় মুখ লাগিযে ছাওকে বলে—বাতাসের বেগে উড়ে গিয়ে মাকে যেন বলে —মামু আসছেন। মা যেন মামুব জন্য চালতা দিয়ে খেসারী ডাল—আর সীম বীচি দিয়ে কচু শাক রেঁধে রাখেন। ভাগ্নে এই বলে কাকের বাচ্চাকে আকাশে উড়িয়ে দিল।

ভাগ্নের সাথে মামা সাত কিলোমিটার পার হয়ে এলেন। মামা দেখেন ভাগ্নের দরজার পাশে খাঁচায়—সেই কাকের বাচ্চা। খেতে বসে পেলেন সেই পদ। মামা তাজ্জব। দর দাম। ফয়সালা। দু হাজারে কাকের বাচ্চা কিনে মামার প্রস্থান।

বলা বাহুল্য। ভাগ্নে মামার বাড়ি যাবার আগেই মাকে বলে গিয়েছিল এ দুটি বিশেষ পদ রান্না করতে। ভাগ্নের সংগৃহীত দুটি বাচ্চার একটিকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। অন্যটি মামার সামনে উড়িয়ে দিয়েছিল। মামা দ্বিতীয় বাচ্চাকে দেখে ভেবেছিলেন এটি সেই উড়িয়ে দেওয়া বাচ্চা। কাকের বাচ্চার চেহারা মনে রাখা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

গ্রামে গঞ্জে কিন্তু কাকের বাচ্চা নিয়ে খুব উৎসাহ। আবহ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ অপেক্ষা গ্রামে গঞ্জে কাকের বাচ্চা বিশ্বাসযোগ্য। কাকের এক থেকে চারটা বাচ্চা হয়। খনা দেবী এই কাকের বাচ্চার সংখ্যা দিয়ে তার বাৎসরিক আবহাওয়া, শস্যের পরিমাণ সম্পর্কে ফোরকাস্ট ঝেড়ে গেছেন। এক বাচ্চা হলে লোক ভয় পায়। দুটো হলে ভয় কিছু পরিমাণ কম। তিনে দারুণ আনন্দ। চারে আতঙ্ক। বচন হচ্ছে—

"একে আকাল—দুয়ে পাকাল।" পাকাল অর্থ অল্প সল্প ধান হবে। "তিনে ধান —চারে বান।" বান অর্থ বন্যা।

পৃথিবী ব্যাপী কাকের সাম্রাজ্য। আকৃতি—ছোট বড় মধ্যম। বঙ—সাদা, কালো, অর্দ্ধকালো।

আমাদের দু ধরনের কাক। দাঁড় এবং পাতি। পাতি কাক অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দাঁড় কাকের মত সর্বাঙ্গ মিশমিশে কালো নয়।

কাক কা-কা করে কালো রাতকে মেরে কেটে আমাদের ঘরে ভোর নিয়ে আসে। লক্ষ লক্ষ বছরব্যাপী কাকের এই কর্মের কোন স্বীকৃতি নেই। তবে জীববিদ্যা বিষয়ের পণ্ডিতগণ কাকদের গুরুগম্ভীর নাম রেখে কিছু ঋণ শোধ করেছেন। বিজ্ঞানীদেব ভাষায়—কাক হচ্ছে—পাসসেরিফর্মেস বর্গের কোর্ভিদে গোত্রের পাখি (order of Passeriformes and Family Corvide)

লেটিন ভাষায় কারভুস (Carvus) হচ্ছে দাঁড়কাক। ইংরেজীতে যাকে বলে রেভেন (Raven)। পাঁতি কাকের ইংরেজী নাম Crow এবং লেটিনে cornix.

আমরা যেমন কাক বলতে সব ধরণের কাক বুঝি তেমনি ইংরেজ সাহেব মেম crow বলতে সব ধরনের কাক বুঝে থাকেন। ইংরেজীতে Crow, Raven এদুটি ছাড়া আরোদুটি নাম হচ্ছে—Rook এবং Jack daw। সাহেব কাকের তিন আকৃতি। ছোট—বড়—এবং মধ্যম। রেভেন বড়। ক্রো মধ্যম। জেক ডো ছোট। এই ছোট কাকের সার্টিফিকেট নাম যদিও জেক ডো তবুও সাহেব মেমবা আদর কবে বলেন—ডো।

আদরের এই daw নামটি হালের নয়। অনেকদিন আগে হিটলারের ঠাকুর্দার তস্য ঠাকুর্দার অর্থাৎ প্রাচীন জার্মানগণ (O. H. G) এই daw কে—"টাহা" (Taha) বলতেন। এখন এই দেয়ালভাঙ্গা জার্মানে এর নামে ডোহোলে (Dohole)। সিলেটিতে দোয়েল পাখিকে "দুইওল" বলে। ডাহুক নামে আমাদের দেশে একটি পাখি আছে। কাকের মত মিশমিশে। কাব্য সাহিত্যে খুব আদর। ঘনবর্ষার বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিব ভাষায়—"মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাওত ছাতিয়া"।

দেশে দেশে যুগে যুগে কাকদের দুর্ভাগ্য। crow হচ্ছে কাক। কাকের প্রতিশব্দ। ইংরেজীতে crow বলে একটি ক্রিয়াপদ আছে। এর অর্থ 'ডাক'। মোবগের ডাক। কাকের ডাক নয়। সাহেবদের এটি মস্ত অপরাধ। মোরগের ডাক হিসাবে crow শব্দের ব্যবহার আজকের নয়। অন্ততঃ হাজার বছরের। প্রাচীন ইংরেজীতে এই crow অর্থাৎ মোরগের ডাক শব্দের রূপ ছিল—ক্রোয়েন (crowen)। মধ্য কালের ইংরেজীতে —ক্রোয়েন (crowen)। মোদ্দা কথা ঐতিহাসিক কাল থেকেই অবিচার।

বাংলা 'কাকলি' শব্দ সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে। কাকলি হচ্ছে পাখির সুমধুর কণ্ঠস্বর। কাকলি শব্দের মাঝে কিন্তু জ্বলজ্যান্ত "কাক" আছে। কাকের ডাককে কাকলি বলা? ছিঃ।

নিঃসন্দেহে এ অবিচার। কাকসমাজের প্রতি ঘোর অন্যায়। দলবদ্ধ ভাবে কাকদের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কর্তব্য।

কাকরা দলবদ্ধ হয়ে বাস না করলেও স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকে। সদাসর্বদা কাকদম্পতির খুব কাছাকাছি থাকা প্রাচীন প্রথা। তবে কাক সমাজে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন দুনিয়ার কাক না হলেও কাছাকাছি সব কাক একসাথে ওজস্বিনী ভাষায়,কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা তোলে।

সুতরাং crow এবং কাকলি শব্দের অপ-ব্যবহার সম্পর্কে কাক সভার আয়োজন করা উচিত।

কাক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সাক্ষরিত চিঠি, জরুরী ডাকে—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, কাক নেতাদের উদ্দেশে পাঠানো প্রয়োজন। চিঠিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কাকদের, তাদের নিজস্ব নামে সম্বোধন করা একান্ত করণীয় কর্ম। নাম লিখার পূর্বে "শ্রদ্ধেয়" শব্দ যুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে একটি পত্রে শ্রদ্ধেয় না লিখে, লিখতে হবে "শ্রদ্ধেয়া"।

সংস্কৃত কাক—বায়স। হিন্দি-নেপালী—কাউয়া' বাংলা—কাক। অসমীযা—কাউরী। পাঞ্জাবী—কাঁ। সাঁওতালী—কাহু। মিজো—চৌ (choak)' মণিপুরের জেলিযাং (Zeliang) নাগা উপজাতি—হে-কাক (Hegak)। গারো—দ্বৌ-কা (Do—Ka) ত্রিপুবাব ককববক ভাষার তোখা সিলেটি—ধূরা-কাউয়া এবং ফাতি-কাউয়া। খাসী? হ্যাঁ। খাসী ভাষার কাকদের লিখতে হবে—শ্রদ্ধেয়া—কা-টেংআব (Ka Tyngab) খাসী ভাষাব কাক হচ্ছে--মহিলা কাক। সুতরাং এই নামে শ্রদ্ধেয়া লিখতে যেন ভুল না হয়।

সভায় বিলাতের ডো, গাবো পাহাড়ের ডৌ-কা ককবরকেব তোখা এবং সিলেটের ধূরা-কাউয়ার কুমারী কন্যাবা—কাক ভোরে—কাকস্নান করে, সর্বাঙ্গে কাজল মেখে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত গাইবেন—

আমার গলা থেকে গান, কে নিল,
নিল—ঠকায়ে। হায় হায়। নিল ঠকাযে।

আশা করা যায় সদাজাগ্রত এই কাক সমাজ সংগ্রামে জয়ী হবে। ...কাক সদা জাগ্রত। এ নিয়ে মহাকবি শব্দ তৈরী করেছেন—কাকনিদ্রা। অর্থাৎ নিদ্রাকালেও সতর্ক থাকা।

... একবার সন্ধ্যা হয হয়। রোদ মগডাল ছেড়ে যাচ্ছে। ডানায অস্ত রোদের গন্ধ। এমন সময়, ঠিক এমন সময় আমার পাশ থেকে ছেলে একটা ধা-করে কাকের ঝাকে গুলতি ছুঁড়ল। মুহূর্তে মনে হলো—এই ছেলে নিষাদের বাচ্চা। আমি পরিশুদ্ধ মিনি রত্মাকব। কল্পনায় দেখলাম—ভগ্নপক্ষ বায়স ভূতলে শযান। বাযসী—কবি বিহারীলালের ভাষায়—"ক্রৌঞ্চের প্রিয় সহচরে। ঘেরে ঘেরে শোক করে। অরণ্য পূরিল কাতব ক্রন্দনে।" আমি "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং দমগমঃ—" শ্লোকে নিষাদ বাচ্চাকে অভিশাপ প্রদান করছি। তাবপর কিলো তিন ওজনের কাব্য ম্যানাস্ক্রিপ্ট—সাহিত্য পাঠক-পাঠিকাব সামনে পাঠ করছি। কাব্য শুনে—শ্রোতার চোখের জলে বরাক-কুশিয়ারা-ধলেশ্বরী নদীর জলে অকাল প্লাবন জেগে উঠেছে।

চেয়ে দেখি অভিশাপেব মত গুলতি উঠছে। ...হঠাৎ—বলা নেই কথা নেই—কাক কটা শূন্যে জুজুৎসু প্যাঁচ কসে সবে গেল। গুলতি ব্যর্থ।

কাকের এই সদাজাগ্রত রূপ মানুষের কাছে মাঝে মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। স্মার্ট পাখি হিসাবে সে পক্ষিদূত রূপে নির্বাচিত। অন্য স্মার্টরা—মানুষের মধ্যে নাপিত। অরণ্যে শেয়াল। দেবতায় নারদ। শ্লোক হচ্ছে —"নরনাং নাপিতঃ দূতঃ, পক্ষিদূতশ্চ বায়সঃ। অরণ্যে জম্বুক দূতঃ, দেবদূতশ্চ নারদঃ।' অবশ্য পাঠান্তরে এই শ্লোকে দূত স্থানে ধূর্ত শব্দও দেখা যায়।

কাকের সদাজাগ্রত রূপ, সদা সর্বদা ব্যস্ততা, সচেষ্টতাকে মানুষ কিছু মূল্য দিয়ে বলেছে কাকের মত সচেষ্ট থাকা বিদ্বান মানুষের অন্যতম লক্ষণ। শ্লোকে কাকের সাথে বকেব ধ্যান, কুকুরের কান খুলে ঘুম—উল্লেখিত হয়েছে—'কাকঃ চেষ্টা, বকধ্যান, শ্বান নিদ্রা। তথৈবচঃ— অল্পাহারঃ, মধুর বাক্যঃ— বিদ্বত্বে পঞ্চ লক্ষণঃ।

বলা বাহুল্য কাক সম্পর্কে এমনি একটু আধটু কথা থাকলেও মানুষ মূলতঃ ওদের পছন্দ করে না। যেমন কোথাও যাত্রাকালে পুরোহিত মঙ্গলঘটে আমপাতা পুরে যাত্রার শুভ মন্ত্র পাঠ কবেন। মন্ত্রে শুভমঙ্গল চিহ্ন হিসাবে অনেক কিছুর লিস্ট দেওয়া হয়। যেমন—ধেনুর বৎসে প্রযুক্তা, বৃষগজ তোরগা। তারপর এই লিস্টে আরো অনেক কিছুর সাথে—দ্বিজনৃপগণিকা। গণিকা অর্থাৎ বেশ্যা পর্যন্ত শুভচিহ্ন। কিন্তু হায় কাক। কৃষ্ণালী ভানার কাক!

শুধু কি তাই? খনা দেবী কাকেব উপর এই যাত্রা বিষযে বটি দা হস্ত। তিনি বলছেন—"শুকনো ডালে বসে—ডাকলে কা" যাত্রীরা যেন আর এক পা না বাড়ায়। মৃত্যু অনিবার্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মশাই মহাভাবতের দুটি মস্ত-মস্ত খণ্ডেব ব্যবস্থা আমাদেব জন্য কবে গেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অংশে আছে—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নরক ট্যুরের বিপোর্ট। সেখানে কাক আছেন। নবকে ভীষণ সব জিনিস পত্র। যেমন- -নিশিত ক্ষুব সমাকীর্ণ অসি পত্র বন। মানে, অস্ত্রের মত ধারাল পত্র যুক্ত বন। অর্থাৎ ভীষণ ভীষণ সব কেকটাস জঙ্গল। সূচিমুখ পর্বতাকাব প্রেত—ইত্যাদির সাথে তাল মিলিয়ে সেখানে পবিক্রমায রত থাকে আযোমুখ কাক। আয়োমুখ শব্দ যদি বুঝতে গণ্ডগোল বাধে এজন্য তারাচিহ্ন এঁকে -অর্থ দেওয়া হয়েছে "লৌহতুল্যতীক্ষ্ণ মুখ"।

প্রাচীন ভারতে অনেক ধরণেব গোত্র নাম ছিল। নামগুলিব উৎস নানা ধবণের প্রাণী। যেমন—তিতির পাখি থেকে—তৈত্তিরীয়। কুশিক অর্থাৎ প্যাঁচা থেকে কুশিক/কৌশিক। কপিঞ্জল পাখি থেকে—কপিঞ্জল। মণ্ডুক অর্থাৎ ব্যাঙ থেকে—মাণ্ডুকেয়। হাঁস থেকে—হংস। কাকড়া থেকে—কর্কট। নাগ বা সাপ থেকে—নাগ ইত্যাদি। কিন্তু কাক থেকে কোন কিছু চোখে পড়েনি।

কাক সমাজেব চৌদ্দ পুরুষের পুণ্যেব ফলে তাদের মধ্যে একজন অবতার জন্মেছিলেন। ভূশণ্ডী। পুবাণ শাস্ত্রে ভূখণ্ডী মহাত্মনকে ত্রিকালজ্ঞ মহাঋষি রূপে স্বীকার করে সম্মান জানানো হয়েছে। তবে কাকদের মধ্যে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' প্রথা আছে কিনা সন্দেহ। কাবণ কাক সভ্যতাও সংস্কৃতিতে এখন পর্যন্ত অন্য কোন যুগাবতার ভূমিষ্ঠ হননি।

হাজার বছর আগের বাংলা সাহিত্যে—অর্থাৎ চর্যাপদে-কাকের নামেব উল্লেখ পাই। সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে কাককে নিন্দা করা হয়নি। সাধারণ ব্যাপার হিসাবে পদকর্ত্তা কুক্কুরীপাদ দেখিয়েছেন—

"দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাও।
রাতি ভইলে কামরু জাও।"

দিনের বেলায় বধু কাকের ডাকের ভয় পায়। রাত্রি হলে কামরু অর্থাৎ কামের রাজ্যে যায়। চর্যাপদের এই কাক বাচক "কাউই" শব্দ নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ।

কারণ চর্যাপদ অতিজীর্ণ অবস্থায় নেপালে আবিষ্কৃত। তাছাড়া পুঁথির আঁখরের রূপ পুরানো। পণ্ডিত শহীদুল্লাহ বলেন—"কাউই" স্থলে হবে—"কাউহি"। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত—"কাড়ই"। সুকুমার সেন—"কাউই"।

তবে আমাদের মোদ্দালাভ কাক শব্দ প্রাচীন বাংলায়—কাউই, কাউহি এবং কাড়ই—এই তিনটিই হতে পারে।

লোক সাহিত্যে সিলেটের স্বভাব কবি হাছন রাজা প্রত্যক্ষভাবে কাককে অবহেলা করে গিয়েছেন— "কাকের পিঞ্জরে শুয়া বন্দীরে—

কান্দে—কান্দে হাছন রাজার

মন ময়নার রে।"

মানব দেহ হচ্ছে কাকের নিকৃষ্ট খাঁচা। পবিত্র আত্মা বা মন শুযাপক্ষি।

সিলেটের হাছন রাজা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লিখেছেন। এখানে কাকের জাতি-গোত্র ইত্যাদির উল্লেখ নেই। তবে শ্রীহট্টিয় সমাজে সম্ভবতঃ পাঁতিকাকের স্থান ততটা নেই। বিষয়টি গবেষণা সাপেক্ষ। কোন এক নামজাদা কবি লিখেছেন (স্বগতঃ—কবি কি মৌলিক শ্রীহট্টিয় অথবা ইতিহাসের পথ বেয়ে এসেছে? —তা ঠিক ধরতে পারছিনা)।

দাঁত ফড়া বুড়া, বইল গাছড় গুড়ীৎ।

ফাতি কাউয়া বিটি দিলা—বাঙ্গা দাঁতর মুড়ীৎ"।

উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে হয়তো বা ভাবা যেতে পারে যে বৃদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে 'ফাতি কাউয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে তথ্যাদির অপ্রতুলতা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির অভাব হেতু—সঠিক সিদ্ধান্ত করা অতীব কঠিন। উদ্ধৃতির দ্বিতীয় পংক্তির শেষ শব্দ—"মুড়ীৎ সম্ভবতঃ দাঁতেব শূন্য মাড়ি।

ইতিপূর্বে চর্যাপদে কাক দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের নামকরা কবি হলেন সাহেব মধুসূদন এবং রবিবাবু। ওরা কেউই কাককে উপযুক্ত মর্যদা দেননি। মধুসূদন তার বীরাঙ্গনা কাব্যে মেয়েদের ফুটানী এঁকেছেন। মেয়েদের একজন হচ্ছেন—তারাদেবী। বৃহস্পতির স্ত্রী। বৃহস্পতি-ঠাকুব দেবতার প্রফেসর। প্রফেসর বাড়িতে কোচিং নিতে এল শত্রু কেম্পের ছাত্র সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেব। তারাদেবী প্রফেসরের পাল্লায় পড়ে সাধ-আহ্লাদ কিছু করতে পাবেন না। ভদ্রলোক পুঁথি নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা। তারা পড়ে গেলেন সোমের প্রেমে। ভীষম ব্যাপার। প্রফেসরের বৌ প্রেম করছে—প্রফেসরের ছেলের মত ছাত্রের সাথে। সোমের প্রতি তারা লিখলেন লব লেটার। প্রেমে পাগল এই সাথে পাপবোধ। এই পাপবোধে তারা নিজেকে কাকের সাথে তুলনা করছেন—

"কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে
কাক শিশু? কর্মনাশা—পাপ প্রবাহিনী!
কেমনি পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে"

তারপর গিয়ে রবিবাবু। বিশ্বকবি। বিশ্বকবি বলতে বুঝি যার কলমের কালি বিশ্বের সব কিছুর উপর শিশিরের মত ভালবাসা হয়ে নামে। প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি বিশ্বকবি? রবীন্দ্রনাথ কাকের ডাক, মোরগের ডাক—এগুলির নিন্দা করেছেন।

সে সময় 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রের উপর চটে-মটে বলেছিলেন —এ হচ্ছে মোরগের কর্কশ ডাক। সম্পাদক সজ্জনীকান্ত দাশ মশাই চটা-মটাকে আশীর্বাদ গণ্য করে—হুট করে গলা উঁচিয়ে ডাকা মোরগের ছবি শনিবারের চিঠির প্রচ্ছদ পট হিসাবে ছেপে দিয়েছিলেন।

কাকের ডাক সম্পর্কে খাপছাড়ায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। —"পাখিওয়ালা বলে—'এটা কালো রঙ চন্দনা'

পানলাল হালদার বলে—'আমি অন্ধ না—
কাক ওটা নিশ্চিত
হরিনাম ঠোটে নাই।'

পাখিওয়ালা বলে—'বুলি
ভাল কবে ফোটে নাই—
পাবে না বলিতে বাবা
কা—কা-নামে বন্দনা"

অর্থাৎ কাকের বাচ্চাব মাতৃভাষায কা—কা—বলা যেন মস্ত অপবাধ।

অবশ্য রবিবাবু কোন এক সুন্দরী কন্যাব কেশদামে মুগ্ধ হয়ে বেফাঁস ভাবে যেন কাককে তার কাব্যে একটু স্থান দিয়ে ফেলেছেন—

'কাক কালো কোকিল কালো
কালো ফিঙের বেশ।
তাহার চেয়ে কালো কন্যা
তোমার চিকন কেশ।

এমনি বেফাস ভাবে কাকের বুদ্ধিও রবিবাবুর একটি ছডায় কিছু পবিমাণ ধবা পড়ে—"দত্ত বাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া—

আৎকে উঠে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান।
এজলাসেতে চমকে উঠেন হবিমোহন সেন।"

কাক সম্পর্কে মানুষেব মনে ভূত-প্রেত ভাব আছে। তবে বৈদিক সাহিত্যে যমলোকেব পাখি হচ্ছে—উলূক এবং কপোত। পণ্ডিতরা উলুকের অর্থ দিয়েছেন প্যাঁচা। কপোত সম্পর্কে ইতস্ততঃ। দেশনেতাদেব শান্তিব দূত হিসাবে আকাশে ঝপ কবে উড়িয়ে দেওয়া পারাবত বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

লৌকিক কেচ্ছা-কাহিনীতে আকছার কাক সম্পর্কে নানা গল্প। যেমন— ...'তারপর? তাবপব সাধু বাবা ত্রিসন্ধ্যায ধুনি জ্বালিয়ে মন্ত্র সুরু করলেন। ঠিক রাত দুপুরে শেয়াল ডাকলো। ব্রহ্মদৈত্যি খড়ম পায়ে বেলগাছ থেকে খট খট করে নামলো। সাধুবাবা গ্রাহ্য করলেন না। সাধু বাবা—হুং-কৃং-বৃং ডিঙ্ক বলে একপাত্র চোলাই ধুনিতে ঢেলে দিয়ে পূর্ণাহুতি দিলেন। আর কি বলব? চিৎকার—। ব্রহ্মদৈত্যির কলজে ফাটানো চিৎকার। —পরদিন দেখা গেল ব্রহ্মদৈত্যির দেহ একটি মরা কাক হয়ে বেলগাছের গোড়ায় পড়ে আছে।"

কাক সম্পর্কে এমনি ভূত প্রেত ভাবের কারণ বর্তমানে-প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্র মতে—কাক যমদূত বা যম অনুচর। মানুষের মৃত্যুর পর—শ্রাদ্ধ-শান্তির মধ্যবর্ত্তী স্তরে

—মানুষের আত্মা কাক দেহে আশ্রয় নেয়। কাক বলি দেওয়া হয়। খড়গ বা দা দিয়ে ঝপ করে বলি দেওয়া নয়। এখানে বলি হচ্ছে খাদ্য শস্য। কাক তখন —কাক নয়। ধর্মরাজ দূত। সবাই আপনি আজ্ঞা করে কথা বলে। 'কাকায়—কাক পুরুষায়—বায়সায় মহাত্মনে—" বলে সম্বোধন করে বিনীত ভাবে বলতে হয়—দয়া করে তিনি যেন প্রদত্ত বলি ভক্ষণ করেন।

আমি কাক বলি দিযেছি।

মার মৃত্যু সংবাদে দুদিন পব বাড়ি পৌছাই সকাল দশটা। তাই তুলসীতলায় বলি প্রদান করে জোড় হাতে ডাকছি। আমি মার কোঠায় ঢুকি। বিছানা শূন্য। বালিশে মুখ রেখে মার গন্ধ পাই। সব আছে। মা নেই। কেন মা নেই? মৃত্যু কি? সব শেষ? মার কি কোন অস্তিত্ব নেই? অসহ্য যন্ত্রণা। ...বাইরে ভাই কাককে ডাকছে—"আও-আও-আও—" এখনো কি মার অস্তিত্ব আছে? চিবঘৃণিত কাক করুণা কবে আমার মাযেব অস্তিত্বকে ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় দিয়েছে? আত্মা কি? সত্যি কি লোক হতে লোকে—আলোকে আলোকে আত্মা নিত্য পরিভ্রমণ রত?

বাইরে ভাই ডাকছে আও—আও ছুটে গেলাম। তুলসীতলায় লুটিযে আর্তনাদ উঠলো—মা—মাগো।

তুলসীতলার পাশে পুবানো আম গাছ। গাছে অনেক দিনের কাকের বাসা। কাক নেমে এলো। বলি মুখে নিযে বাসায় উড়ে বসলো। বাসায় কটি বাচ্চা হাঁ করে ডানা ঝাপটাতে থাকে। ঠোঁটের ভেতব লাল টক টক। মা তার ঠোঁট শাবকের মুখে ঢুকিয়ে খাইয়ে দিল। আবাব নেমে বলি নিয়ে গেল। বাব বার। ভাই বোন আমরা চেয়ে থাকি।

জোড় হাতে বলি—আকাশস্থ নিবালম্ব—বায়ুভূত নিবাশ্রয়—ওগো মা! ইদম ক্ষীরম, ইদম নীরম—তুমি গ্রহণ কর। গ্রহণ কব।

বিমল চৌধুরী

অনুভাব

বৃষ্টি বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কখনো মূষলধাবে, কখনো বা টিপ টিপ। কালো আকাশ, ঝাপসা পৃথিবী। এই বৃষ্টির মধ্যেই ঢাকা-নাবাযণগঞ্জ একটা দশ-এর প্যাসেঞ্জাব ট্রেনটি, বাদলা দিনের জড়তা কাটিযে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে নড়ে চড়ে উঠল। বৃষ্টির ঝিম ঝিম শব্দের বুক চিবে চিরে শেষ হুইশলটা একটা দীর্ঘ বিলম্বিত করুণ আর্তনাদেব মতো নাবায়ণগঞ্জ ষ্টেশনেব ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

পাথরকুচি বিছানো ষ্টেশন চৌহদ্দিব সীমা পার হবাব মুখে ছুটতে ছুটতে এল মকবুল। কাঁধের বর্ষাতিটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডানহাতে কোনক্রমে চলন্ত ট্রেনের একটা কামরার হাতল ধবে সে উঠে পড়ল। কযেকটা সমতালের শ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়া টেনে এবং ছেড়ে উর্ধশ্বাস দমটাকে কিছুক্ষণেব মধ্যেই সহজ করে নিল সে। তারপর ধীরে সুস্থে এগিযে এসে কোণের বেঞ্চিটায জানালাব ধারে বসতে গিয়ে টেব পেল সার্ট পাজামা ভিজে জবজবে হযে উঠেছে। উঃ, যে তাড়াহুড়ো করে নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমেই চো-চা দৌড় মেবেছে—বর্ষাতিটা পববার সময কোথায়। তবু রক্ষে ষ্টেশনের গা লাগোযা নদী, তাই ট্রেনটা ধবা গেল। নতুবা পাক্কা আড়াইটি ঘণ্টা বসে বসে শীতলক্ষ্যার ঢেউ গুনতে হত ওকে। তাব মানে-ই তো আম্মার কাছে ততোখানি দেরীতে পৌঁছোন। এবং সেটা ওব পক্ষে সহ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। সেই বিকেল তিনটে চল্লিশ অবধি পবেব ট্রেনেব জন্য অপেক্ষা কবা এই নারায়ণগঞ্জ বসে বসে—অ্যাবসার্ড। ততক্ষণে আমি আম্মাব কাছে পৌঁছে পুবোনো হয়ে যাব।

ফেরাব পথে মাঝিটাকে কিছু বখশিস দিতেই হবে। কিন্তু ওব চেহাবাটা মনে থাকবে তো? আলবৎ থাকবে, মুন্সীগঞ্জ থেকে নাবাযণগঞ্জ তক মাঝিটাকে কম ধমক দ্যাযনি সে, বেচারা। জান প্রাণ দিযে সে নৌকো ছুটিয়ে এনেছে। দারুণ খেটেছে সে ভিজে সপসপে দেহ নিয়ে। বৃষ্টির জল। ঘামেব জল। ওকে ঠিক চিনে নেবে ফেরার পথে। কোন ভুলচুক হবে না।

গত কয়েকটি ঘণ্টার সমস্ত উৎকণ্ঠা, ঝঞ্ঝাটগুলো দূব হযে গিযে মকবুলের মন আনন্দে ভরে ভঠল ক্রমশঃ। আনন্দ, দারুণ আনন্দ। মা-বাবা দীর্ঘ দু'বছব বাদে ঢাকায় ফিরে এসেছেন পশ্চিমেব কার্য্যস্থল থেকে। আব খবর পেয়েই সে আগামী পবীক্ষার আতঙ্ক, হবগঙ্গা কলেজ হোস্টেলেব জাঁদবেল সুপারের শাসন তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে আম্মাব কাছে।

পকেট থেকে সীজার্সের প্যাকেট বেব কবে ছাত্র সুলভ সমীহ-দৃষ্টি নিযে কামরাব চারদিক দেখে নিল মকবুল। না, কামরা প্রায় খালি। যা' দু'চাবজন রয়েছে, তাবা ছড়িযে ছিটিযে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। সে নির্দ্বিধায সিগারেট জ্বালায়। বাইরের দ্রুত অপসৃযমান দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে—আম্মাব কথা ভাবে।

বৃষ্টির জোর কমে এসেছে, গুড়ি গুড়ি ঝরে পড়ছে কচি কোমল ধান গাছ আর পাটক্ষেতের ওপর। দূরে গাছগাছালি ভরা গ্রামের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সড়ক পথ আর তার পাশে প্রবাহিত ঝাপসা বুড়িগঙ্গা নদী। গাছের ডালে কাক শালিখেরা গলা ফুলিয়ে চোখে দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে ঠায় বসে ভিজছে, কখনোবা অসহ্য চিন্তার ভার ঝেড়ে ফেলবার মতো পাখায় সঞ্চিত বৃষ্টির জল ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলছে। এই শান্ত মেঘ মেদুর পরিবেশেও ফিংগেদের দুষ্টুমির কমতি নেই, ওরা টেলিগ্রাফের তারে বসে যথারীতি লেজ নাচিয়ে দোল খেয়ে চলেছে। মাথ্‌লা মাথায় কৃষকেরা আমন ধানের কচি চারাগুলো ক্ষেতে বুনছে, মাঝে মাঝে মাথলার আড়ালে ছোট্ট হুকোয় বেদম টান মেরে বৃষ্টি কাদা মাখা ঠাণ্ডা শরীরকে চাংগা করে নিচ্ছে।

তন্দ্রায় জড়িয়ে এল মকবুলের চোখ দুটো। মনোরাজ্যের একান্ত চিন্তা ওর তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে স্বপ্নছায়া ফেলতে লাগল.....অনেক, অনেকদূরে থেকে ছুটে এসে বিষম ক্লান্ত হয়ে যেন সে আম্মার কাছে পৌঁছে গেছে....আম্মা দু'হাত বাড়িয়ে মকবুলকে কোলে টেনে নিয়েছেন.....নিমেষে সব ক্লান্তি দূর হয়ে মকবুল স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।.....

'সাহাব, ও সাহাব, আপনের শলাই বাক্সটা এট্টু দ্যান না'....হাতের ধাক্কায় সচকিত হয়ে মকবুল কথাগুলো শুনতে পেল। রেগে চোখ খুলতেই সে, পাশে বসা বোকাবোকা হাসিমুখো এক গ্রাম্য মুসলমানকে এক পলক দেখে নিয়ে বিরক্তিভরে দেশলাইটি ওর হাতে তুলে দিল।

লোকটি হাতে ধরে রাখা বিড়িটি যত্ন সহকারে ধরিযে দেশলাই ফেবত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—'সাহাব, কোনখানে যাইবেন'?

গ্রাম্য লোকটিব নির্লজ্জ অনুসন্ধিৎসায় মকবুল এবার ধৈর্য হারাল। ক্ষেপে গিয়ে ধমকে উঠলো,—'দোজখে যামু মিঞা। তোমার অত খববে দরকার কী হুনি'! কথাটি ছুঁড়ে দিয়ে জানালার গবাদে মাথা রেখে বুঝিবা সেই ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্নটাই জোড়া লাগাতে চাইল সে।

মকবুলেব মেজাজ দেখে গ্রাম্য লোকটি হতভম্ব হয়ে অস্ফুটস্বরে যেন কৈফিয়ৎ পেশ করলো,—'না হুনলাম কিনা ঢাকায় 'গরম' তাই....' বিড়িটা পুনরায় নিভে যেতে পাবে এই ভযে সে ওটা নিবিষ্ট মনে টেনে যেতে লাগলো।

অবশেষে গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে এসে ট্রেন দু'মিনিটের জন্য থামল। পাজামাটা কিছু মুড়ে নিয়ে বর্ষাতিতে দেহ ঢেকে মকবুল দ্রুত নেমে পড়ল। উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত রেললাইনেব পাশে ছোট্ট ষ্টেশনটি যেন ঢাকা শহর আর গ্রামেব মধ্যে সীমারেখা টেনে দাঁড়িয়ে বয়েছে। পূর্ব দিকে অবারিত ফসল ভরা ক্ষেত-ঝিল-বিল, গাছগাছালি ভরা গ্রাম আব পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ শহরের ইসারা। ট্রেন থেকে যাত্রী একজনও নামলো না। এমনকি ষ্টেশন গেটে চেকারও নেই। ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে। দুপুরের আমেজী বৃষ্টিতে জনবিরল পথ। ইল্‌সে গুড়ি বৃষ্টি গায়ে মেখে পথে নেমে পড়ল মকবুল। ঘোড়ার গাড়ীও নেই একটা। যাহোক সে হেঁটেই চলে যাবে নারিন্দা, কতোটুকু বা পথ!

বাঁদিকে চায়ের দোকানের একচালা তিনটের ঝাপ বন্ধ। একটু এগিয়ে ডান

দিকের ছোট ছোট বাড়িগুলো মেঘলা দুপুরে যেন ঝিমুচ্ছে। এই বাড়ি ক'টা পার হলে পথের দু'পাশের মাঠগুলি জল থৈ থৈ। তারপর কিছুদূর এগিয়ে গেলে, দু'ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়ির গাঁথুনি গেঁথে এগিয়ে চলেছে গেণ্ডারিয়া পাড়া সমুখে, ডানে আর বাঁয়ে। ডানদিকের শেষ বাড়িটা পার হতে গিয়ে ওখান থেকে ভেসে আসা কয়েকটি কথা শুনে মকবুল হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল। হৃৎপিণ্ড থেকে একটা বরফ ঠাণ্ডা রক্তস্রোত সারা শরীবের শিরা-উপশিরায় বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। গলা মুখ শুকিয়ে মুহূর্তে ওর মাথাটা বড়ো ভারী মনে হতে লাগল। 'ইয়া খুদা' শুকনো মুখ থেকে অতি কষ্টে বেরিয়ে এল কথাটা। চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে ষ্টেশনের দূরত্ব দেখে নিল তাবপর দ্রুত এগিয়ে ডানদিকের মাঠের জলে নেমে পড়ল।

শাপলা-কলমী-কচুরিপানার আড়ালে মাথাটা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মকবুল। খেদ জাগলো ওর মনে,—'খাস হিন্দু পাড়া এটা....সাঁতার জানে না সে নতুবা ডুব সাঁতারে বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে শ'পাঁচেক গজ গিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডে ওঠা যেত, হয়তো বা বেঁচে যেত আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে। ক্ষণকাল পূর্বে শোনা সেই সংলাপে মকবুলের অন্তর উথাল পাথাল... 'শুনেছ ঘণ্টা দু'এক আগে এ পাড়ারই একটি হিন্দু ছেলেকে লোহার পুলের ওপর নাকি একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। রুগীর জন্য নাকি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল বেচাবা। উঃ আজই লাগল আর এর মধ্যেই আটটি হিন্দু আর ছ'টি মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে বেঘোরে।

মেয়েলী গলার জবাব শুনেছিলো,—ঢাকা ছাড়া তো আর বাড়ি করার জায়গা খুঁজে পেলে না তুমি। দুটো দিন একনাগাড়ে শান্তিতে কাটাবাব উপায় নেই, নাও এবার ঠ্যালা পোহাও'।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুটস্বর বেরিয়ে এল মকবুলের বুক চিরে, 'সাতের কোঠা কী আমিই পূরণ করুম খোদা.....এ জীবনে আর আম্মার দ্যাখা পাইলাম না বুঝি! ....অবিরল ধারায় মকবুলের চোখ থেকে লোনাজল গড়িয়ে বিলেব জলে মিশতে লাগলো।

আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গিয়ে ক্রমশ বাঁচার প্রেরণা অনুভব কবল মকবুল। উন্মুক্তস্থানে থাকা ঠিক নয় ভেবে, বর্ষাতিটা কোনও মতে খুলে গুটিযে হাতে নিযে, অতি সন্তর্পনে মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সমুখের পাড়াব কাছাকাছি একটা পুবোনো কালভার্টের তলায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু জলের প্রবল স্রোতে সেখানে দাঁড়াতে না পেরে, কোণের বুড়ো বটগাছটার অসংখ্য ঝুড়ি ও শেকড়ের মধ্যে মাথা তুলে ধরে কোমর জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকল।

মাঠময় বর্ষার জলে অসংখ্য লাল-সাদা শালুক-কলমী-কচুরীপানার ফুল ফুটে রয়েছে। মকবুলের দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে উঠলো। ছোট্ট বেলায় এক বর্ষায় আম্মার সংগে এরকম ফুলভরা বিলে নৌকোয় যাচ্ছিল সে। নৌকোর ধারে ঝুঁকে বার বাব সে শাপলা আর কচুরিপানার ফুল টেনে তুলছিল, আম্মা কিছুতেই ওকে নিবৃত্ত করতে পারছিল না। অবশেযে আম্মা মমতাময় অভয় হাত দুটো দিযে মকবুলকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন—পাছে সে পড়ে যায়....আজ এই চরম বিপদে আম্মা তুমি কই গো...অবাধ্য অশ্রু মকবুলের চোখে বাঁধ ভাংগা বন্যার মতো নেমে আসে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কালভার্টের ওপাশের চায়ের ষ্টলটায় দু'একজন করে পাড়ার লোক এসে জমতে শুরু করলো। 'কই হে মহাজন, পত্রিকা আইছে নাকি'?

—'না বাবু, তিনটা বাইজ্যা গ্যালো এহনো তো আইল না দেহি। কইলকাতার মেল আইজ লেট করচে মনে অয়! বাবুর দেহি আইজ তিনটায় ঘুম ভাইংগা গেল'!

—'কতো আর ঘুম অইব কও দেহি। ছুটি লইয়া বাড়ি আইয়্যা কী বিপদেই না পড়লাম, সাতদিনের ছুটিতে আইলাম, দুইদিন যাইতে না যাইতে এই যে রায়ট লাগলো, কয়দিন থাকবো কে জানে'!

আর একজন বলে উঠলো,—'আর কন ক্যান মশয়। দুইদিন পর পর এই যন্ত্রণা আর সহ্য অয় না হালায়। ব্যবসা-বাণিজ্য হগল পোটল উঠলো, নিত্যি ভিক্ষা তনু রক্ষা আমাগো, ডাণ্ডাব বদলে অহন দেহি না খাইয়া মবতে অইবো গুষ্টিশুদ্দো। মুসলমানেগোও তো একই অবস্থা....ক্যান যে তবে লাগে বুঝি না...'।

অপর একটি গলা বাঁধা দিল,—'আবে তাও জানেন না! লাগায় তো হালায় হেই লাল মুইখ্যাবা। হোনেন না আমাগো দোকানপসার জ্বালানের লেইগ্যা ওই হালাব পেট্রোলের টিন আউগাইয়্যা দ্যায় মুসলমানগো, তারপর দুইদলে কামড়া-কামড়ি লাগাইয়া মজা দ্যাহে। দুই দলের গুণ্ডারাও মজা পায় মানুষ মাইর্যা। তবে আর দেরী নাই, হালাব লাল মুইখ্যাগো আমাগো দ্যাশ ছাইড়া যাইতে অইবোই; সময় কাছাইছ্যে...'

হঠাৎ একটা বাঁজখাই গলার আওয়াজে কথাবার্তা সব বন্ধ হয়ে গেল। মকবুলও চমকে উঠলো জলর মধ্যে বটের ঝুড়িব নিচে।

—'গুণ্ডারা সব মজা পায়, নাঃ, যতো সব মাউগ্যার দল। অরা আমাগো মাইর্যা ফালাইব আব আমরা বউযের আঁচলের তলায় বইয়া থাকুম, না! হুনছনি, সকাল থেইক্যা আটটা হিন্দুরে অরা মারছে আর মুসলমান মাত্র ছ'টা, এইটা পূরণ করতে অইবো না। ....এই যে নিতাইয়ের মা'র কান্দনের চোটে হালায ঘুমাইতে পারলাম না, লোহাব পুলেব উপব নিতাইরে কাইট্যা দোলাইখালে ফালাইয়া দিল—এইটার শোধ নিতে অইবো না....দেহিনা ইষ্টিশানে দুই একটা লুঙ্গি নি লামে....এই বইলাম তৈয়াব অইযা।"

পূর্ব্বের লোকটি মিয়ানো গলায় বললে,—'তবে লোযার পুলে গিয়া হেই গুণ্ডাগো না মাবণেব দবকাব, বেলগাড়ি থেইক্যা যারা নামবো তাগো মাইব্যা লাভ কী?'

বাজখাঁই গলা হুংকার ছাড়লো, 'হালায যে বড়ো লম্বা লম্বা কথা কয় দেহি। এই নে' তবে ঘাবে ধাক্কা দিযা বাইর করলাম......লোয়ার পুলে গিয়া হেই গুণ্ডাগো মাইব্যা তাবপব পাড়ায় আইবি নাইলে তবই একদিন কী আমাবই......'

চারদিক থেকে অনকেগুলো গলা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—আবে কর কী মইন্যাদা', মশা মাইব্যা হাত কালা করবা নাকি....ও কি তোমার লায়েক নিকি যে অব কথায রাগ হও....আরে তুমি আছ দেইখ্যা পাডাটা এখনো আস্ত আছে, নাইলে...'

নাইলে যে কী হতো তা' আর কেউ-ই বললো না। শোনা গেল, দোকানের মহাজন চা এনে অমায়িক গলায় মইন্যাদা'কে খেতে অনুরোধ জানাল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সহসা দোকানের বাইরে একটি উত্তেজিত কিশোর কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠলো। —'মইন্যাদা' সাংঘাতিক খবর, ঘণ্টা খানেক আগে নাকি একটা মুসলমান

ইষ্টিশানে নাইম্যা এই রাস্তা দিয়া আইছে...’

—‘অ্যাঃ কস্ কী! গর্জে ওঠে বাজখাঁই গলা, সকলের উদ্দেশে বলে, —‘তোমরা কেউ দেখছো নাকি অ্যাঃ’!

সবাই জানাল, তারা কেউ দ্যাখেনি, যেহেতু এত আগে কেউ ওরা এখানে ছিল না, দোকান বন্ধ ছিল।

—‘অ্যাঃ, তবে কি হালায় পার হইয়া গ্যালো গেগুইরার বুকের উপর দিযা, কেউ-ই দেখলো না! অই পরেইশ্যা, তুই ভোলারে লইয়া পোষ্টাফিস পর্যন্ত যা’, আর বাস্তায় যাবে যাবে পাবি সক্কলকে চারদিকে পাঠাবি। আমি নাউর‍্যা আর কমইল্যারে লইয়া ইষ্টিশনের দিকে যাই, কোনখানেনি পলাইয়া রইছে। দেহি আইজ যদি হালারে পাই...’ দাত কিডমিড় করে মইন্যা, ‘—নিতাইর জানেব বদলা ক্যামনে লই দেহিস তবা, অব রক্তে ছান করুম—হাঃ।’

মকবুলেব বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে গিয়েছে ততোক্ষণে। সে সাবা দেহ্ জলে ডুবিয়ে বটের ঝুড়ির নিচে কোনক্রমে নাকটা জাগিয়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বইল। নিজেকে সে বার বার ধিক্কাব জানাল, ট্রেনের সেই সরল গ্রাম্য লোকটির কথায় মনোযোগ না দেয়ায়। সে তো বলেছিলো—হুনলাম, ঢাকায নাকি গরম।’ অবহেলাভরে ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দেয়নি সে। মকবুলেব মন ডুকরে উঠলো—‘আম্মাগো!’

ওদিকে দোকান থেকে ওরা বেরিয়ে এসে পথেব দ্‌'পাশে নজর বুলিয়ে বটগাছ পার হয়ে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। দোকানটায় বোধ হয় একজন লোকই বাকী ছিল, বললে—‘মহাজন’ বাড়িতে কপাট বন্ধ কইর‍্যা বসি গিয়া, খুন খারাপী অইলে শেষে পুলিশের হাতে পডতে অইবো।

মহাজনেব উত্তর এল,—‘আমিও দোকান বন্ধ কইর‍্যা চল্লাম। মইন্যা যে চটছে, পাইলে খতম না কইব্যা ছাড়বো না।’

দোকানের ঝাপ বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপর সব চুপচাপ। মকবুলের মনে অন্তিম আশা জাগছিল—সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে জলের মধ্য দিয়ে বাডিগুলোব পেছন দিযে কোনও মতে ষ্টেশনে উঠে বেল পুলিশেব কাছে বসে থেকে কোনও ট্রেনে উঠে পড়বে—সে আশাও সুখস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। ষ্টেশনের কাছে ওকে না পেয়ে ঘাতকরা খুঁজে খুঁজে এসে হয়তো ওকে পাকডাও কববে আর...না আর ভাবতে পারে না সে। ভাবনা চিন্তাহীন একটা বোবা আতংকে চোখ বুঁজে সে স্থির হয়ে রইল।

মুহূর্তগুলি দীর্ঘতব। মকবুল স্থানু। হঠাৎ কী একটা শব্দে পথের দিকে তাকাল সে। তিন-চার বছবের একটি স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে ছেলে অদূরে পথেব ধারে এসে দাঁড়িয়েছে আব জলের কিনাবে ফুটে থাকা শালুক-কচুবি-পানাব ফুলগুলো দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথাব একরাশ কোঁকড়া চুলেব গুচ্ছ দুলিয়ে ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটি দিযে হাততালি দিচ্ছে।

মকবুলেব বুক কেঁপে উঠল। নির্জন পথ, ছেলেটি যদি ফুল তুলতে গিয়ে জলে পড়ে যায়.....তার তো সাধ্য নেই এই আড়াল থেকে বেরিয়ে ওকে রক্ষা করে। মকবুলেব বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে, গুটি গুটি পা ফেলে ঢালু পথ বেয়ে হেলে দুলে ফুলের মতো শিশুটি জলের ধারে নেমে এল, ফুল নেবার লোভে।

অক্ষম একটা ইচ্ছা মকবুলের বুকের ভেতর ছটফট করে মাথা খুঁড়তে লাগল! ওর ব্যাকুল দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠলো, অর্দ্ধস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মকবুলের মুখ থেকে। শিশুটি ফুল ধরতে জলে গিয়ে পড়েছে....ওর দু'টি ছোট্ট মুঠি দিয়ে কলমী-শালুক আঁকড়ে ধরে তীরে ওঠার ব্যাকুল চেষ্টা করছে কিন্তু ক্রমেই গড়িয়ে গিয়ে বেশী জলে পড়ছে....ওর কচি কোমল মুখখানিতে, ডাগর কালো চোখে আতংকের কালো ছায়া দুলছে।

মকবুলের অসাড় দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহ উদ্দাম হয়ে উঠলো, দৌড়ের আগ মুহূর্তে দৌড়বীরদের মতো....কিন্তু হঠাৎ থমকে গেল সে। ষ্টেশনের দিক থেকে একদল লোক এদিকেই আসছে, সেই ঘাতকেরা নিশ্চয়—যারা জানের বদলে জান নেবাব জন্য ঘুরছে। এ নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হওয়া মানে মৃত্যুব কোলে এগিয়ে যাওয়া....আম্মাকে জীবনে আর দেখতে না পাওয়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে, 'মা-আ-গো' কচি গলার শেষ আর্ত চিৎকারে মকবুলের হৃৎপিণ্ডেব রক্ত ছলাৎ করে উঠলো....ঈথার তরঙ্গে চরাচরময় ছড়িয়ে পড়লো যেন এ করুণ মর্মভেদী আহ্বান।

মকবুল যখন পথের ওপর হাঁটু ছড়িয়ে বসে বুক থেকে শিশুটিকে কোলে নামিয়ে পরিচর্যা করছে ততোক্ষণে এদিক সেদিক থেকে বেশ কয়েকজন লোক এসে জড়ো হয়েছে। হঠাৎ 'খোকন.....আমার খোকনরে'....খোকন.....আকুল চিৎকাবে সবাই চমকে উঠলো। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে আলুথালু বেশে ছুটে এসেছে একটি মা।

'কিচ্ছু হয় নাই খোকনের, ভয় পাইছে তো—তাই চোখ বুইজ্যা চুপ কইর‍্যা রইছে।....খোকন ঐ দ্যাখো তোমার মা আইছে.....চোখ ম্যালো....'

মকবুল শান্ত গলায় দুজনকেই সান্ত্বনা দিয়ে, খোকনকে ওর মায়ের কোলে তুলে দিলো। মাযেব কোলে গিযে খোকনের মুখের খুশির ঝলক আর মায়ের চোখ থেকে ঝরে পড়া আনন্দাশ্রু—প্রতিবিম্বিত এবং সংক্রামিত হলো মকবুলেব মুখে-চোখেও।

ঠিক এই সময ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো মইন্যা। মকবুলের ভিজে পাজামাটা একনজরে দেখে বাঁজখাই গলায় হেঁকে উঠলো সে—'অ্যাঃ, তুমিই তো সেই....' কথা শেষ না কবেই সে দ্রুত জামার নিচে কোমব থেকে একটা ধারালো ছোরা বের কবে আনলো। প্রশান্তির প্রসন্নতায় মকবুল তখন মগ্ন। ছোরাটা জলে ছুঁড়ে ফেলে ভারমুক্ত হয়ে মইন্যা ততোক্ষণে দু'হাতে মকবুলকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছে।

মানিক চক্রবর্তী

তিনজন অবিনাশ এবং শিম্পাঞ্জী

রাতে বোধহয় বেকায়দায় শুয়েছিল অবিনাশ। ঘাড়ে একটা কনকনে ব্যথা টের পেল। গত রাতের কথা ভাবতে গিয়েই মনে হলো আজ রোববার। বেশ একটা আমেজ পেল সে। লেপ দিয়ে মুখটুক ঢেকে আবার সে শুয়ে থাকলো। ঘুম আসবে না আর। রোদ উঠেছে। জানালা দিয়ে কিছুটা আলো তির্যকভাবে এসে পড়েছে বিছানায়। এই আলোটাকে ঠিক সহ্য হচ্ছিল না তার। ওর ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। যদিও সে লেপ দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে তবুও বিছানায় রোদ এসে পড়েছে কথাটা ভাবতেই সে একটা অস্বস্তি বোধ করলো। পাশের বালিশ খালি। সুমিতাও উঠে গেছে। কখন উঠলো সে? আজ তো রোববার। সুমিতার পায়ে দেখছি সব সময় মেলট্রেনের দৌড় লেগে আছে। আর একটু শুয়ে থাকতে পারতো সুমিতা। অবিনাশ ভেবে পাচ্ছে না তিনশো টাকার পরিবারে কী এতো কাজ থাকতে পারে। ওর মনটা খিঁচড়ে গেল। অবিনাশ ভেবেছিল সুমিতার দেহটা আজ কেটে কেটে সুন্দর ডিজাইন বানাবে। ওর ইচ্ছে মতো কাটবে। যেখান থেকে যতটুকু মাংস কেটে ফেলা দরকার সেখান থেকে ততোটুকু কেটে ফেলবে। ডাক্তাররা এটাকে কি বলে? প্লাসটিক সার্জারী না অন্য কিছু। যাকগে। এসব নাম দিয়ে কিছু যায় আসে না। বালিশের তলায় রাখা ছুরিটার কথা ওর মনে হলো। সুমিতার ভারী বুক, বড়ো পাছা—বেটে থলথলে দেহটাকে কেটে ঠিক সাইজে বানিয়ে নিতে হবে। সেই মাদারীপুর মাদারীপুর গন্ধটাও সুমিতার শরীর থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। মাদারীপুরের গন্ধটাও অবিনাশের কাছে খুবই বিরক্তিকর। সেবার মাদারীপুরে যাবার পর কি ভাবে জানি গন্ধটা সুড়ুৎ করে অবিনাশের নাক দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে গেলে হঠাৎ হঠাৎ সে এই গন্ধটা টের পায়। নাকের সর্দির সঙ্গে অনেকবার সে এই গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই গন্ধটা যায়নি। কিছুটা রয়েই গেছে। কিছুতেই এই বিরক্তিকর অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না অবিনাশ। সুমিতা কাছে আসলে এই গন্ধটা সে আরো বেশী করে টের পায়। সুমিতার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকলেই অবিনাশ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই গন্ধটা অনুভব করে। অবিনাশ ভাবলো যত গণ্ডগোল সুমিতার এই দেহটার মধ্যে। এই দেহটাই মাদারীপুর গন্ধটার রোগ জীবাণু বয়ে বেড়াচ্ছে। অবিনাশ ভেবে নিল আজকেই সুমিতার দেহটাকে কেটে ঠিক করবে। আজ রোববার। তাছাড়া অন্যদিন বিশেষ সময় পাবে না। কিন্তু সুমিতা উঠে গেছে বিছানা থেকে। তা না হলে কাজটা এখনি সেরে নেয়া যেত। ছুরিটা তো হাতের পাশেই আছে। আজ একটু ধার দিয়ে রাখতে হবে। সুমিতার নামটা তো অবিনাশের মতো এতো সেকেলে নয়। কাজেই সুমিতার দেহটা একটু বাঁদা করে নিলে ঠিক মানিয়ে যাবে ওর নামের সঙ্গে। ছুরিটা ধার দিতে হবে। অবিনাশের পাশেই ওদের বাচ্চা মেয়ে তুতুল শুয়ে আছে। মুখ

দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। বালিশ ভিজে গেছে। গালের পাশে কিছুটা শুকিয়ে সাদা চটচটে হয়ে আছে। অয়েল ক্লথে কিছুটা পেচ্ছাব। বিছানায় পেচ্ছাব করাটা এখনো তুতুলের কাছে অন্যায় নয়। কারণ ওর বয়স বছর দেড়েক। মাথার তুলনায় হাতপাগুলো বেমানান। মনটা এখন থেকে ওর মায়ের কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে। বিবক্তিকর। যখন ও কাঁদতে শুরু করে—বিরক্তিকর। ওর নাকের সর্দি ওর মুখের লালা বিরক্তিকর। ওর পেচ্ছাব রীতিমত বিরক্তিকর ইয়ার্কি অবিনাশের কাছে। ওর পেচ্ছাবে ওর সর্বাঙ্গে মাদারীপুরের গন্ধ পাচ্ছে অবিনাশ এখন। একটা মোক্ষম খিস্তি ঝাড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু বাচ্চাদের খিস্তি স্বাস্থ্যকর নয়। তাই খিস্তিটা এখন অবিনাশের গলায় এসে আটকে গেল। কিন্তু গন্ধটা ওর দেহটা ওর ভবিষ্যতের ম·টাকে কী করে আটকাবে অবিনাশ! অবিনাশ যখন বাবা হয়েছে তখন তার তো একটা দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। তুতুলের শরীরটাকে ঠিক করতে হবে। বিশেষ করে গন্ধটাকে বিদেয় করতে হবে। অবিনাশের ছুরিটার কথা মনে হলো। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। বালিশের তলা থেকে চাবির রিঙ সহ ছোট ছুরিটা হাতে নিল অবিনাশ।

মেয়েটাব বুক ঘড়ির কাঁটাব মতো টিক টিক করে কাঁপছে। অবিনাশ একবার মেয়েটার সমস্ত শরীরটা দেখে নিল। কিছুটা ভাবলো। তুতুলের জাঙ্গিয়াটা আস্তে করে খুলে নিল সে। গাযেব জামাটা খুলতে গেলে ঘুমের মধ্যে মেয়েটা কেঁদে উঠল। বেশ একটু কাযদা করে জামাটা খুলে ফেললো। প্রথমে তুতুলের মুখের দিক থেকে ছুরিটা দিয়ে অবিনাশ ওর কাজ আরম্ভ করলো। গাল থেকে চেঁছে চেঁছে সাদা চটচটে লালাব দাগগুলো তুলে ফেললো। মেয়েটার গালটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো বেশ খানিকটা। মেয়েটা ব্যথায় দারুণভাবে কেঁদে উঠল। অবিনাশের রাগ হলো খুব। সে বললো—এই চুপ, কাজ করতে দে।

তুতুলেব কান্নাব শব্দে সুমিতা ব্যস্ত হয়ে ঘবে ঢুকল। তুমি কি আজ উঠবে না বলে ঠিক করেছ? মেয়েটা কাঁদছে কেন? ওমা! একি গো। এতো রক্ত! একি দশা হয়েছে মেয়েটার। অবিনাশের হাতে তখনো ছুরিটা বোদের আলোয় চকচক করছে। ঝটিতি সুমিতা তুতুলকে বিছানা থেকে তুলে নিল। আঁচল দিয়ে রক্ত মুছে বুকে জড়িযে ধবল। তাকের ওপব থেকে ডেটলের শিশিটা নিয়ে খানিকটা তুতুলের গায়ে লাগিয়ে দিল। সুমিতাব চোখে জল এসে গেছে। সুমিতা আর কিছু না বলে দরোজার দিকে গেলো। ততোক্ষণে অবিনাশ বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছে। অবিনাশ সুমিতার দিকে চেয়ে বললো—দাঁড়াও। সুমিতাব তীব্র চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো কবে বললো—ডাকাত। সুমিতা পাশের ঘরে চলে গেল।

অবিনাশ ছুরিটা নিয়ে বাথরুমে গেল। ছুবিটা ধুয়ে নিলো কলের জলে। হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এলো। ঘরে এসে দেখলো সুমিতা চা ও খাবার নিয়ে এসেছে। সুমিতার মুখ থমথম করছে। চোখ লাল। কিছু বলছে না সে। অবিনাশ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল—হাতে অবসর ছিল আজ। তুমি আমার কাজটা মাটি করে দিলে। ভেবেছিলাম তোমাকেই আজকে একটু ফিটফাট করে দেব। কিন্তু

সাত সকালে উঠে গিয়ে...। সুমিতা হঠাৎ বাধা দিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠলো, তোমার কি হয়েছে গো! পাগলের মত কি সব বলছো? আর তখনই অবিনাশ মাদারীপুরের গন্ধটা অনুভব করলো দারুণভাবে। এ এক বিচ্ছিরি অবস্থা। অবিনাশ আর কথা বাড়ালো না। উঠে গেল চেয়ার থেকে। আলনা থেকে নামিয়ে প্যান্ট সার্ট পরতে লাগলো সে। সুমিতা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

জামা কাপড় পরে বসে বসে ভাবছিলো অবিনাশ। সুমিতাকে নিয়ে তুতুলকে নিয়ে নিজেকে নিয়ে কি কবা উচিত কি করা উচিত নয় এসব ভাবছিলো অবিনাশ। ওর হাতে ধরে থাকা রোদ-চশমাটায় ওর চেহারাটা ভাসছিলো। বিভিন্ন রকমের চেহারা দেখা যাচ্ছিল ওতে। বিকৃত ধরণের সব চেহাবা। অবিনাশ কিন্তু এই চেহারাগুলোব খুব তারিফ করছিল। বার বার তাই সে রোদ-চশমার কাঁচ দুটো্র দিকে তাকাচ্ছিল। মাঝখানের মুখটা অনেকটা অবিনাশেরই মতো। কিছুটা লম্পটে ধবনেব মুখ। অবিনাশের মনে হলো—হায় অবিনাশ তোমাব একি দশা হয়েছে। কোন সোহাগী বন্ধুর মতো ন্যাকা সুরে মনে মনে ভাবলো কথাটা অবিনাশ। ডানপাশ দিয়ে তাকিয়ে যে মুখটা দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকটা পকেটমারদের মতো ধূর্ত কিংবা চোলাইমদের কারবারীর মতো আদর্শ গোছের। অবিনাশ মনে মনে বললো—বন্ধু কেমন আছো। বাঁ পাশের মুখটা কিছুটা সেই রেসের মাঠের জকিটার মতো কিংবা চিডিযাখানাব সেই বডো শিমপানজীটাব মতো বন্য। রোদ-চশমাব কাঁচের দিকে তাকিয়ে ভাবছে অবিনাশ, চোখ মেরে অবিনাশের বলতে ইচ্ছা করল—দোস্ত!

হঠাৎ বান্নাঘরে তুতুল কেঁদে উঠল। বোধহয় মাই খাবার জন্যে। অবিনাশের মনে হলো এখন বেরুতে হবে। রোববাবেব সকালটাই মাটি হবে দেখছি। অবিনাশ বাইবে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। সুমিতা এখন বান্নাঘরে। সেই দিকে তাকিয়ে টেলিফোনের মতো কবে অবিনাশ বললো—আমি বেরুচ্ছি। আজ বোববাব। ফিরতে দেবী হবে। সুমিতা তুতুলকে কোলে নিয়ে রান্নাঘব থেকে বেরিযে এলো। ওব ব্লাউজেব বোতাম খোলা। হযতো আদৌ বোতাম নেই। তুতুল মাই খাচ্ছে। অবিনাশের মনে হলো রাবিশ। সুমিতার গলায অভিমান—কেন, বোববাব সকালটায একটু বিশ্রাম নিলেই তো পারতে। কি এমন কাজ। বাইরে যাবার। অবিনাশ একটা সিগাবেট ধবাতে ধরাতে বললো—আছে। অনেক কাজ রাস্তায় নেমে এলো অবিনাশ। হাঁটছে সে। কোন একটা উষ্ণ আড্ডায যেতে হবে। তাই ব্যস্ততা। ভাবতে ভাবতে অবিনাশ অনেক দূর হেঁটে এসেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে সে একটা গলিপথ ধরেছে। অনেক কিছুই ভাবছিল অবিনাশ। সে তার ভাবনাগুলোকে মনে মনে গোছাতে লাগলো :

আমি শ্রীঅবিনাশ সমাজপতি। প্রমোদবিহারীদের সর্বশেষ সংস্করণ। বাজপথে আমি এক উষ্ণতা শিকারী। তাছাড়া রীতার সঙ্গে সম্প্রতি আমাব ....হয়তো অনেকেরই জানা আছে কারণ ১৪-১২-৪৮ তারিখে ফ্যাশন প্যারেডে অনেকেই ওকে দেখতে পেয়েছে। তাহলে আমি এখন রীতার কাছেই যাচ্ছি। —অবিনাশ এইটুকু ভাবতেই এক দারুণ ঘটনা ঘটলো। একটা লোক পেছন থেকে এসে অবিনাশকে জাপটিয়ে ধরলো। অবিনাশের দিকে কটমট করে তাকিয়ে গর্জে উঠলো লোকটা—বদমাস,

তুই আমার ছেলেটাকে বে-লাইনে নিয়েছিস। আমার মেয়েটাকে নষ্ট করেছিস। আমার বৌটাকেও তুই খারাপ করেছিস। মেরে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেব আজ।

অবিনাশ ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপছে তখন। অবিনাশ দেখলো লোকটার চোখ থেকে যাদুঘরেব তীব্র ঘৃণা অবিনাশকে দেখে হাসছে। লোকটা প্রচণ্ড রাগে অবিনাশের শার্ট প্যান্টের অনেকখানি ছিঁড়ে ফেলেছে। প্যান্টেব কোমবের বোতামটা ছিঁড়ে গেছে। খুলে যাচ্ছে প্যান্টটা। পাগলের মতো চেহাবা হয়েছে অবিনাশের। কয়েকটা ছোট ছেলে খানিকটা দূরে ফুটপাতে ক্রিকেট খেলছিল। ওরা অবিনাশকে দেখতে পেয়ে পাগল পাগল বলে খেপাতে লাগলো। অবিনাশ একটু মেজাজ দেখাতে গেলে একটা ছেলে 'দূর পাগলা' বলে বলটা বোঁ করে ছুঁড়ে মারলো অবিনাশের মাথায। দারুণ চোট লেগে অবিনাশের মাথা ঘুরে গেল। চোখে লাল-কালো রং দেখছে অবিনাশ। ছেলেগুলো ছুটে পালালো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে অবিনাশেব। হঠাৎ অবিনাশ দেখতে পেল ওর পাশে আরো দুজন অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে। 'আদেশ করুন জাঁহাপনা—এ রকম একটা বিনীত ভাব ওদের। অবিনাশ কী সব নির্দেশ দিল ওদের। ওরা যার যার কাজে চলে গেল। এই বিচ্ছিরি অবস্থায় রীতার কাছে যাওয়া হলো না অবিনাশের। তাই সুমিতার স্বামী, তুতুলের বাবা অবিনাশ সমাজপতি হাঁটছে রাস্তায়। রোববার সকালে হাঁটছে। সকাল পেরিযে দুপুরেও হাঁটছে। অবিনাশের মনে হলো সুমিতার কথাটা—'কি এমন কাজ বাইরে যাবার।' কোন ভদ্রলোক রোববার ঘরে বসে থাকে? কথাটা মনে হলো অবিনাশের। নিজেকে ভদ্রলোক ভেবে অবিনাশ একটু অবাক হলো। গর্বও হলো বোধহয় কিছুটা। আশেপাশে পানের দোকান থাকলে একবার আয়নায় চেহারাটা দেখে নিত। ভদ্রলোকের চেহারার কোন লক্ষণ দেখা দিয়েছে কিনা ওর মধ্যে। তবে তার চেহারাটা এমনিতে মন্দ নয়। বেশ একটা বুদ্ধি-দীপ্ত ভাব আছে তার চেহারায। ছেলেবেলায় অবিনাশের বেশ একটা আদুরে চেহারা ছিল। তাই বিশেষ করে মেয়েদের কাছে সে বেশ লোভনীয় ছিল। হঠাৎ অবিনাশ ভাবলো—এখনো ওদের কেউ কেউ ওকে আদব সোহাগ জানাতে কসুর করে না। কিন্তু বাবা, এতো সহজে অবিনাশ এখন গলে যাবার পাত্র নয়। মাদারীপুর গন্ধেব ত্রিসীমানার ছায়াও অবিনাশ আর মাড়াবে না। আজই সুমিতার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। না বাবা, এতো সহজে গলছি না আমি, কথাটা ভাবতেই অবিনাশের মনে পড়ল ছেলেবেলায় মেয়েগুলো ওদের বুকের উত্তাপে অবিনাশকে গলিয়ে ফেলতে চাইতো। মুখ পিছলিয়ে একটা খিস্তি বেরিয়ে এলো অবিনাশের। না-না একটু পা চালাতে হবে। কথাটা ভেবেই অবিনাশ ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু কবল। রোববার দুপুরে হাঁটছে অবিনাশ। এতোক্ষণে কিন্তু রাস্তার সেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবিনাশ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ওদের কাজ শুরু করে দিয়েছ। দ্বিতীয় অবিনাশের একটা বিশেষ ইচ্ছে ছিল। সে ভাবলো সেইটে দিয়েই ওর কাজ আরম্ভ করতে হবে। পেটমোটা সেই পার্শী ভদ্রলোকের কথা ওর মনে হলা। ওকে ফাঁসাতে হবে। শালার বড়ো বাড় হয়েছে। ২নং অবিনাশ টুক করে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল। একটা লেডিস সীটের পরের সীটে নির্বিকার ভদ্রলোকের মতো বসলো সে। আহা ভদ্রলোক। সে ভাবছে ভদ্রলোক কাদের বলে? ওদেব ডেফিনেশন কি? ভাবছে

২নং অবিনাশ। ক্রমশঃ ট্রামে ভিড় বাড়ল। আর কি আশ্চর্য, সেই পেটমোটা পার্শী ভদ্রলোক অবিনাশের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। যাক্ বাবা। বেশ একটা মৌকা পাওয়া গেছে। এক হাত দেখে নিতে হবে শালাকে। ২নং অবিনাশ বসে বসে ভাবছে সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। তাই ট্রাম থেকে নামবার আগে সে বেশ একটা কায়দায় ভদ্রলোকের হিপ পকেট থেকে টুক করে পার্সটা তুলে নিল। কেউ মোটেও টের পেল না। পার্সটা তুলে নিয়ে সে একটা স্টপেজ আসতেই নেমে এল রাস্তায়। সে এক ফাঁকে গুনে দেখলো ব্যগটাতে কড়কড়ে বেশ কযেকটা নোট রয়েছে। মনে মনে সে হাততালি দিল একচোট। আর কোন দিকে না তাকিযে একটা ঢালাও কাববাবের বেস্তোরাতে ঢুকে পড়লো সে। মেনু দেখে প্রথম থেকে কয়েকটা আইটেমের অর্ডাব দিল। বেশ মেজাজে অর্ডার দিল স্কচ হুইস্কিব। তারপব সে ডান হাত বাঁ হাত দিয়ে বাক্ষসেব মতো খেতে আরম্ভ কবল। হুইস্কি দিয়ে বেশ জমিয়ে নিযেছে সে। পর্দার ফাঁক দিয়ে বযটা বেশ চকচকে গোল গোল চোখে তাকাচ্ছে। ২নং অবিনাশ একটি চোখ মাবল বযটার দিকে। বয়টার চোখে কিছুটা যেন মাদারীপুরের গন্ধ লেগে আছে। সুমিতা ও তুতুলেব কথা মনে হলো। প্রভু অবিনাশের নির্দেশ অর্থাৎ ১নং অবিনাশের নির্দেশ, সুমিতার একটা গতি করতে হবে। কেটে রাঁদা ঘষে ওর শরীরটা ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। মাদারীপুরের গন্ধটাকেও বিদেয় করতে হবে। গপ গপ করে খাবাব খাচ্ছে ২নং অবিনাশ। চুকচুক কবে হুইস্কি টানছে।

তৃতীয় অবিনাশের তলপেটটা টনটন করছে। একটা পবিচিত অস্বস্তি বোধ করছে সে। এক ফাঁকে কাজটা সেরে নিল। একটা প্লান ঠিক করে হাঁটতে হাঁটতে এক বন্ধুব দোকানে গেল। বন্ধুটি তাব রেসের দোসর। ফলের রসের দোকান। ফলের রস না নর্দমার জল। বেশ একটা চাল মেরে গোটা কয়েক দশ টাকার নোট ধার করলো ৩নং অবিনাশ। দু-একটা ফালতু কথা বলে বেরিয়ে এলো। সে কিছুটা কেনাকাটা করলো—এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক, ইংরেজি হলের তিনটে টিকিট, তিনটে লটারীর টিকিট। ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের টিকিটের জন্যেও লোক লাগালো সে। ঠোঁটের সিগ্রেটটা ব্যস্তভাবে ফেলে দিল। তারপর চিড়িয়াখানার ট্রাম ধরলো। চিড়িয়াখানা। প্রিয় সেই শিমপানজী আব ৩নং অবিনাশ। বেশ জমেছে। ৩নং অবিনাশ ও শিমপানজী বেশ আছে। শিমপানজী লাফাচ্ছে অবিনাশ হাসছে। শিমপানজী মুখ চুলকাচ্ছে। অবিনাশ জ্বলন্ত সিগ্রেট এগিয়ে দিচ্ছে। চিড়িয়াখানার একজন লোক এসে লোহাব খাঁচাব দরজা কেন জানি খুলল। ৩নং অবিনাশ টুক করে ঢুকে গেলো খাঁচাটায। চার দিক থেকে লোকজন হৈ হৈ কবে তেড়ে এল। অবিনাশকে হিঁচড়ে টেনে বাইরে আনা হলো। তারপব মাদারীপুরের দারুণ গন্ধের মধ্যে অবিনাশ হাঁপাতে লাগল।

ফুচকা খাচ্ছে তখন অবিনাশ। ময়দানে ফুচকা খাচ্ছে। মন্দ লাগছে না ওর। খিদেও পেয়েছিল জব্বব। এই কটা হল আমার। আটটা হল বাবু। আটটা কি বলছ হে। সবে তো ছ'টা হল। না, বাবু আটটাই হল আপনাব। দেখি, আরো গোটা চাবেক দাও দেখি।

মাইজি, আপনাকে আরো দেব—ফুচকাওয়ালার বিনীত আব্দার। সলজ্জ মাথা নাড়ে

পাশের থলথলে ভারী দেহ অবাঙ্গালী মেয়েমানুষটা। অবিনাশ দেখলো মেয়ে মানুষটার নাভির নিচের অনেকদূর থেকে বুকের প্রান্ত পর্যন্ত কোন আবরণ নেই। বিরাট শরীর ফুচকা চিবোনোর তালে তালে নড়ছে, কাঁপছে। মাথায় এক হাত ঘোমটা। মাগী ঘোমটার নিচে খেমটা নাচ দেখাচ্ছে। ভড়ং দেখে বাঁচি না। অবিনাশের মুখ পিছলিয়ে মনে মনে বেশ কয়েকটা দারুণ খিস্তি বেরিয়ে এলো। বুড়ো মানুষের কাশির মত অবিনাশ দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু চা খেতে হবে। তেঁতুলের জলে মুখটা কেমন যেন হয়ে গেছে। এই চা-অলা, দেখি এক ভাঁড়। চা খেল অবিনাশ। কিছু দূরে মেয়েদের বাসকেটবল খেলা হচ্ছে। অবিনাশ সেখানে গেল। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, অ্যাংলো সব আছে। অবিনাশ ওদের শরীর দেখছে। অবিনাশ মাংস দেখছে। শরীর নাচছে। মাংস নড়ছে। এক দুই তিন। দ্রিমি দ্রিমি দ্রিম—এক দুই......।
পাশ দিয়ে মিষ্টি পান চিবোতে চিবোতে মফস্বলের স্বামী-স্ত্রী হেঁটে গেল। ইস ভীষণভাবে মাদারীপুরের গন্ধ ছড়াচ্ছে ওবা। কি বিচ্ছিরি। অবিনাশের বমি আসছে। ও—য়াক—থুঃ। মুখে টক জল উঠছে। নাঃ বাবা। বাড়ি যেতে হবে। ছুরিটা ধার দিতে হবে। কাজটা সারতে হবে। ইস কত কাজ বাকি। মাদারীপুরের গন্ধ। ওয়াক —থুঃ।
বাড়ি এল অবিনাশ। অবিনাশের ঘরে ২নং ও ৩নং অবিনাশ বসে আছে। ২নং অবিনাশ রুমালে হাত মুখ মুছছে। টেবিলে ৩টে খালি হুইস্কির বোতল। পাশে একটা বাটিতে কিছুটা কাঁচা মাংস। আব চকচকে সেই ছুরিটা। মাদারীপুরের মাংস। ৩নং অবিনাশ বসে আছে। চোখ টিপে হাসছে। ওর কাঁধে একটা শিমপানজীর বাচ্চা। লাফাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে। টেবিলে তিনটে লটারীর টিকিট তিনটে সিনেমার। অবিনাশকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ২নং ও ৩নং অবিনাশ উঠে বাইবে চলে গেল। ওরা চলে যাবাব পর ভেতর দিকের দরজার পর্দাটা সরিয়ে একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে একজন মেয়েমানুষ ঘরে ঢুকলো। মেয়ে-ছেলেটার কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ওর শবীরের প্রতিটি ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। অবিনাশকে দেখে ওরা ফিক ফিক করে হাসছে। বাচ্চাটা হাততালি দিচ্ছে। শিমপানজী চেঁচাচ্ছে। সাহেবী বাবে রাত্রে এরকম..মেয়েমানুষ দেখেছে অবিনাশ। চারদিকে বমির শব্দ উঠছে ওয়াক—থুঃ, ওয়াক—থুঃ। শিমপানজী চেঁচাচ্ছে। এসব কী দেখছে অবিনাশ। একি হলো! একটা দুটো তিনটে হাজারটা ক্রিকেট বল প্রচণ্ডভাবে পড়ছে এসে অবিনাশের মাথায়। লাল-কালো, লাল-কালো। অবিনাশেব চোখে লাল-কালো। মাংসের বাটিটাসহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অবিনাশ। অদূবে শিমপানজী চেঁচাচ্ছে।

মানস দেববর্মন

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী

নাম—সৌগত দেববর্মা
পিতার নাম—রাধাচরণ দেববর্মা
ঠিকানা—কৃষ্ণনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
জাতি—ভারতীয়
ধর্ম—হিন্দু
তপশিলী জাতি/উপজাতি (ত্রিপুরী)
মাতৃভাষা ....

চাকুরীর দরখাস্ত ফর্মেব এ অংশে এসে সৌগত থেমে পড়ে কলম উঠিযে নেয়। সামনে চিৎপাত ফর্মের মুদ্রিত অক্ষরের পাশাপাশি তাব হস্তাক্ষর কি রকম বেখাপ্পা হয়ে চোখে পীড়া দেয়। সৌগত বারবার পূরণ করা অংশটা পড়ে এবং পড়তে পড়তে ক্রমশঃ চোখ থেকে মনে এবং মন থেকে যেন আরো গভীর কোন অংশে সে নাড়া খেতে থাকে। চাপা নাকে চশমার ব্রিজ আটকে থাকতে পারে না, বারবার নীচে সরে আসে, এবং হাত দিয়ে বারবার তাকে ঠেলে উপরে তুলে দিতে দিতে এক সময় সে আব তার প্রয়োজন বোধ করে না কিংবা হযত বা ভুলেই যায়।

রাধাচরণ বললেন, কি অইব, লিইখা দে—বাংলা।

কিন্তু লিখতাছিত ত্রিপুরী, তা ঐলে মাতৃভাষা বাংলা অইব কেমনে! —সৌগত বলে।

—একটা ফুডা তিপ্রা কথা জানছ? জানছ না হিডা হগগলে জানে, তব ডিরেক্টাবেও জানে, জিডা হাচা কথা সিডাই লেখ। বাধাচরণ রেগে উঠেন। তিনি নিজেও তিপরা জানেন না।

বাধাচরণ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুবা' খুলে ছেলেমেযেদের ছবি দেখান, রবিঠাকুরেব সাথে জমায়েত লোকারণ্যের মাঝ থেকে বের করেন বালক বয়সের নিজেকে—বলেন, রবিঠাকুব যখন আইছিল আমরা তারে সম্বর্ধনা জানাইছিলাম। একডা থিয়েটাব করছিলাম, বাংলা, তাতে আমি...সৌগত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে তখন কলেজে পড়ছে।

বেঁচে থাকার কারণেই বর্তমানে সৌগতের একটা চাকুরীর জরুরী দরকার হয়ে পড়েছে। এতদিন মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা একরকম চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে রাধাচরণ রিটায়ার্ড হয়ে যাওয়ায় চলমান বর্তমান একটা গভীর অন্ধকার ফাটলের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থেমে পড়ে। রাধাচরণ সৌগতকে সামনে ঠেলে দেন। পেছনের দিকে তখুনি তার চোখ পড়ে, সে সার বেঁধে দাঁড়ানো মা, বাবা, ভাই বোনদেব দেখে। দেখে এবং আঁতকে ওঠে।

রাধাচরণ বলেন, মহারাজা কইতেন—রাধা, বাজারে দুইডা দরজা লইয়া ল। কেডা জানত, ত্রিপুবা এমন হইব। কইছি, আইজ্ঞা দালান তুলনের ক্ষমতা আমার নাই। প্রভাবতী বলেন,—ভুন্দা।

সৌগত নিজেও উত্তেজিত হয়। তখনও সে ফর্মের ৭নং পূরণ করে না, কলম দাঁতে কামড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, নিজেরাইত দুষ। তুমরা জান না কেন?

রাধাচরণ চুপ করে থাকেন, একটু যেন চুপসেও যান।

রাধাচরণের পিতৃপুরুষ খাঁটি ত্রিপুরী অর্থাৎ পাহাড়িয়া।

রাধাচরণ সম্প্রতি প্রকাশিত 'ত্রিপুরা গেজেট' খুলে ছোট ভাই বোনদের মাষ্টারমশাইকে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলায় আদালতী রূপটি দেখান। মাষ্টারমশাই বলেন, ওরেব্বাস, এবকম বাংলায় আপনেরা কথা কইতেন নাকি। রাধাচরণ হাসেন, ধুর, তবে এরকম সাধু বাংলাও আমরা বুঝি। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় সম্মান বাংলাদেশেই বুঝি প্রথম পাইল মনে কর? এর কত আগে ইখানে বাংলা ভাষা...'রবীন্দ্রনাথ... গোবিন্দমাণিক্য...সিবায় রবিঠাকুর...রাধাচবণ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' খুঁজতে ঘরে ঢোকেন। সৌগত এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে বলে,—চল ঝন্টু।

মাষ্টারমশাই সৌগতের স্কুল কলেজের বন্ধু।

বাড়ীর কাদা বাঁচিয়ে রাস্তায় পা দিলেই পাকা সড়ক। রাস্তার পাশে মিটমিটে বৈদ্যুতিক আলো।

আয়াসে মানুষ অতিদ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কষ্টকর অতীত ততোধিক দ্রুত ভুলে যায়।

বারচোদ্দ বছর আগেও এরকম বর্ষার সন্ধ্যায় খালি পায়ে হাকুঁরপাকুঁর করে আন্ধাইরে অনেক হোঁচট খেতে খেতে রাস্তায় মানুষকে চলতে হত। এই কৃষ্ণনগর নয়, সারা ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা এরকমটিই ছিল। উদয়পুর থেকে সোনামুড়ো বদলী হলে সেই পঞ্চাশ-একান্ন সনেও রাধাচরণ সপরিবারে স্থান পরিবর্তনের জন্য অনেক সময়সাপেক্ষ নদী পথকে, বিকল্প নয়, একমাত্র উপায় বলে মেনে নিয়েছিলেন। অতীতের সেই সমস্ত দিনগুলোতে কৃষ্ণনগরের এই স্থানে বসত বাটি করার কথা উঠলে নাক সিঁটকে রাধাচবণ বলতেন, অই ধানক্ষেত্রে কেডা থাকব? রাজপ্রাসাদ থেকে সেই ধানক্ষেতের দূরত্ব অনধিক আটশ গজ।

বিয়ের যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত বলে লজ্জায় নয়, সত্যিই এককানি পরিমিত এই জায়গা এবং আশপাশের আরো কিছু অঞ্চল জুড়ে লীলায়িত ধানক্ষেতের জলা জমিতে বসত বাটি নির্মাণের অনিচ্ছাটা রাধাচরণের স্বাভাবিকই ছিল। সেই সময়ে জানবার কথায় উল্লেখিত ত্রিপুরার সম্পদ কি—বনজ সম্পদ, খাঁটি সত্য, ত্রিপুরার আয়তন এবং লোকসংখ্যাব পারস্পরিক সম্পর্কের সংগে কোন বিরোধও ছিল না। তারপর অতিদ্রুত, ঠিক সৌগতের বালক বয়সের কৈশোরকে দ্রুত টপকে যৌবনে পদস্থাপনের মত হঠাৎ ত্রিপুরা চারিদিক থেকে কল্লোলিত হয়ে উঠল। খোয়াই থেকে সদরে বদলী হয়ে রাধাচরণ ফেলে রাখা দানের জমি থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে চৌচালা তুললেন। সৌগত ক্লাস নাইনে ভর্তি হল।

ঝন্টু বলল, ওর দুষ কি! মফঃস্বলে মফস্বলে আছিলি ঘরে বাইরে দুইখানেই বাংলা কথা। ঘরে বাইরে একটাতেও চলে না এমন ভাষা তুই জানবি কেমনে?

আর এইখানে তর বন্ধুত আমরাই। দেববর্মা বন্ধু ত তর নাই-ই। সৌগত বলল, থাকলেই কি হইত। টাউনের এক পার্সেন্ট দেববর্মাও তিপরা ভাষা জানে কিনা সন্দেহ। অনেক বাড়ীতে গিয়া দেখ—নেপালী জানে, মণিপুরী জানে, কিন্তু তিপ্‌রা জানে না। তারা পিকুইলিয়ার টোনে টেনে টেনে বাংলা বলে, আমরা কই অন্দরের কথা। মোদ্দা কথা আমার মাদার টাং প্রায় চিতাত উঠল বইল্যা এবং আমরাই তার কারণ।

—কারণ?

প্রভাবতী দেবীর সুন্দর চেহারা। চেহারা বলতে মুখশ্রীও। অর্থাৎ নাক চোখ বেশ শার্প। স্বামী কিংবা পুত্র কন্যাদের মত ভোঁতা ভোঁতা নয়।

—আমাব বাবার এই দশাসই চেহারা, খাঁড়া নাকেব নীচে পাকাইন্যা মোচ, চখের দিগে তাকাইলে ডর লাগে—জমিদার বইল্যা কইয়া দিয়ন লাগে না।

—...

—বুঝজি। বাবাবা আসলে ঠিক দেববর্মা না, লিখত আর কি! এমনে বাঙালীই। আর আমার নানু ত ঠিক পরীর লাখান। পান্না-গোযলিয়রের রাণীর থিইক্যাও সুন্দব। তর বড় মামার পশ্চিমা বৌযের মত চখের কাটা। এত বড় বড়। অখনে যেমন বাঙালীর লগে বেশী সম্পর্ক হইতাছে, আগে বেশীব ভাগ অইত নেপালী, মণিপুরী কিংবা পশ্চিমাদের লগে।

—স্বজাতির মধ্যে কোন সম্পর্ক হয় না?

রমা প্রায়ই বলে—তোমাকে দেখতে অনেকটা আমাদের মত। প্রথমদিকে সৌগত খুশীই হত। সৌন্দর্য্যের তৈরী মাপ কাঠিতে নাক, চোখ এবং মুখের আদল তাদের ঠিক সুন্দব নয়, এ বোধে সে সচেতন কিন্তু রমার মন্তব্যে সৌগত ক্রমশঃ একটা পৃথকীকরণের গন্ধ পেতে থাকে এবং হঠাৎ-ই একদিন সে 'আমাদের' শব্দটিকে প্রত্যক্ষ করে চমকে ওঠে। এবং এই প্রথম একটা ব্যক্তিগত দুঃখ একটা বিরাট রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত সমস্যারূপে তাব চোখে উন্নীত হয়। এবং এই প্রথম সে একটা কঠিন দায়িত্ববোধেব চেতনায় পীড়িত বোধ কবে। গল্পে তাকে ধবতে সে কলম হাতে নেয়।

সৌমেন বলে, যদি আমি বাংলা না জানতুম, যদি আমার চেহারা খাস পাহাড়িযাদের মত হত, আব, যদি আমি এই বকম মোটামুটি ভাল চাকুরী না করতুম, তাহলে তুমি কি আমার প্রেমে পড়তে?

রমলা উত্তর দিল,—এত সব নয় প্রথমটা না হলেই তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হ'ত না। তুমি কি আর তাহলে রবিঠাকুবের গান জানতে!

—কিন্তু যদি কোন মন্দিবে দেখা হ'ত। দুজনেই ত' হিন্দু। অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক এমন কিছু নয়। কমন একটা মিল ত' আছে।

—দূর, প্রোব্লেম ত' রয়েই গেল। কম্যুনিকেশনের দরকারটাই প্রাথমিক। তারপর না হয় আর অন্য সবকে, প্রেম অন্ধ বলে গোঁজামিল দেয়া যায়। সৌগত বুঝতে পারল সে একটা গোঁজামিলের দিকে তার গল্পকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চাবুকবিহীন এ-কি পানসে ভাষা! কলম বন্ধ কবে সৌগত ঘরময় পায়চারি করতে থাকে।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই সৌগত বিমলের বাড়ী ছুটল। স্কুলের আগেই

তাকে ধরা চাই। বিমলের সারা মুখ উদ্ভাসিত। আতিথেয়তা প্রকাশের সামনে সৌগত তার কাল রাতের লেখা গল্পের শুরু পেতে দেয়। বিমল গল্পে চোখ রেখেই পিছু হটে বিছানায় গিয়ে বসল। সৌগত তার মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকে। সারা মুখে স্পষ্ট চিন্তার ছাপ নিয়ে বিমল পড়া শেষ করল এবং সৌগতকে কিছু না বলে প্রথমে বৌকে ডেকে চা করতে বলল। সৌগত এবং বিমল তারপর মুখোমুখি হ'ল।

—দুঃসাহস না হইলেও তর সাহস আছে, মানতেই হইব। তুই গল্পটারে কই টাইন্যা লইয়া যাইতাছত...মানে বুঝজত ত?

সৌগত বুঝতে পারে বিমলের মনের অ'সল কথাটা। সে নিজেই এ প্রশ্নে ভাবিত এবং বিমলের সাথে তার এই সাক্ষাতের প্রয়োজনটা তার কারণেই। সৌগত এবং বিমল উভয়েই নিজেদের পুরোমাত্রায় সচেতন লেখক বলে বিশ্বাস করে এবং ফলে লেখকের দায়িত্ববোধে তারা মানবতার পক্ষেই কলমকে টেনে নিয়ে যায়। সৌগত জানে বিমলরা তাকে সঠিক বিচারে নির্ভুলভাবে চিনতে সমর্থ হবে।

—দ্যাখ বিমল, আমি সজ্ঞানে কোন কনফ্লিকটকে উৎসাহ দিতাছি না। সত্যের খাতিরে যা আসতাছে তাতে মিথ্যা যে নাই তা তুই-ও জানস আমিও জানি। আমার ছিন্নমূল অস্তিত্বের দুঃখটাই এইখানে বড়।

—অনেক দেবী হইয়া গ্যাছে রে। বিমল সিগারেটেব ধোঁয়া ছাড়ল। সৌগতের কথা শুনতে শুনতে সে যেন সমস্যার আরো গভীরে চলে যায়।

—কিন্তু, আমার জম্মত' এখনেই। একটা বোয়াল মাছের পেটের ভিতর থিকা একটা ছোট মাছকে কাটা-ছেড়া কইরা বাইর করনের হাঙ্গামা কষ্ট অনেক। উভয় পক্ষ কাটা-ছেড়ার আঘাতে ব্যথা কম বেশী পাইবই। কিন্তু, আমাব মূল উদ্দেশ্যটা দেখবি না। দু'পক্ষকে স্ব-রূপে বাঁচতে সাহায্য করাটা আমার নয়, আমাদের কর্তব্য।

—একটু সাবধান হ বন্ধু।

—তর ইঙ্গিতটা আমি বুঝছি। একক কাউরে আমি দোষী করতাছি না। পেটের ভিতবে অবস্থানটা বর্তমান। পেটের ভিতবে সেঁধানের অতীত প্রক্রিয়াটা উভয় পক্ষের সহযোগিতায় সংঘটিত।

—একটু খোলসা কর।

রবীন্দ্র পক্ষে ত্রিপুবায় শিল্পানুবাগেব একটা জোয়ার প্রতি বছরই আসে। তখন শিল্প সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেক আলোচনার আসর নানা জায়গায় বসে। অতীত বর্তমানের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় সে সমস্ত আসর জমজমাট। 'মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন সৎশিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁর বিরাট প্রতিভা শিল্পের নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে তাঁকে একজন মহৎ শিল্পী করে তুলেছিল। সংগীত, চিত্রকলা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁর বাংলায় লিখিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে ভাস্বর রূপ নিতে পারে।'

ত্রিপুরী ভাষায় উনি কি কোন শিল্পকর্ম করেছেন?

আদৌ সে ভাষা তিনি জানতেন কি?

...'তারপর অনঙ্গমোহিনী দেবীর শোক-গাঁথা কাব্যগ্রন্থের আলোচনা ত' পূর্বানুষ্ঠিত সভায়

বিস্তারিতভাবে আলোচিত।'

...'শুধু তাই নয়। সাহিত্য এবং রাজ্যশাসন ব্যবস্থা উন্নততর করার বাসনায় মহারাজগণ রাজ্যের বাইরে থেকে (বঙ্গদেশ নিকটবর্তী থাকায় সেখান থেকে অধিক) পণ্ডিতদের নিয়ে আসতেন এবং তা রবিঠাকুরের সাথে ত্রিপুরার রাখীবন্ধনেরও পূর্বাতিহাস'।

অর্থাৎ শাসনকার্য মানে, বড় বড় ক্ষমতার আসীন ব্যক্তিগণের আদেশ-প্রত্যাদেশ চলত প্রধানতঃ মহারাজা এবং বাহির থেকে আমদানীকৃত পণ্ডিতগণের যৌথ উদ্যোগে। সুতবাং তাদের কাছাকাছি পৌঁছতে গেলে নিজের খোলস একটু পাল্টানো দরকারী-ই।

...'সুতবাং বাংলা সাহিত্যের সাথে ত্রিপুবাব অচ্ছেদ্য বন্ধন সেই সুদূর অতীত কাল থেকেই।'

বাড়ী ফিরে সৌগত বইনাবীকে সামনে ঝুড়ি এবং মেঝেতে আলাদা আলাদা ভাগে সব্জি সাজিয়ে, চায়ের কাপ হাতে বসে আছে দেখতে পায়। বইনারীর পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে মেঝেতে লেপ্টানো শবীরে ভারসাম্য দু'হাতে ঠেকা দিয়ে মুখময় ছড়ানো হাসি মা-র সাথে গল্প করছে একটি মধ্যবয়স্ক তিপরা। বইনারীর স্বামী।

—তর বিয়াবে কই, আমারে একটা মযনা আইন্যা দে। মা বইনারীর দিকে মুখ ফিরায়।

বইনারী বলল—অহন কইলে কই পাইব? আগে কইলিনা কিবে। বইনাবীব বিযা যোগ দিল—আমাব তা অইলে এই এত্ত-অ ডাঙ্গব অইযা গেছে। নানান কথা কয়। অগগল তিপবা কথা। তরা অইলে কিছু বুজত না। হা হা কবে সে হাসে।

সৌগত প্রভাবতীব দিকে তাকায়, বলে—কি হইছে মা?

—বইনাবী তার জামাইরে লইয়া আইছে তব বাবার কাছে। কাম কাজের কোন সুবিধা ইখানে করতে পাবে কিনা চাইতাছে।

—কেন? পাহাড়-অ কোন কাম নাই? তাব টিলা জমি নাই? সৌগত তীক্ষ্ণ স্ববে প্রশ্নগুলি তার মাকে কবলেও আসলে আদিবাসী পুরুষটিই জিজ্ঞাসিত। সে উত্তব দিল. আব মামু, জমি দিয়া আইলে আব কিতা অইব। অগগল কালা অইযা গেছে খবানে। অপিস, কাচারিত একডা কাম লইযা দেনা মানু। সৌগত চমকে ওঠে।

বিমল একটু তেবছা কবেই বলে, আমবাব না হোক, তর চাকবী অইবই। আছত আরামে। হালাব নিজেব ভাষা না জাইন্যাও ট্রাইবেল। এই ইংরাজী কথাডা ছাড়া তর লগে আমার তফাৎ কোন খানে? তর বাবা আমার বাবাব থিইক্যা অনেক ভালো চাকবী করত।

বিমল প্রসঙ্গটায অন্য একটা মোচড দেয—আসলে সৌগত, আদিবাসীদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে যেকোনভাবেই তাদের সরকাবী সাহায্য পাওয়া উচিৎ। ইখানে ট্রাইবেলের থিকাও বড কথা তারা দুঃস্থ মানুষ। সাহায্য শব্দটা মানুষের দুববস্থার সাথে যুক্ত। এই সাহায্যকে এক্সপ্লয়েট শুধু তবা না, আমরাও করতাছি।

সৌগত জালে আটকানো মাছের মত ছটফট কবে। হঠাৎ সে চেঁচিযে ওঠে,

আমার কি দোষ?

প্রভাবতী সৌগতের হয়ে উত্তর দেন,—হ, বলে নিজেই চাকরীর খুজ করতাছে তুমারে দিব চাকরী!

সৌগত একটু ধাতস্থ হয। পুরুষটির দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং সময় কি ভাবে থেমে থাকে হঠাৎ করে সে উপলব্ধি কবে। বাবার কাছারিতে জ্ঞান হওয়া থেকে ঠিক যেমন চেহারা, কথাবার্তা এবং পোষাকে এই বিশেষ শ্রেণীটিকে সে দেখত, আজ কত বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কোন ফারাক নেই। সৌগতের চোখের সামনে এক লহমায অগুন্তি এই সমস্ত মানুষের চেহারা ঝাপসা আয়নায কুয়াশাময় চিত্রেব মতো ভেসে ওঠে। মঙ্গোলিযান টাইপ চেহারা। কাউকে আলাদা করে চেনা কষ্টকব। এমনি মিল। তবে? সৌগত বলল—মামু, তিপরা কথা আমারে শিখা না! তরে আমি মাষ্টাব রাখমু। যেদিনই আইব ইখানে খাইব, যাঅন আঅনেব খবচ আর দুই এক টাকা দিমু।

মামু হেসে ফেলে। মুখ গোল কবে কেঁপে কেঁপে হ-হ কবে হাসে।—কিতা যে কইযা থাকস মামু, আমি অইলে তরে কি শিখাইব। তবা লেখা পড়া কইবা কতত জানস!

বইনারী এবং সাথে সাথে প্রভাবতী দেবীও হাসতে থাকেন। প্রভাবতী বললেন, আব রাজ্যে মানুষ নাই। অর কাছে তর তিপরা কথা শিখতে অইব। ক্যান, কেডা না বলে কগববকেব উপরে বই লিখছে, হিখান থিইক্যা শিখনা।

বইনাবী এবং তাব স্বামী তখনো হেসে চলেছে এবং হাসাতে হাসতেই তারা উঠে দাঁডায। মামুর মোটা দরাজ গলার সাথে বইনাবীর গলা থেকে দমকায দমকায় বেরিয়ে আসা সরু চাপা হাসি কেমন একটা প্রাচীন সংগীতেব মত বাজতে থাকে। সৌগত সবাসবি গিয়ে মামুব বালি এবং ঘামে আঠাল কব্জি হাত দিয়ে চেপে ধরে। দৃঢ কণ্ঠে বলে, মামু তুই কইয়া যা কবে কবে আইব। আমাব ইডা শিখনেব কাম আছে। মামুর হাসি চট কবে থেমে যায়। কুতকুতে চোখ যতদুব সম্ভব বড় করে সৌগতকে দেখে বুঝিবা তাকে বুঝতে চেষ্টা করে, তাবপব তিপবা ভাষায বইনাবীব সাথে অতি দ্রুত কিছু কথা সেবে নিযে বলল—একদিন ত' অব লগেই আইতে পারব। আঙুল দিযে সে বইনাবীকে দেখায়। আর দুই একদিন, হঃ একলাই আইয়া পডব আর কি।

বইনারী এবং তাব স্বামী বাবান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামে এবং ধীব পদক্ষেপে বাড়ী থেকে বেরুতে থাকে। আদিবাসীদের হাঁটা-চলার ধরনটাও আলাদা। সৌগত তাকিয়ে থাকে। বাড়ীর গেটে দাঁডিযে মামু মুখ ফেরায—মামু, আমি আইব।

প্রভাবতী মেঝেয় ছড়ানো সব্জিগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলেন, —একডা চালকুমড়া, দুই মুঠা করোল, ছই, থুর, ডেডা—কত দাম অইববে ইখানে বাবুল?

বাবুল ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে, দিছ ত' মা আড আনা। একডা চালকুমড়ার দামই আড আনার বেশি।

প্রভাবতী খুশি হ'ন, কিন্তু তা আংশিক চেপে বলেন,—ওমা, পূজাত একডা কাপড় দিতে অইব না?

—হ, ঠকাইয়া যাও। তিন কাপড়ের দাম উইঠ্যা গেছে। আমি হিসাব করছি।

ঘরে বাবুলও উঁকি ঝুঁকি মারে। ফাঁক পেয়ে বলে,—মামু ইখানের একজিবিশনটা দেখছিলানি?

—নাহ্।

—তুমরার ঘরের মত একডা বাঁশের টং বনাইছিল। কি সুন্দর। মামু, তুমার ঘর দেখাইবা?

—হ, কিতা অইলে কস মামু, আমার টং-দেখলে তুই ছেপ ফালাইব।

—ইডা তুলতে দালানের থিইক্যা বেশী খরচ লাগছিল। পাচ-ছ হাজারের কম না। হিসাব কইরা দেখছি।

মামু এবার হ বলে না, বলে—অ।

রাং কুরুই—মানে টাকা নাই, তঙ্গ—আছে। মামু বলে। আগে একানা, দুই আনা, এক পইসা, আধা পইসা তিপবা কথায় আমরা কইত। অখন ত নাই-ই, আর কিতা অইলে কইব!

—তুমার নাম কি?

—নিনি মুং তাম?

—নাঃ, তুমার নাম জিগাইতাছি।

—জ্ঞানচন্দ্র। সৌগত একটু অবাক হয়। এ তো একেবারে বাংলা নাম।

—তর বাবার নাম কিতা?

ওয়াক-খি। শূকরের বিষ্টা।

তকখি—মোরগের বিষ্টা। খারাপ দেবতা থিকা বাচত আগে অইলে এরকম নামই রাখত।

মামুরা আমাদের মত সভ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

—জানেনি মামু, আমার আরেকতা নাম-অ আছে। তুই আমার গালা গেলে টসকু কই কইলেই আমার নক দেখাইয়া দিব।

নিনি পাড়া বড় অ—তোমার বাড়ী কোথায়?

—জানেনি মামু, বুড়া দেবতার গালা আগে আমরা থাকত। অখন থাকে আরও দুরুই। তুই যাইত গেলে কষ্ট পাইব। ইতা-অ ছাড়ত অইব। বহুত দেনা কইরা রাখছে। মহাজনরে কিতা আইলে কইব?

তোমরা কোথায় যাচ্ছ। —নরক বড় অ থাংগনানি নাই-অ?

ভাত খেয়েছ—মাই চাখা দে?

তুই—জল, মাই—ভাত, থাইপুং বলাই—কাঁঠাল পাতা, মুইআ—কবোল, বাত কমই খাইতে পারে—মাই কিসান মাচাও।

নিজ বাসভূমে, পরবাসী—এসব বাংলা মামু বুঝবে না।

আ—মাছ, ওয়াহান—মাংস, তকতুই—ডিম, ওআক—শূকর, ওয়ানছা—বাঙালী।

আর কতদিন মামু!

বেয়ারা ডাকতে সৌগত স্যুইংডোর ঠেলে প্রশস্ত ঘরে ঢুকল। বড় টেবিলটার

ওপাশে পাঁচজন বসে। একজন দূর সম্পর্কের কাকু, সৌগত চিনতে পারল। তিনি দু'হাত ভাঁজ করে থুতনির নিচে ঠেকা দিয়ে রেখেছেন। অপর চারজন হাসতে হাসতে একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত। সৌগতের আবেদনপত্র। কাকুর হাতের ইশারা সৌগতকে বসতে বলল।

মুখোমুখি বসে থাকা ভদ্রলোক এবার তার মুখের দিকে তাকালেন। নিমেষে ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর, থমথমে হয়ে গেল।

—হোয়াটস য়্যুর মাদার ট্যাং? ভদ্রলোকের স্বর গাঁক গাঁক করে উঠল।

—আমারা বাংলা ভাষায় কথা বলি।

—নোঃ, তোমার মাতৃভাষা কি? ঘরে এক্টা চাপা হাসির শব্দ।

—ত্রিপুরী। সাবা ঘব দমকা হাসিতে ভেঙে পড়ল।

সৌগত কাকুব দিকে তাকালো—তিনিও উর্দ্ধনেত্রে হা হা করে হাসছেন।

—ডু য়্যু নো—পেট খাবলে খাবলে প্রশ্নটি ভদ্রলোকের মুখে এল।

—না শিখছি, মামু...এবার আর কারোর মুখে হাঁ বন্ধ হল না। সারা শরীর কাঁপিয়ে, কেবল মুখের হা-টি স্থির তাঁরা হো হো হ হ কবে হাসতে থাকলেন।

—আমার মামু আর কদিন কিংবা ক'মাস কিংবা ক'বছর তারপর মাথা উঁচু করে...তারপর...সৌগতেব গলা মিইয়ে আসতে লাগল। সে হঠাৎ উপলব্ধি করল তাব সমস্ত কথা পাঁচটা বিরাট গহ্বর দাঁতের আঁকশি দিয়ে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে।

ভূতে পাওয়া মানুষেব মত উদাসীন উদভ্রান্ত, ঘরের পর্দা সরাতেই সৌগত দেখতে পায একটা বেমানান পোষাকের মত সোফায় মামুর শরীবটি লেপ্টে রয়েছে। সৌগতের সাবা শরীরে হঠাৎ করে একটা কাঁপুনি আসে। সে বালি, ঘামে আঠালো মামুর হাত ধবে। আঙুলের কাঁপুনি মুঠিকে ক্ষণে আলগা কবে দিচ্ছে। আরো কঠিন পেষণে মামুর কব্জি চেপে ধরে সৌগত এতক্ষণে বলল—আন নিনি অর তুলাঙগই থাংদি আং আরণ তংনানি।

আমাকে তোমাব কাছে নিয়ে চল না—আমি ওখানেই থাকব।

মামু এতক্ষণ অবাক চোখে সৌগতকে দেখছিল। এবাব সে হ-হ করে হাসতে থাকল। হাসতেই থাকল। তার পরিস্কার মুখেব অন্ধকার হাঁ ক্রমশঃ বিস্তৃত। বিস্তৃত। স্থিব।

সৌগত বলল—বিশ্বাস কব।

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

বংশীর ভাতার

আবার বাতাসের বুকে টি, টি, টি। বংশীর কান খাড়া। একটু চঞ্চলও। উদাসী ভঙ্গীমায় বংশীর চোখের মণি দুটো একটু নড়ে।

মাথার উপর হেলে পড়ে সূর্যটা এখন কিছুটা দমেছে। সামনেব আম কাঁঠালের ডাল পালার ফাঁক ফোঁকব দিযে আলোব তীব-বেঁধা উদোম-গা বংশী শব্দের সাথে সাথে ঘাড় ফেরায়। এধাব ওধাব থেকে নীলচে আকাশটা কেমন ঝিমুনী ভাবে আটকা পরা। গাছেব ছায়াবা এখন সব পূবমুখী। একটা আর একটাব গায। তাই ছায়া ছাযা ভাবটা ক্রমে জমজমাট।

এদিকে জন মনিষ্যি কম। আব কম বলেই বংশী নিরাপদ বোধ করে। জন মনিষ্যি বড় আপদ বালাই। আছ তুমি বসে—সেই কখন থেকে হা পিত্যেশ করে, এদিকে কথায়, হাত তালিতে, চিৎকারে অথবা 'আবে ও বংশী' ডাকে ভেস্তে দেবে; আর তাব মানে হল আবাব অপেক্ষা কব। অপেক্ষা কবতে কবতে বংশীর পায়ের তলায দুব্বা গজিযে গেছে। যত অপেক্ষাই কর না কেন—ঐ মেজাজ না হলে এলো না, এলো তো বসল না। যেন বাপের ঠাকুব। বংশীব ভাতেব ডেলা। উড়ন্ত ভাতার।

ডাক শোনার পর থেকেই বংশী যেমন এগাছ ওগাছ দেখে তেমনি সামনে পেতে বাখা ছেঁড়া পাটিটার উপব বাব বার তাকায়। যাঃ। ছায়ায থাকলেও বাতাসে টেনে নিয়েছে, তাই তো খড়খড়ি ভাব। মুখটা বিকৃত কবে নিজেকেই নিজে যেন গাল দেয়, সারা দিন ভব হা পিত্যেশ কইব্যা বইযা বইলাম—একবাব দেহা নাই। এখন আইছে মসকবা করতে। ঠোঁট নাড়ায তবে কোন শব্দ করে না।

বংশী তাকায় এগাছ ওগাছে তবে চোখে ঠাহর হয় না। এগাছ ওগাছেব ফাঁক ফোঁকর থেকে, ডালেব ভেতবে পাতাব আড়াল থেকে ডাক যেন আসে, কিন্তু দেখেনা বংশী, ভাবে ডাইলে সব বান্ধা নাহি? মস্কবা?

তবে, বংশী অধৈর্য হয় না। দিনেব পর দিন বংশী এ টিলা সে টিলায় হাতে তাব এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে, গামছাব কোনায বিড়ির টুকরো কয়েকটা বেধে বেড়িযে যায, এবং তারপর থেকেই তো নিযত অপেক্ষার পালা। সামনে বিছানো ফাঁদ পেতে, একটু আড়ালে বসে অপেক্ষা আর অপেক্ষাব ফাঁদে টি, টি, টি— করে কখন উড়ে আসবে বংশীব অপেক্ষা।

বংশী নিষ্কর্মার ঢেকি! এ কথা বংশীর বউটা বলত এবং আরো বলত—নিব্বইং-শা। আব এই অক্ষর চতুষ্টয় উচ্চারণ কালে বংশীর বউ-এর চোখের মধ্যে ঘোলাটে আকাশের মত বিদঘুটে অবস্থা একটা হয়ে যেত। দাঁত চেপে বলা এই কথা এলে বংশী অসহায এবং অপমানের তীব্র ধাক্কায় ছুঁড়ে মারা বাটুলের মত উঠে দাঁড়াত।

এবং তখন একটি পুরুষ ও নারী উভয়ের শব্দ যুদ্ধে, কিল চড় এইসবে

অন্ধকার ঘরের মধ্যে লণ্ড ভণ্ড অবস্থা, বাঁশের দাড়গুলিতে আটক টিয়াগুলো তখন শব্দে শব্দে সচকিত আর তাই ডানার ছটফটানিতে, টি, টি, টি, শব্দে পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টায় তীব্রভাবে উদ্যত, অথচ যেহেতু অন্ধকার এবং যেহেতু কচি পায় নতুন শিকলের বাঁধন—কেবল তাই বন্দীত্ব তীব্র হলেও নিস্ফল প্রতিবাদ।

এই সব শব্দে বংশী ফিরে তাকাত। থেমে যেত বংশীর ক্রোধ, আক্রোশ। আর তখন বংশীর বউ লোকটার দিকে তাকাত মার খাওয়া বিড়ালের মত। টিয়ার পায়ের শিকল কাটতে পারে না কিন্তু বংশীর বউ শিকল কাটে—কেননা তার আর কিইবা করার থাকে। ভাত দিতে পারে না—আবাব ভাতার—এই আকুল প্রশ্নে অন্ধকার, ভাঙ্গা ঘর দোর, ছিন্ন ভিন্ন তৈজষ, শব্দরত টিয়াগুলোকে পার করে বংশীকে অবশ করে দেয়। এই কথা বংশীও জানে। আর যে কথাটা বংশী হয়ত শুনতে শুনতে বিশ্বাসই করে ফেলে তা হল 'নিষ্কর্মার ঢেকি!' এই ভাঙ্গাচোরা তার ডেরার চারপাশে অথবা বাইরের গাছপালাকে বংশী যতটুকু চেনে, ঠিক ততটুকুই অপরিচিত ক্রমে বেড়ে ওঠা মানুষজন। বংশী ঠিক পথ পায় না—তাই বংশী আপদ বালাই। সদ্য ধান কাটা শূন্য মাঠে কেমন এক বৈরাগী রিক্ততা থাকে। কেবল কিছু পাখ পাখালী, কয়েকটা গরু এবং বংশী সেই শূন্য মাঠে ঘোবে—একই উদ্দেশ্যে। বংশী পিঠের ঝোলাটায় ধান কুড়োয়—খুঁটে খুঁটে। মাটির বুকে মাটির রঙ মেপে একাকার ধান তোলে এক দুই করেই, কেননা মুঠা মুঠা ধান শূন্য মাঠে থাকেনা। এভাবেই এক মুঠ দু'মুঠ ধান কুড়াতে দীর্ঘ সময় চলে যায় এবং ধনুকের মত বাঁকানো পিঠ টন টন করে—অথচ একদা, এক মাঠ ধান কেটে বংশীও বাড়ী ফিরত—সে সব কবেকার ইতিহাস—যা কুড়ে কুড়ে সব পিঁপড়ায় খেয়ে গেছে—তাই এখন ধান কুড়োতে গিয়ে বংশীর পিঠ টন টন করে কিন্তু এই সব ধান টানই বংশীর দরকার—ধান না হলে ফাঁদ হবেনা, ফাঁদ ঠিকমত না হলে গাছের ডাল থেকে টিয়া নামবে না আর টিয়াই তো এখন বংশীর ভাত যোগানদাব।

ধানেব ফাঁদ—কথাটা বংশীকেও হাসায়। যে মাটিটার বুক থেকে এক দুই করে ধান তোলে বংশী সেই মাঠ থেকে বংশী ও তার বাপ কাটা ধান মাথায় নিযে বাড়ী ফিরছে। কবে? ধুর! এসব কথার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। তবে, ধান কুড়োতে কুড়োতে মাটির সোঁদাগন্ধ বংশীর নাকেও যায়, ধান নেই মাঠে, বংশীও জানে না কেমন করে আঁটি বাঁধে। মাথার উপর গোছা গোছা ধান কেমন নাচে, সেই সব জানে না—তবে মাটিতে গন্ধ থাকে যা বংশীর নাকেও যায়—বংশী এখন বুনো হয়ে গেছে. সোঁদা মাটির গন্ধ সে ভুলে যায়, বংশী কেবল দুরন্ত টি, টি, টি শব্দ চেনে, আর তার আগমনেব সঙ্কেতধবনির জন্য অপেক্ষা করে। বোধহয়, এই কাজ বংশীকে উত্তেজিতও কবে। যখন এক ঝাঁক সবুজ বিন্দু উড়ে আসে গাছের ফাঁক থেকে, যখন আম কাঁঠালের বনভূমি সচকিত করে বংশীর ফাঁদে এসে পাতানো আঠার আসনে বসে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে বুঝতে থাকে ফেরার পথ আটক—ডানাব ঝাপটায় তীব্র প্রতিবাদে সামনে বিছানো ধানগুলোর উপর লাল লাল ধারালো ঠোঁটে আঘাত করে—তখন নিশ্চেষ্ট বংশীর শিরায় শিরায় কেমন যেন শিহরণ বয়ে যায়। অথবা কেবল মনে হয় তুই আর মুই তো একই রে। তাই বংশী আবার তাকায় চোখ দুটো সব দিকে বুলিয়ে আনে। গাছ, গাছ আর গাছ, একটু দূরে নেমে গেছে

ঢাল, ঢালের নিচে অজস্র গাছের মাথা একাকার। ওখানে জাল পাতা যায় না, গাছের গুড়িতে গুড়িতে ফাঁক নেই—বংশী একবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু রুখতে পারেনি। কিছু না পেরে ঐ বুনো কলার বন থেকে যা পায় কুড়িয়ে অপরাহ্নে প্রায় অন্ধকার ডেবায় ফিরে এসে দেখেছিল—বউ নেই। দু'তিনবার ডাকাডাকি করেছিল—কেবল কয়েকটা বাঁধা টিয়া টি, টি, টি, করে উঠেছিল, বাইরে গাছে গাছে বাতাসে যেমন পাতা নড়ে তেমনি নড়েছিল, বংশীর বউ জবাব দেয়নি। তারপর ভেবেছিল বউটা বোধহয় এধার ওধার গেছে। কেননা বংশীর কেমন মনে হয়েছিল শিকল ছেঁড়া যায় না। টিয়া পাখী সব। বংশী ভেবেছিল বউ বোধহয় নতুন পুল বানানোর কন্ট্রাক্টরের ছাউনীতে ঘব গেরস্থলীর কাজ সেরে ফেরেনি।

বংশী দিনভর পাখী ধরায এ টিলা থেকে সে টিলায়, এ বন থেকে সে বন ঘুবে বেড়ায়, জন মনিষ্যি নেই কেবল কতগুলি অবুঝ বৃক্ষ। মানুষ জনেব ভাব ভাবনা সে বুঝতে পারে না। তার চেযে অনেক সহজ গাছেব সাথে কথা বলা, তার চেয়ে অনেক ভালো এক ঝাঁক টিযার পথে তাকিযে থাকা। এইসব অনেক নিজেব মত মনে হয়। লোকজনেব হাভ-ভাব এখন বংশী জানে না। তাই বউ ঘরে আসে না, কেন তা বংশীকে ভাবালেও কোন পথ পায না—অন্ধকারের মধ্যে এধার ওধাব হাতড়ায় তার ভাঁটায় পড়া চোখ—এখন দিনে যাওবা দেখে রাতে নয় একটুও—হাত মাটিতে হাতড়ায় এবং ঘুবতে ঘুবতে নিজের গাঁয়ে এসে থামে তারপর ঝিম ধরে বসে থাকা বংশী। নিশ্চেষ্ট আবো কিছুক্ষণ বউ-এর জন্য অপেক্ষা কবে, তারপর ঘুমিয়ে যায—যেমন শিকলের বুকে বার বার ঠোঁট ঠকাশ ঠকাশ কবে বুনো টিযারা এখন ঘুমায বা ক্লান্তিতে ঝিমায।

বংশীব বউ আসেনি আর। ঠিকেদারী ছাউনী কাল বিকালেই উঠে গেছে। কাজ শেষ। আবার হয়তবা কোথাও নতুন পুল বানাবে। গত বাতে বংশী জলছাড়া আর কিছু পেটে দেযনি। বউ-এর দুঃখে, ভাবনায নয়—ছিল না কিছুই। আগামীকাল বাজাব। হাটে যাবে বংশী সেদিন। গোটা পাঁচেক টিযা হলে তবু যা হোক। এই মধ্যবর্তী সময়ে বংশী বড় শূন্য। তাই ভোব বাতে ঘুম ভাঙে—পিচুটি মাখা চোখ ডিম ভাঙ্গা রঙ সূর্যটাকে দেখছিল—আব হযত বা কে জানে, নির্বাক পুলটাব দিকে তাকিযে ভাবছিল এবাব বউটা আসবে—যেমন আসে কোচায় দুমুঠ চাল, কযেকটা আলু, মাটি মাখা কাগজেব পুটলিতে এক চিমটি লবণ নিযে। এসে বাক্যহীন বংশীব বউ, কুডানো ডালপালা দিযে উনানে আগুন দেবে ভাত ফুটাবে যে ভাতেব গন্ধ মাঝে মধ্যে এইসব সকালকে বড ভালবাসায় জড়ায বংশীকে। ভাত ফুটিযে কালচে ওঠা এনামেলেব ভাঙা থালাটায় ঢেলে দিয়ে বলবে—মিত্যুও নাই, যমও খায় না আমারে —খাও!

বংশী তখন এইসব কথা গাযে মাখে না। এই সকালে কেমন বোদ, কেমন আনন্দ মাখা ভাতেব গন্ধ—সব ভুলে যায। আব তারপর ছেঁড়া থলিটায জাল, চাটাই, আঠা এবং কঞ্চিবাঁশের দাডগুলো নিযে আস্তে আস্তে টিলার ঢাল বেয়ে নেমে যায়।

তা, আজ আর বউ এলো না। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বংশীর মনে হয়, ভাতের ফাঁদে বউও টিয়া।

অন্যদিনের তুলনায় বেশ আগেই বংশী বনে যায়। বংশী যে কেন এলো তা নিজেও জানে না। দু'দিনের জমে থাকা ক্ষুধা, নাকি বউ এলো না তার কোন ক্ষত—তা বংশীও জানে না। ক্ষুধাও নতুন নয়—এইসব না ফেরাও নতুন নয়। নিজের জমিনে চোরের মত ধান কুড়ায় বংশী—জমি আসে না, বাপ, পুত এইসব মরে মরে যায়—আসে না, বউও যায়—আসে না—কোনটাই নতুন নয়।

গাছ তলায় বিছানো ফাঁদ রেখে একটু আড়ালে বংশী উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। দূর থেকে টি টি টি শব্দ—গাছগুলোর বুক চিরে উড়ে এসে বংশীকে সচকিত করে—তাকায এদিক ওদিক—সকাল থেকে এই নিয়ে তিন ঝাঁক এলো—তবু শালা একটাও বসল না—তবু অভ্যাস বসে ডাক শুনেই যেন বিদ্যুত বযে যায়—ঘোলাটে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠে, বাকানো শিরদাড়াটা একটু টেনে তোলে, ভাত বিছানো ফাঁদ, ঐ ফাঁদেই আবাব উডন্ত ভাত, টিযা-টিয়ায় বাবুর ঘরে হুল্লোব, এক দুই তিন অজস্র ভাত, ধোঁযা ওঠা ফাঁদে ভাত—উড়ন্ত টিযায ভাত, বংশী দূর থেকে, কাছ থেকে গাছেব অজস্র পাতাব আড়াল থেকে ভাতের ডাক শোনে—অথচ বংশীব ভাত ধবা ফাঁদে, এখন চাটাই এর উপব সমস্ত আঠা শুকিযে গেছে, সূর্য সব টেনে টুনে নিযেছে। বংশী একবার হাত বুলিয়ে দেখে—খডখড়ে। হাত বোলাতে বোলাতে বংশীর হাত অবশ হযে আসে—আহাবে আঠা নাই, পাখী এলে অটকাবে না—না আটকালে সাবাদিনমান গেল কেন?

এ প্রশ্ন এখন বংশীব। সাবাদিনমান যায় তবু শব্দগুলো একটাও টিয়া হযে এলো না; আব এখন যদিই বা আসে. তবে সামনে বিছানো চাটাইতে এখন আর আঠা নাই। খডখডে চাটাই'পবে ছডানো ধান—সে ধান খাবে আর তারপর লাল ঠোঁট মুখে উড়ে যাবে।

বংশী তা কি করে মানবে। বংশী মনে মনে উথাল পাথাল হয়। অথচ কবার মত কিইবা আছে। আঠা নাই সামনের চাটাইতে। এখন এই পডন্ত বিকেলে কোথা থেকে আঠা পায়— কিন্তু টিযারা এসেছে—না দেখা পেলেও তার ডাক শোনে —এই ডাক তাব ধমনীতে এখন জোয়াব তোলে—কেননা টিয়াবাই বংশীব ভাত দেয়।

বিমল সিংহ

গোলাপের ছেলেবেলা

দাবাগাঁও বাগানে ছিলাম। প্রথম লেবাব চালানেব সাথে কিছু জমি পায় বাবা। পাকা পিলাব, টিনেব ছাউনি দেওয়া ঘব। সঙ্গে এক ফালি জমিও মঞ্জুর কবে কোম্পানী। আমি দেখিনি। বাবাব মুখেই শোনা। দুটো দুধেব গাই আব এক জোড়া বলদও ছিলো। লোকে বলতো, মদ খেযে সব কিছু বেচে দিযেছে বাবা। তবুও. একটা দুধেব গাই ছিল শেষ অবধি।

এটা ঠিক। বাবা খুব মদ খেতো। খাওযা হজম হতো না মদ না খেলে। পূবেব অংশে ছিলো তাসা উডিযাব বাডি। একই ঘবে দুই পবিবাব। পশ্চিমে কে ছিল এখন আব মনে নেই। অস্পষ্ট মুখ মনে পড়ে। এটুকুই। নাম আব মনে আসে না। তাসা উডিযা মাতাল হযে বউ পিটতো বাতভব। বাডিব আসবাবপত্র উঠানে ছুঁডে ফেলত। পাশেব বাডিতে এত গোলমাল—বাবা কিন্তু কোন দিন বাইবে বেবিযে দেখেনি। এত গোলমাল কানে পৌছত কিনা কে জানে। পৌছলেও কি কববে। কাব গোযালে কে ধোঁযা দেয। নিজেই শুযে থাকত চটেব থলি বিছিযে। নেশায অঘোব ঘোবে। নুন নেই, কেবোসিন নেই কাপড নেই। কত অভাব আমাদেব সংসাবে। বাবাব সব অভাব ছিল গা-সহা। বিশ্বভুবন অভাবেব তাডনায় জ্বলছে জ্বলুক। বাবাব তাতে কিছু আসে যায না। এমনই নির্বিকাব ও উদাসীন। মা ওই বাগানেই কাজ কবতো। সন্ধ্যেবেলা ফিবে এসে দেখতো--বাবা বেহুঁশ। মা বলতো আক্ষেপেব সুবে, 'সংসাবে কি আছে কি নাই চোখে কোনদিন কুছু নাই ভালছে। তুই মবছিস মবাছিস লেবকা বাচ্চা গিলান মববেক কেনে। হামেশা মদ খাই কবে দেইটা শেষ কবে ফেইললে।'

বাবা অনেক কথাব পবে নেশাব ঘোবে জবাব দিত। 'সাবাদিন কোদালি কবে মদ খাই। তাতে তোব বাচ্চা গিলানেব মাথা খাই কবে দিযেছি নাকি।'

ভোবে বাগিচাব ঘণ্টা বাজতো। বাবা দুধ দোহাত বালতি ভবে। বালতি নিযে ছুটতাম দিদির সাথে ইস্টিশান মাষ্টাবেব ঘবে। সামনেই মাইল খানেক গিযে ইস্টিশান। লেংটা. খালি গাযে যেতাম। মাথায় ছিল লম্বা চুটকি। রেল গাড়ীর বাঁশি বাজত অনেক দূর থেকে। বাঁশির শব্দে মাথার চুটকি বাতাসে উড়িয়ে দৌড়াতাম। দিদি ডাকত পিছু পিছু। গোলাপ, গোলা-আ-আ-প। আমার কানে সে ডাক পৌঁছত না। দিদি কেবল চিৎকার করতো—যাচ্ছিস ভাইয়া যা কিন্তুন বেলের সামনে যাবি না। কালী কাছে টানে লিবেক। ইঞ্জিনেব ভিতব বয়লার আগুনে লাল শিখার মধ্যে দেখতাম কালীর জিহ্বা। রেলের বাঁশি সামনেব টিলা পেরিয়ে। সে বাঁশির ভাষা মন বুঝে, অন্যকে বোঝানো যায নাই।

রেলগাড়ি রোজ আসে। থামে আর চলে যায়। অসীম কৌতূহলে আমি কেবল তাকিয়ে থাকতাম। ইঞ্জিনের ঘট ঘটাং—ঘট ঘটাং—ঘট ঘটাং—শব্দে দেহমনের শিরা-

উপশিরায় বিচিত্র চঞ্চলতা। মাটি মানুষ যন্ত্রের মাঝখানে খুঁজতাম অদৃশ্য অচেনা শক্তির উৎস। অনেকদিন দিদিকে জিজ্ঞেস করেছি—'দিদি ওটা কেমনে চলে?'

'তুই নাই জানেছিস?' দিদিও বিজ্ঞের মতো বুঝিয়ে দিত। 'কালীপূজা যে দেখেছিস, সেই কালীর জোরেই ওটা চলছে।'

কালীর মূর্তি কোথায় বসানো দেখার জন্যে রেলগাড়ির নিচে বিরাট বিরাট লোহার মধ্যে উঁকি দিয়ে খুঁজেছি। দেখতে পাইনি। কেবল ইঞ্জিনের ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং শুনতাম। যেন কালীপূজার ঘন্টা বজছে। জানালা দিয়ে বসা অসংখ্য মানুষের মুখ দেখতাম। কোথা থেকে এত মানুষ আসে। কোথায় যায়। কত সুখে রেল চড়ছে। বিচিত্র মুখ, বিচিত্র পোষাক।

রেলগাড়ি পুল পাব হয। সাপ্তাগঞ্জে বাঁক নিয়ে হারিযে যায়। বিন্দুর মতো। তখনো দাঁড়িযেই থাকতাম। তারপব রেলের লাইনে কান পেতে শুনতাম কালীপূজাব বাজনা। ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং।

ওই ইস্টিশানে কোন লেবার যদি নামে'। নিশ্চয় বাগানেব কারো কুটুম হবে। দিদিকে জিজ্ঞেস কবতাম, 'দিদি, বাগানে কত লোকের কুটুম আসে। হামদের কেনে নাই আসছে?'

'আছে।' দিদি বলতো। 'সাগবনল বাগানে হামদেরও অনেক কুটুম আছে।'

'আছে তবে আসে নাই কেনে?'

'আসবেক। দবকাব থাকলে জরুর বেলগাড়ি চড়েই আসবেক।'

দিদিব কথা শুনে মনে মনে প্রতিদিন ইস্টিশানে কুটুম খুঁজেছি। কেউ কোনদিন আসেনি। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করতাম, 'হামদেব মতো ছোট লেবকা কুটুম থাকলে ওরা বেলে চড়ে আসবেক নাই, দিদি?'

এত কথায চটে গিয়ে মাথায় ঠোকর মারতো দিদি। একই প্রশ্ন বাড়িতেও করতাম। মা বাবা দুজনকেই।

রেল চলে গেলে ইস্টিশান মাষ্টাবের বাড়ি দুধের বালতি নিয়ে দাঁড়াতাম। ইস্টিশান মাষ্টাবেব ছেলেমেয়ে ছিল আমারই বযেসী। তাবা কত সুন্দব জামা কাপড় পরতো। খাট, আলনা, ঝকঝকে কত আসবাবপত্র। প্রত্যেক খাটে তাদেব মশাবী টাঙানো। আমাদেব সাবা বাড়িতে একটিও মশাবী নেই। ছেলেমেয়েবা দেখতে খুব পরিস্কাব পবিচ্ছন্ন। ঈশ্বরেব দুনিয়াতে আমরাই শুধু নোংবা।

কিন্তু সুন্দব হলে কি হবে। বারান্দায় উঠলেই ওবা আমার চুটকী ধরে টানতো। বাগ কবে ওদিকে তাকালেই পেছন থেকে আর একজন টানতো। এই টানাটানির কী মজা। এতেই হেসে ঢলে গলে পড়ত সবাই, বাথা লাগতো, ব্যথার চেয়েও লজ্জিয়ে উঠত সাবা মুখ। কানের কাছে গরম লাগতো। লাজিয়ে উঠলে রাঙিয়ে যেতো না কালো কুচকুচে তনুর রঙ। অপমান আর অবজ্ঞায় জ্বলতাম নীরবে। প্রতিবাদ বা প্রতিকারের ভাষা থাকত না। ওদেব খেলার জন্যই বোধ হয় চুটকী রেখে দিযেছিল বাবা।

মনের দুঃখে বাবাকে বলতাম "কেনে এই চুটকী বাখে দিয়েছিস বাবুর বাচ্চা গিলান ওটা লিযে রোজ টানাটানি করে, হামার বড় সরম লাগে" বাবা তখন কাছে ডেকে সযত্নে বড় সোহাগ করে চুটকীটা আমার পিঠে বেধে দিয়ে বলেছিলো—

'হিন্দু ধর্মের নিয়ম ওঠা কাটে দিলে লোক মুসলমান বলবেক।'

তখন জিজ্ঞেস করেছি—ইস্টিশান বাবুর বাচ্চা গিলান তবে কী জাত?

বাবা উত্তর দিয়েছিলো—ওরাও হিন্দু, তবে বাবু। মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, হিন্দু, মুসলমান আর বাবু এই তিন জাতিই হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। আর এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বাবু। ওরা যে পর-জাত, আমাদের জাত ওদের নয়, দেখেই বোঝা যেতো।

সকালেই কাজে চলে যেতো মা বাবা। ঘরে থাকতাম আমি দিদি আর ছোট বোন শিবদাসীয়া। খিদে পেলে ছোটবোন কাঁদতো চিৎকার করে। মাকে খুঁজতো। কত রকম সুর, ছড়া আর ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে দিদি চেষ্টা করতো কান্না থামাতে। শিবদাসীয়াকে ভোলাতে। চোখে ঘুম এলেও পেটের খিদে বশ মানতো না ঘুমপাড়ানি গানে। শুকনো চা পাতা সিদ্ধ জলে মাড়ের সাথে নুন গোলা বাটি শিবদাসীয়ার মুখে তুলে ধরতো দিদি। এতে কোনদিন কান্না থেমেও যেতো। ঘরে দুধ ছিলো না। দুধের গাই অনেক আগেই বেঁচে দিয়েছিলো বাবা। মাড়ের বাটি মুখে নিয়েই বড় হয়েছি। দুধের স্বাদ মিঠা না তিতা আমি কিছুটা বুঝলেও শিবদাসীয়া বোঝেনি। ঘরের পাশে কাঁঠাল ডালে দোলনা বেঁধে ঝুলতে ঝুলতে শিবদাসীয়ার কান্না থামাত দিদি। নুনু ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে। দিদির ছড়া শুনে মনে মনে দেখেছি বিরাট গোঁফওয়ালা বর্শা হাতে বর্গীর চেহারা। ধানের পাকা ডগায় বুলবুলির রাঙা লেজের চঞ্চল নাচ ভাবতে গিয়ে ভুলে গেছি লুঠেরা বর্গীর লুণ্ঠনের নিষ্ঠুর ছবি। শিবদাসীয়ার ঘুমচোখে স্বপ্নের ঘোড়ায় বর্গীর ছবি ভাসত কি না কে জানে। বর্শার চেয়েও তীক্ষ্ণ ক্ষুধা শিবদাসীয়ার ঘুম চোখের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো। দিদি পিঠে শিবদাসীয়াকে কাপড়ে বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত উঠানে। মায়ের জন্য অধীর অপেক্ষায় চেয়ে থাকতাম আমরা তিনটি বাচ্চা। বাগিচার উঁচু টিলা বেয়ে মা আসবে। বিকেলের সূর্য ডুবে যায়। গরু ছাগল গোয়ালে ফিরে। গরু রাখালের বাঁশি মিলায় বস্তিতে। হাঁস মোরগ কবুতর সবাই ঘরে ফিরে। মা আসে না। পাখীরা গাছে গাছে নিজ আস্তানায়, ঘরে ঘরে ছানা পোনা পাখীদের মমতা মুখর কলরব। আমি কষ্ট পাই। মা আসে না। বুক মুচড়ে দুমড়ে দিতো গভীর উৎকণ্ঠা।

দেখতে দেখতে অন্ধকার। মাথায় পাতি তোলার ঝুরি নিয়ে ফিরতো মা। দূর থেকে 'মা' বলে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকোতাম। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতো অসহায় কান্না। আকাশ বাতাস বোবা হয় "মা" চিৎকারে। মাথার বিড়ে উঠানে নামিয়ে বসত মা। পা ছড়িয়ে কোলে নিত শিবদাসীয়াকে। দোক্তা মিশানো চিবানো পান জিভ দিয়ে আমার জিবে দিত পুরে। একটা স্তন মুখে পুরে দিয়ে অন্য স্তন হাতে আগলে রাখতো। ওই এক জায়গায় যেন আর কারো কোন অধিকার নেই। ডাগর কালো চোখ মেলে চারদিকে তাকাতো অপূর্ব মমতাময় অহংকারে।

আমার নাক মুছে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিত বাসন্তীরঙের শাড়ির আচলে। আমার নখে টিপতে দিত দিদির মাথার উকুন। সংসারের সেই সোহাগী ছবি আজও মনে ভাসে।

মায়ের স্তন খেতো শিবদসীয়া। তার উপর একটু ঈর্ষা জাগতো আমার। মাকে

বলতাম, 'শিবদাসীয়াকে হামি আর দিদি দিনভর খেলাই করে রাখি। হামি যখন শিবদাসীয়ার নিয়ত বুনি খাইতাম তখন হামকে কে ভাতের মাড় খাওয়াই দিত?'

মা চুপ করে থাকতে পারতো না। বলতো, 'তোকে নিয়ে বাবা বহুত কষ্ট হয়েছে। তুই যখন ছোট লেরকা ছিলি, তোকে আর তোর দিদিকে নিয়ে যেতাম চারা বাড়িতে। যেখানে পাতি তুলতাম কাছেই গাছের নিচে তোর দিদি তোকে ঘুম করাই বসে থাকতো। লোহা চিমটি কামড় দিলে তুই তো বাগান ফাটায় নিতিস কান্দে করে।'

লোহা চিমটি মানে লাল বড় বড় পিপড়ে।

'তখন কি হইল বলে করে দৌড় দিয়ে আসতাম। দেখতাম লোহা চিমটির কামড়ে লাল হয়ে ফুলে গেছে সাবা দেহীটা। বাবে বারে তোকে লোহা চিমটি কামডাইত। হামি কাম ছাড়ে কবে তোকে বুনি দিয়েছি বলে সর্দাব কত গোসা কবেছিল। হামকে গালি দিত। কাছছেই যাইতে দিত না। কোন কোনদিন হাজিরেও কাটে করে দিয়েছিল। কুছু বলতাম না। তোব বাপকে বলেছি—হামকে ছুটি করাই দে না হলে গোলাপ শুখাযে শুখাযে মববেক। সাহেব তোব বাপকে হুকুম করেছিল। লম্বা ছুটি লিতে পাবে। তবে বাগান ছাড়ে কবে যাতে হবেক। বুকের পিযাস মিটায়ে তুইত দুধ কোনদিন নাই পেয়েছিস। তোব পিযাস নাই মিটেছে, অন্যদিকে আবাব পাতিব নিবীখ পুবা কবে পুরা হাজিবি নাই পেযেছি।'

'বুনি নাই খাইতে খাইতে পেট ঢাকের মতো ফুলে গিয়েছিল। পা সরু হলো। বুকেব হাড গনতি কবতে পাবতাম। তুই তখন হাঠতে নাই পার। কত দাওয়াই খাওয়াইলাম, ডাক্তাব দেখেছিল কুছু ভাল করতে নাই পারে। একদিন তোব বাপ লিয়ে এল পূবণ কবিবাজকে। কবিবাজ দেখে করে লাল মোরগা, এক বোতল মদ, কলা বাতাসা কত কিছু দিযে তোকে ভাল কবল। তোর গলায যে তাবিজটা ঝুলছে ওটাব গুণেই তো আজও বাঁচে আছিস।'

মাযেব গল্পো শুনে নিজের জীর্ণ শীর্ণ শরীবেব দিকে তাকিযে ভাবতাম, মাযেব দুধ পেলে বোধহয এত লিকলিকে হতাম না। অসুখের কথা মনে নেই। তবে কালো সূতায় ঝোলানো গলার মাদুলীটা বড় হয়েও রয়েছিল।

আমাদের লাইনেব সোজা পূবে ছিল ছোট সাহেবের বাংলো। ঘোড়া থাকত ওই বাংলোর পাশে। ঘোড়া বুড়ো হলে বা অসুস্থ হলে সাহেববা গুলি করে মারতো। কবর দিত বাংলোর টিলার পাশেই। দিদিব মুখে শুনেছিলাম—ঘোডা মার করে জিন ভূত হয়। জিন ভূত কেমন দেখতে? কালো লম্বা লম্বা চুল। দিদি বলতো, এক হাত লম্বা জিব। মাথায় শিং জিনের কথা শুনে সারা শরীর শিউরে উঠত।

এরা থাকে কোথায়? হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকে। একলা কোন লেরকা বাচ্চা দেখলে আবার জিনভূত তৈয়ারী হয়ে যায়! সেই ভয়েই তো দিদির সাথে ছায়ার মতো থাকতাম সারাক্ষণ। বাবা কাজে যেতে দিদিকে বলতো গোলাপকে যখন যা মাঙবে তা খাওয়াবি। দিদি শুধু নুন-চা আর চাল ভাজা খাওয়াত। প্রতিদিন ভালো লাগে না। বাগানে অনেকেই সকালে ভাত খেতো। রাগ করতাম, রোজ চালভাজা খাওয়াছিস্, ভাত কেনে খাওয়াছিস নাই। হামরা গরীব মানুষ তিনবার ভাত তোকে

কোথা লে দিব। আমরা গরীব কেনে দিদি?

দেনেওয়াল ভগবান, না দিলে পাবি কোথা লে। আমি চুপচাপ থাকি। বাবা যখন কোদালি কাজ থেকে বেলা বারোটায় ঘরে আসে—বললাম, দিদি বলছে ভগবান দেনেওয়ালা আমাদের বেশী করে চাল দিচ্ছে নাই। তো একদিন যা না বাবা! ভগবানের কাছে বেশী করে চাল মাঙবি। তিন বেলা খাতে পারব তা হলে।

সবাই খিলখিল কবে হেসেছিল। আকাশেব দিকে দেখিয়ে বাবা বলে ভগবান ওই স্বর্গে থাকে।

ভগবান স্বর্গে কোদালী করে না চালের দোকান করছে।

বাবা বলেছিল না বে না। মানুষের জন্মের দিন ভগবান ছেনী মারতুল লিয়ে কপালে টাকী (লিখে) মাবে কে গবীব আব কে ধনী। বাবা তোব কপালে কেনে নাই দেখছি। বলল, ওটা নাই দেখা যাবেক চামডা দিযে ঢাকা। আর দেখলেও কেউ ওটা পডতে পাবে না।

বললাম, দিদিব কপালে বা আমাব কপালে লিখবাব দিন তুই কেনে ভগবানকে নাই বললি ধনী লিখে দিতে।

হাসতে হাসতে বাবা মাটিতে গডিযে পডেছিল।

শিবদাসীযা যেদিন জন্ম নেয আমি ছিলাম আতুব ঘবেব পাশে লুকিযে। দরজা বন্ধ। কাছে পিঠে পুরুষ লোক নেই। মা তখন হামাগুডিব ভঙ্গীতে। দু'চোখে জলেব ধারা। সাবা মুখ যন্ত্রণায কাতব। গোঙানিব সাথে বিকট খিঁচুনীব শব্দ। দেহ মুচরে উঠছিল থেকে থেকে। চোখ দুটি বেবিযে আসাব মতো। দাঁত কামডানো। ঘরে তিন চাবজন বযস্কা মহিলা। পাশে ধোঁযা ওঠা গবম জলেব গামলা। কাছেই ঠাণ্ডা জলেব বালতি। বেবিয়ে এলো শিশু ওঁঞা ওঁঞা কান্নাব শব্দ। সে কপালে ধনী লিখে দেওয়াব আকুল আবেদন কিনা কে জানে। বিস্ফাবিত চোখে ভগবানকে খুঁজলাম ছেনী মারতুলওয়ালা কাউকে সেখানে দেখিনি।

কেঁদে কেঁদে হাত পা ছুঁডছিল। বুঝলাম, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার জন্য দুটি কচি হাত এল অগনিত আধ পেটা মানুষেব পৃথিবীতে।

কালিপদ চক্রবর্তী

দৃশ্যটা বাস্তবিকই অদ্ভুত ছিল। তার বাম হাত উপরের দিকটা মুঠো করে ধরে থাকলেও নীচের দিকে তীরের ফলাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ডান হাতের বাহুমূলের কাছ দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তীরটা। এখন আর টাটকা রক্ত বেরোচ্ছিল না, তবে হাতেব অনেকটা অংশই জমাটবাঁধা কালো রক্তে রঞ্জিত। তার উর্দ্ধাঙ্গ পুরোপুরি নগ্ন, কোমবে একফালি ন্যাকড়া মাত্র বেড় দেয়া, পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত ধূলার আস্তরণে ঢাকা, কপালে নাকের ডগায় বড় বড় ঘামের ফোঁটা, দু'গালের কাঁচা পাকা দাড়ির ভেতর দিয়ে ঘামেব ধারা নামছে। সমস্ত শরীব ঘামে, ধূলায় চিটচিটে। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে শহরের প্রবেশপথে দাঁড়ানো তার সামগ্রিক এই চেহারাটা নূতন রকম ঠেকলেও যে কযজন তার আশপাশে থমকে দাঁড়িযেছিল, অদ্ভুত কিছু তারা ভাবে নি। এ'ত জানা কথাই, হয়ত মারামারি লেগেছিল। তীর এসে হাতটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে শহরেব হাসপাতালে চলে এসেছে খুলিয়ে নিতে। তারা হাসপাতালের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলেওছিল, ইহান দিয়্যা যাও। কিন্তু ষষ্ঠীচরণের কথায় সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও, বেশ দৃঢ়চিত্তেই চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সে সংক্ষেপে বলে, আমি হাকিমের কাছত যামু। এবং এরপবই তার চারপাশে আস্তে আস্তে ভিড় জমতে থাকে, দুপুর রোদেব মধ্যেও চালাক চতুর, বোকাহাবা, ধূর্ত বেশ কয়টা মুখ কোথা থেকে এসে উদয় হয়। হাতে তীব মেরেছে কেউ, কিন্তু তাই বলে তীরটা বের না কবে এমনভাবে একেবারে হাকিমের সামনে গিযে পৌঁছানোর বাসনা। ব্যাপারটা অভিনব বটে। তবে কিনা, ষষ্ঠীর দেহটা বেশ বড়সড, তীরটা ঢুকে আছে যেন কিছুই না। কেউ কেউ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ষষ্ঠীব দিকে চায়, অনেকের মুখে বেদনার চিহ্ন, আহা!

কি অইছে কর্তা, হাকিমরে বুঝি পরমান দেহাইবা? দেহাইবা মানে? ষষ্ঠী প্রমাণ দেখাতেই তো বাবটা মাইল ছুটে এসেছে তীরটা না খুলেই। একটানে এটা খুলে ফেলা তাব কাছে কিছুই না, তার বিশাল শক্ত শরীবটার মত মনটাও শক্ত, কিন্তু তাহলে হয়ত হাকিম বিশ্বাস করবেন না, কেমন কবে তীর মেরে তার ডান হাতটাকে অচল কবে দেযার চেষ্টা করেছে ম্যানেজাব এবং এভাবেই তাঁব জমিটাকে, পুরো দু'বছরেব হাডভাঙ্গা খাটুনী দিয়ে যেটাকে সে তৈরী করেছে তা কেড়ে নেবার ফন্দি চালাচ্ছে। ষষ্ঠি পারত, যে কয়টা এসেছিল, একাই তাদের মহড়া নিতে। সে এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু একটাকে লাঠির ঘা মারতেই দূর থেকে তীর মারতে শুরু করল বুধনটা, ম্যানেজারের কুত্তাটা, আর ম্যানেজারটা ছিল পাশেই। ষষ্ঠী আর এগোয়নি। ওরা মনে করেছে ষষ্ঠী পালাচ্ছে, কিন্তু ষষ্ঠী তীরটা ঢুকে যাওয়া মাত্রই, লাঠি ফেলে দৌড়ে এসেছে। এমন একটা হাতেনাতে প্রমাণকে সে বৃথা যেতে দেবে না; ম্যানেজারের টাকা আছে, লোক আছে, একদলকে মেরে ফেললেও আরেক দল

আনবে, ষষ্ঠী একা কতজনের বিরুদ্ধে লড়বে, তার চাইতে এই প্রমাণটি হাতে পেয়েছে, এবার সে পুলিশের কাছে যাবে, প্রমাণটা দেবে।

ষষ্ঠী চার মাইল দূরের থানায় গিয়ে উঠল। তখনও রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত দিয়ে। তীরটা সে বের করে নি, উপরের দিকটা মুঠো করে ধরে রেখেছে, যেন তা ফস্কে বেরিয়ে যাবে। আরও কয়েকবার সে থানায় এসেছে—অনেক ঘটনা, ম্যানেজারের অনেক কথা সাফ সাফ তুলে দিয়েও ষষ্ঠী দারোগাবাবুকে বিশ্বাস করাতে পারে নি। দারোগাবাবুর এক কথা—বাস্তব প্রমাণের অভাব, এমন কি কেউ তার হয়ে সাক্ষীও দেবে না। শেষ পর্যন্ত একটি কথাই ষষ্ঠী বলেছে, কিন্তুক বেডা হয়তানের আড্ডি, ইডাত জানেন হুজুব। গর-বারি পুরাইযা দিব হুজুর, তার লেগ্যাইত কাউরে পাই না।

—তয় আমি কি করম্যু—দেশীয় টানেই দারোগাবাবু হেসেছেন, প্রমাণ না পাইয়া, সাক্ষী না জোগাড় কইরা বেডা মুখ্য, আমি কি নিজের চরণে কুড়াল মারুম?

এতদিনে প্রমাণ এনেছে ষষ্ঠী। বুধনের নিজের হাতে তৈবী তীব, এ তীব বিশিষ্ট, আব বুধনটা যে ম্যানেজারের কুত্তা দারোগাবাবু নিশ্চয়ই তা জানেন।

সকাল বেলাই ষষ্ঠীকে এবেশে দেখে দারোগাবাবু হকচকিয়ে যান। ষষ্ঠী তো কোন মার দাঙ্গার মধ্যে নেই. দেহটা বিশাল হলে কি হয়, আসলে ষষ্ঠী অত্যন্ত নিরীহ। তাব যত কিছু হম্বিতম্বি বিঘা কয়েক জমিটাকে ঘিরেই, এক ম্যানেজাব আর তার দলবল বাদে এ তল্লাটে আর বোধহয় কেউ তাব শত্রু নেই।

দারোগা বললেন. আবে! কি অইছেবে ষষ্ঠী? তীর মারছে কেডা? ষষ্ঠী বলল, হুজুর আপনে পবমান চাইছলেন, অই দ্যাহেন, বুদইন্যা আমাবে তীব মাবছে, মেনেজারবাবু লগেই অছলেন। হুজুর, আপনে মেনেজাব বাবুরে দইর্য়া আনেন।

সে বর্ণনা দেয, কেমন কবে, যখন সকালের মিষ্টি বোদে ধানের চারাগুলি হাওয়ায় দুলছিল, দুলে দুলে তাকে সোহাগ জানাচ্ছিল (একটা সুন্দর মুহূর্ত্তেব বর্ণনা দিতে এর চেযে বেশী কবিত্ব ষষ্ঠীব মত জম্ম চাষার কাছ থেকে আশা করা যায় না) তখন ম্যানেজারেব দলবল তাকে ঘিবে ফেলে। কিন্তু ষষ্ঠী অত কাঁচা ছেলে নয়, লাঠিগাছটা সে সঙ্গে নিযেই বেরিযেছিল, ম্যানেজারেব মতলব তো তাব আর বুঝতে বাকী ছিল না। দাবোগা বললেন, এই বেযাইন্যা বেলাঅই কাইজ্যা লাগাইযা বইলি? ষষ্ঠী দরজার সামনে বসে পড়েছিল, উত্তেজিত হযে দাঁড়িযে বলল, ইডা কেমুন কইলেন হুজুর, কাইজ্যা আমি লাগাইছি? আমাব দান কাইট্যা নিতে আইব, আমি চাইয়া দেহুম? চাইয়া?

ষষ্ঠীর চোখ উত্তেজনায, রাগে জ্বলতে থাকে। হাতটা ফুলছে, টনটন কবছে, ঘামে সমস্ত শবীব জ্যাবজেবে, কিন্তু ব্যথা বা শ্রান্তি কোনটাবই লক্ষণ নেই।

দারোগা বললেন, আইচ্ছা, আইচ্ছা, ঠিহ্ আছে অহন তিরডা ত খুল। গ্রামদেশের টোটকা ওষুধে তীরটা খুলে নিয়ে অনায়াসেই বক্তক্ষরণ বন্ধ কবা যায, এমনকি পচনও রোধ কবা যায। কিন্তু ষষ্ঠী রাজী নয়। ক্রমাগত সে দাবী জানাতে থাকে, তার অভিযোগ লিখে নেয়া হোক, তীরটাকে প্রমাণ হিসেবে জমা নেয়া হোক এবং ম্যানেজারকে ধবে আনা হোক। ষষ্ঠীর যথেষ্ট বল আছে, তীরটা আরো কিছুক্ষণ থাকলে কিছুই এসে যাবে না। ষষ্ঠীর একঘেযে দাবীব সুরে বিরক্ত হযে দারোগাবাবু

একজন পুলিশকে ডেকে তার অভিযোগ শুনতে বললেন। নেহাৎ একটা জরুরী খবর পাঠাতে হবে, তাই এত সকালে তিনি দপ্তরে এসে বসেছেন, বাড়ীতে তার অনেক কাজ আছে, গোঁয়ার্তুমীতে কান দিলে তার চলে না। ষষ্ঠীর শরীবে সত্যিই যথেষ্ট শক্তি আছে। আরো দু'এক ঘণ্টা তীরটা না বের করলেও কিছু হবে না। আপনিই বেটা এক সময় খুলে নেবে। আর, খুলে না নিলেই বা তার কী করার আছে?

ষষ্ঠী কিন্তু সবিস্তারে তার কাহিনী বলতে শুরু করে—হুজুর যানেন, আগে অত কইছি, আমারে বাগি দিলে কি অইব, জমিনডার উপর অহন মেনেজার বাবুব দিষ্টি লাগল, লুক লাগাইল, কিন্তুক আমি ছাবি না, তখন মাইরের ডর দেহাইল।

পুলিশটি নতুন এসেছে এ অঞ্চলে, ব্যাপাবটা ঠিক সে জানে না। প্রশ্ন কবল, কিন্তু ম্যানেজারতো আব নিজে হাল চাষ করবে না। ষষ্ঠীব কাছ থেকে নিয়ে নিলেও অন্য কারো কাছে তো জমি বর্গা দিতেই হবে। তাহলে ষষ্ঠীর সঙ্গে এমন ব্যবহারের কাবণ কী? ষষ্ঠী হাসল দাঁত দেখিয়ে। পুলিশটিব নির্বুদ্ধিতা দেখে, এতক্ষণের উত্তেজনাব মধ্যেও তার হাসি পেল। আবে, জমি তৈরী কবেছে ষষ্ঠীচবণ। দু'বছব ধরে মাথার ঘাম পাযে ফেলে তাকে জমিটা ঠিক মত তৈবী করতে হযেছে। তার সঙ্গে ফসল ভাগাভাগিব শর্ত থাকবে, তৈবী জমি অন্য কাউকে বাগি দিলে তাব চাইতে অনেক বেশী ফসল পাবে ম্যানেজার, এতো একটা কচি খোকাও বোঝে।

দারোগা মাথা গুঁজে রিপোর্ট লিখে যাচ্ছেন। পুলিশটি আড চোখে তাকিয়ে বুঝল, আবো কিছুটা সময তাকে কাটাতে হবে। ষষ্ঠীকে বিদায কবা তার কর্ম নয়, আব এ অপ্রিয় কাজ সে করতেও চায না। সুতবাং সময় কাটানোর জন্য সে নানা প্রশ্ন কবে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাইল। ষষ্ঠীও উৎসাহিত হয়ে উঠল। জমিব গল্পের চাইতে আর কিছু প্রিয আছে নাকি?

সোৎসাহে সে বলতে থাকে, এ অঞ্চলে চা বাগান আছে হুজুব নিশ্চয়ই দেখেছেন। চারাগুলি লাগানো হয উপরেব টিলাভূমিতে, ধাপ কেটে কেটে নীচেব দিকেও নেমে আসে। কিন্তু টিলাব লাগোয়া লুঙ্গাগুলি পর্যন্ত নামে না। লুঙ্গা, যা জলোভূমি, তাতে চা গাছ বাঁচে না, কিন্তু ধানেব আবাদ হয় খুব ভালো, অবশ্য বছর দুযেকেব পবিশ্রমের পর। চা বাগানের ম্যানেজারবা, বাগানে মাস কয়েকেব জন্য ঠিকা করতে আসে যারা এবং বছরের বেশীব ভাগ সমযই হাতে নির্দিষ্ট কোন কাজ থাকে না, তাদেব কাছে এই লুঙ্গাগুলি বর্গা দেয, ফসলের একটা বড় অংশই ঐ ম্যানেজারবা নিয়ে নেয।

'মেলা বেগ পাইতে অয় হুজুর', ষষ্ঠী বলে, জউল্লা মাডি, ইয়া মুডা মুডা জুক, দরল্যে ছারান নাই। আব বন—সা সা কইয়া গাছ বারে, হাল চলে না হুজুব, গাছের গুড়া হাবল মাইরা চাইর দিয়া তুলতে অয, কুদাল কুবাইতে অয।

অথচ জমি ভাল তৈরী হয়ে গেলে যখন ফলন বেড়ে যায়, তখন ছলে বলে মূল বর্গাদারকে হটিযে দিযে নূতন কাউকে এনে বসিয় দেয় আরো বেশী ফসল পাবার লোভে। ষষ্ঠীকেও হঠানোর চেষ্টা করেছে। ষষ্ঠী অনেকবার জানিয়েছে বড় বাবুকে, কিন্তু বড়বাবু প্রমাণ পান নি। বড়বাবু ষষ্ঠীকে অনুগ্রহ করেন কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তিনি কী কববেন? আজ ষষ্ঠী প্রমাণ এনেছে। এ তীর বুধনের তীর, ষষ্ঠী

তীরটার ফলায় সস্নেহে হাত দেয়, আর বুধন ম্যানেজারের কুত্তা, এ তো বড়বাবু জানেনেই।

থানার সামনে তিনদিকে বিস্তৃত মাঠ। প্রচুর রোদে সমস্ত মাঠ ভেসে যাচ্ছে। মাঠের সীমান্ত পেরিয়ে বনরেখা। থানার ডানদিকে শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদী। লোকালয় আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সহসা দূর থেকে বোঝা যায় না।

রোদের দিকে চেয়ে দারোগাবাবু হেসে উঠলেন। তার রিপোর্ট শেষ হয়েছে। বেশ ভালভাবেই তৈরী হয়েছে সব। চেয়ারে হেলান দিয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তিনি বললেন, বুজছি ত। অহন তিরডা খুল আগে—হ, তর কেইসটা ত দ্যাহন লাগেঅই।

দাবোগাব মুখেব হাসিতে, কথার সুবে ষষ্ঠী কি বুঝল, তড়াক কবে সে উঠে দাঁড়ায়, বিদ্যুচ্চমকের মত তার মাথায় খেলে যায—তাকে কোন গুরুত্বই দেয়া হয নি,তার অভিযোগ লেখা হবে না, দারোগাবাবু কিছুই করবেন না ম্যানেজাবের। কুত্তা, কুত্তা সব কুত্তা।

কিন্তু ষষ্ঠী সংযতভাবে উঠে দাঁড়ায়, হুজুব গবিবের মা, বাপ। কিন্তুক ইডা অল্যায় অইল হুজুব।

ষষ্ঠী থানা থেকে বেরিযে আসে। সে হাকিমেব কাছে যাবে। হাকিম, দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা তিনি, ন্যায় অন্যাযের বিচার করেন, তিনি নিশ্চয়ই ষষ্ঠীর কথা বুঝবেন। একটানা বার মাইল পথ রোদের মধ্যে হেঁটে ষষ্ঠী শহরে এসে পৌছায় হাকিমের কাছে তাব আর্জি পেশ কবতে।

পথে সে অনেক কথা ভেবেছে, বাব বার মহড়া দিয়েছে কেমন কবে হাকিমেব সামনে তার কথা তুলে ধববে। হাকিম তো আর ম্যানেজারকে চিনেন না, ষষ্ঠী একটি একটি করে নজীব দিযে ম্যানেজাবের চবিত্র তুলে ধরবে। পাশাপাশি তাব নিজেব কথাও বলতে হবে বৈকি। সে বলবে কেমন করে দেশবাড়ী থেকে পালিযে এসে একটুকরো জমিব জন্য তাব প্রাণ কাঁদত এবং তাবপব জোঁক, আগাছা ভর্তি একফালি জলো লুঙ্গা পেয়ে (হোকনা তা বাগিতে পাওযা) বুকেব রক্ত ঢেলে তৈবী কবার পর কেমন কবে তাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালিযেছে ম্যানেজাব। আব বেশী বলারইবা দরকার কি, ষষ্ঠী তার দেহেই তো প্রমাণ ধাবণ কবে নিযে এসেছে। আচ্ছা এমন কি হয় না, ম্যানেজাবকে শাস্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীকেই ঐ জমি দিয়ে দিলেন হাকিম। আর বর্গাদার নয়, ষষ্ঠীই এবাব থেকে মালিক, জমির মালিক। আসলেও তো ঐ জমি ষষ্ঠীব সৃষ্টি, চাষ তো সেই করছে। না কি? ষষ্ঠী পঞ্চাশ বছর এই পৃথিবীতে বাস করছে, অভিজ্ঞতা তার নেহাৎ কম হয নি। কিন্তু কল্পনা বড় মারাত্মক জিনিস। তীরটা ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে নাতে প্রমাণ সংগ্রহেব উত্তেজনায় কখন যে এত সব কল্পনা তার চাষাড়ে মাথায় ঢুকে পড়েছে ষষ্ঠী টেরও পায়নি। অস্পষ্ট, ধোঁযাটে দিবা স্বপ্ন অবশ্য মাঝে মধ্যে যে সে দেখেনি তা নয়, কিন্তু তাই বলে, যুক্তি তর্ক সহকারে এমন ভাবে কল্পনাকে সত্যির রূপ দেয়া।

শহরে ঢুকে কৌতূহলী মানুষের সম্মুখীন হলেও বেশীক্ষণ অবশ্য তারা তাকে আটকাতে পারে নি। ষষ্ঠীর অতি সংক্ষিপ্ত, একটি মাত্র বাক্যাংশ, 'আমি হাকিমের কাছত যামু'—তাদের সন্তুষ্ট না করলেও কিছু কারার ছিল না, ষষ্ঠী আর কিছু বলতে নারাজ। এখানে বলে কী হবে, যা বলার সে হাকিমের কাছেই বলবে। একে তাকে জিজ্ঞেস করে ষষ্ঠী সোজা আদালতে উঠে এসেছে।

কিন্তু বিধি বাম। হাকিম নাকি এজলাসে নেই। যা কিছু বাধা দিতে পারে, সব অগ্রাহ্য করে সে আদালত ঘরের বারান্দায় বসে পড়ে। তার অদৃষ্ট যেন তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। ষষ্ঠীর মন কিছুটা দমে গেল। এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরে একটা ধস্ নেমে আসছে। হাতটা ক্রমশ:ই আরো ফুলে উঠছে, ভিতরে ভিতরে রক্ত যেন চুঁইয়ে নামছে। অসহ্য টনটনানি, তিলেক মাত্র নড়ন চড়নে বিদ্যুতের মত চিলিক মেরে উঠছে মাথার ভেতবে। জ্বর আসছে। শহরে ঢোকার পর একটা দোকান থেকে আকণ্ঠ জল খেয়েছিল সে, তবু এখন আবারো জিহ্বা তালু গলা বেয়ে বুকের ভেতরে এবং ক্রমশঃ প্রতিটি শিরায় আরো জলের জন্য প্রার্থনা, অনন্ত হাহাকার বিস্তৃত। উর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন, কোমরে একফালি ন্যাকড়া মাত্র বেড় দেয়া, টকটকে লাল চোখে বিশাল দেহ ষষ্ঠীচরণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত জবুথবু হয়ে হাকিমের অপেক্ষায় আদালত ঘরের বারান্দায বসে থাকে। যেন জন্মাবধি সে এমনি বসে আছে এবং বসে থাকবে।

কিন্তু এমন মনে হলেও, খুব একটা বেশীক্ষণ অবশ্য ষষ্ঠীকে বসে থাকতে হল না। তখন দুপুব গড়িয়ে বিকেলে পৌঁচেছে। ষষ্ঠী, এমন কী অস্পষ্ট ভাবে না বুঝতে পারলেও, তার নত চোখের সীমানার মধ্যে কয়েক জোড়া বুট পরা পা এসে থামে এবং একটি পরুষ কণ্ঠ তীব্র স্ববে তাব নাম ধরে ডাকে।

ষষ্ঠী লাল চোখ তুলে বলল, হাকিম...

পরুষ কণ্ঠ বলল, আয় বেডা, হাকিমের কাছেঅই নিয়া যাইতাছি তরে।

শ্রীপুর চা বাগানের ম্যানেজারের উপর হামলা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া ষষ্ঠীচরণ মাতাল অথবা শিশুর মত এলোমেলো পা ফেলে আদালত ঘরের বারান্দা থেকে নেমে আসে।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

সমীরের প্রতিদ্বন্দ্বী

এ যেন এক রহস্যময় খেলা—সমীর নিমাইদার হাত পা মুণ্ডু বুক পেট খুলে খুলে সাজিয়ে রাখছিল—এখন কোনটা নিমাইদা চেনা যায়না। চিতার কাঠ দিয়ে নিমাইদার মুণ্ডু ঢেকে দিল বিজন। কাঠের ফাঁকে দেখল নিমাইদার একটা রক্তবর্ণ চোখ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তার দিকে। সমীর চোখ বন্ধ করে। এদিকে বিকালবেলার নরম আলোয় আরো কয়েকজন গোল হয়ে বসেছিল। তাদের চাপা ফিসফিস কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কানে। তারা দলের কেউ নয়— বোধহয় দর্শক অথবা নিমাইদার আত্মীয়স্বজন। একটা গরু ফুল, ফুলের মালাগুলি চিবিয়ে খায় দেখে কে যেন ঢিল ছুঁড়ে মারল। গরুটা শরীবের চামড়া সামান্য কাঁপিয়ে আবার একমনে চিবোতে লাগলো রজনীগন্ধার ডাঁটা।

দলের সবাই ঘাটের চাতালে ক্লান্তভাবে বসেছিল চুপচাপ। সেখানে সমীর এল। কে একজন বলল—'রেডি হয়েছে'। সমীর ঘাড হেলাল সামান্য, বলল— 'আসুন'।

চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিজন একটা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে বাববার আগুনটা উসকে দিতে লাগল। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সমীর কাঠের টুকরোর উপরে বসে সিগারেট টানছে—সারাদেহ ক্লান্তির ভারে যেন নুয়ে পড়ে —কপালের দুপাশের শিরাদুটো দপদপ করছিল। কে একজন সমীরের কাঁধে হাত রাখল—ঘাড় ফিবিয়ে দেখে ড্রেনপাইপের এক পকেটে হাত ঢুকিযে অন্যহাতে তাকে সত্যদা ডাকছে—'চল টেনে নিবি, খানিকটা রেখেছি তোব জন্য', পকেটের দিকে চোখ আনল সে।

সমীর সত্যদাব পিছন পিছন অন্ধকাব একটা দেয়ালের পাশে বসে পড়ল। সত্যদা পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বার কবল।

সমীর বলল— 'দেশী মাল?' বলে হা করল।

'টেনেই দ্যাখ' বলে বোতলের মুখটা উলটে দিল সত্যদা।

সারাদিনের ক্লান্তি অনাহাব তার উপব এই জিনিস—সমীরের চোখের সামনে সত্যদার মুখ-চোখ বেলুনের মতো ফুলতে লাগল।

সমীর একটা সিগারেট ধরাল। সত্যদা ঘাসের উপর শুযে আছে। সমীর দেখল দেয়ালে কিসব লেখা রয়েছে কাঠ কয়লায়—দেশলাই জ্বেলে সমীব পড়তে লাগল লেখাগুলি। 'রেণুকা + হরিশ'...... 'রমনী আর নাই'......গণেশ চন্দ্র পাল ইহলোকে প্রবেশ ১৩ চৈত্র ১৩২৬—প্রস্থান ৩ ভাদ্র ১৩৪০।.........'এইখানে দাঁড়াইয়া বসিয়া অথবা শুইয়া প্রেম করিবেন না.......'।

দেশলাই এর কাঠির আগুনে হাতে ছ্যাকা লাগলে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সমীর।

'সত্যদা'।

'...........'

'ও সত্যদা'

'উমঁ'

'নিমাইদা তা হলে খতম'

সত্যদা উত্তর দিলনা। পাশ ফিরল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'একটা সিগারেট ছাড়'। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিতে দিতে দেখল সত্যদার চোখ রক্তজবার মত লাল। সমীর হাসল। সত্যদা মাতাল হয়ে গেছে।

'শালারা কুমড়ো-কাটা করল'

'অহংকাবটা খারাপ জিনিস—নিমাইদার অহংকারই কাল হল'

নিমাইদা একটাকে অন্ততঃ সঙ্গে নিতে পারত।

'কাপুরুষের মত মার খেল— 'কাওয়ার্ড'—সত্যদা বিড়বিড় করছিল। ঘাসে শুয়ে সিগারেটেব আলোয় তার লালচে ঘেমো মুখ দেখা যায়। সমীরের মনে হল—সত্যদা বোধহয় বন্ধুর জন্যে কাঁদছে। আপনমনে হাসল সমীর। নিমাইদার মৃত্যুব পর বোধহয় সত্যদাই দলের গুরু হবে। সমীর ঘুরতে ঘুরতে চিতার পাশে এলো। নিমাইদার একটা জ্বলন্ত হাত নিচে ঝুলছিল—আর বিজন বাঁশ দিযে খুঁচিয়ে তুলে দিতে চেষ্টা করছে। সমীরের মনে হল একদিন নিমাইদা দুপুরবেলা এমনি শুয়ে ছিল—তার একটা হাত ঝুলে পড়েছিল বিছানাব একপাশে। আর নিমাইদার প্রিয় বেড়ালটা সে হাত নিয়ে খেলা করছিল। সমীরের ডাকে নিমাইদা উঠে বসে বলেছিল—'কিরে সমু আয়'।

বিজন মাটিতে আঁটো প্যান্ট আর কপালে রুমাল বেঁধে বসেছিল উবু হয়ে সমীব সেখানে আর দাঁড়াল না—আগুনের বড় তাপ। দলের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ আর নেই। রাত কত হয়েছে কে জানে। এক জায়গায় দেখল শ্মশান কর্মচারীর সঙ্গে পল্টু বিডি টানছে। শ্মশান কর্মচারী তাকে দেখে বলল—'আসুন'।

সমীব এর আগেও বারকযেক এসেছে বলে মুখ চেনা। একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধবে বলল—'নিন, ভিতবে মাল আছে'। সমীর বুঝতে পেরে বিড়িটা নিল হাতের মধ্যে। পল্টু দেখেও দেখল না যেন। এমন ভাব করল। 'চিন্তার বিডি এ অঞ্চলের বিখ্যাত স্যার—লোকটা হলদে দাঁত বার করে হাসছিল।

অনেকক্ষণ পর সমীর দেখল তার মাথার ভিতর যেন আগুন ধরে গেছে —ধোঁয়াগুলি যেন রক্তের মধ্যে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কর্মচারীর মাথাটা ঝুলে পড়ছিল বার বার বুকের উপর। ভীষণ জলপিপাসা পেয়েছে— 'ও মশাই একগ্লাস জল দেবেন'। ভদ্রলোক ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালেন। সমীর আবার বলল—'একগ্লাস জল দেবেন'। ভদ্রলোক শ্যাওলা পড়া একটা মাটির কলস থেকে —কাচের গ্লাসে করে জল রাখল টেবিলে উপর। জল খেয়ে সমীরের অবসাদ যেন দূর হ'ল—ঠোঁটে লাজুক হাসির ছায়া রেখে বলল— 'সারাদিন এই রৌদ্রে শবযাত্রায় ঘুরে বেড়িয়েছি—গতকাল রাতেও খাইনি কিছু তাছাড়া পলিটিক্যাল মার্ডার তো-পুলিশেরও ঝুট ঝামেলা গেছে'। ভদ্রলোক জিভ দিয়ে সহানুভূতি সূচক চুকচুক শব্দ করে বলল—'আহা নিমাইবাবু বড় ভালোলোক—এমন ভাবে মারা গেল'! সমীর ভদ্রলোকের ঝাপসা ভাঁজ পড়া মুখের চামড়ার দিকে তাকিয়ে রইল—কোন কথা

বলল না। তার জিহ্বা যেন অবশ হয়ে আছে—মুখের ভিতরে। 'যাই হোক বিয়ে থা করেননি—পিছনে কিছু রেখে যেতে হল না'—সমীরের মনে পড়ল বেলাদির কথা। বড় রহস্যময় সম্পর্ক ছিল নিমাইদার সঙ্গে। নিমাইদার পাশে পাশে ছায়ার মত ছিল। বেলাদি এখন কি করছে?

পল্টু বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল—অশ্লীল মন্তব্য করে বলল—'মাইরি বিয়ে করেনি বটে মজা লুটে নিয়েছে সবই—সব শালা পরমহংস', সমীরের মাথার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। নিমেষে লাফিয়ে উঠে পল্টুর গলার মাংস দশ আঙুলে খিমচে ধরে বলল—'চুপ শালা—জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব'! সমীরের বুকটা যেন হাঁপরের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। যেন সত্যি সত্যি পল্টুকে খুন করে ফেলবে সে। তাব আঙ্গুলের বড় বড় ধারাল নখ পল্টুর গালের চামড়ায় বসে গেল। পল্টু প্রাণপণে সমীরের পেটে লাথি কষাল। সমীর ছিটকে পড়ল। ইতিমধ্যে বিজন মড়া খোঁচানো আধপোড়া জ্বলন্ত বাঁশ নিয়ে ছুটে এল সেখানে। পল্টুর হাতে তখন ছুরি ঝকঝক করছে—বিজন চেঁচিয়ে সত্যদাকে ডাকছিল। সত্যদা টলতে টলতে এসে জড়ানো গলায় বলল—'এ্যাই পল্টু হাতের কব্জি ভেঙ্গে ফেলব—শূয়োরের বাচ্চা!' সমীর মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছিল—বিজন তাকে উঠিয়ে ঘরের একটা বেঞ্চে শুইয়ে দিল। পল্টুর তখনও রাগে কুকুরের মত গলা দিয়ে গরগর শব্দ বেরুচ্ছে। দলের কয়েকজন সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'সত্য ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও'। সমীরের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিল। চোখের সামনে লাল-হলুদ রঙের আতস বাজি। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল জোরে কারা যেন। মাংস পোড়ার গন্ধ নাকে তীব্রভাবে এসে ঢুকছে—পেটের নাড়িভুড়ি যেন বেরিয়ে আসবে—এখন বমির ভাব।

সত্যদার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এলো—'মরে যায়নি তো'! কে যেন নাড়ি দেখছে। সমীর হড়হড় কর বমি করল—শুধু জল। শরীরটা যেন হালকা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। সমীর আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল 'একটু জল দেবেন' জল দিয়ে মুখ ধুয়ে বলল—'শালা, নিমাইদাকে গাল দিচ্ছিল...' পেটের ভিতবে একটা চিনচিন ব্যথা। বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। পকেটে পয়সা নেই—নয়ত হোটেলে খেয়ে দলের অফিসে শুয়ে থাকত।

বিজন মুখের উপর ঝুঁকে বলল—'প্রায় শেষ হয়ে এল, একসঙ্গে চলে যাবো সত্যদার মেসে'।

ভিড় পাতলা হয়ে এলো। সমীরের বড় ঘুম পাচ্ছে। সমীর পেটের উপর বাঁহাত চেপে পাশ ফিরল।

তিনদিন সমীর বাড়ি থেকে বেরুল না। পেটের ভিতরে যন্ত্রণাটা আস্তে আস্তে কমে গেল। তিনদিন পর সমীর প্রথম দাড়ি কাটল—স্নান করল তারপর বিকেলবেলা রোদের তাপ একটু কমে আসতেই বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল যেন অনেকদিন রোগশয্যায় পড়ে ছিল। তার হাত-পা এলোমেলো ভাবে চলছে। রাস্তায় পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে যখন দড়ির আগুনে ধরাচ্ছিল তখন দেখল উল্টোদিক থেকে সাইকেল চেপে বিজন আসছে—হ্যাণ্ডেলে তপন। সমীর তাদের দেখে খুশি হল। হাত তুলে তাদের থামিয়ে আরো দুটো সিগারেট কিনল।

বিজন সাইকেল থেকে নামল না— একপা মাটিতে—অন্যটা প্যাডেলে। একহাতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তপন বলল—'এ ক'দিন কোথায় ছিলি' বলে কপালের ঘাম মুছল।

'বাড়িতে'।

'কাল ছটায় নিমাইদার শোকসভা'।

সমীর মাথা নীচু করে রইল। তারপর শান্ত চোখ দু'টি তুলে বলল—'পেটে ব্যথাটা এখনও আছে রে'। তপনের চোখ দুটো যেন শ্বাপদের মত চকচক করছে।

'সন্ধ্যার পর চলে যাস—সারারাত পোষ্টার মারতে হ'বে'।

'দেখি যাব'।

'দেখি মানে?'—তপন বলল।

'সত্যদা বলেছে তোকে খবর দিতে—তাই জানাতে এলুম'। বিজন সাইকেল ঘোরাল। তপনের একটা হাত কাঁধের সামান্য নিচে এসেই শেষ হয়ে গেছে—বোমায় উড়ে গিয়েছিল। সেই হাতাটা সবসময় শার্টের হাতায় ঢেকে রাখে। সমীর দেখল এখন সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে সেই হাতাটা পতপত্ করে পতাকার মত উড়ছে বাতাসে।

সমীর বড় অবসন্ন বোধ করে। পানের দোকানটার সামনেই দঁডিয়ে রইল একা। সমীবেব এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। অথচ কোথায় যাবে—পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে সে মিশতে পারে না। তারাও ঠিক সহজভাবে নিতে পারে না। এ পাড়ায় বন্ধুবান্ধব বেশি নেই সমীরের। যারা আছে তারা সবাই সমীরকে সমীহ করে চলে—ভয় করে।

একবার ভাবল, চাযের দোকানটার গিয়ে বসে—মনে মনে হিসেব করে দেখল মাত্র চল্লিশ পয়সার মত পকেটে আছে। হঠাৎ এতগুলি পয়সা খরচ করে ফেলা উচিত হবে কিনা ভাবছিল সমীর। এখন মাসের শেষ, মেজদির হাতেও বোধহয় পয়সা নেই। পুরো সংসারের ভার তার একার উপর।

'আরে সমীরবাবু যে...'! সমীর দেখল সুনীল সেন সামনে দাঁড়িয়ে। এই লোকটাকে দেখে রাগে সমস্ত শরীব শিবশির করছিল সমীরের। সামনের একটা দাঁত সোনাবাঁধান—এখন তাতে পড়ন্তবোদ পড়ে ঝকঝক কবছে—সুনীল সেন হাসছিল। হাসিটা পর্যন্ত কুৎসিত লাগে। এই লোকটা তাদেব পাশের বাড়ির, কণ্ট্রাকটারি কবে, ইদানিং কিছু পযসা কবেছে। চোখে কালো চশমা সোনালি ফ্রেমের থেকে' হাতে পোর্ট ফোলিও। সমীর বিড়বিড় করল 'এই ফিরলেন বুঝি কাজ থেকে। 'আ—র কাজ' প্যান্টেব পকেট থেকে সিগারেটেব প্যাকেট বাব করতে করতে বলল। সমীর দেখল খুব দামী সিগারেট। একটা নিল হাত বাড়িযে। সুনীল সেন প্যাকেটটা পকেটে রেখে-অন্য পকেট থেকে বার কবল চারমিনার 'আমার আবার এসব ছাড়া জমে না এই সিগারেট কর্তাদের জন্য রাখতে হয় কিনা'—সোনার দাঁত দেখিয়ে হাসল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল চক্রাকারে। সমীরের রক্তের মধ্যে যেন গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে কেউ। এই লোকটাই একবার কচ্ছপের মত গলা বার করে জানালা দিয়ে মেজদির স্নানের সময় উঁকি দিচ্ছিল—সমীর দেখেছে। মেজদির উপর লোভ আছে বোধহয এখনও। লোভের চোখ সমীর চেনে।

'চলুন—একটু চা খাই দোকানে বসে'

'না চা খাবো না' সমীর ঘাড় নাড়ল। 'আমার এক বন্ধু আসার কথা...'

সুনীল সেন হাসল, আবার যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে সমীর। সমীরের ইচ্ছে হল পাঞ্চ দিয়ে ওর নাক থেবড়ে দেয়। 'আচ্ছা চলি তা'হলে', চলে গেলে সমীর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সমীর মুখ খারাপ করে, 'শালা লম্পট'।

সারাটা বিকেল রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াল, লোকজন দেখে। এতলোক অথচ পরিচিত একটা মুখ দেখল না। সংসারের অনেক কিছু দেখা হলনা এখনও। অপরিচিত।

সমীর অবশেষে সন্ধ্যাবেলা পুতুলের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। ভিতরে যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে কড়া নাড়ল জোরে। দরজা খোলাই ছিল ভিতবে দেখল ঘব খালি—আলো নেই। সমীর কি করবে ভাবছিল—এমন সময় পুতুল ঘরে ঢুকল 'কখন এসেছ'—বলে আলো জ্বালাল খুঁট করে।

'এইমাত্র'। পুতুল বোধ হয় চান করেছে, ভেজা খোলা চুল পিঠের উপব ছড়িয়ে আছে।

'এখানে বসবে নাকি ঘরে' পুতুল সুন্দর কবে হাসল। পুতুলকে খুব ক্লান্ত দেখায়—সাবাদিন স্কুলে কাটিয়ে বোধ হয় এইমাত্র ফিরেছে।

'মল্লিকাদির মুখে শুনলাম—তোমাব নাকি পেটে খুব ব্যাথা, আজ কমনরুমে গল্প করছিল'। মেজদি আর পুতুল একই স্কুলে কাজ করে।

'না এই সামান্য লেগেছিল'।

'এখন ভালো আছো?'

সমীব সিগারেট ধরাতে ধরাতে ঘাড নাডল। পুতুলের পিছন পিছন পুতুলের নিজস্ব ঘরে এসে ঢুকল। ছোট্ট একটা খাট সুন্দর সাদা বিছানা মসৃণ কবে পাতা। টেবিলে এক গ্লাস জল আর অনেকগুলি পবীক্ষাব খাতা ছড়ান।

'বসো' পুতুল দবজায় দাঁড়িয়ে বইল।

সমীব বিছানায় বসে বলল—'এক কাপ চা-খাওয়াতে পাবো, সারাটা বিকেল ঘুবে বেড়িয়েছি'।

'কাজে'

'নাহ এমনি উদ্দেশ্যহীন......'

'নিমাইদা—তোমাদেব নিমাইদার ছবি দেখলাম কাগজে'

সমীব নিমাইদার প্রসঙ্গে চুপচাপ নিঃশব্দ হয়ে রইল। একমনে সিগাবেট টানতে লাগল। ইচ্ছে হল পুতুলকে বলে—দোহাই তোমার পুতুল—নিমাইদাব কথা আজ বল না।

'কাবা মেরেছে জেনেছ কিছু।'

'আমি জানি না'

'কেন নিমাইদাতো তোমার গুরু'

'............'

'বেলা ব্যানার্জির কি খবর, খুব কাঁদছে?'

'আমি জানিনা পুতুল' সমীরেব চোখ দেখে পুতুল বোধহয় বুঝতে পারল কিছু। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সমীর দু'হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে রইল একা। ছোট জানলায় বোধহয় পুরানো শাড়ির পর্দা—বাতাসে কাঁপছিল।

কতক্ষণ এভাবে একা বসেছিল সমীর জানেনা। পুতুল দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে পুতুলের দাদাবৌদি—আলাদা হয়ে সরে পড়েছে অনেকদিন। এই সংসারের দায়িত্ব পুতুলের একার। পুতুলের জন্য এখন মমতা বোধ হল। এতক্ষণ আগুনের তাপে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। পুতুল আঁচল দিয়ে মুখ মুছল —'কি হ'ল, চা খাও'। সমীরের মনে হ'ল কেন এখানে এলাম—পুতুলের সঙ্গে তার কি। পুতুল তাকে কোনদিন বলেনি ভালবাসার কথা—সেও বলেনি, তবু কিসের প্রত্যাশা তাদের। সমীর জানে সে যে পথে চলেছে—সে পথে নিমাইদার মত নিঃশেষ হয়ে যেতে হ'বে একদিন।

'কি ভাবছো'

'না কিছু না'

'মিথ্যে কথা'

'হয়ত তাই' সমীর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল মধ্যে মধ্যে।

'এবার এসব ছেড়ে দাও'

'কি সব'

'এই বাজনীতি'

'পুতুল'

'আমাব বড ভয় করে—এ বড় ভয়ংকর খেলা'

নিমাইদাকে চিতায তুলে দিতে দিতে সমীরেরও একথা মনে হয়েছিল। অথচ সংসারে ফেরার পথ নেই—সংসার মানে তো দারিদ্র ঘৃণা লোভ।

'তুমি এবাব একটা চাকরি বাকরির খোঁজ করো মন দিয়ে। এম. এ. টাতো পাশ করেছিলে। মল্লিকাদির দিকে তাকাও বড় কষ্ট হয় এতবড় একটা সংসারের দায়িত্ব, বয়স হয়েছে এবপর বিযে দিতে কষ্ট হ'বে.......'। পুতুলের কথাগুলি মন দিযে শুনল। কথা শেষ হয়ে যাওযার পর পুতুল চুপচাপ বসেছিল টেবিলেব উপব। প্রতিটি মানুষের প্রতিটি মানুষীর মিনিমাম রিকোঅ্যারমেণ্ট, খাদ্য আশ্রয় এ বাজনীতি নয় পুতুল—এ'হল বাঁচার জন্য যুদ্ধ—আমি সংসারের কথা অস্বীকার করিনা—আমাব দায়িত্বও ইগনোর করিনা.......সমীর ভাবছিল বসে বসে। একটা দুঃখবোধেব ধোঁয়া তার রক্তেব মধ্যে মিশে যাচ্ছিল।

খালি চাযের কাপে একটা নীলমাছি উড়ছিল। জানালার বাইরে আকাশে কয়েকটা তারা। পুতুলের টেবিল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। মধ্যে মধ্যে ক্যালণ্ডার দুলছিল বাতাসে। পুতুল চুপ। সমীর চুপ।

'পুতুল'........'অ' পুতুল'........পাশের ঘর থেকে পুতুলের মা ডাকে। পুতুল টেবিল থেকে নেমে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আবাব নীলমাছি.....খালি চায়ের কাপ.....টেবিলঘড়ির মৃদু টিকটিক শব্দ.....হাওয়ায় দোলানো ক্যালেণ্ডার ....। সমীর বড় একা।

'শোন আমি একটু বাইরে যাব' বলে পুতুল দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল। তার এই ভঙ্গী বড় সুন্দর—বড় সহজ। সমীর বলল 'কাপড় পালটে আসবে?'

'এই কাপড়টা কি খুব ময়লা........এতে চলবে না?' পুতুল কাঁধের কাপড় হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বলল।

'চলো'—সমীর উঠে দাঁড়িয়ে প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরাল দেশলাই জ্বেলে। পুতুল আগে—সমীর পিছন পিছন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে পুতুল রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার ঠাণ্ডা বাতাস চোখে মুখে লাগতে খুব ভাল লাগল সমীরের। সমীর বলল,—'মা'কে ভিতরে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরুলে?'

'এ ভাবেই তো বেরুতে হয় এখন'

'যদি কেউ আসে'

'আসে না কেউ'

'ধর তোমার দাদা'

'আসে না আর' পুতুলের গলার স্বর খুব শান্ত খুব অসহায়। সমীর হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ের মধ্যে পুতুলকে হারাচ্ছিল। একবার দুজন খুব কাছাকাছি চলে আসছিল —আবার দূরে চলে যাচ্ছিল। 'এত মানুষ' পুতুলের গলায় বিস্ময়।

সমীর পুতুলের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল সুন্দব করে। পুতুল চোখ নামাল। এবার তারা দু'জন পাশাপাশি হাঁটছিল। পুতুল খুব ঘামছিল ফলে মধ্যে মধ্যে অভ্যাসবশে ছোট রুমালে মুখ মোছে।

'কোথায় যাবে'

'চশমার দোকানে মা'র চশমার ফ্রেম বদলাতে'

'তারপর'

'ভেবে দেখিনি'...পুতুল হাসল। সমীর লক্ষ্য করল পুতুলের দাঁতগুলো সমান সাদা মসৃণ আর আলোয চিকচিক করে। পুতুলের শাড়ির আঁচল উড়ে উড়ে সমীবেব হাতে লাগছিল। আর সমীরেব তখনই মনে পড়ে কেন পুতুলেব প্রতি তাব এই দুর্ব্বলতা। নাকি এ-ই সুখ। এই সুখের জন্য পুতুল বেঁচে আছে প্রায়—অন্ধ মাকে নিযে। একটা চশমার দোকানে পুতুল ঢুকে গেল। সমীব পাশের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনল—ধরাতে গিয়ে লক্ষ্য কবল রাস্তাব অন্যপাশ থেকে একটি লোক তার দিকে তাকিয়ে। মুখটা বড় চেনা। সমীব চোখ সবিযে আনল—চশমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। সমীবেব চোখটা আবাব ঘুবে গেল সেদিকে—লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সমীবেব অস্বস্তিবোধ হ'ল—লোকটিকে কখনও দেখেছে কি-না মনে করতে পাবে না।

'এই' পুতুলের হাত সমীবে হাত ধরল। সমীর চমকে ঘুবে তাকাল। পুতুল বলল—'কিছু ভাবছিলে'। সমীর ঘাড় নাড়ল। উত্তর দিলনা—কাবণ, লোকটা তখনও দূর থেকে তাকিয়েছিল। সমীর কিছুতেই লোকটাব পরিচয় মনে কবতে পারল না।

পুতুল বলল—'চল চা খাবো'

সমীর আপত্তি করল না। আপাততঃ ওই লোকটার চোখ থেকে সরে যেতে চায় সমীর কিছুক্ষণেব জন্য। তাছাড়া রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বড় ক্লান্ত লাগছে। একটা সাধারণ রেস্তোরায় ঢুকে পড়ল দু'জন। সমীর ঢুকতে ঢুকতে পুতুলকে বলল —'আমার পকেটে কিন্তু কয়েকটি পয়সা।' পুতুল শুনল কি শোনেনি বোঝা গেলনা।

'একটা কেবিনে ঢুকলে হয়' সমীর বলল। পুতুলের চোখে শাসন—ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

পুতুলকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পর একা সমীর বাড়ি ফিরছিল। সেই লোকটা তখনও তার পিছনে ছায়ার মত। তার উদ্দেশ্য কি সমীর বুঝতে পারছিল না। সমীর প্যান্টের দু'পকেটে হাত ডুবিয়ে পথ হাঁটে। সমীর প্রতিবার লক্ষ্য করেছে —লোকটির চোখে চোখ পড়লে সে আড়ালে সরে যায়। যতক্ষণ পুতুল সঙ্গে ছিল —সমীরের মনে হয়েছে এ পুতুলের কোন প্রেমিক হ'তে পারে। কিন্তু পুতুলকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরও সমীর দেখল লোকটি ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করছ। সমীরের একটা সন্দেহ হল—নিমাইদার হত্যাকারীদের কেউ নয়ত...সঙ্গে সঙ্গে একটা অহেতুক ভয়ে—সমীরের শরীর শিরশির করে উঠল। সমীর আজ একা—এবং নিরস্ত্র। রাস্তা নির্জন, দোকানগুলির দরজা বন্ধ। নিমাইদার শেষ চেহারা মনে পড়ল—তার কাঁটা হাত...একটা খালি ট্যাক্সি দেখে সমীর রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থামাল। ড্রাইভার গলা বার করে জিজ্ঞাসা করল কোনদিকে। সমীর দ্রুত দরজা খুলে বাড়ির ঠিকানা বলে—কপালের ঘাম মুছলো আস্তিনে। তারপর পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখল সে যেখান থেকে ট্যাক্সিতে উঠেছে—লোকটা সেখানে তখনও দাঁড়িয়ে। সমীর চোখের পাতা বন্ধ করে—সিটের উপর মাথাটা এলিয়ে দিল। বাড়ি পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া দেবার জন্য মল্লিকাকে ডেকে ওঠাল। মল্লিকা বোধ হয় তখনও ঘুমায়নি—নাকি আজকাল ঘুমায় না—মেজদি বাক্স খুলে পয়সা দিল—কোন প্রশ্ন করলনা। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে এসে সমীর দেখল মেজদি বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল দিচ্ছে। আজকাল এরকম হয়। মেজদির জন্য দুঃখ হয়। সমীর দাঁড়িয়ে স্থানুর মত এই দৃশ্য দেখে। বাথরুমের আলো নিভিয়ে মেজদি সমীরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'দাঁড়িয়ে আছিস'

'.............'

'এত রাত করে বাড়ি ফিরিস'

সমীর তখনও স্তব্ধ। তার জিহ্বা যেন মুখের ভিতর পেরেক দিয়ে আটকান। অবশ।

মেজদি তোয়ালে দিয়ে মাথা ঘষল। আবার বলল 'ভাত ঢাকা আছে তোর —খেয়ে তুই আমার ঘরে আসিস একটু' সমীর খাওয়াদাওয়ার পর মেজদির ঘরে এল। অন্ধকার জানালার নিচে ইজিচেয়ারে মেজদি বসেছিল। একটা হাত মাথার নীচে দিয়ে। সমীর চুপচাপ মেজদির বিছানার উপর বসল। এভাবে নিঃশব্দ বসে রইল দু'জন। মেজদি কেন তাকে এমনভাবে এত রাতে তার ঘরে ডাকল—সমীর ভাবছিল। সংসারের কোন কিছুতে মেজদি সাধারণত ডাকে না—পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কোনদিন আলোচনা করেনা।

মল্লিকা অনেকক্ষণ পরে মাথার তলা থেকে হাত নামিয়ে কোলের উপর রাখল —শান্ত গলায় বলল—'খেয়েছিস?' সমীর ঘাড় নাড়ল। ভাত খাওয়ার পর সিগারেটের প্রচণ্ড নেশা পায় তার। অথচ মল্লিকার সামনে সিগারেট খেতে পারেনা, অস্বস্তি হয়।

'তুই কি এভাবেই কাটাবি স্থির করেছিস'

'একটা চাকুরী আছে—করবি?'

মল্লিকা হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি ঠিক করছিল। সমীর মল্লিকার প্রশ্নের জবাব দিলনা। নিঃশব্দে বসে রইল।

'আমি আর পারিনা'—মল্লিকার স্বর বড় শান্ত। সমীর মাথা নীচু করে আঙ্গুলের নখ দিয়ে বিছানার চাদর খুঁটছিল।

'আজ মৃণাল এসেছিল—তোব জন্য বসেও ছিল অনেকক্ষণ'

'তুমি যে চাকুরীর কথা বলছিলে?'

'মৃণালদেরই ফার্ম্মে—বোধহয় হয়ে যাবে তবে এই শহরের বাইরে'

'মেজদি' সমীরের কণ্ঠস্বর যেন গুমোট ঘরের দেয়ালে কাঁচের বাসনের মত আছড়ে ভেঙ্গে পড়ল।

'তুই ভেবে দ্যাখ—কাল বিকেলে তোকে নিয়ে যাবে'

সমীর স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। মল্লিকা ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, জানালার পর্দা সরিয়ে অন্ধকার দেখছিল। কোথায যেন কে কড়া নাড়ছে বড শব্দ কবে। টিকটিকি ডাকল—টিকটিক। ঘর থেকে—গুনগুন করে মা ঠাকুরকে ডাকছিল। নিচেব ঘরে বাসনের শব্দ হ'ল, মা বলল 'মল্লিকা শুয়েছিস? দেখতো মা কিসেব শব্দ।' মেজদি উত্তর দিল না। মা আবার রাণুকে ধমক দিল—ঠিক হয়ে শুতে পারিস না এত বড় মেয়ে।'

'সমীর' মল্লিকা চোখ ফেরাল এদিকে। সমীর বলল 'আমি যাই'। মল্লিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'না' আরো কথা আছে দাঁড়া...' সমীর দেখল অন্ধকাবে যেন মল্লিকার চোখ জ্বলছে।

'এখন থেকে সংসারের সব-দায়িত্ব তোকেই নিতে হ'বে'

'মেজদি'

'মৃণাল আর অপেক্ষা করতে চায়না'

সমীর বিছানা ছেড়ে মল্লিকার মুখোমুখি দাঁড়াল। মল্লিকা তখন হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে থব থব করে। মল্লিকাকে এর আগে কখনও এত উত্তেজিত হ'তে দেখেনি। সমীরের খুব আশ্চর্য লাগছিল।

'এ চাকবি নিতে হ'বে তোকে'

'আমি ভেবে দেখি মেজদি'

মল্লিকা ক্লান্তভাবে আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। সমীর ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে এল। আজ গরম—ঘরে ঘুমোবার উপায় নেই। সমীর সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই আর মাদুর নিয়ে ছাদের দরজা খুলল শব্দ করে। মা বোধ হয় ঘুমায়নি বলল 'কে সমু...ফিরলি'। সমীর ছাদে এসে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশে হাজার তারা সাপের চোখেব মত নীল চিকচিক করে। সমীর সিগারেট ধরাল। পেটের ভিতর ব্যথাটা যেন আবার আরম্ভ হয়েছে। সমীর পাশ ফিরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ চোখের পাতা বন্ধ করে। ছাদের সিঁড়ির দরজায় মায়ের গলা শুনতে পেল সমীর,

মা ডাকছে। সমীর শীষের মত গলায় বলল—'মা শুতে যাও' মা সিড়ি বেয়ে বেয়ে ছাদে উঠতে উঠতে বলল 'ঘুম কি আর আছে বাবা'। মা চোখে ভালো দেখতে পায়না বলে সমীর দ্রুত উঠে গিয়ে মা'র হাত ধরে বলল—'যদি পড়ে যেতে'।

'পড়ব না বাবা, আমার মৃত্যু নেই'

মা হাঁপাচ্ছিল মাদুরে বসে। সমীর সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাদুরে শুয়ে পড়ল। মা বিড়বিড় করে বলল 'আকাশে মেঘ আছে বোধহয়—বড় গুমোট'—সমীরের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল মা, সমীর চোখের পাতা বন্ধ করে পড়ে রইল, উত্তর দিল না। রাত কত হয়েছে কে জানে—মধ্যে মধ্যে এরকম হয়, আজকাল তারও ঘুম আসে না।

পুতুল বোধহয় ঘুমে—নাকি পরীক্ষার খাতা দেখছে রাত জেগে। নিমাইদার শোকসভার পোষ্টার বোধহয় দেয়ালে দেয়ালে লাগছে এখন। সত্যদা এখন দলের নেতা। শালা—পল্টু! ও কেন এসেছিল নিমাইদার শ্মশানে? মেজদি সারারাত ঘুমোবে না। মৃণালদা মেজদিকে ভালবাসে। আর অপেক্ষা করতে চায়না। আহাবে প্রেম! প্রেম কি? ওই লোকটা কে সারা সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াল ছায়ার মত—পুতুলের ব্যর্থ প্রেমিক? প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে আমাকে? শালার মেয়েছেলে। মেজদি বলছিল 'আর পারি না'—অমিই কি পারি। আমার আর ভালো লাগেনা.......।

'সমু অ সমু'

'বল'

'নীচে চল—শেষরাতেব হিম লেগে যাবে।'

'তুমি যাও না'

মা নীচে গেল না। শিযবে পা ছড়িয়ে বসে দড়ির মত হাত সমীরেব কপালে বাখল—'এতো রাত করে বাড়ি ফিবিস, কখনো ফিবিসই না—সমযমতো চান নেই —খাওয়া নেই ...তুই কি কবিস বলতো? কিভাবে সংসার চলে দেখিস না...'

'মা তুমি চুপ কর'—সমীর পাশ ফিরতে ফিরতে বলল।

'আমি চুপ কবলেই তো মানুষ চুপ কববে না'

'মানুষকে টানছো কেন এর মধ্যে'

'লোকে কি বলে—মেয়ের রোজগাবের ভাত না ছাই খাচ্ছি'—

মার গলা শুকনো—ফ্যাসফ্যাসে। সমীর জানে এব পরই মা কাঁদবে। পায়ের উপব দিয়ে কি চলে যায়—পাযেব পাতা দিযে অন্য পা ঘসে, বোধহয় আরশোলা। আবার আকাশের দিকে মুখ ফেরায সমীব। সমীর না তাকিয়েও বুঝতে পারে মায়ের চোখে জল। সমীব খুব অসহায় হয়ে অন্ধকাবের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে।

মৃণাল ঘন কাচের দরজা খুলে বলে—এসো! সমীরের হাত পা যেন গড়িয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। মৃণালেব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকায়—দ্যাখে ঘন কাচের বন্ধ দবজাব ওপাশে একটা ছায়ামুণ্ড দ্রুত পিছলে যায়।

ঘরের ভিতর সুন্দর অথচ তীব্র গন্ধ তাকে প্রায় জ্ঞানহীন মানুষের মত মৃণালকে অনুসবণ করতে দেখে। অবশেষে জনশূন্য বিশাল হলঘর আর চেয়ার টেবিলের ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে, নাকি তার শরীরটা হাঁটতে হাঁটতে তাকে আরো একটা দরজার

সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখে, মৃণালদা ভিতরে ঢুকে যায়। একজন মাত্র বেয়ারা পাষাণমূর্ত্তির মত দরজার একপাশে স্থির বসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সমীর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল জানেনা—বোধহয় পাঁচ, বোধহয়....। ঘরটা কেমন যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। লোকটি তার দিকে একইভাবে তাকিয়ে থাকে। সমীর দেখে চারদিকের আসবাবপত্রের মত অথবা দেয়ালঘড়ির মত তার শরীর ও হৃদয় অসাড় হয়ে যাচ্ছে। সমীর এই ২৮ বছর ৩ মাস ৯ দিনের জীবন অথবা সময় অথবা দুঃখসুখ অথবা সুখদুঃখ অথবা তার সব ঘৃণা অথবা তার ভালবাসা ইত্যাদি সবকিছু বেমালুম ভুলে যায় সে দেখে তার পা দুটি শিকড়ের মত হু হু করে ফ্লোরে গেঁথে যাচ্ছে। একসময় দরজা খুলে যায়—মৃণালদা ডাকে—'এসো'। সমীর যেন বড় দ্রুত তার হাতপা নিয়ে ভিতরে গড়িয়ে যায়। চেয়ারে বসে সমীর দেখে একজন মানুষ (যার বয়স ৩০ বা ৫০) নিখুঁত কামান মসৃণ মুখ নিখুঁত পোষাক-আসাক—তার নাম বাবার নাম বয়স ইত্যাদি সবকিছু জেনে নেয়। ইস্কুলে একবাব একজন যাদুকর এসেছিল—কিছু লাল নীল কাগজের টুকরো জল দিয়ে গিলে তারপর অতিদ্রুত একটা লাল নীল কাগজের ফিতে দু আঙ্গুলে টেনে বার করে ফেলেছিল। এ লোকটাও যেন সেরকম তার সবকিছু টেনে বাব কবে অদ্ভুত নিপুণতায়। সমীর দেখে এসব কিছু জেনে নেওযাব ফাঁকে ফাঁকে তার কলম নাড়ে আব মাঝে মাঝে টেলিফোনে কিছু নির্দ্দেশ দিতে থাকে। এই লোকটিকে দেখে তাব মনে হয় পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে—যাবা একসঙ্গে নির্ভুলভাবে অনেকগুলি কাজ করে যেতে পারে—এবং এই কাবণে তাব খুব শ্রদ্ধা হয়। সমীব সব প্রশ্নের কী উত্তর দিযেছে মনে করতে পারেনা। মৃণালদা লোকটির কানে কানে ফিসফিস করে কি সব বলে--সমীর টেবিলের কাচে তার মুখ দেখে তাব চোয়াল যেন ঝুলে গেছে চোখগুলি খুব নিষ্প্রভ নিরক্ত। তার মুখে সর্বোপবি যে ছায়াটা ঝুলে থাকে—তা হল খুব বিনীতভাব। যেন এই লোকটি বলে দিলে তার জুতো মুখ ও জিহ্বাব লালা দিয়ে ঘষে চকচকে কবে দিতে পারে। অথবা এই লোকটি যদি একটা লাল বল ছুঁড়ে দেয় তাহলে সে দৌড়ে ছুটে গিযে বলটা দাঁতে করে নিযে আসতে পাবে—কুকুবের মত। মৃণালদা তাকে চোখ টেপে। সমীর বুঝতে পাবে না এখন সে অথবা তাব হাত-পা মুণ্ডু সমেত শরীরটাব করণীয় আব কী থাকতে পাবে। মৃণালদা চোখেব ইশারায দরজা দেখালে তার হাত-পাগুলি খুব কর্মতৎপর হযে ওঠে। নবম শব্দে 'ক্যান আই গো নাউ স্যার' বলে দবজাব দিকে যায 'ওহ ইয়েস' ভারী গলায শুনতে শুনতে বেরিয়ে আসে সমীব। বাইরে বেরিয়ে মৃদু অথচ স্নিগ্ধ আলোয দেখে বেয়াবাটি তাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল ও একপাশে সাজানো চেযারগুলির দিকে আঙুল তুলে বসতে বলল। সমীবের চেযাবেব নরম গদীব উপব বসে সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে হয তারপর চারপাশে তাকিযে কোন অ্যাসট্রে দেখতে না পেযে চুপচাপ বসে থাকে। সমীর দেখে মৃণালদা দরজার ফাঁকে মুখ বাব করে 'চিত্ত চিত্ত' বলে বেয়ারাটাকে ডাকে। লোকটি স্প্রিং-এর পুতুলের মত উঠে দাঁড়ায় ও ঈষৎ ঝুকে মৃণালদার হাত থেকে একটা ফাইল নিয়ে—আরেকটা দবজা দিয়ে বেবিয়ে যায়। মৃণালদা তার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়, তারপর দরজার আড়ালে চলে যায় মৃণালদার মুখ। যখন আবাব সেই ভারী কাচের দরজা ঠেলে সমীর বাইরে

এসে ঘড়ি দেখল তখন পুরো ৪৩ মিনিট কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেছে সমীর কিছুই মনে করতে পারেনা। বাইরে তখন তিলতিল করে অন্ধকার জমে—সন্ধ্যা ঘন হয়। মৃণালদা বলে—'তাহলে কাল একবার এসো অফিসে'। সমীর উত্তর দেয়না সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে। আসলে সে এই ৪৩ মিনিটে কি কি ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করে। কী কাণ্ড—কিছুই মনে পড়েনা। সিগারেট টানে প্রাণপণে কোন কিছুই মনে পড়েনা, একটা বিশাল ঘর আর দেয়াল ঘড়ির দুটি অসহায় কাঁটা ছাড়া। মৃণাল আবার বলে—'মুখার্জি সাহেব খুব খুশী—ট্রেনিং এর পরেই তোমাকে নতুন জোনে কাজ করতে হ'বে। সমীর ভাবে কোন মুখার্জি সাহেব? মৃণাল আপন মনে বলে যায়—'আমার খুব ভয় ছিল'—আরো অনেকের ক্যাণ্ডিডেট ছিলো 'অথচ তোমার প্রয়োজন তাদের কারো চেয়ে কম নয়।' 'অষুধের ফেরিওয়ালার চাকুরি হলেও প্রফেশ্যানটা খুব খারাপ নয়'—ইত্যাদি। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই বলে সমীর হাঁটতে লাগল মৃণালের সঙ্গে সঙ্গে। একসময় মৃণাল বলল —'তা তুমি এবার কোনদিকে'? সমীরের কোন গন্তব্যস্থল নেই বলে উত্তর না দিয়ে একমনে হাঁটে। তার একটা চাকরির খুব দরকার ছিল কি? না যাদের ছিল তারা কেউ পেলনা বলে সমীর নিজের যোগ্যতা নিজেই যাচাই করল। আসলে এরমধ্যে তার যোগ্যতা কি, নাকি মৃণালদার যোগ্যতা অনায়াসে এরকম একটা চাকুরি পাইয়ে দিল। খুব অবিশ্বাস্য লাগে তার সবখানি—সবখানি রহস্যময়। আসলে মৃণালদার মত লোকেরাই লটারি কিংবা ক'ন্ট্রাক্টরি করে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু ছুঁতে পারে—আসলে এই এদের কর্ম্মতৎপরতা—ব্যবসায়িক বুদ্ধি খুব প্রখর। এদের জীবনে ক্রমাগত ১+১=২ হয়, কখনও ৩ বা ৪ হয় না—সমীর লোকজনের শরীরের ফাঁকে গড়িয়ে পথ হাঁটে। সমীর চারপাশে তাকিয়ে দেখে প্রতিটি মানুষের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যবিন্দু আছে। গন্তব্যস্থল থাকে বলেই এরা খুব দ্রুত—খুব নিপুণভাবে নিজের শরীর নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েও আলাদা আলাদা। ভাবতে ভাললাগে এই জনারণ্যে কিছু লোক লম্পট কিছুলোক ধর্ম্মযাজক কিছু লোক চোর কিছু বেশ্যা কিছু সতী কিছু দেশসেবক কিছু লোক হত্যাকারী কিছু প্রেমিক ইত্যাদি হয়েও সব মিলেমিশে আছে।

জোরে বৃষ্টি নামল—রাস্তার লোকজন মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মৃণলদা চীৎকার করে ডাকে 'ট্যাক্সিই'—ট্যাক্সি থামেনা। দৌড়োতে শুরু করলো, বৃষ্টি আরো জোরে নামে। অন্ধকারে আকাশে মেঘ ছিল কিনা—সমীরের মনে পড়েনা। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে চোখেমুখে সমীরের। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।......সমীরের খুব ভালো লাগে। রাস্তায় লোকজন নেই, প্রায় ফাঁকা। মানুষ কি হিসেবী কি নিয়মমাফিক, জন্ম বিবাহ মৃত্যু সব রুটিন মাফিক। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি সমীরের মনে হয় তার জীবনে এমনভাবে বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ আর আসবেনা। সমীর আরো দ্রুত দৌড়োতে থাকে, তার মুখে ফেনা উঠে আসে। মৃণাল অনেক পিছনে পড়ে যায়। সমীর তার দৌড় থামাতে পারেনা তাকে যেন এই বৃষ্টির ভিতরে কেবলই দৌঁড়োতে হবে এই শেষবারের মত—বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত। সদ্য পাটভাঙ্গা কাপড় চোপড় বৃষ্টিতে ভিজে একাকার জলে কাদায় ভিজে কাপড়ের একটা শব্দ হয় পায়ে পায়ে।

সমীর খুব নিপুণভাবে দৌড়ে যায় জলের মধ্যে। আর বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। বৃষ্টির জল রাস্তাঘাট ডুবিয়ে—দু পা জড়িয়ে সমীরের কোমর জড়িয়ে ধরে।

সমীরের চুল বেয়ে টপ টপ জলের ফোঁটা—সারা শরীর ভিজে জবজব। দুপাশের বাড়িগুলির আনাচে কানাচে যে সব লোকজন মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দিকে তাকিয়ে সমীর কৌতুক অনুভব করে—এরা সব সেইসব মানুষ যারা কার্তিকের গোড়াতে গলায় মাফলার বাঁধে—অথবা বৃষ্টিতে সামান্য ভিজলে আদা-চা অথবা কোসাভিল খায় সর্দির ভয়ে। অথচ তারা কোন কিছুতেই আশ্চর্য বোধ করেনা —এই বৃষ্টি অথবা খুব সুন্দর সূর্যোদয় অথবা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত বনভূমি—সবকিছু এরা অন্যের কাছ থেকে জেনে নেয়—অথচ নিজের দু'চোখ মেলে দেখেনা।

সমীর দেখে একটা পান-দোকানের সামনে সেই লোকটি জুবুথুবু হয়ে দাড়িয়ে আরক্ত চোখে তাকে লক্ষ্য করে, যে সমীরের পিছনে ক'দিন ধবে. ছায়ার মত ফিরছে। তার চোয়ালগুলো শক্ত—মাংসপেশীগুলি স্পষ্ট হযে উঠে মুহুর্ত্তে মিলিয়ে যায়—সমীর সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে আরো জোরে ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির ভিতরে ঢুকে যায়—সেই লোকটার ভয়ে পিছনে ফিরে তাকায় না। তার নিঃশ্বাস খুব দ্রুত ও ঘন হয়। মুখে ফেলা উঠছে—হাত পা কাঁপে থরথর করে জলের ভিতরে। এই লোকটি তার কাছে কি চায় সমীর জানেনা—জেনে নিতে গেলে নিমাইদার কাটা হাত পায়ের স্মৃতি চোখের সামনে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

সুখময় ঘোষ

আদালত প্রাঙ্গনে অসময়ে বৃষ্টি

খুব জোরে বৃষ্টি এলো। বড় বড় ফোঁটায় তেরছা ভাবে যেন হাজার বর্শা ছুটে এলো। লোকজন ছুটোছুটি করে জজকোর্টের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো। যারা গাছ তলায় কবজ-তাবিজ, গাছ গাছড়ার ওষুধ, ঝালাই করার রাঙতা, ইত্যাদির দোকান সাজিয়ে বসেছিলো, কোনরকমে দোকান গুটিয়ে তারাও মাথা বাচাঁতে যে-যার মতো আশ্রয় খুঁজে নিলো।

নকুলের দোকানের বিষয় আশয় খুব সামান্য। একটি খাঁচাবন্ধ টিয়াপাখি আর একরকম ভাগ্য-লেখা খাম। পলিথিনের টুকবো দিয়ে খাঁচা শুদ্ধ পাখি এবং বাক্সটি ঢেকে দিলো সে। তারপর চটপট উঠে গেল পাশের টাইপিস্ট হৃদয়বাবুর চালার তলায়। সেখানে যথেষ্ট ভিড। তবে তাবই মধ্যে কোনরকমে নকুলের জায়গা হযে গেল।

অসময়ের বৃষ্টি। অঘ্রাণেব শুরুতে এমন বৃষ্টি ক্বচিৎ দেখা যায। ছোট চালাটায় তখন এই নিয়েই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। একজন বলছে—খুব খারাপ লক্ষণ হে, চালের দাম হু হু কবে বেড়ে যাবে।

আরেকজন বলল—কম ছিলো কবে যে বাড়ার কথা বলছেন, ও তো বেড়েই আছে।

—তা যা বলেছেন। তবে কথায বলে না, যদি বর্ষে আঘনে বাজা যায় মাগনে।

—তাহলেই বুঝুন, যেখানে বাজাকেই ভিক্ষে করতে হয়, সেখানে দেশের গরীব গুরবো সাধারণ লোকের কি দশা।

—এটা আবার কি বকম কথা হল মশাই। গবীবেব দশার আবাব খাবাপ ভালো হয নাকি। সে তো ভদ্রলোকেব এক কথাব মত, চিরকালই এক দশা। তবে হ্যাঁ, ঐ যে প্রবচনটা বললেন, তাতে রাজাব জন্যে কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। দুঃখ টুঃখ করতে হলে রাজা বাজড়াদেব জন্যে করলেই সেটা হয় মহৎ দুঃখ।

—তা যা বলেছেন। কিন্তু এখন তো রাজাই নেই!

—তা নেই। কিন্তু আমবা আছি। ঐ যে কে একজন বলেছেন না—'আমরা সবাই রাজা'।

একজনের মনের মধ্যে কথাটা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো বলে মনে হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণ কিছুই বলেন নি। এবাব বললেন—খুব খাঁটি কথা বলেছেন। আমরা সবাই রাজা। কেউ কারো ধার ধাবি না। বড় ছোট মান্য করিনা। দেশে যদি একটি মান্যগণ্য কবার ব্যাপাব থাকতো তাহলে কি আমাকে আজ এই বয়সে কোর্টের দরজায় ঘুরতে হত?

নকুল ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিযে চিনতে পারলো। প্রায মাস চাবেক আগে ভদ্রলোক একবার তার কাছে ভাগ্য জানতে এসেছিলেন। তখন তাকে খুব

হাসিখুশি দেখা যাচ্ছিল। এই চার মাসে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। চোখ মুখে কপালে দু'একটা বাড়তি রেখা ফুটে উঠেছে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পডায় বক্তাদের মধ্যে তাত্ত্বিক আলোচনায় হঠাৎ একটু বাধা পড়লো।

তখন জোর বৃষ্টি পড়ছে। টাইপিস্ট হৃদয়বাবুর বাঁশের চালা আর কতক্ষণ এই জল আটকাবে বলা মুশকিল। সামনের খাল ভরে গিয়ে ইতিমধ্যেই রাস্তায় জল উঠতে শুরু করেছে। আজকের রোজগার তো গেলই, নকুলের এখন বাড়ি ফেরার সমস্যাই বড় হয়ে উঠছে। শহরতলীর যে দিকটায় তাব বাসা, একটানা এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে তার পথ ঘাট সব ডুবে যায়। বাড়ি ঘরের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য জলে কাদায় থৈ থৈ।

অথচ শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূবে নকুলের পৈতৃক ভিটেতে এসব জলবন্যাব কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু ভাগ্যই নকুলকে বাপের আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করেছে। ছোট ভাই সহদেব সবটা সম্পত্তি দখল কবে নিল। ব্ল্যাকের ব্যবসায় সহদেবের অনেক টাকা। ফলে বাবা-মা সহজেই তার দলে। ছোট ছেলে হয়ে দাঁড়ালো বাডিব কর্তা।

ঐ সেই মান্যগণ্যের ব্যাপাব। অকথ্য ভাষায় গালাগাল কবতো সহদেব তার রোজগার কম বলে। সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছিলো সেদিন, যেদিন ইন্দুব আবেকটা বাচ্চা হবে শুনে সহদেব অশ্লীল একটা কথা বলেছিল।

সেদিন সে সহদেবকে মারতে গিয়েছিল। মারতে তো পারেই নি, উল্টো ঐ ব্ল্যাকমাষ্টার দৈত্যটার হাতে—। ঘটনাটা মনে পডে তার মনটা খুব বিষণ্ণ হযে উঠলো। গ্রামেব লোক বলেছিল, তুমি কেস কর। কিন্তু নকুল সাহস করেনি। করলে কি দশা হত, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখেই সে সেটা বুঝতে পারছে। তাছাডা এত দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাবার ক্ষমতাই তার ছিল না। অগত্যা ছোট ভাই-এব হাতে মার খেয়ে সে নিজেই সবে এসেছিল বউ বাচ্চার হাত ধরে ঐ এক ছোট্ট টিয়াপাখিকে সম্বল করে। তবে মিথ্যা বলবে না নকুল। এই পাখি তাকে খাইয়ে বেখেছে। আর বাঁচিয়ে রেখেছে এই কোর্টেব বটতলা। এখানে যাবা আসে, তাবা সবাই যদি পটাপট তাদের মামলাব রায় জেনে ফেলতো, তাহলে তার কাছে কেউ আসতো না।

বটতলায় উঁচু বেদীব ওপব বাখা পলিথিনের ঢাকা দেওয়া পাখিব খাঁচাটার দিকে তাকালো নকুল। গাছেব গুড়ি বেয়ে সেখানে মোটা মোটা ফোঁটা পডছে। তাতে পাখিব কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। বরং পলিথিনেব ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় তাতে সেটি মনের আনন্দে লাফাচ্ছে মনে হল। ভয় শুধু টিনের বাক্সে সাজিয়ে রাখা খামগুলোর জন্য। জলে ভিজে খামগুলো নষ্ট হযে গেলে তাকে আবার লিখতে হবে। একেক জনের ভাগ্য লেখা কি সোজা কথা, তাও কাব ভাগ্য সেটাই যেখানে জানা নেই।

অনেকেই বলে এগুলো সবই বুজরুকি। সহদেব তো প্রায়ই এই বলে তাকে খিস্তি দিত। এতে ইন্দুর খুব অপমান হত। সে চাইতো নকুল এর প্রতিবাদ করুক। কিন্তু সে ওসব কথার প্রতিবাদ করতো না। বলতো—'আরে যেতে দাও। ও একটা পাগল। তাছাড়া এ সবের বোঝেই বা কি! এ হচ্ছে গণনার ব্যাপার। বুঝলে! খুব

শক্ত বিষয়। এসব বোঝা সহদেবের কর্ম নয়।'

মুখে বলত বটে। এবং তাতে ইন্দু খুশিই হতো। কিন্তু সে নিজে মনে মনে জানতো কথাটা মিথ্যেও নয়। খামের ভেতর একেক জনের ভাগ্য বলে সে যা লিখে রেখেছে, সে সবই তার মনগড়া। খালি তার সততা এইটুকু যে সে লোক বুঝে কোন বিশেষ খাম তোলে না। তার শিক্ষিত টিয়া পাখি বিছিয়ে রাখা খামগুলো থেকে খুশিমতো যে কোন একটা তোলে। অতএব, যার ভাগ্য যেরকম—এটা নিশ্চয়ই বলা যায়।

অবশ্য, যারা বিশ্বাস করে তার কাছে আসে, তাদের বিশ্বাসের শিখাটিকে আরো একটু উজ্জীবিত করে তোলার জন্য খামের ভেতরে যে চিরকুটটি থাকে, তাতে তাকে কিছু কেরামতি করতে হয়। প্রত্যেকটি চিরকুটের ওপর একটি ছক আঁকা থাকে। তাতে রাশি চক্রের বিভিন্ন ঘর বসানো। তার নিচে টীকার মতো দু' তিন লাইন। বিষয়বস্তু প্রায় সবই এক, শুধু ভাষা আলাদা আলাদা। যেমন, কোনটায় লেখা 'শত্রু কর্তৃক ক্ষতি সাধনের সব চেষ্টা বিফল হবে'। আবার অন্যটায় —'বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী কারো সহায়তায় সাময়িক দুর্যোগ কেটে যাবে।' কিংবা 'সাবধানতা ও ধৈর্যের ফলে বহুদিনের পুরনো অবিচারের সুবাহা হবে।'

নকুল জানে, এসব ভবিষ্যৎ বাণীর কোন ভিত্তি নেই। পাখি তুললো বলেই সেটা অজানা রহস্যের মতো ভাগ্যের পূর্বাভাষ হয়ে গেল, সাধারণ ভাবে কেউই তা বিশ্বাস কববে না। কিন্তু এই কোর্ট প্রাঙ্গনে যারা আসে, তাদের কেউ কেউ অবশ্যই বিশ্বাস করে। এবং তার জন্য সবটুকু বাহাদুরী প্রাপ্য তার পাখিব। পাখিটি এমন সব ভঙ্গি করে, যে মাঝে মাঝে নকুল নিজেও অবাক হয়। এত সব কায়দা কানুন তাকে শেখানো হয়নি। কিন্তু বহুদিন থেকে এ কাজ করে করে পাখিটা নিজেই এখন কেমন অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। লোক বুঝে কখনো সে চট করে একটা খাম তুলে দেয। আবাব কখনো হযতো অনেক ধানাই পানাই করে, অনেকগুলো খাম উল্টে দিয়ে, নিচের দিক থেকে, যেন অনেক জটিল অবস্থা থেকে, সঠিক ভাগ্য লেখা খামটি ঠোঁট দিয়ে তুলে ধরে।

একদিনেব কথা মনে পডলো নকুলেব। এক কমবয়সী গরীব মহিলা এসেছিলেন। ভাগ্য জানতে। তাব পবনে ছিল পরিস্কাব কিন্তু প্রায জীর্ণ একখানা কাপড। দুই হাতে ক্ষয়ে যাওয়া দু'খানি শাঁখা। কিন্তু কপালের মাঝে সিঁদুবের টিপটিকে তার মুখশ্রী যেন এক করুণ সৌন্দর্যের প্রতিমা হযে উঠেছিল। কাপডেব খুঁট থেকে মোট সাততি টাকা বার করলো অতি সাবধানে। তাব থেকে দু'টি টাকা নকুলের হাতে দিয়ে সে তাব ভাগ্য জানতে চাইল।

নকুলের আদেশে পাখি একটা খাম তুলে দিল। তাতে লেখা—'আত্মীয় কর্তৃক বঞ্চিত হইবাব প্রবল সম্ভাবনা।'

বৌ-টির চোখে জল এসে গেল। কান্না চেপে প্রায় স্বগতোক্তির মতোই সে বললো "নতুন কবে আর বঞ্চিত হব কি। সেদিনই তো সব শেষ হয়ে গেছে যেদিন স্বামী আরেকটা বিয়ে করে লাথি মেবে আমায় তাড়িয়ে দিল।"

নকুলের মনে হ'ল খামের ভাগ্য জেনে বৌ-টি যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল।

যেন সে আর মামলা লড়বে না। অথচ এই মামলা যদি সে হারে বা না-লড়ে, তাহলে যে তার কি দশা হবে, নকুলের বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না।

বৌ-টির এই হতাশার জন্য দায়ী তার পাখি। অধিকাংশ খামে যে-সব আশার বাণী লেখা , তার থেকে না তুলে পাখিটা কেন বাহাদুরী করে নিচের দিক থেকে তুলতে গেল। কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি ছাড়া এই খামের আর কি মূল্য আছে? এই প্রথম সে পাখিটার ওপর খুব রাগ করলো। ইচ্ছে হচ্ছিল, টাকা দু'টো ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ইন্দু এবং আর চারটি সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সেটি করতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত বৌ-টির কি হয়েছিল, নকুল জানে না। তবে তাকে আর কোনদিন কোর্ট প্রাঙ্গনে দেখা যায়নি। জীবনের মামলায় যে হেরে গেছে, আদালতের মামলায় লড়াই করে সে কি আর তা ফিরে পাবে?

—কিছুতেই না—

চমকে উঠলো নকুল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো ওপাশ থেকে। নকুল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলে শুনতে পায়নি। এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে খুনের মামলা। বক্তা বলছে—"আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আসামী বেকসুব খালাস পেয়ে যাবে। কেউ সাক্ষ্য দেবে না।"

—তাই বলে নিজের বোনও দেবে না, যাকে বাঁচাতে গিয়ে ভাইটা প্রাণ দিলো।

—না। কারণ, তাহলে তাব যেটুকু সর্বনাশ সেদিন বাকি ছিল, সেটুকুও হয়ে যাবে।

কথাটা সকলেই জানে। তবু স্বীকার করতে কি রকম যেন দ্বিধা। তাই বক্তার এইরকম জোবালো যুক্তির পরও সবাই মাথা নিচু করে রইলো।

খুনের মামলাটা নকুল জানে অনেকদিন থেকেই তাবিখ পড়ছে। এখন সাক্ষী সাবুদ চলছে। বাদীপক্ষের সাক্ষী হাজিব হতে পারেনি বলে আবার তারিখ পড়েছে আগামীকাল।

কিন্তু নকুল তাব সহজ বুদ্ধিতে বুঝেছে, বাদীপক্ষের হাব অনিবার্য। খুন ধর্ষণেব মামালায় সাক্ষ্য প্রমাণেব ফাঁক ফোঁকড় এত বেশি যে একজন নির্দোষকে শাস্তি দেবার ভযে অধিকাংশ আসামী মুক্তি পেযে যায। এই কথাগুলো উকিলবাবুবা স্বীকাব কবেন না কেন? মিথ্যে ভাগ্য-গণনাব নাম কবে নকুল বডজোর দু'টাকা বোজগাব কবে। আর একই মামলায় উকিলবাবুদেব আয কত? নকুলের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, সব ক'টা খামেব মধ্যে একই কথা লিখে রাখে "মামলা মোকদ্দমায নিশ্চিত পরাজয়।" তাহলে আর কেউ মামলা কবতে আসবেনা। তখন দেখা যাবে উকিল বাবুদেব মুখই শুকিয়ে গেছে। দোয়াত আছে কালি নেই। ঠিক তেমনি কোর্ট আছে, জজ মেজিষ্ট্রেট দালাল পিওন উকিল মহুবী সবই আছে। নেই শুধু মামলা ঠুকবার লোক। আহা! এমন যদি হত! উকিলবাবুরাও তারই মতো গাছতলায় এসে বসেছেন মক্কেল ধরবার আশায়। তাহলে উকিলবাবুদের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলো অনেক অপ্রয়োজনীয কষ্ট থেকে বাঁচবে।

আবো একটা লাভ হবে নকুলের। গাছতলায বসে রোজগাব করে বলে সহদেব কিংবা আরো অনেকেই তাকে বা তার স্ত্রীকে যে হেনস্তা করে, সেটা আর করবে না। কিন্তু এসব উলটো পালটা ভাবনার এখানেই ইতি হয় যখন ইন্দুর শুকনো

মুখটা মনে পড়ে। ইন্দু যৌবনে সুন্দরীই ছিল। চোখ দু'টিতে যেন হাসি লেগে থাকতো। কিন্তু এখন সংসারের ধকলে চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখ নেই, সে চোখেও এখন যন্ত্রণার আভাস। অপরের ভাগ্য গণনার জালিয়াতি করে নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারেনি নকুল।

অথচ আর কীইবা করতে পারে সে? সহদেবের সাগরেদ হয়ে ব্ল্যাকমার্কেট করবে? সে খুব ভাল গান গাইতো। দেশের বাড়িতে যৌবনে অনেক পালাগান করে কিছু রোজগার পাতিও হতো। এখানে কে এসবের মর্ম বোঝে? এখানে গুণাগুণেব চেয়ে সুযোগ আদায়ের বুদ্ধিরই বেশি দাম, যা নকুলের নেই। তাই তার নিজের ভাগ্যেই এরকম জালিয়াতি হয়ে বসে আছে।

"নাঃ"—কথাটা হঠাৎ যেন ঠেলে বেরিয়ে এলো। টাইপিস্ট হৃদয় ভট্টচার্য ততক্ষণে কাগজপত্র গুছোচ্ছিলেন। বললেন—"কী না মশাই! বাড়ি যাবেন না। গোটা কোর্ট যে ফাঁকা হয়ে গেল!"

সত্যিই তো! এতক্ষণ খেয়াল করেনি নকুল। বৃষ্টি থেমে গেছে বোধহয় কিছুক্ষণ আগেই। জজ কোর্টের বারান্দা থেকে শুরু করে হৃদয়বাবুর চালা সবই ফাঁকা হয়ে গেছে। হৃদয় ভট্টাটার্যও এবার চলে যাবে।

লজ্জিত হল নকুল। তাড়াতাড়ি সে গাছতলায় ছুটে গেল। জল টল ঝেড়ে পাখির খাঁচা আর টিনেব বাক্সটা ঝুলিয়ে বাড়ির পথ ধরলো! রাস্তায় তখন জলের স্রোত বইছে।

ঠিক যেমন একটা স্রোত বইছিল তার মাথার মধ্যেও।

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

জঙ্গম

সারা রাত অপেক্ষা করে আজো ফিরে এলো সোমনাথ। মালতীর এখনো কষ্ট। ডাক্তাব বলেছেন, ভালো হবাব মতো আব অবস্থা নেই। প্রাণটুকু যতক্ষণ আছে এই মাত্র। শহরেব আকাশে ভোব হযেছে অনেকক্ষণ। জলেব গাডি ধুলোয় জল ছিঁটিয়ে গেছে। মাটিব নবম গন্ধ পেল সোমনাথ। ফাল্গুনেব শেষে প্রথম বৃষ্টি হ'লে মাটি থেকে যেমন গন্ধ ভেসে আসে। ভেজা মাটিব গন্ধ। সমস্ত রাত হাসপাতালের বারান্দায়। কখনো শুযে, কখনো বসে, দেয়ালে গা হেলান দিয়ে। শিড়দাঁড়া টনটন কবছে। মশার উৎপাত। কাবা যেন হাসপাতালের বাবান্দায় অস্পষ্ট আলোয় সারা রাত শুয়ে বসে কথা বলেছে। কি এত সুখদুঃখের কথা। অসংলগ্ন শব্দ, কথা, দীর্ঘশ্বাস সোমনাথ শুনেছে অস্পষ্ট। কান দিতে না চাইলেও শুনেছে। কি কথা, কাদের প্রসঙ্গ জানার একদম আগ্রহ নেই বলেই কথাগুলো শুধু শব্দ ছাড়া সবই অর্থহীন, অনাবশ্যক তার কাছে। কিছুই মনে পড়ছে না এখন। মনে করাব তাগিদও নেই। কে কার কথা মনে রাখে? বিশেষত অপ্রয়োজনে? শ্যামলীবাজারের বাস স্টপ ছাড়িয়ে শহরের পথে হাঁটছে সোমনাথ। ভোরের রাজপথে বাযুসেবীবা তৎপর। কেউ হাঁটছে নিয়ম মাফিক। কেউ অনাবশ্যক দ্রুত। কেউ গড়িযে গড়িয়ে কয়েকজন মিলে গল্প করতে করতেও হাঁটছে। সদ্য ঘুমভাঙা আদুরে মুখের কিশোবী হাঁটছে মায়েব সঙ্গে। আব একটু বাদে সাদা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান নাইট ডিউটিব নার্সদেব নিয়ে শহরেব পথে যাবে। সোমনাথ হঠাৎ দাঁড়িযে পেছন ফিরে সোজা সডকের দিকে তাকালো। না, সাদা গাডি এখনো আসছে না। ক'দিন থেকেই সোমনাথেব শরীব খাবাপ। কাল রাতেই মনে হয়েছিল, আর বুঝি পারবে না। তন্দ্রায়, ক্লান্তিতে, দেয়ালে গা হেলান গিয়ে এক-একটা রাত কিভাবে কেটে যায়, সকালবেলা ভাবতে গিয়েই যেন কেমন লাগে। হাসপাতালের বাবান্দায় থাকার নিয়ম নেই। মাঝখানে খুব কড়াকড়ি হয়েছিল। এখন বলে কয়ে একটু ঠাঁই মেলে। কবে তাও বন্ধ হবে। তখন শুধু বাইরেব গাছতলাই একমাত্র বাতের আশ্রয়।

বিনা কাজে রাত জাগা আরো ক্লান্তিকর। যদিও রাতভর জেগে থাকাই সোমনাথেব কাজ। সবাই যখন ঘুমোয়, সারা রাত জেগে থেকে দৈনিক কাগজের প্রুফ দেখে সোমনাথ। এ-কাগজ সে-কাগজ করে রাতের প্রুফ দেখার চাকরি আজ প্রায় বাইশ বছবের বেশি। নিজেই ভেবে অবাক হয় সোমনাথ। সারা বছরে ক'টা দিনই বা নিজের ঘরে, নিজের মশারি টানিয়ে রাত কাটাতে পারে। এভাবে মাস গেছে, বছব যায়। অভ্যাস হয়ে গিযেছে। দিনেও আড়াই-তিন ঘণ্টা ঘুম যদি হয় যথেষ্ট। তাও চোখে ঘুম এলে। ঘুম কি আর এত সহজে আসে! শুধু তন্দ্রার ঘোর। রান্নাবান্না, ঘর ঘোছানো, আসনের নিত্যপুজো, মালতিব সেবা, একটুখানি নিজের লেখালেখি, ছেলেকে পড়ানো, ঘুডি বানিয়ে দেওয়া, সুতো মেজে দেওয়া, এ সমস্তই সোমনাথের

দিনের বেলার রুটিন। পরিবার বলতে সাত বছরের ছেলে নকুল আর দেড় গণ্ডা মুরগী। ওর বৌ বিয়ের দু'বছর বাদেই মানসিক স্থিরতা হারায়। প্রথম প্রথম ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ, ওষুধ, পুজো, মাদুলি সবই হয়েছে। নরেন্দ্রপুরে মালতীর এক নিকট সম্পর্কের ভাই থাকেন। সেখানে রেখে কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে সোমনাথ। গোড়ার দিকে ওষুধপত্তরে কিছু কাজ হয়েছে বলে মনে হতো। মালতী একটু আধটু রান্নাবাড়া করতে পারত। ছেলেকে খাওয়াতো। সোমনাথের সঙ্গে হেসে বা রাগ দেখিয়ে কথা বলতে পারত। ক্রমশ সব এলোমেলো হতে আরম্ভ করল। চান করানো খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। এ নিয়ে নিত্য ঝামেলা। সোমনাথ কত গালমন্দ করেছে। দু' চার দিন অসহ্য হয়ে চড়চাপাটিও দিয়েছে। পরে নিজের মনেই যন্ত্রণা পেয়েছে সোমনাথ। এ যন্ত্রণা যে কী, যে বোঝে, সেই বোঝে একমাত্র। গত কয়েক বছরে মালতীর অবস্থা ক্রমশ খারাপই হয়েছে দিন দিন। হয় বেঁধে, নাহয় আটকে রাখতে হয় ঘরের ভেতর। ছেলেটাকে মায়ের আদরে বড় করেছে সোমনাথ। যাব মা থেকেও নেই, সে বড় দুর্ভাগা । নকুল আর মায়ের কাছে যেতে চায় না। মালতী ছাড়া পেলেই ওকে মারতে যায়। আবার জড়িয়ে ধরে ছড়া কাটে, বানান শেখায়, কাঁদেও। একদিন ঘুমন্ত ছেলের বুকের ওপর বসে ওর চোখে আঙুল বিঁধিয়ে দিতে যাচ্ছিল মালতী। চিৎকার শুনে সোমনাথ দৌড়ে এসেছিল। রাগের মাথায় মালতীকে মেরেছিল। সেই থেকে মালতী হয় চিলেকোঠায় বন্দী, নাহয় হাত অথবা পা বাঁধা। অশ্রাব্য কথা বলে গাল দেয়, গান করে, কাঁদেও। ছেলে, স্বামী, প্রতিবেশীব নাম নিয়ে মিনতি করে—... 'আমায় ছেড়ে দাও না গো, কিচ্ছু হয় নি গো আমার... আমি চান করব... আর মারব না কাউকে।'

প্রথম প্রথম মায়ের হাহাকারে নকুল কেঁদে ফেলতো—'বাবা, শুধু আজকের দিনটা, একটুখানি ছেড়ে দাও না...'। নিজের বুকের ভেতর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেতো সোমনাথ। নাকের ভেতরটা যন্ত্রণায় টনটন করতো। মালতীকে পুরো মুক্তি দেবার ভরসা পেতো না। ছাড়া পেলেই ও হয়তো ঘবের চালে আগুন দেবে। এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সয়ে গেছে। এবাবে সবই সয়। সবচেয়ে বেশি সইতে পাবে মানুষ। সোমনাথের বুকের ভেতর কেউ আর তেমন শব্দ করে হাঁটে না। হাঁটলেও সোমনাথ টের পায় না। যন্ত্রণা শুকিয়ে গেছে। মালতী মাঝরাতে গলা চড়িয়ে গাল দেয় সবাইকে, কাঁদে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে। নিজে নিজে বিড়বিড় করে দিন যায়। সোমনাথের আত্মীয়স্বজন বলে পাগল চিকিৎসার হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। সোমনাথ খোঁজখবর নেয় নি তাও নয়। নিজে গিয়ে দেখে এসেছে। সে দৃশ্য নারকীয়। মালতীকে এমন নির্বাসনে পাঠাতে মন সায় দেয় নি কিছুতেই। নিজের বাড়ির চিলতে কোঠাই বরং ভালো। তবু চোখের সামনে দেখতে পাবে সোমনাথ। যন্ত্রণা করে করুক। খরচ করে চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই। ওষুধ ডাক্তার সাধ্যমত তো সবই হ'ল। এখন ভাগ্যের হাতে।

মাথা নীচু করে হেঁটে যাচ্ছে সোমনাথ। যেন অনেক দিন ধরে হাঁটছে। অনেক মাস, অনেক বছর। সব সময় হাতে টর্চ। শীতে কাঁধে একটা হালকা কম্বল, গরমে হাতে ছাতা। জীবনেও জুতো পরে না। ঢলঢলে ময়লা পাজামার ওপর একটা বিধ্বস্ত, বোতামহীন শার্ট। এটাই যেন আবহমান পোশাক। শরীর কুঁজো হয়েছে দারিদ্র্যে আর

দুশ্চিন্তায়। ঘাড়ের প্রান্ত থেকে মাথাটা আকস্মিক ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। এমন নিবিষ্ট হয়ে হাঁটা—ওকে না দেখলে কেউ বুঝবে না। পারত পক্ষে মাথা তুলে তাকায় না কোনদিকে। এটা ওর মর্জি। সোমনাথ হাঁটছে—হেঁটে হেঁটে এখন ও মোহিতের বাড়ি চলে যাবে। মোহিতের পত্রিকায় সোমনাথ প্রুফ দেখার কাজ করে। মোহিতের স্ত্রী সুনন্দা এই সকালে সোমনাথকে দেখেই বিরক্ত হবে। মোহিত এখনো ঘুমিয়ে থাকলে সুনন্দা সোমনাথের নাকের ওপর শব্দ করে দরজার পাটটা টেনে দেবে। সোমনাথ ভ্রূক্ষেপও করবে না। বারান্দায় নিঃশব্দ, ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে থাকবে- যতক্ষণ দরজার পাট আবার না খুলছে। দরজা খোলা থাকলে সোমনাথ গলায় কোন শব্দ না করেই ঘরে চলে যাবে। একদিন মশারিব ভেতব মুখ বাড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল দেখে, সুনন্দা ধমকের মতো কবে কথা বলেছিল। সুনন্দার ধাবণা লোকটা আদপ কায়দা জানে না। "বেচাবা আদপ, ফাদপ নিয়ে মাথা ঘামায় না। শুধু শুধু ওকে..." স্ত্রীকে পবে বোঝাতে চেয়েছিল মোহিত। সোমনাথের এত জোবে কথা বলাব অভ্যাস সুনন্দার একেবাবেই অপছন্দ। ওর কোটরাগত, ভাবলেশহীন, ঠাণ্ডা দু'টো চোখের দিকে তাকালে সুনন্দাব নাকি কি রকম লাগে। মোহিত ধমক দিয়েছিল। বলেছিল—"ন্যাকামি।"

কবিতা লিখতো সোমনাথ। যদিও ভাব কথা সেই পুরনো চেহারার। যেমন কবিতার একটা লাইনের শেষে যদি 'দিয়া' বা 'করিযা' কথাটা থাকে, তবে এব পরের লাইনের শেষে 'হিয়া' কিংবা 'বহিয়া' কথাটা সোমনাথ লিখবেই। নির্বাক বিনয় আর গভীর আগ্রহ নিয়ে সোমনাথ মোহিতকে তাব কবিতা পডতে দিযেছে। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটুখানি মন্তব্যেব জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছে। অন্যমনস্ক দু'এক লাইন পড়ে মোহিত বলেছে, "বাঃ বেশ হয়েছে।" সোমনাথ খুশি। যদিও খুশি হবার ভাবটা তার চোহারায় কখনোই প্রকাশ্য নয়। সোমনাথ কখনো নিজের আগ্রহের কথাটা প্রকাশ করতে চায় না। মোহিতেব কাগজে দু'টি-একটি কবিতা ছাপাবার গোপন আগ্রহ সোমনাথের ছিল কিনা কে জানে। মোহিত গোড়া থেকেই এড়িয়ে যাবাব ব্যাপারে সতর্ক। মোহিত বলেছে—"আমাদের তো খবরের কাগজ, কবিতা বা গল্প ছাপাবার সুযোগ বড় হয না। আপনার ফ্লাড নিযে সেই কবিতাটা ছাপাতে পারলে কিন্তু বেশ হতো।" সোমনাথ তেমনি নিঃশব্দ, রুগণ, 'স্ট্যাচু'র মতো ভাবলেশহীন।

সোমনাথের কবিতায় বেশ একটুখানি ছন্দেব শব্দ আছে। আশা, আদর্শ টাদর্শর কথা আছে। মানুষের এত যে কষ্ট, তা থেকে পরিত্রাণ পাবার কমবেশি উপদেশও আছে। সোমনাথ তার নিজের কবিতার একমাত্র পাঠক না হলেও তার পাঠকের সংখ্যা খুব বিরল হওয়াই সম্ভব। পাড়ার দুর্গাপূজার স্যুভেনির ছাড়া তার কবিতা বড় একটা কেউ ছাপাতে চায় না। কারোর কাছে নিজের দুঃখেব কথা বলেও না সোমনাথ। নিজের কবিতার কাছেও না।

মোড়ের মাথায় এসে হঠাৎ দাঁড়াল সোমনাথ। এভাবে থেমে পড়ার ইচ্ছা যেন ছিল না। বড় বাস্তার পাশে বাঁদিকে একটা চায়েব দোকানের সামনে মালিক বালতি থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। ভেতরে বসে আছে একজন লোক। হয়তো কাস্টমার। সোমনাথ দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে এক গ্লাস জল খেল। দোকান থেকে বেরিয়ে

এসে অপিস কোয়ার্টার লেন ধরে এখন পশ্চিম মুখো হাঁটতে থাকলো।

সরকারী বিজ্ঞাপন ভরসা করে মফঃস্বল শহরে ছোট্ট একটা দৈনিক কাগজ করে মোহিত। সোমনাথের কষ্টের কথা সব জেনেশুনেও হপ্তায় পঞ্চাশ টাকার বেশি মাইনে দেবার ক্ষমতা মোহিতের নেই। সোমনাথ অবশ্য কখনোই অভিযোগ করে না। কদাচিৎ বাড়তি টাকা চেয়েছে কিনা সন্দেহ।

বেলা বাড়ছে। হেঁটে হেঁটে শরীরে ঘাম দিচ্ছে সোমনাথের। নদীর বাঁধের কাছে এসে সোমনাথ জামা খুলে ফেলল। জামাটা কাঁধের উপর জমিয়ে রাখলো। বেঁটে গোছের ময়লা ছোট জামার ফাঁক গ'লে সোমনাথের পৈতা ঝুলছে। আরো রুগণ কুঁজো দেখাচ্ছে ওকে। একটু জোরে টান দিলে ওর যে-কোন একটা শীর্ণ হাত যেন শরীব থেকে ছিঁড়ে যাবে মনে হয। মনে হচ্ছে, ওর মাথা ওর ঘাড় থেকে ভয়ংকর নিচে নেমে যাচ্ছে।

মোহিত তেমন একটা কিছু বক্তা টক্তা নয। নেহাত খববেব কাগজ করে —তাই শহরে না হলেও, শহবতলীব এলাকায কদাচিৎ নেমন্তন্ন জুটে যায়। দক্ষিণ শহরতলীর নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালযে শরৎচন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় মোহিত সভাপতি। শরীর খারাপ টাবাপ বলে এড়াতে চেয়েছিল মোহিত। সুনন্দা ফোঁস কবেছে—'দেখছি তো, কেউ তোমায পাত্তা দেয না। ওবা একটু বলেছেন, গিযে দু-চাব কথা বলা এই মাত্র। যেন তুমি জাহাজ-ইস্টিমারে করে যাবে—এত বাযনা।'' বৌকে ঠিক বোঝাতে পারবে না মোহিত, অসুবিধেটা কোথায। কেন ভালো লাগে না। সুনন্দাব এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নিবেদিতা ইস্কুলে কাজ করেন। সুনন্দাব বড়ো ইচ্ছা মোহিত সেখানে সভাপতি হয়। ছুটিব দিন। ভাদ্র মাসের নিষ্করুণ রোদেব বেলা তিনটা থেকে মিটিং। মনে করেই মোহিত আবার বিগড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ট্রাঙ্ক থেকে গিলে কবা ন্যাপথেলিনের গন্ধময পাঞ্জাবি, ধুতি বার কবেছে সুনন্দা। নকল সোনার বোতাম লাগিয়ে দিযেছে। রুমালের কোণায় একটু গন্ধ মাখিয়ে দিযেছে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ কবেছে মোহিত। বেচাবা।

সুনন্দার মনর ভেতব তখন হয়তো আরেক দৃশ্য। মেয়ে-পুরুষ, ছাত্রীবা পথের পাশে দাঁড়িয়ে মালাচন্দনে সভাপতিকে অভ্যর্থনা করছে। একটি সুদর্শনা কিশোরী যেন সভাপতি শ্রীযুক্ত মোহিতোষ বায মহাশযকে মালা পরিযে দিতে এলো। মোহিতবাবু কিন্তু মালাটা গলায় না পরে, হাতে নিলেন। আদর করে মেয়েটির গাল টিপে দিলেন। হাসল, সবাই হাসল। সভাপতি সভা-মণ্ডপেব দিকে যাচ্ছেন।

সভাপতির ভাষণেব নামে কোন রকমে দু'চার কথা বলে একবকম তাড়া খাবার মতন অবস্থায় মোহিত হল ছেড়ে বারান্দায় এলো। সাহিত্যসভা-টভা নয। শরৎচন্দ্রের নামে নাচ-গানেব অনুষ্ঠান। হলঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভ্যাপসা গরম। বক্তৃতা কেউ শুনতে চায় না—জানতে চায়, নাচ কখন শুরু হবে। মোহিত ভাবল, উদ্যোক্তারা কিন্তু বলেছিলেন সাহিত্যসভা। কাছা খুলে পড়ার অবস্থা। স্টেজেব ভেতর কোন জায়গায় কি রকম আলো হবে, ড্রপ পড়বে না, নাচের মেয়েদের সাজগোজ, একজন মাননীয় অতিথি নাচ দেখতে আসবেন, মিসেসও আসছেন তো হ্যাঁ তিনিও তো গাইতে পারেন, তাহ'লে অনুরোধ করা দরকার, কে বলবে, জলের গ্লাস, সন্দেশ

এখনো এলো না কিন্তু—প্রায় সমস্ত দিদিমণি, দাদামণি এ-সব নিয়ে অস্থির। হলের ভেতর নৃত্যকলা পিপাসুদের হৈ হট্টগোল থামানো যাচ্ছে না। বিপন্ন মোহিত বাইরে এসে শ্বাস নিল, পেছনে তাকাল। কী সুন্দব করে সাজানো গেট, ভেতরের সাজসজ্জাও চোখে পড়ার মতো। এমন সুন্দর আয়োজন নিষ্ফল হ'ল—মোহিত ভাবল। পাঞ্জাবি ঘামে ঘাড়েব কাছে লেপ্টে আছে। গিলে করা হাত দু'টোর অবস্থা খুবই করুণ। সুনন্দার কথা মনে করে মোহিতেব কষ্ট হলো।

—'আপনি এখানে?' গেটেব ওপাশে ষ্ট্যাচুব ভঙ্গিতে সোমনাথ দাঁড়িযে।

—'হ্যাঁ স্যাব, আপনাকে বাড়ি নিযে যাবো বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি।' সোমনাথ বলল।

—'কি করে জানলেন এখানে এসেছি?' মোহিত জানতে চায।

—'আগেই জানতাম। তাছাড়া আপনি যখন ভেতবে ঢুকছিলেন, আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আপনি দেখেন নি। সোমনাথ একটুখানি হাসিব ভাব কবল।

—'মিটিংএ গেলেন না?'

—'না, আমার কোন নেমন্তন্ন নেই,' বলল সোমনাথ। প্রসঙ্গ এড়াল মোহিত।

—'কোন দিকে বাড়ি?'

—'এদিকে সামনেই স্যাব। কখনো তো আব যান নি। এদিকে একবাব যখন এলেনই, ভাবলাম'—সোমনাথ এমন পালিশ কবে কথা বলে, মোহিতেব অস্বস্তি লাগে। অনেক বলাব পবও "স্যার" কথাটা আর ছাড়ল না সোমনাথ। হযতো সম্পর্কটাকে স্পষ্ট বাখতে চায। সোমনাথেব আব্দাব উপেক্ষা কবল না মোহিত। মোহিত চাইছিল একটু খোলা হাওযায দাঁড়াতে। ওব মাথা ঝিম ঝিম করছিল।

বিশালগড়েব দিকে জাতীয সড়কের গা বেযে লালমাটিব পথ পূবদিকে মাঠেব ভেতব গড়িযেছে। বিশাল মাঠেব মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়েব মতো টিলা। যদ্দুর চোখ যায়, ঘাস আব টিলাব মাথায় গেরুযা মাটির ছোপ। দক্ষিণ থেকে হু হু কবে হাওয়া। ভাদ্রেব শেষ বেলাব বোদ মৃদু, উজ্জ্বল। সোমনাথ জাতীয সডক ছেড়ে মেঠো পথ ধবল। মোহিত পেছন পেছন হাঁটছে উদ্দেশ্যহীনেব মতো।

—'স্ত্রী'ব খবব নিযেছিলেন?'

—'কাল সাবাবাত হাসপাতালেই ছিলাম। গত বাতেও শ্বাস কষ্ট ছিল।' উদাসীন ভঙ্গীতে বলল সোমনাথ।

কথাগুলি কি বকম মনে হ'ল মোহিতেব। একটা মানুষ নাহয বাঁচবেই না। এভাবে জেনেশুনে মৃত্যুব অপেক্ষাটাও নাহয স্বাভাবিক। কিন্তু সোমনাথেব কথা বলাব ধরনটাই যেন কি রকম। মনে মনে বিবক্ত হল মোহিত। মলতী পাগল, এটাই শেষ নয। লীভাব পচে গিযে সে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর অপেক্ষায। গত ছ'যদিন মালতী সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন বাঁচবে না। যে-কোন মুহূর্তে প্রাণ যাবে। সোমনাথের জীবনটার কথা ভেবে মোহিতেব আবাব মমতা হল।

মাঠের মাঝখানে লালমাটির একটা বাড়িতে সোমনাথ ভাড়া থাকে। সোমনাথেব ঘরটা গরীব। বেশ পুবনো। ছনেব চালের আদ্ধেক আবাব ত্রিপল দিযে ঢাকা। সঙ্গে ছোট্ট একচালা ঘবের ভেতর ভাঙা টেবিলের সামনে মোহিতকে একটা চেয়ার জুটিয়ে দিল সোমনাথ। চারদিকে এত দারিদ্র্য মোহিতের অস্বস্তি লাগছিল। বছর উনিশেব

একটি মেয়ে চা নিয়ে এলো। সঙ্গে দু'টো বিস্কুট। কালো বেঁটে মতো মেয়েটি। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট করে কাটা। বেশ প্রণোচ্ছল। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় কুৎসিত মনে হয় না। মোহিতের সামনে চা বেখে মেয়েটি খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। খুব সরল মনে হল মোহিতের। কিরকম অবাক চোখে দেখছিল মোহিতকে।

—'কি নাম তোমার?' মোহিত জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলেই মুহূর্তে উধাও। লজ্জা পেয়েছে—মোহিত ভাবল। সোমনাথ উঠোনে ছিল। ঘরে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল।

—'তোমার নকুল কোথায়?'

—'ও পিসির বাড়ি গেছে।' সোমনাথ বলল,--'ভাবছি শ্রাদ্ধের আগে ওকে আর আনবো না।' শ্রাদ্ধ মানে মালতীর শ্রাদ্ধের কথা বলছে সোমনাথ। মোহিতের আবাব খুব অস্বস্তি লাগল। আঁচল দাঁতে চিবিয়ে মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। সোমনাথ ইঙ্গিত করতেই মেযেটি উবু হযে পড়ে মোহিতকে একটা প্রণাম করল। ...'না না, থাক থাক' ইত্যাদি বলার আগেই সোমনাথ বলল—

—'স্যার' ওর কথাই বলেছিলাম। ও হল গিয়ে মালতীব দূর সম্পর্কের মামাতো বোন। নকুল ওর কাছেই থাকতে চায় কিনা। ভাবছি মালতীর একটা কিনারা হয়ে গেলে ওকে স্থায়ীভাবে এখানে নিয়ে আসবো।' একটু আমতা আমতা করে সোমনাথ বলল 'দিদিকে সবই বলেছি, উনি জানেন।' দিদি মানে সোমনাথ সুনন্দার কথা বোঝাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠলো মোহিত, সুনন্দা বলেছিল—সোমনাথ ওর বৌ'এর এক বোনকে নাকি বিয়ে করতে চায়। তাহ'লে এই সেই মেয়ে? সোমনাথ আগেভাগে বিযে করলে তো ওব মতো মেয়েই হত। মোহিতের মাথার ভেতর সেই অস্বস্তিটা দপ দপ করতে থাকলো। মনে হলো, ঘামে কুচ কুচ ঘাড়ের ওপর দিয়ে জামার ভেতর পিঁপড়ে হাঁটছে। তেমনি উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ। মোহিত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। মেয়েটির অবাক মুখেব দিকে তাকিয়ে সহজ হল। মোহিত আবার জিজ্ঞেস কবল—'কি নাম তোমার ?' মেয়েটি এক মুহূর্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকে, আবার ফিক কবে হেসে ফেলেই উধাও। 'ওর নাম সুহাসী,' সোমনাথ বলল। সোমনাথের দিকে না তাকিয়েই মোহিত বলল—'খুব লাজুক।'

—'না স্যাব, ও বোবা কথা বলতে পারে না। মা-বাবা নেই। কেবল এক ভাই আছে। খুব গবীব। কে আব নেবে। তাই এখানেই বিয়ে দিতে চায়।' উদাসীন ভঙ্গিতে সোমনাথ বলে যাচ্ছিল। মোহিত আর কোন কথা শুনতে পেলো না। ধাক্কা খাবার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিছু বলতে পারলো না। বাইরে চলে এলো মোহিত। অস্বস্তিটা মাথার ভেতর বাজির মতো জ্বলছিল। 'আজ চলি'— কোনরকমে বলতে পারলো মোহিত।

—'স্যার, একটা জিনিস দেখাবো' হঠাৎ যেন উৎসাহিত হ'ল সোমনাথ। একচালার দরজা খুলে একটা টর্চ নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। 'আসুন স্যার, একটা জিনিস দেখবেন।' কী দেখাবে সোমনাথ? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নামবে এইমাত্র। বিমূঢ়ের মতো মোহিত মাথা নুইয়ে একচালার ভেতব ঢুকলো। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার। মোহিতের মনে হ'ল একচালার ভেতর হাওয়া নেই, কেমন শ্বাসরুদ্ধ। পচা গন্ধ আসছে কিসের। খস খস একটা শব্দ হচ্ছে। অস্পষ্টতায় দাঁড়িয়ে কথা

বলছে সোমনাথ। 'এ ঘরেই মালতীর শেষ ক'টা দিন কেটেছে। হয় বেঁধে রাখতাম, নাহয় আটকে রাখতাম। এখন তো আর...' ভারী মনে হচ্ছিল সোমনাথের কণ্ঠ। মোহিত টের পেলো, সোমনাথ অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মাটির ওপর জানু পেতে বসল। অন্ধকারের মধ্যে খড়, রাশি রাশি শুকনো পাতা সারাবার শব্দ হতে থাকলো। মোহিতের গা ছম ছম করছিল। গোটা বাড়িটা, মাঠটা এই মুহূর্তে বড় বেশি নিঃশব্দ। কী দেখাবে সোমনাথ?

—'দেখুন স্যার'।

হঠাৎ টর্চ জ্বলে উঠলো। মোহিত দেখলো রাশি রাশি খড, শুকনো পাতার ভেতর সারি সারি ডিম সাজানো রয়েছে। মুরগীর ডিম। এক মুহূর্ত উবু হয়ে ডিমের গায়ে কান পেতে কি শুনতে চাইলো সোমনাথ। 'সময় হয়ে গেছে। বাচ্চা গুলো একে একে ডিম ফেটে বেরুবে। সূর্যের আলো লাগতে নেই,—তাই এমন যত্নে রেখেছি। স্যার আমি বললাম, একটাও মরবে না, দেখবেন স্যার, একটাও না।'

মোহিত একচালা থেকে বেরিয়ে এলো। মনে হ'লো অন্ধকারে সারি সারি সাজানো ডিমের চারপাশে শুকনো খড আবার আগের মতো সাজিয়ে রাখছে সোমনাথ।

সুবিমল রায়

অন্যপথ

গত অমাবস্যায় বাজাবেব ব্যবসায়ী সমিতি একটা কালীমূর্ত্তি তৈরী কবিয়ে নিয়েছিল, অথচ আজো দামটা পাওয়া গেল না; আজ এক পূর্ণিমা। ঠিক পনেরো দিন কাটলো নিত্যানন্দ দুবার বাজাবে গিয়েছিল ভরা দুপুবেব বোদে। কিন্তু "ভাগেব মা গঙ্গা পায় না।" সবাই বলে, "এখনো আপনাব টাকা পাননি? এসব বাবোযাবী পুজোব ব্যাপাব, বাকী দিতে গেলেন কেন? টাকা কি আব আছে? দেখুন সেক্রেটাবীব কাছে খোঁজ করে।"

সেক্রেটাবী সোনাব চোবা-কাববাবী। মাসেব মধ্যে পনেবো দিন থাকে পাকিস্তানে। নিত্যানন্দ এবাবও গিয়ে শুনলো পুজোর সেক্রেটাবী পাকিস্তানে। খালিহাতে মেজাজ কবে চলে এলো।

কিন্তু এলেই তো চলে না। এবার কি উপায়, বাডীতে নিয়ে যাবে কি? নিত্যানন্দ ভাবছিলো, একটা পয়সা নেই চাল কেনাব মতো। শ্মশান কালীব মন্দিরেব তবফ থেকে একটা শীতলা প্রতিমাব অর্ডার আছে। বলেছিলো দু'টাকা বায়না দিয়ে যাবে আজ কালে। কিন্তু তাও দিয়ে গেল না, অথচ বেলা বাজে দু'টো । নিত্যানন্দ দোকানের ঝাপ ফেলে ছোট গদিটার উপর বসে বসে ভাবতে থাকে আব মাঝে মাঝে দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে বাইবেব বৌদ্রে তাকিয়ে দেখে ঐ গেরুয়া পবা সন্ন্যাসীব মতো লোকটা আসে কিনা। মধ্যাহ্নেব পথিক ক্লান্ত পায়ে দবজা দিয়ে দেখা যাওয়া ফালি পথটুকু অতিক্রম কবে যায়। ক্রিং ক্রিং কবে ছুটে পালায় দুই একটা বিক্সো, সাইকেল। নিত্যানন্দ শুধু ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে ঐ গেরুয়াধাবীব আশায়। বাইবেব কডা বৌদ্র দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেয়, তবু নিত্যানন্দেব চাইতে হয়—চেয়েই থাকে।

মাত্র দু'টো টাকাব জন্যে নিত্যানন্দকে তীর্থেব কাকেব মতো বসে থাকতে হবে সে কোন দিনই কল্পনা কবতে পারেনি। যেদিন কাজ শিখে নিত্যানন্দ তার মহাজনের কাছে বিদায় চেয়েছিলো, তাব মহাজন আশিসবাণীতে বলেছিলেন 'যা, এবার নিজেব হাতে কাজ কবগে। তোব পেটেব জন্যে কোনদিন ভাবতে হবে না; আমার যতটা সাধ্য দিয়েছি। তোরও নিষ্ঠা ছিল, শিখেছিস দশজনেব মনে ধবাবার মত কাজ। না হলে বিনে বেতনে দশবছর কাজ শেখা কি সহজ কথা? কতো তো এলো তোর চোখের উপর। পাঁচ টাকার লোভে চলে গিয়েছে। আরে, লোভ থাকলে কি শিল্পী হওয়া যায়? আমরা কি কম কষ্ট করে কাজ শিখেছি? তাই আজ দু'টো পয়সার মুখ দেখছি। বাইরে কিছু সুনামও কিনেছি ভগবানের দয়ায়। তা, তোর মধ্যে ছিল, তাই শিখেছিস। এবার অদৃষ্ট নিয়ে দাঁডা নিজেব পায়ে।"

নিত্যানন্দের প্রত্যেকটি কথা মনে আছে। কিছুই ভোলেনি। যদিও বিশ বছর তো পেরিয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক বিশ বছর হ'লো গত ভাদ্রে। চট্টগ্রামে দশ ঢাকায় সাত আর এখানে তিন বছর, একুনে কুড়ি বছর। তবু যেন মনে হয় সেদিনের

কথা।

কাজ নিত্যানন্দ ভালোই জানে। তার প্রতিমা বহুবার প্রথম হয়েছে গুণের বিচারে। আর হবে না কেন? কতো মুখ, কতো অলঙ্কার, কতো নক্সা নিত্যানন্দ গড়েছে অন্তরের নিষ্ঠা মাধুর্য্য দিয়ে। ছোট কাঠির হাতিয়াব দিযে নিটোল করে খোঁদাই করেছে নিত্যানন্দ মনের মতো ছাঁচ। তার জন্যে দিনরাত তাকে ভাবতে হয়েছে। রাতে স্বপ্ন দেখেছে নিত্যানন্দ, দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশভূষা। পত্রিকা দেখে বড়ো বড়ো শিল্পীব গড়া মূর্ত্তিব ছবি সঞ্চয় কবে রেখেছে। পবেব বছব নিজেব হাতে গড়বে বলে।

অথচ মাত্র চৌদ্দ বছবের নিত্যানন্দ ঘর থেকে পথে বেরিযেছিল কাজ শিখবে বলে। কোন উদ্দেশ্যই তার সামনে ছিল না। কতো দিন কেটেছে অনাহাবে কতো রাত্র কেটেছে তার অনিদ্রায। টিকিট চেকার নামিযে দিযেছে লাথি মেবে ট্রেনের কামরা থেকে। সব শেষে যেন স্রোতেব পানাব মতো গিয়ে ঠেকলো কৃষ্ণনগরেব শিল্পীব ঘাটে।

প্রথম প্রথম কাবিগবেব মাটি ছেনে দিত নিত্যানন্দ। পাটের আঁশ মিশিযে আঙুল আর অলঙ্কারেব আঁঠালো মাটি তৈবী কবতো। তাবপব ছোট পোটলা থেকে ছাইযেব অপূর্ব কারুকার্য্য। দিনভর ঐ একই কাজেব পুনবাবৃত্তি। মাঝে মাঝে শিল্পীব কাছে দাঁড়াতো নীববে, দেখতো কেমন কবে দেহেব বিভিন্ন অংশগুলো জ্যান্ত মানুসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো সজীব হযে উঠতো। দেখতো দাঁড়িযে কেমন কবে শাড়ীর ভাঁজ ফুটে উঠছে কাঠিব আঁচড। অপলক দৃষ্টিতে নিত্যানন্দ সব কিছু আযত্তে এনেছে নিজেব মধ্যে। এইভাবে মাটি, জল, আব তুলিতে নিত্যানন্দ দশটি বছর কাটিযেছে।

ফিবে এলো দেশে। দুর্গাপূজার মরশুম। নিত্যানন্দ হাতে পেলো মাত্র তিনটি কাজ। সামান্য টাকা পুঁজি নিযে নামলো কাজে। দিনে রাতে খেটে তৈবী কবলো তিনটি অপূর্ব প্রতিমা। তার মানসমূর্ত্তি যেন। দশমী দিন তাবই গড়া মূর্ত্তি পুবস্কৃত হলো। লোকে ধন্য ধন্য করলো শিল্পীব সৃষ্টিব। পরেব বছব প্রতিমাব সংখ্যা হলো দশ। নিত্যানন্দ এবাব বাখল একজন জোগালী। এবাবও সাফল্যেব জয়টিকা। নিত্যানন্দ টাকার মুখ দেখলো। দুদিন পরে পরেই বাঙালীব ঘবে পুজো আসে। নিত্যানন্দেব স্টুডিওতে ভিড জমে। আসে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সবস্বতী পুজো। নিত্যানন্দেব কাজেব চাপ বাড়ে। দিন রাত স্টুডিওতে খাটতে হয। নির্দ্ধাবিত দিনে দিতে হবে। দাযিত্বের বোঝা ঘাড়ে ভূতেব মতো চেপে বসে আব ঐ ভূতের খাটুনি খাটে নিত্যানন্দ। কাঁচা টাকায় নিত্যানন্দেব থলে ভর্ত্তি হযে উঠে। ঢাকেব তালে তালে তার অন্তরও নাচতে থাকে। উজ্জ্বল হযে উঠে দু'টো চোখ। ছাত্র-ছাত্রী যখন 'সরস্বতী মা কী জয়,' বলে চেঁচিয়ে উঠে, নিত্যানন্দ মুদিত চোখে বলে 'জয় লক্ষ্মী মা কী।'

দু'জন সহকর্মীব সাহায্য নিয়ে নিত্যানন্দ সেবার গডল সত্তবটি সবস্বতী মূর্ত্তি। নানা স্কুল, ক্লাব, কলেজ থেকে বায়না পেল। সবাই বলে "আমাদের প্রতিমা এবার প্রথম করিয়ে দিতেই হবে।" নিত্যানন্দ বিনীত হেসে তাদের আশ্বস্ত কবে, তাব যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

চেষ্টাও করেছিল। বাত একটা দেড়টা বেজে যায় মূর্ত্তির মুখ ঘসতে ঘসতে। টিপ টিপ করে দু'টো আঙ্গুল দিযে নিত্যানন্দ অনন্য মনে কাজ করে চলে। মাঘের

হাড়-কাঁপানো শীতে তার ক্লান্তি নেই। চোখে নিদ্রা নেই। শুধু কাজ আর কাজ। জলের বাল্‌তি আর মাটির স্তূপে হাত দিলে মনে হয় হাত দু'টো অবশ হয়ে আসে। কিন্তু কি ক'রে হাতের শিরা উপশিরা তাজা রাখতে হয় নিত্যানন্দ জানে। পেট্রোমাক্সটায় দু'টো পাম্প দিয়ে আলোটাকে চেতিয়ে দিয়ে গিয়ে বসে ধারে। একটা বিড়ি ধরায়। লম্বা লম্বা টান দিযে মুখভর্ত্তি ধোঁয়া ছাড়ে। আবার কাজের জন্যে তৈরী হয়ে এসে মাটি মাখালো চৌকিটায় চেপে বসে। কাজ এগিয়ে চলে।

বাবা-মার কর্তব্যজ্ঞান আছে। অর্থের আনুকূল্যে সবই আত্মপ্রকাশ করে। শুধু দারিদ্র্যের দুর্বিসহ জ্বালায় ষোল বছরেব সন্তানকে অনির্দ্দিষ্টের পথে ঠেসে দেয়। দীর্ঘ দিন তার সংবাদ না পেযে বিব্রত হয় না। নিত্যানন্দ এবার বহু টাকা নাড়াচাড়া করে, তাই মা তাকে বিয়ে কবিয়ে কর্তব্য সমাধা করতে চান। পুত্রের কাছে ঐ আশা ব্যক্তও করলেন। নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী থাকবে বলে কোনদিনই প্রতিজ্ঞা করেনি, ববং একটা সঙ্গিনীব জন্যে গত দু'বছর যাবতই মন আনচান করছিল। যখন পুজোর মরশুম কেটে যায কাজ থাকে হাতে সামান্য। দু'টো একটা সখের মূর্ত্তি। মন্দিরের জন্যে পাথরের খোঁদাই করা রামকৃষ্ণ অথবা 'প্লাস্টার অফ পেরিসের' চৈতন্যদেব। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে নিত্যানন্দ ওদের সম্পূর্ণ করে। রাতে পান মুখে দিয়ে সিনেমা ঘরে ঢোকে। মনে হয় তখন কেউ যদি থাকতো ধারে কাছে। তারইবা দোষ কোথায়? কাজ শেখাব আগ্রহে যৌবনই তো প্রায বিগত। এতোদিন ছিল অর্থহীন নিরর্থক জীবন। আজ তো সবই আছে। সাধাবণ শিল্পীর জীবনে রক্ত-মাংসেব মানসী প্রাপ্তির লোভ অস্বীকার করা স্বাভাবিক নয় এবং সংগতও নয়, নিত্যানন্দ রাজী হয়ে গেল মার কথায়।

মাত্র দু'মাসেব চেষ্টায় নাম করা শিল্পীর জন্যে পাওয়া গেল সুন্দরী ছবিকে। ছবিব বাবা তাদের সম্প্রদায়ে বড়োলোক। ক্ষেত আছে, খামার আছে। বছরের খোরাকী হয়ে যায়। বাইরের যতটুকু আয় বাইরেবই খরচ। ছবির বিয়েতে তার বাবা তাই খরচ কবেছে ভালো। দান সামগ্রীতে ওর বাবা তথাকথিত ভদ্রলোকের মতো পরিচয় দিয়েছে।

নিত্যানন্দ নিজে বিয়ে করেছে ভালো, তা বলে ভোগ করবার বেলায় সবই যেন ভাগ করে দিয়েছে ভাই বোনের প্রয়োজনে। চেয়ার, টেবিল, আলনা সবই এখন কাজে আসছে ওর পড়ুয়া ভাইদেব। এমনকি সাইকেল, ঘড়িব মালিক যেন তার ভাইয়েরাও। ছবি এ সম্বন্ধে দু'দিন কথা কইতে চেয়েছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের ভ্রাতৃপ্রীতির গভীর প্রাচীরকে ভেদ করবার সাহস পায়নি।

নিত্যানন্দ হাড় ভাঙা খাটুনিতে নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাব ভাই বোনের জন্য। আব ছবি তার বাবার দেওয়া টেবিল চেয়ারের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে না? তাছাড়া অভাব তো নেই। না চাইতেই নিত্যানন্দ ছবির উপহার এনে দেয়। যা সামান্য খরচ হতো তার মধ্যে নিত্যানন্দ মনের আনন্দে বেশী করে। ছবির মুখ কোথায় কিছু বলার?

ভাইয়েরা পাশ করলো। বংশের মধ্যে চৌদ্দপুরুষে যা হযনি তাই হলো নিত্যানন্দের নিঃস্বার্থ সেবায় আর আন্তরিকতায়। নিত্যানন্দের আনন্দ আর ধরে না। গর্ব করে সবার কাছে। বলে তার ভাইয়েরা কলেজে পড়ে। শ্রোতার চেয়ে নিত্যানন্দের

আনন্দটা বেশী। বিষয়টা বিরাট। *সে নিজের চেষ্টায় তাদের মানুষ করে তুলছে,* মূর্ত্তি গড়ার শিল্পী সে, মানুষ গড়ার শিল্পীও তো হলো নিত্যানন্দ।

পাড়ার স্কুলে পড়া সপ্তম শ্রেণীর শিশুকে ডেকে নিয়ে আসে নিত্যানন্দ। বিড়ির ধোঁয়া তৃপ্তির সাথে ছেড়ে ছেড়ে মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্তে পত্র লেখায় ভাইদেব কাছে। ব্যক্ত করে তার স্বপ্ন। মাসে মাসে পোষ্ট অফিস থেকে তুলে টাকা পাঠায়। ছবি জানতেও পারেনা কোন মাসে কত টাকা পাঠিয়েছে। ভাইরা লেখে বেশী টাকার জন্য। নিত্যানন্দ তাই পাঠায়। ভাবে কলেজে পডতে গেলে বুঝি ওর প্রয়োজন আছে। ছবিকে বলে, কলেজে পড়া বা পড়ানো কি সহজ কথা, টাকা পযসা বেশী লাগবেই। পোষাক পরিচ্ছদতো বই খাতাবই মতো অতি প্রয়োজনীয়। দশজনের সাথে চলতে ফিরতে হয়। সেকি স্টুডিওর মাটি মাখানো বেঞ্চির উপব চেপে বসে মূর্ত্তিতে তুলির কাজ করা?

যে মাসে নিত্যানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লো, ভাইদেব কাছ থেকে টাকার দাবী এলো সবচেয়ে বেশী। নিত্যানন্দ শয্যাশাযী, তাই এবাব ছবির উপব সে ভাব। কিন্তু সে সবটা চাওযাই পূরণ কবতে অস্বীকৃত হলো। লিখে দিল—তাদের দাদার শরীর ভালো নেই। তার জন্যেই টাকার প্রয়োজন। ভালো চিকিৎসা করাতে হবে।

ভাইরা পরবর্ত্তী সময়ে ভীষণ রেগে আবার চিঠি লিখলো—টাকা না পাঠালে তাদের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পবীক্ষার জন্য মোটা টাকার প্রযোজন। তাছাড়া মাইনেও বাকী পডেছে অনেক মাসের। অসুবিধে থাকায আগে তা জমা দেওয়া হয়নি। যেভাবেই হোক টাকা পাঠাতেই হবে।

নিত্যানন্দ তখন অচেতন। ছবি দেখলো, পোষ্ট অফিসে মাত্র এক হাজার টাকা। এই সামান্য টাকা থেকে পাঠাতে কিছুতেই সাহসী হ'লো না। এবাবও অক্ষমতা জানিয়ে পত্র দিলো। ভাইরা এরপর কিভাবে পবীক্ষা দিয়েছে সে খবব ছবি বা নিত্যানন্দ জানে না। কোন চিঠিই এ পর্য্যন্ত আসেনি তাদের কাছ থেকে।

ছবির প্রবল চেষ্টায় এবং নিবলস সেবায়, নিত্যানন্দের জ্ঞান হলো। বিধাতা বুঝি বাম। তার দক্ষিণাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অবশ হয়ে গেল। এমন কি জিহ্বার ডান দিক পর্যন্ত অবশ। ছবি তার দুর্ভাগ্যের জন্য কেঁদে উঠলো। নিত্যানন্দ নিঃশব্দে চোখের জল ফেললো। জল পড়তে পডতে স্থিব অপলক দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। ছবিব মনটা হয়ে উঠল অস্পষ্ট।

নিত্যানন্দ নডতে পারেনা নিজের ইচ্ছায। বসিযে দিলে বালিসেব চাপ দিযে একভাবে বসে থাকে। মাটির পুতুলের মত স্থির অচঞ্চল। কথা কইতে পারে না। যতটুকু উচ্চারণ করে, বোঝা যায় না কিছুই। মনে হয়, মুখের অভিব্যক্তি, পশুব দুর্বোধ্য ভাষা।

নিত্যানন্দের ষ্টুডিওর সামনে এবার ছাত্রছাত্রী যুবকের ভীড় জমেনি। তার প্রাঙ্গনের আকাশ বাতাস ঢাকের গম্ভীর শব্দে মুখর হয়ে উঠেনি। উচ্চাবিত হয়নি গগনভেদী উল্লাস 'সরস্বতী মা কী জয'। নিত্যানন্দের কানের পর্দ্দা বুঝি অকেজো হযনি। কানে আসে বহুদূর ঢাকের বাজনা। সে চোখ দুটো বোজে, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপে তারপর গোঁ গোঁ করে শরীর কাঁপিয়ে কেঁদে উঠে। সে এক অবিশ্রাম কম্পন। ছবি মাঝে মাঝে এসে দেখে, নিত্যানন্দের চোখ থেকে জল ঝরছে গাল বেয়ে। শরীর কাঁপছে,

মুখে লালা উঠছে। কাছে এসে বসে ছবি, সুকন্যা, পুত্রদ্বয় বিবেক আর বিপুল। পুত্র-কন্যা দেহে হাত বুলোয় পিতার। বলে 'বাবা তুমি ভাল হয়ে উঠবে কেঁদো না।' নিত্যানন্দ দক্ষিণ হাতটি বাড়িয়ে ছেলেদের বুকের কাছটিতে টানতে চায়, কিন্তু অশক্ত হাতটিকে প্রবল চেষ্টায় নাড়াতে পারে না। শুধু কাঁপতে থাকে অবিরত।

যেবার পাকিস্তানে দাঙ্গা হয়েছিল ছবি নিত্যানন্দকে নিয়ে পালিয়ে এলো হিন্দুস্থানে—সাহায্য পেলো নিত্যানন্দের সহকর্মী যুবক মাধবেব। ছেলেটি কর্ত্তব্যপরায়ন আর হৃদয়বান। নিত্যানন্দের কাছেই কাজ শিখছিলো। যে কাজ শিখেছে অনায়াসে নিজে দোকান খুলতে পারে, কিন্তু নিত্যানন্দের এই মহাবিপদের সময় চলে যেতে তার কেমন লাগে। সে বলে, "বিপদে মানুষ মানুষকে সাহায্য করে। বিশেষতঃ তিনি আমাব গুরু। যার নুন খেয়েছি, তাব জন্যে অন্ততঃ কর্তব্যটুকু না করলে ভগবানেব কাছে অপবাধী হবো।"

মাধব করেছেও যথেষ্ট। যে প্রাণগুলো অনাহারে প্রায় শুকিয়ে মবতো মাধবেবই চেষ্টায আজো ওরা পৃথিবীব নিঃশ্বাস নিচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় তার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকব। শুধুমাত্র যাপনের নিষ্ঠুর সত্যেব তপস্যা মাধব করেছে দিনের পর দিন। নিজে যতটুকু কাজ করে, ঢেলে দেয় পবিবারে, নিঃশেষিত নিজের অঙ্গ তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তার, অবশ্য এ জীবনে টাকার প্রয়োজন শুধু তাব আত্মপ্রয়োজনে তাই তাব চাল সে এমন এক সুবে বেঁধেছে যেখানে ছবি আর নিত্যানন্দের প্রয়োজনে একিভূত হযে গিযেছে।

নিত্যানন্দে স্থূল দুর্ব্বল দেহটাকে নিযে ছবি এসে উঠলো এক অখ্যাত জীর্ণ কুটিরে। নিত্যানন্দর জীবন্মৃত। তাই অবস্থাব ঘোব তারতম্যেব কাষাঘাতটা যেন লাগলো ছবিব বুকে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই আগুন সে চেপে রাখলো সমস্ত জীবনী শক্তি দিযে।

মাধব উদ্যোগী ছেলে। এখানে এসেই একটা কাজ জুটিযে নিলো। তাবপর আরো কিছুদিন পব খুললো এটা ছোট দোকান। দুর্গাপুজোব মরশুম তো এগিযে এলো। পুঁজি নেই, তবু ছবিব কিছু সোনাব গহনা বন্ধক দিয়ে কাজে নামলো। ছবি নিজেও বসে বইল না। ধানেব ভূষি মিশিয়ে লাফিযে লাফিযে মাডিযে মাটি তৈরী কবে। নিত্যানন্দের বসবাব স্থান থেকে ছবির অমানুষিক খাটুনিব অভিব্যক্তি চোখে পডে। তাব ক্লান্ত নিবাভবণ এবং নিরাবরণ দেহ। চোখেব অনভ্যস্ত শ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। নিত্যানন্দেব ভীরু দৃষ্টি থেকে জল গড়িয়ে পডে। দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। কুকুরের মতো কুঁ্য কুঁ্য শব্দ হতে থাকে লালা-নিঃসৃত মুখাবয়ব থেকে। এই তার প্রাণের ছবি। চিরদিন যাকে দাবিদ্র্যেব দুষ্টপোকা থেকে বাঁচিয়ে সোহাগের ফ্রেমে আঁটা ছবি করে রেখেছিল। আজ সে শুধু প্রাণধাবণের গ্লানিতে মাথাব ঘাম পাযে ফেলছে। আর নিত্যানন্দ তার সমস্ত পৌরুষের বন্ধ সামুদ্রিক শক্তি নিয়ে নিশ্চল গর্জ্জন করছে। তার কিছু করবাব নেই। বিধাতা তার শক্তিকে বদ্ধ কমুণ্ডলুতে স্থির কবে বেখেছেন। নিত্যানন্দ ভাবে এরচেয়ে মৃত্যু ভালো। আব তো সহ্য করা যায় না।

বিধাতা পুরুষের মহাশক্তির সবটাই আর অবরুদ্ধ করে রাখলেন না। মাধব আর নিত্যানন্দের পুরাতন বন্ধুর প্রচেষ্টায় নিত্যানন্দ অনেকটা ভালো হয়ে উঠলো।

হাটতে পারে, চলতে পারে, কিন্তু শরীর কাঁপে অসামঞ্জস্য ভাবে। সূক্ষ্ম কাজে হাত দিতে পারে না। দক্ষতা অনেক অবলুপ্ত—সীমায়িত। এবার যা মূর্ত্তি গড়ে, পথের পাশে অজস্র শিল্পী তা নির্মাণ করতে পারে। শিশু পর্য্যন্ত সমালোচনা করে যায় নিত্যানন্দের সৃষ্টির। নিত্যানন্দ নূতন করে আবার বিষন্নতায় ডুবল। দিন রাত কেঁদে কেঁদে বলে, "ভগবান, যদি শক্তি দিয়েছিলে কেন এই ভরা সংসারে কেড়ে নিলে। আমি তো আজ একা নই। ছবি, সুকন্যা, বিবেক, ওরা যে তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করে এসেছে। ভগবান, আমায় কাজ কববার অধিকার দাও।"

নিত্যানন্দের জীবনের দুঃসহনীযতার আব এক ধাপ এগোলো যেদিন ছবি মুখ খুললো। ক্রমাগত দারিদ্র্যেব অভিশাপ মাথায় নিয়ে চিরদিন কোন অশিক্ষিত নারী স্থির থাকতে পাবে না। জীবনের যা কিছু বিপর্যয, তার জন্যে যে নিত্যানন্দ দাযী, যেদিন ও কথাটা বুঝতে পারলো, সে সমস্ত সহানুভূতি ত্যাগ করলো, নিত্যানন্দ ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করতে ভয় পায। কে জানে আবো কি লিখা বয়েছে ওতে। ভাগ্য যে অন্ধকার থেকে ধেয়ে এসে জীবনের ওপর আক্রমণ করে। ঠিক মেঘের আড়াল থেকে বুকে শক্তিশেল মাবাব মতো। তাব ওপব কি চোখ বাঙানো চলে?

কিন্তু ছবি আজকাল মুখর। বলে অপরিণামদর্শী। "মনে আছে যেদিন বলেছিলুম ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় কবো আমার মনতো ছিল ছোট। আব আজ? ভাইবা জিজ্ঞেস করে না? মবতে যখন বসেছিলে একটা চিঠি দিয়েও তো খোঁজ খবব নিলোনা। আমাব জন্যে তুমি কি বেখেছ? একে একে সব কিছু খুইয়েছি। আজ পরনে একটা পরনে একটা কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, মেযেটা ঘর থেকে বের হতে পারে না, ছেলে দু'টোর জীবন নষ্ট হলো, কি দরকার ছিল? যারা নিজেব স্বার্থ বুঝে চলে না তাদের কপালে এমনই দুঃখই থাকে। নাও, এবাব মরো। আমি আর পাবি না। বহু সহ্য কবেছি, জীবন শেষ করেছি তোমার জন্যে। আব পারবো না।"

নিত্যানন্দ ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'বলতে পাবো তুমি, সবই আমার অদৃষ্ট। এ জীবনে বহু রোজগাব করেছিলুম। ভেবেছিলুম পৃথিবীতে বুঝি কর্তব্যই বড়ো। ভাইগুলোকেও ঐ কথাটাই শিখিয়েছিলুম। কিন্তু ওব তো ওদের কর্তব্য করলো না। কি কববো বলো? ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে ছবি, না হয আমাবও এমন হবে কেন?

'কথায় চিড়ে ভেজে না। যা কিছু ঘটেছে সব কিছুর মূলেই তুমি। যখন বলতুম এভাবে হাড়ভাঙা খাটুনী খেটোনা জলে কাঁদায়, কৈ তখনতো শোনোনি? ভেবেছিলে আমি তোমাব শত্রু। ভাই, ভাই করে তুমি নিজেকে পাগল ক'বে তুলেছ। তোমাব স্ত্রী পুত্রের দিকে কোনদিন তাকিয়েছ? জলের মত টাকা খবচ কবেছ। যদি কোনদিন বলতে গিযেছি আমাকে যা তা বলেছ। তখন তোমাব শক্তি ছিল, তুমি কর্মক্ষম, তাই সহ্য কবেছি। কিন্তু আজ আমাব মুখ বন্ধ করতে পারবে না। একটা ন্যাকড়া পরে থাকি, বাইরেব টিউবওয়েল থেকে এক কলসী জল আনতে যেতে পারিনা। এভাবে কোন বৌ থাকতে পারে? তবু তো তুমি আজো মরোনি। মনকে বোঝাতুম আমি বিধবা। কেন এতো দুঃখ ভোগ করবো? ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন না। তোমার জন্য করিনি এমন কোন কাজ নেই। মাটি মাথায করে বয়ে এনেছি। মান ইজ্জৎ সব খুইয়েছি, আরো?'

নিত্যানন্দ মাথাটা নিচু ক'রে শোনে। স্ত্রীর অভিযোগ মিথ্যে নয়, কিছুই মিথ্যে নয়, শুধু মিথ্যে নিত্যানন্দের জীবনের ক্ষণিকের ঔজ্জ্বল্য দু'টো দিনের আবু হোসেনের রাজা হবার ঘটনা। বসে বসে ভাবে কেন দু'দিনের দীপ্তি ভগবান তাকে দিয়েছিলেন, ছবি, সুকন্যা, বিবেক বিপুল ওরা তো সেই সুদিনেরই ফসল। আবার কানে আসে —'যেমন করে পারো খাওয়াতে পারবে। না হয় আমি নিজেই সব পারি। দেখেছি অনেক মাস আমার রথে এখনো ঘুণে ধরেনি। কিন্তু সে রথ এখন খাটাবো কেন? তুমি ম'লে।'

নিত্যানন্দের মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, 'তুমি ম'লে।' মনে হয় পরিবারটা বাঁচতে পারে সে নিজে মরলে পরে, কিন্তু সে ক্ষণিকের চিন্তা। নিত্যানন্দ সজোরে দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনার টুটি চেপে ধরে। সমস্ত শরীরটা আবার কেঁপে ওঠে। চোখ দু'টো লাল হয়ে যায়। মুখটা রুক্ষ হয়ে কুৎসিত হয়।

কেঁপে কেঁপে, ধীবে ধীরে চলে এসেছে দোকানে। একটা মূর্ত্তিতে মাটি দেবার চেষ্টা করেছে সারা সকাল। কিন্তু কাজে মন বসেনি। একটা হাত সরু হয়ে যায় অন্যটি মোটা। অস্থানে, আঁচড় পড়ে' মসৃণ চিক্কন হাতিয়ারটিব। মাথায খালি ঘুরে 'একটা চাউল নেই। কেঁদে মরে গেলেও বিপুলের মুখে কিছু দিতে পাববো না।'

কেঁদে হয়তো মরবে না ছোট ছেলে বিপুল। কিন্তু হয়তো কাঁদছে ক্ষুধায়। বেলা তো পড়ে এলো। তিনটে বাজে। সবাই দোকানের দরজায় তালাতে চাবি লাগাচ্ছে। এখন বৈকালিক বেচাকেনায় বসবে, নিত্যানন্দেব এখনো বাড়ি যাওয়া হয়নি।

বিপুল কাঁদাকাটি করলে ছবি আজকাল আর সান্ত্বনা দেয় না। কোলের উপর টেনে নিয়ে প্রবোধ দেয় না। কানেব কাছে ঘ্যান ঘ্যান করলে উঠে গালে দুই থাপ্পর মারে। তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত শিশুর করুণ কান্না যেন দারিদ্র্যের বিশ্বগ্রাসী হাহাকার গঞ্জনা হয়ে জীর্ণ কুটীরকে অভিশপ্ত ক'রে তোলে। নিত্যানন্দ বহুদিন শুনেছে, বহুরাত দেখেছে।

মাধব এলো। নিত্যানন্দের হাতে দু'টো টাকা দিয়ে বললে 'আর দেরী কবো না দাদা। যা হয় ওতেই বাজার করে বাড়ী যাও। বেলাটাতো গেছে। ওবা বোধহয় কান্নাকাটি করবে তোমার তো ভাবনা চিন্তায় যা অবস্থা হয়েছে, একেবারে তাকানো যায় না। যাওয়ার সময় পারলে মুখটা পরিষ্কার করে যেয়ো। দাড়ি বড়ো হলে যেন আরো রোগা মনে হয।'

মাধব ঠেলে পাঠিয়ে দিলে নিত্যানন্দকে। ক্লান্ত দেহে ভর ক'রে নিত্যানন্দ দাঁড়ায়। গামছাটা আর তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে পথে নেমে পড়ে। ঘরে পৌঁছে দেখে বিপুল ঘুমোচ্ছে। সুকন্যা তৈলাভাবে লাল চুলগুলোকে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে জানলার ধারে বসে সূঁচ দিয়ে কি যেন সেলাই করছে। তার শতছিন্ন শাড়ীটি? ছবি রান্না ঘরে কালি মাখানো মেটে হাড়িতে জল দিয়ে উনোনের ধারে বসে মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে। সমস্ত ঘরখানিতে নিস্তব্ধতা, অপরাধীর মতো নিত্যানন্দ গামছায় বাঁধা চাউলগুলো নামিয়ে রাখলো ছবির পাশে। একটু দাঁড়ালো কিন্তু ছবি মাথা তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। নিত্যানন্দ কি আকাশ পাতাল ভাবলো কে জানে, ঘুমিয়ে পড়লো খানিক পরে।

সুকন্যার ডাকে ঘুম ভাঙ্গে নিত্যানন্দের 'বাবা চান সেরে খেতে এসো।'— 'হ্যাঁ যাচ্ছি।' নিত্যানন্দ উঠে বসে। চোখে ক্ষুধা তৃষ্ণা আব দুর্ভাবনার ক্লান্তি জড়ানো। বিপুলকে ডেকে তুললো ঘুম থেকে। কোলে ক'রে নিয়ে বসলো পিঁড়িতে। এ অবেলায় আর চান করতে ইচ্ছে হলো না।

নিত্যানন্দের আহার সমাপ্ত হয়েছে। বিবেক বুঝি আরো দু'টো ভাত চাইছিল। ছবি শোনেনা শোনেনা কবে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। নিত্যানন্দ বললে, 'বিবেককে আর দু'টো ভাত দাও না ছবি।'

কথাটা শেষ হলো না। নিত্যানন্দ দেখল ছবি কালিমাখা ভাতেব হাড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। ভাঙা হাড়িব টুকবো বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িযে পডলো সমস্ত ঘরে। সামান্য কটা ভাত বিক্ষিপ্ত হ'লো। লজ্জায় নিত্যানন্দের মুখ থেকে শুধু অস্ফুট আওয়াজ বেবোল, 'ভাত আর ছিল না আমি বুঝতে পারিনি ছবি।' ছবি কাপড়ে মুখ গুঁজে কেঁদে কেঁদে ফুলে ফুলে উঠছিলো।

নিত্যানন্দ আসাব সময় শুনলো সুকন্যা ভিজে গলায় বলছে 'মা তুমি কাল রাতেও কিছু খাওনি।'

নিত্যানন্দ আর সহ্য করতে পারছিল না। বিতাড়িত কুকুবেব মতো লুকিয়ে বেরিয়ে এলো পথে। সন্ধ্যায় নিত্যানন্দ ফিরে এলো না। বাত হলো, মাধব দিশেহাবা হয়ে পথে পথে খুঁজলো নিত্যানন্দকে। ভয ছিল বিবশ দেহ নিযে কোথায বুঝি পথে পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে পথে সবাই চলে নিত্যানন্দ তো ঐ পথে যাযনি। পরদিন ভোরে পাওযা গিয়েছে গাছেব ডালে। সমস্ত দাবিদ্রেব দিকে যেন মুখ বিকৃত অবহেলা ভরে বীভৎসভাবে চেযে বয়েছে নিত্যানন্দ। দশ বছব ধবে যে কিশোব ধৈর্য্য ভবে জীবনকে সাফল্যে বসাবার কল্পনায় বিনা বেতনে পৌরুষকে জাগ্রত রেখেছিল, আজ সব কিছু জলাঞ্জলি দিলো স্ত্রীব উপোসের গ্লানিতে।

নিত্যানন্দ লেখাপডা জানে না তাই তাঁব শেষেব কথাগুলো অবান্তর হয়ে গিয়েছে।

কিশোর রঞ্জন দে

জ্যোৎস্নায় পাগলী ছেলে ও ময়ূর

আমি নিজের চোখে একদিন রাতে, জ্যোৎস্নায় যখন ত্রিপুরার এক মহকুমা শহর ধুয়ে যাচ্ছে, ময়ূরকে শুধু গেঞ্জি গায়ে হনহন করে একটা আধপাগলা ছেলের পেছনে নদীর দিকে ছুটে যেতে দেখেছি।

একটু আগে ভাত খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে রাত দশটায় বাংলা খবর শুনলো ময়ূর। তারপর হাত ধুতে বাইরে এসে দেখলো শরৎ মোচড় খাচ্ছে বাতাসে। শরৎ ঋতুকে ত্রিপুরার এই মহকুমা শহরে ঠিকঠাক চেনাই যায় না আর। দিনের রোদে কড়া ঝাঁজ। বর্ষা শরৎ হেমন্ত সব একাকার। তবে সন্ধ্যার পরে, বাহ্! বেশ শরৎ শরৎ বোধ আসে। বিকেলে একপশলা বৃষ্টি নোটিফায়েড এরিয়াটাকে ঠাণ্ডা করে গেল। আজ আগস্টের ত্রিশ তারিখ। ভাদ্রের মাঝামাঝি। শরতের বয়স তাহলে পনের দিন হলো।

দু একদিনের মধ্যে বোধহয় পূর্ণিমা। বড় তীক্ষ্ণ জ্যোৎস্না শুয়ে আছে ময়ূরদের উঠোনের ওপর। কলাপাতা নড়ছে রান্নাঘরের পেছনে। প্রত্যেকটা পাতার ছেঁড়া অংশগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এতো জ্যোৎস্না। বাঁদিকে নতুন লাগানো ছোট নারকেল গাছটার পাতা এতো মসৃণ যে জ্যোৎস্না পিছলে পিছলে পড়ছে। আকাশে কিছু মেঘ ভেসে গেলে ময়ূর অনেকদিন আগের ছেলেবেলার মতো ভুল করে দেখলো চাঁদটাই সাঁতার কেটে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে।

কেউ ডাকছিল ময়ূরকে। টের পাচ্ছিল না সে। দিদি বেরিয়ে এলো উঠানে।

—'এই ময়ূর! দেখতো কে ডাকছে তোকে। ছুটকু বোধহয়। শুনছিস না?'

—'কি রে ছুটকু?'

ছুটকুর পাগলামি কি আবার বেড়ে গেল? পূর্ণিমায় পাগলামি বাড়ে। গেট খুলে হাফপ্যান্ট পরা ছুটকুকে দেখলো ময়ূর। তার হাতে একটা সাইকেলের চাকার রিঙ আর কাঠি। কাঠি দিয়ে রিঙটাকে ঠেলে গাড়ী চালিয়ে এসেছে। এখনো হাঁফাচ্ছে।

—'ময়ূরদা! ময়ূরদা! মা এখনো বাড়ি ফিরেনি। সেই সকালে বেরিয়েছে। কিছু রাঁধে নি।'

—'তোর বাবা ফিরেছে?'

—'বাবা বলেছে খুঁজতে পারবো না। সেই ডাইনীকে ভূতে খাক। তুমি চলো না ময়ূরদা।'

—'এই ময়ূর যাবি না বলছি। তোর পড়াশুনা নেই। তুই না অনার্স নিয়েছিস? পড়াশুনার তো নামও করিস না। ও মা দেখো তো ময়ূর—'

—'যা যা। তুই নিজে অনার্স রাখতে পেরেছিলি? ওস্তাদি মারতে হবে না। পাড়ার লোক বিপদে পড়েছে।'

—বিপদ না হাতি। একটা অসতীকে—'

ময়ূর আর দাঁড়াতে চাইলো না। পায়জামা গেঞ্জির উপরে সার্টটা চাপাতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু মা জানার আগেই তাকে বেরুতে হলো। মা গিরিকাকীমাকে একদম দেখতে পারেন না। গিরিকাকীমাকে কেউই দেখতে পারে না।

এই দশ বছরের জীবনেই ছুটকু একবার পাগলাগাবদ ঘুরে এসেছে। হাসপাতালেব ডাক্তার বলেছেন তাড়াতাড়ি চিকিৎসাটা করালে ভাল হয়। ছোট বাচ্চা। ছুটকুর বাবা ছেলেকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে পাঠাতে রাজী হন নি। ছুটুক তখন সাবা পাডাব বিবক্তির কাবণ হযে উঠেছিল। ময়ূবদেব বাডিতে এসে উঠোনের তারে মেলে দেযা মা দিদির শাডীতে থুথু ফেলতো। দা নিযে বাচ্চাদের তেড়ে যেত। বাতে ঘুমাতো না। আবোল তাবোল কথা বলতো। একবাব রাতে উঠে শিবানীদিদের ছনের ঘবে আগুন প্রায লাগিযে দিচ্ছিল। আবেকবাব তাব নিজেব কুকুর তাডিয়ে একটা জার্সি গরুকে কামড়িযে দিয়েছিল। ছুটকুব মতো তাব কুকুব পাগল ছিল না তবু গরুব মালিক চৌদ্দটা ইঞ্জেকশন নেওযালেন গরুকে। দু একবার এবাড়ি ওবাডি খুব মার খেলো ছুটকু।

তারপর একদিন বাডি থেকে পালিযে গেল। কি কবে যেন গৌহাটী চলে গেছিল। পালিযে যাবার পবেব সময়টাব কথা ঠিকঠাক জানা যায নি। মোটমাট পুলিশ তাকে ধবে তেজপুর পাগলাগাবদে পাঠিযে দিয়েছিল। ন'মাসের মাথায ফিবে এসে নানাজনেব কাছে যে গল্প কবলো তার সারাংশ মোটামুটি এবকম—সেখানে অনেক বড় পাগল ছিল। বাচ্চাপাগল জনাকয়েক। একটা চেযারে বসিযে, বেঁধে, তাব লাগিয়ে দিত মাথায়। খুব বমি হতো। সব্জি ক্ষেতে কাজ করতো। অনেক আলু তুলো। ছেড়ে দেবাব সময তেইশ টাকা হাতে পেল।

—'নিজের টাকায বাড়ি চলে এলাম।'

ফিরে এসে ছুটকু প্রায স্বাভাবিক। স্কুলেও যায় ইচ্ছে হলে। তবে তার চার পাঁচ বয়সের দুষ্টুমি আব ছেলেমানুষিগুলো এখনো বযে গেছে। এখন সে মযূবদাব আগে আগে সিবিযাস মুখ কবে কাঠি দিযে বিঙটা চালাচ্ছে। মাকে খুঁজতে যাচ্ছে। মাকে প্রায়ই খুঁজে পায না ছুটকু। খিদে পেলেই মাকে খোঁজে। তার বাবা খুব নির্লিপ্ত। ময়ূব জানে ছুটকু তার মাব বন্ধুদের কাকা ডাকে। সেই কাকাবা কোন দূব দূর জায়গা থেকে আসে। তাবা বৌদিকেই চিনে। দাদাকে চিনে না। বাবাও তার এইসব ভাইদের জীবনে দেখেনি।

বাঁদিকেব শর্মাদেব সুপুরী বাগানটা জ্যোৎস্নায বড বহস্যময লাগছে। গিবিকাকীমা কাঁচাসুপুরী খুব পচ্ছন্দ কবে বলে ছুটকু তিন কানি আযতনের বাগানটায প্রায়ই হাবিয়ে যায। মায়ের জন্য একেবাবে সবুজ সুপুরী পকেট ভর্তি কবে নিযে যায। হঠাৎ গাড়ী চালানো থামিয়ে সে বাগানেব দিকে পেচ্ছাপ করতে শুরু করলো।

—'পেচ্ছাপ করে দাও ময়ূরদা। গাছেদের দিকে মুখ কবে পেচ্ছাপ কবলে ভূতে ধরে না। বাবা বলেছে।'

হেসে উঠলো ময়ূর। 'তাড়াতাডি আয তো' বলে হাঁটতে শুরু করল। ইট বাঁধানো বাস্তাটা এখানে শেষ হযে নীচেব দিকে নেমে গেছে। পাযে হাঁটা পথ গেছে নদীব দিকে।

এতো রাতে গিরিকাকীমা কোথায় থাকতে পারে মোটামুটি একটা ধারণা ময়ূরের আছে। সামনে এখন আর মানুষের বাড়িঘর নেই। এই রাতে মানুষও নেই। ইস্ কি পরিস্কার স্বচ্ছ জ্যোৎস্না! এই বরই গাছের ঝোপটার নীচে জমিতে জুলফু মিঞাদের লাঙল দুবার পড়ে গেছে। শিশিরঝরা সকালে শীতের ফসল প্রদর্শনীর মতো শুয়ে থাকে জুলফু মিঞার ক্ষেতে। এখন এখানে লাঙল ওপড়ানো মাটির ঢেলা শুধু। এদিকটা পুরোদস্তুর গ্রাম।

সুধীরকাকা পাড়ার মানুষ মাত্র। খুব সম্পর্ক ছিল ময়ূরদেব সঙ্গে। ছুটকুর পাগলামিটা বংশগত। কিন্তু সুধীরকাকা না গিবিকাকীমা কার কাছ থেকে রোগটা পেয়েছে ছুটকু? সুধীরকাকা বোকা ধরণের মানুষ।' কেমন যেন চেতচৈতন্যহীন। লম্বা রোগা চেহারা। বোকামিটা ময়ূবের পাগলামির ছদ্মবেশ বলে মনে হয়। কম্পাউণ্ডারের কাজ করে মিহিব-ডাক্তারের সঙ্গে। সংসাব সম্পর্কে অত্যন্ত নির্লিপ্ত হলেও বাইরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ওষুধ দিতে দিতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একবার নাকি কার বাড়িতে ইঞ্জেকশন দেয়াব জন্য সন্ধ্যার সময় সুধীরকাকাকে ধরে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে নামডাক বেশ। গিয়ে গবমজল তৈরী করায় সুধীবকাকা। গবমজল দিতে দেবী হচ্ছে বলে হল্লা করে। পরে গরমজলে সিবিঞ্জ ধুচ্ছে এমন সময আলো নিভে যায়। লোডশেডিং। বোগীব ঘরের লোকেদের হ্যারিকেন ধবিয়ে আনতে দু মিনিট সময় লাগে। এসে দেখে কম্পাউণ্ডারবাবুর ইঞ্জেকশন দেযা হযে গেছে অন্ধকারেই। হাতেব ছোট বাক্সটা গুছিযে চলে যাচ্ছে। এ নিযে বড হৈ-চৈ হয়। মোটকথা সুধীরকাকা বড় বিরক্তিকরভাবে নিস্পৃহ। সব ব্যাপাবেই।

কোন সকালে তার বউ বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। দুপুরে রান্না হযনি। ছেলেটা বোধহয় না খেযেই আছে। এতো বাত হয়েছে। কোন চেতনা নেই তবু।

--"কিবে ছুটকু? দুপুবেলা ভাত খাসনি?"

—"না, না। জামবুরা খেযেছি। কাঁচা লঙ্কা দিযে মা মাখিযে দিয়েছে।"

—"মাকে কোথায় পেলি?"

"—কেন নদীব ঘাটে। মা চান কবছিল তো আমি গিযে বললাম 'খিদে'। গাছ থেকে পেড়ে মা হাত দিযে ছুলে দিল।"

এসবই গিবিকাকীমার দ্বাবা সম্ভব। নদীব ঘাটে কয়েকটা জামবুবা গাছ আছে সার্বজনীন। বাডি থেকে নদী প্রায় আধমাইল। এতো দূবে কোন মহিলা চান করতে যায় বান্নাবান্না, বাড়িঘব, আধপাগলা ছেলেকে ফেলে? গেল তো আসার নাম নেই। খিদেয ছেলে গিয়ে ধরলো, তো তেত্রিশ চৌত্রিশ বছবের গিরিকাকীমা সবার সামনে গাছে উঠলো। জামবুড়া প্রায় কমলালেবুর মতো ছুলে দিল ছেলেকে। কাঁচা লঙ্কা কই পেল কে জানে? ওর দ্বারা সব সম্ভব।

—"তাবপর কই গেল গিরিকাকামা? তুই কি করলি?"

—"আমি তো চলে গেলাম। মা চান করছিল বলে শাড়ী ভেজা ছিল তো। গায়ে শাড়ী শুকাতে রোদে বসে থাকল।"

—"যতো সব পাগলের কাণ্ড।" সবাই চরিত্র নিয়ে ইংগিত করলেও আসলে পাগল। সব কিছুর জন্য সুধীরকাকাকে দায়ী মনে হয় ময়ূরের। যাব বউয়ের মাথায় ছিট আছে তাকে খুব কড়া হতে হয়।

—"এই ছুটকু তাড়াতাড়ি আয়।" গেঞ্জি গায়ে ময়ূরের একটু শীত করছিল। জ্যোৎস্না বলেই এতোটা হেঁটে এসেছে। ছুটকু এখন সাইকেলের রিঙ হাতে রীতিমতো দৌড়াচ্ছে। যতোটা না মায়ের টানে তার চেয়ে বেশী খিদের জ্বালায়।

এবারে হঠাৎ করে ছায়া ছায়া পথে ঢুকলো দুজন। ডানে বাঁয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে কুশিয়ারের ক্ষেত। এখনো কোমরের নীচে পরে আছে কুশিয়ারের চাবা। শীতের শেষে এগুলো সাত আট ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়। খুব মিষ্টি হয় গোমতীর পাড়ের কুশিয়ার।

অনেকটা হাঁটার পর কুশিয়ার ক্ষেত যেখানে শেষ হলো সেখানে খালি বালি। নদীর বালি। নদীর হাওয়া ঝাপটা দিল আবার। নদীর ওই পাড়ে কোথাও মাইক লাগিয়েছে। খুব মিষ্টি ভাষায় কেউ গীতার ব্যাখ্যা করছেন। অনেকক্ষণ পরে পরে গীতার পুণ্য কথা এসে ঝাপটা মারছে কানে। সন্ধ্যার বৃষ্টির জন্য বালি ভেজা ভেজা।

গিরীকাকীমার গায়ের রঙ খুব পরিস্কার। ধনী ঘরের সযত্নে থাকা সুন্দরী মেয়েদের রঙ। ত্রিপুরার এই অংশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে। এখানে সূর্যের জন্য গায়ের রঙ পরিস্কার হবার কথা নয়। ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও গিরিকাকীমাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায়না—তার অগোছালো স্বভাব আর দারিদ্রতার জন্য। তাছাড়া চোখে এমন কিছু একটা আছে যার জন্য সুন্দরী মহিলা তো দূরের কথা—মহিলা বলেই মনে হয় না ময়ূরের। মেদহীন অত্যন্ত সক্ষম চেহারা। বোঝা যায় না যে তার দশবছরের আধপাগলা ছেলে আছে। ময়ূরের প্রায়ই মনে হয় একটা দৌড় প্রতিযোগিতা হলে গিরিকাকীমা মেয়েদের তো বটেই অনেক ছেলেদেরও হারিয়ে দেবে। শ্রাবণে সাপ মারতে নেই। আমিনবাবুদের শোবার ঘরে সাপ ঢুকছে। গিরিকাকীমা বেঁটে একটা লাঠি নিয়ে একটা তিনহাতের দাঁড়াইশ সাপ মারলো একাই। তাও এক বাড়িতে। দ্বিতীয় আঘাত করার চেষ্টাই করে নি।

গিরিকাকীমার বদনাম আছে। বিশেষ করে মেয়েরা দেখতে পারে না। চরিত্র খারাপ এমন প্রমাণ কেউ কোনদিন পায়নি। তবে তার অনেক বেয়াড়া ধরণের তরুণ বন্ধু আছে। সবকিছু মিলিয়ে ময়ূরের কেমন যেন মায়া হয় এই পরিবারটার জন্য। ছুটকুর জন্ম সম্পর্কে নানান বটনা আছে। ময়ূর বিশ্বাস করে ছুটকু সুধীরকাকারই ছেলে। মার চেয়ে বাবার পাগলামির সঙ্গে ছুটকুর পাগলামির মিল বেশী।

সুধীরকাকারা এ পাড়ায় প্রথম আসার পর ময়ূরদের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল। স্কুলে পড়ার সময় একবার ময়ূরের টাইফয়েড হয়েছিল। পরপর কয়েক রাত জেগে গিরিকাকীমা সেবা করেছিল। একবার মেজদা বেড়াতে এলেন কলকাতা থেকে। মেজদার ফুটফুটে মেয়েটা গিয়েছিল সবার সাথে। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল একনাগাড়ে। পরিবারের সবাই প্রায় সর্দি জ্বরে পড়লো। প্রচণ্ড জ্বর। বৌদি ভয় পাচ্ছিল মামনিকে নিয়ে। ছোটদের সর্দির ভাইরাস তাড়াতাড়ি ধরে। মামনি এমনি কাকু পিসিদের গা ঘেষে থাকে সব সময়। বৌদির ভয়ের কথা শুনে গিরিকাকীমা এক বালতি জলে এক পোয়া লবণ গুলে রাত নটায় কাউকে কিছু না বলে মামনিকে স্নান করিয়ে দেয়। বাড়িতে তুলকালাম হয় এ নিয়ে। মামনির কিন্তু সর্দি হয় নি। যা হোক, ময়ূরদের পরিবারের সঙ্গে গিরিকাকীমার ঘনিষ্ঠতা বেশি দিন থাকে নি। মা একদিন মুখ কালো করে বললেন—'তুমি আর আমাদের বাসায় এসো না গিরি।

জলের ব্যাপারে না করবো না। কূয়ো থেকে জল নিয়ে যেও। কিন্তু কূয়োর পাড়ে চান করো না।' দিদি এখন পণ্ডিতি করে। কূয়োতে প্রথম দিনই স্নান করা দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ না হাতি। দিদি তো তখন গিরিকাকীমার ফ্যান ছিল।

ময়ূরের বড় মায়া হয় পরিবারটাকে। কলেজে ঢোকার পর এখন দেখা কমই হয়। আগেও যে কথাবার্তা খুব হতো তাও নয়। আসলে প্রায়ই বড় অনুচিত আর অস্বাভাবিক কথা বলে ছুটকুর মা।

—"আচ্ছা তোব নাম মযূব কে বাখলে' বল তো? জানিস, মেয়ে ময়ূরের পেখম নেই। নেচে নেচে তারা ছেলে মযূরদের ভুলায়। ঠিক এমনি কবে।" নিজেই দুহাত তুলে নাচতে লাগলো হয় তো।

—"দেখে হাটিস বে ছুটকু। সাপটাপ থাকতে পারে।"

নদীব একদম গা ঘেষে বকসিদেব ক্ষেত। মিষ্টি আলু লাগায তারা আর টমেটো। এখনো লাগানো হযনি। লাইন বেঁধে জাযগা তৈরী করা হযেছে মাত্র। বালি মাটিতে পা ডুবে সেণ্ডেলে বালি আসছে। প্রথমে দুটো নৌকো পরে নদীর জল দেখা গেল। গোমতীব জলে চাঁদ ভাসছে। চারদিকের নির্জনতা ভেঙে হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো নদী থেকে। থমকে দাঁড়ালো মযূর আব ছুটকু। একটু পবে তিনটে মানুষেব মূর্তি স্পষ্ট হযে উঠে এলো উপবে। তাদেব পা টলছে। ছুটকু বোধহয কাউকে চিনতে পাবলো।

—"আমার মা কোথায? মাকে দেখেছ? আমার ক্ষিধে পেয়েছে বিশুকাকু।" মযূর এঁদেবকে চিনতে পাবলো না। লোকটা অনকক্ষণ ধবে ছুটকুকে দেখলো। তারপর কিছু না বলে উঠে যেতে লাগলো বড রাস্তার দিকে। উপবে উঠতে হঠাৎ একজন ফিবে তাকালো।

—"ও, তোমবা বৌদিকে খুঁজছো? বৌদি বাড়ি যাবে না। ঘুমিযে পডেছে। বললাম অতো টেনো না। শুনলোই না।"

মযূর স্পষ্টতই বাতাসে গাঁজাব গন্ধ পাচ্ছিল। লোকগুলো নৌকায বসে গাঁজা খেযে ফিবছে।

—"এই লোকগুলো গাঁজা খেযেছে. জানো মযূবদা?"

—"তুই কি করে জানলি?"

—"মা খায় তো। আমি গন্ধ জানি।"

বাতাসে নৌকো দুলছে। জলেব শব্দ হচ্ছে তাতে। সাবধানে দু'জনে নেমে এলো। দুটো নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। কোনটাতেই গিবিকাকীমার চিহ্ন নেই। একটা খোলা নৌকো। অন্যটাতে ছই আছে।

—"মা আমাব ক্ষিধে পেযেছে। চলো মা। আমাব ক্ষিধে পেয়েছে।"

মযূব আশ্চর্য্য হচ্ছিল। ছুটকু এমনভাবে ডাকছে যেন জানে কোথায তার মা রযেছে। সেও ছই দেযা নৌকোব দিকে ডাকলো—

—"গিরীকাকীমা, গিরীকাকীমা!"

—"ও তোরা এসেছিস। চল আসছি।" ছই দেযা নয, খোলা নৌকোটাতেই কেউ জেগে উঠলো। জ্যোৎস্নায় গিরিকাকীমাব ডোবা কাটা শাড়ীটা চেনা গেল। যেন কেউ হঠাৎ নির্জন বাতাসে একটা শাডী এঁকে দিল। শাডীর অস্পষ্ট অবয়বটা লাফিয়ে

তীরে নামলে নৌকো দুলে উঠলো প্রচণ্ডভাবে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে নদী প্রতিবাদ করলো। গোমতীর বুকে তাদের গোল প্রতিবিম্বটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। গিরিকাকীমা মাথার খোঁপা ঠিক কবছে এমন সময় ছুটকু দৌড়ে গিয়ে কোলে উঠে গেল। তার হাতে তখনো সাইকেলের রিঙ। ছুটকুকে কোলে নিয়ে গিবিকাকীমা আরো কাছে এলে, ময়ূর দেখলো ব্লাউজ গায়ে নেই। তাব মানে নদীর পাড়ে কোথায় রেখে চান করেছে—ভুলে গেছে গাঁজার নেশায়, না হলে হারিয়ে ফেলেছে।

—"চল বে ময়ূর।"

—"তুমি এতো বড় ছেলেটাকে কোলে নিয়ে যাবে নাকি। পারবে?"

—"পারবো, তুই চলতো।"

—"অসম্ভব।"

পারবে না নিশ্চযই। তবে সন্ধ্যা থেকে গাঁজা খাচ্ছে। গাঁজা খেলে নাকি ভাব বইবার ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু একজন মহিলা সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই এতোক্ষণ একনাগাড়ে গাঁজা খেয়ে সিধা আছে কি করে? এ না হলে পাগলেব বংশ বলে সবাই!

পিছনে ফিরে ময়ূর জ্যোৎস্নামাখা নদী, অন্যপাড়েব গাছপালা ইত্যাদিকে দেখলো। গোমতীর বুকে আবাব চাঁদের গোল প্রতিবিম্বটা ভেসে উঠেছে।

আমি নিজের চোখে এক গভীর রাতে, জ্যোৎস্নায় যখন ধুয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার এক মহকুমা শহর, গেঞ্জি পরা ময়ূরকে—এক পাগলি, পাগলির কোলে একটা কোলে ওঠার বয়স পেরিয়ে যাওয়া ছেলে সহ নদী থেকে ফিরে আসতে দেখি। পাগলিটা নাকি এই গভীর রাতে ছেলেটাকে ভাত রেঁধে খাওয়াবে।

সুশীল দে

মুদ্রারাক্ষস

ঠিক এ সময়ে নীলার সঙ্গে দেখা হবার কথা নয়। ভর দুপুরে পোষ্টাপিসের বারান্দায়। ও একা দাঁড়িয়ে। চৈত্রের গনগনে রোদ আর তার আগুন রঙা শাড়ী। একটা অন্য ডাইমেনশন নিয়ে ধরা দিল। ভালই লাগল। লাঞ্চের অবকাশে এরকম একটা কিছু আশা করা যায় না।

কাছে আসতেই যেন অনুযোগের ভঙ্গীতে বলল "সেই কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি —একটাও রিক্সা পাচ্ছি না।"

"আমাকে দেখতে কি রিক্সাওয়ালার মতো মনে হয়?"

"তাই বলেছি বুঝি—তুমি তো—তোমাকে তো"—

মিষ্টি হাসির জলতরঙ্গে চৈত্রের রোদ্দুরকেও বুঝি নীলা বলতে চেষ্টা করে যুৎসই শব্দ খুঁজে না পেয়ে বললে—

"তুমি একটা যাচ্ছেতাই—"

"আর তুমি...?"

"আমিও তাই।"

"তবে আপাতত তোমাকে মনে হচ্ছে...তুমি একটি রক্তমুখী নীলা। তা এমন খুন-খারাবী রং এর শাড়ী কেন এই গরমের দুপুরে।" বলেই নীলার মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম প্রশ্নটা বেমককা হয়ে গেছে। কিন্তু নীলা সপ্রতিভ স্মিতহাসিতে সব সহজ করে দেয় বলে, "উত্তরটা ভবিষ্যতে একদিন দেয়া যাবে।"

আব ঠিক তক্ষুনি পশ্চিম দিক থেকে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে রঘুকে আসতে দেখি। আমাকে দেখে স্পীড কমায়—কাছে এসে কায়দা করে দাঁড় করায় সাইকেলটা। ইঞ্জিন থামায়না "হাই শেখর, কোনদিকে যাচ্ছিস" সানগ্লাস খুলে ফ্যালে।

"এইতো ডাকঘরে একটা কাজ রয়েছে।"

"দেরী হবে?'

"হ্যাঁ, একটু সময় নেবে।"

"তা'লে চলি—একটু তাড়া আছে।"

নীলাকে দেখে নেয় একবার, সানগ্লাস ঠিক করে লাগায়, একসিলারেটারে চাপ দেয়। রঘু চলে যায়। পোড়া পেট্রলের গন্ধমাখা কিছু ধোঁয়া আর নীলার চোখ মুখের একটা মুগ্ধতা এই সব নিয়ে আমি কৃষ্ণচূড়ার দিকে চেয়ে থাকতে চেষ্টা করি।

"তোমার বন্ধু রঘুনাথবাবু না?"

"হ্যাঁ কী করে চিনলে বলতো?" নিষ্প্রাণ সুরে বলি।

বাঃ শহরের কে না চেনে—আর তোমার মুখে তো অনেকবার শুনেছি। সেই যে মোটর সাইকেল নিয়ে দু'জনেই পুকুরে পড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি..." খিল খিল করে হেসে ওঠে নীলা স্থানকাল ভুলেই। আমারও হাসি পায়। ব্যাপারটা সত্যিই

দারুণ মজার। কিন্তু এ সময়ে তত মজার মনে হচ্ছে না আমার। প্রসঙ্গ পাল্টে বলি "এ সময়ে কোত্থেকে এলে উল্টো দিকে?"

"উল্টো মানে?"

"যুঁইদের বাড়িতো এদিকে নয়—তোমার বান্ধবী।"

"বারে আমার বুঝি বান্ধবী একটাই।"

"ওহ্-হো—তাওতো বটে, তোমার তো অনেক...আচ্ছা তুমি ততোক্ষণ রিক্সাওয়ালার ধ্যান করো আমি কাজটা সেরে নিই।"

..."মোটর সাইকেল আমার খুব ভাল লাগে।"

পাশাপাশি হাঁটছি আমরা। আমি কিছুই বলি না। "তুমি আসছো না যে ক'দিন?" আমি নীলাকে দেখি।

"একজামিন তো এসে গ্যালো...আজ সন্ধ্যায় একটু আসবে।"

"যদি সময় করতে পারি—এই রিক্সা।" নীলা রিক্সায় উঠে গেলে থানার মোড় ধরে আমি আপিস মুখো হাঁটতে থাকি আপাতত আমারও একটা রিক্সা পেলে ভাল হত। একটা সাইকেল—একটা মোটর সাইকেল, একটা মোটর সাইকেল কিনতে কতো টাকা লাগে আজকাল? আপিস থেকে কিছু লোন নিলে হয় না? কিস্তিতেও তো কেনা যায়। তা এই মোটর সাইকেলের কথা কেন ভাবছি আমি। রোদদুরে হাঁটতে হচ্ছে বলে—নীলার ভাল লাগে বলে, নাকি ঠুনকো ঈর্ষা। রঘুর দিকে নীলার সপ্রশংস তাকিয়ে থাকাটা কি আমার ভাল লাগেনি। আমার ভাবনার অস্বাভাবিকতা কদ্দুর। রঘুনাথকে নীলা চেনে। শহরের সব মেয়েরা চেনে। আমাকে কি শহরের সব মেয়েরা চেনে। আচ্ছা, সব মেয়েদের কাছে আমার পরিচিতি কি একান্তই অপরিহার্য। রঘুনাথকে কেন চেনে শহরের সব মেয়েরা। টাকা আছে বলেই কি? রঘুনাথ তো কলেজে ঢোকার মুখেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলো। আমি তো স্কুল কলেজের সেরা ছাত্র। সাহিত্যে দর্শণে বুঁদ হয়ে আছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে জানি। ধ্যাৎ, এইসব পুরনো বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আমাকে পাগল করছে কেন। ভাবনা চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলি যেন। দুপুরের জনবিরল রাজপথে এসবের কোন মানেই নেই। হাসপাতালের সামনের রাশি রাশি গুলমোহরের দিকে তাকাতে ভুলে যাই আজ। বেলা আড়াইটা, অপিস পাড়াটা নিঃঝুম যেন। হবার কথা নয়, এখন মার্চ মাস। কিন্তু ভ্যাপসা গরম। লোডশেডিং। সিলিং ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিই। নিজেই একগ্লাস জল নিই।

মার্চ এর ব্যস্ততা কেটে যেতে তিন সপ্তাহ লাগে। এ ক'দিন নীলার সঙ্গে দেখা হয়নি। রঘুর সঙ্গেও না। অথবা দেখা করিনি। কিন্তু রঘুর সঙ্গে দেখা করতেই হয়। আমার কিছু টাকার দরকার। রঘুর ঘরে হালকা নীল জিরো পাওয়ারের বাল্ব। টিভিতে বিলিতি অনুষ্ঠান। ছায়াছবি। সিগারেটের ধোঁয়া মৃদু বেগুনী আভাস দিচ্ছে। টিপয়ের ওপর রাখা গবলেটের পানীয়ের রঙ-এ বিচিত্র আলোর খেলা। আমি নিয়মিত মদ খাইনা। রঘু আমাকে ঢেলে দেয়।

"আজ থাক" আমি বলি।

"গুড বয়" বলে নিজেই ঠেলে দেয় আবার। আয়রণ সেফ দেখিয়ে বলে "দরকারী কাজটা আগে সেরে ফ্যাল।" আমি জানি ও কী বলছে। আমি সেফ

খুলে দেরাজ টেনে নিই। "তিনশ নিলাম।"

"সময়মতো ফেরৎ দিতে ভুলে যাস না যেন?"

"কার সময় মতো?"

"সার্টেনলি তোর।"

এ সব আমাদের পরিচিত শব্দের খেলা।

"তারপর, কদ্দুর এগিয়েছিস?" রঘুর চোখে কৌতুক আবছা আলোতেও ঝিলিক মারে।

"কীসের কদ্দুর?"

"নে চীয়ার্স...যদিও আমার দু পেগ হয়ে গেছে...।"

"চীয়ার্স...ববফগলা হুইস্কীর স্রোত আমাব বুক বেয়ে নিচের দিকে নামছে...দামী মদ...আমি মাঝে মাঝে মদ খাই...পয়সা থাকলে নিয়মিত খাওযা যেত...ন্যায় অন্যায় বুঝিনা...আমার ভাল লাগে...ঘুষ নিতে আমার ভালো লাগে না...।

"মেয়েটির নাম কীবে...তুইতো কোনদিন বলিস নি...ও হ্যাঁ তোব তো অনেকক্ষণ কিছুই খাওয়া হয়নি...তুই চালা, আমি দেখছি কালুর কদ্দুর হল..."

আমি নীলার কথা কোনদিন বলিনি...নীলার কথা বলার কী আছে...রঘুব এসব কোনদিনই পছন্দ নয়...আসলে সেসব প্রসঙ্গই কোনদিন ওঠে না...এসময নীলাকে ভাবতে চেষ্টা করি...নীলাব কী কী বৈশিষ্ট্য...হাসি, হাঁটা চলা...এম. এ পাশ কবে কী করবে নীলা?...তার তো অনেক দায়িত্ব...বাবার বড় মেয়ে নেহাৎই মধ্যবিত্ত...গানের ট্যুইশন করতে হয...ছিমছাম...এর কথা কী বলব রঘুকে...আব নীলা তো একান্তই আমার গোপন...মনেব ভেতর বুকের ভেতর ঝিনুকেব মুক্তোব মতন...

একটা ভয়ংকর আর্তচিৎকাবে চমকে উঠি। আসলে টিভিব দিকে এতোক্ষণ নজরই দিতে পাবিনি। পর্দায় একটা খুন হযে গ্যালো। দশতলা বাড়িব জানালা গলিয়ে একটি মেয়েকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল কযেকটি মুখোশপবা লোক। মেয়েটিব অন্তিম আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। পর্দায এখন একরাশ ফুল। দোমড়ানো মোচডানো মেয়েটির শরীর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় স্থিব। রঙ বাহার ফুলের গায়ে রক্তের ছিটা। মৃদু বাতাস এসে দুলিযে দেয় সেই ফুল।

রঘুর পেছনে কালু আসে। অনেক মাছ ভাজা পেঁয়াজ কুচি-শশা চিনেবাদাম ভাজা। রঘু তার গ্লাস চোঁ চোঁ করে টেনে নিয়ে বললো, এখন গান শোনা যাক কী বলিস টিভি প্রোগ্রাম ভাল্লাগেনা এখন আর। স্টিরিও প্লেয়ারে হেমন্তের গানের রেকর্ড চালিয়ে দেয়। আসলে রঘু আমার ভাললাগাকে আমল দেয়। আমার পছন্দকে মর্যাদা দেয়। কিন্তু নীলাকে যদি মর্যাদা না দেয়...। আমার সব ভালো লাগাকে সবাই মর্যাদা দেবে এমনটা কি সম্ভব। নীলা কি আমার মদ খাওয়াকে ভাল চোখে দেখবে। হোকনা এম. এ পড়া মেয়ে।

"তুই একটা ছোট লোক...নে টেনে ফ্যাল...প্রথম সিপটা সার্প দিতে হয়...তারপর চুক চুক করে চোখ বুজে বুজে...তবহি আ জায়েগা মজা।" আমিও একটানে গ্লাসের সবটুকু তরল নিঃশেষ করি। বদাম তুলে নিই।

"তোর বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলিনা যে, মেয়েটাতো খাসা..."

...খাসা...অশ্লীল ইঙ্গিত নয়ত..."এইতো ক'মাস হল ওর বাবা এখানে বদলি

নিয়ে এলেন আমাদেরই অপিসে—তেমন সুযোগ তো হয়নি তোকে বলার...”

“তা দুর্যোগ কিছু ঘটেনি তো...প্রেম-ভালবাসা...ফুল পাখী চাঁদ...মন দেয়া নেয়া...বিয়ে...আদান-প্রদান...শরীব-টবীর...।”

“তা হয়তো নীলাকে বিয়ে করতেও পারি...ও যদি বাজী হয়...।'

“তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস তো, কোন পাড়ায় থাকে?”

“তোর কী সময় হবে?” আমি এড়িয়ে যেতে চাই। নীলাদের ছোট্ট নিতান্ত আটপৌরে ঘবে রঘুকে মানাবে না। ওরা বিব্রত হবে। আমি একটা উত্তেজনা অনুভব করি। এটা নিয়ে চতুর্থ গ্লাস নিঃশেষ কবি। আমার গ্লাসে আবার মদ ঢেলে দিতে দিতে রঘু বলে “হবে হবে...খুব সময় হবে...সুন্দবী তোর ওষ্ঠের তিলেব জন্য আমি সমরখন্দ বোখাবা দিযে দিতে পাবি...আর আমার সামান্য ঠিকেদারী।” এ ভাবে বাত্রির কাছে এসে একে অন্যের কাছে আমবা মনেব আগল খুলে দিতে থাকি। যে কোন দিনের মতোই। যখন কথা জড়িযে আসে...পৃথিবী মুছে যায় চোখেব থেকে...নিরপরাধ ঘুম নেমে আসে টের পাই না। পরদিন ঘুম ভাঙলে কালু বলে বঘু ভোবেই বেবিযে গেছে কোথায় কাজে। আর তখুনি মনে পড়ে আজই নীলার সঙ্গে একবার দেখা করবো।

কিন্তু আমাব সব আশঙ্কা অমূলক হযে যায। বঘু নিজেকে বেশ মানিযে নেয। যতক্ষণ থাকে একটা আনন্দ হয়ে যেন জ্বলতে থাকে ওদেব মাঝখানে। বরং গভীর বিস্ময়ে টের পাই আমিই যেন একলা ঘবেব এক কোণে পড়ে থাকি। অন্যদিন আমার এ বাড়িতে উপস্থিতি নেহাৎই আটপৌবে। সুখ দুঃখের কথা অভাব অভিযোগ। রোজীব পড়াটড়া দেখিয়ে দেওযা এই সব. আব আজ।

“বঘুদা আসবেন, সময় হলেই যেদিন খুশি।”

রঘু আমাকে দেখিয়ে বলে “শেখব যদি অনুমতি দেয়।”

নীলা, ঈষৎ হেসে বলে “কই তুমি কিছু বলছো না শেখবদা—”

“আগে ভেবে নিই—অনুমতি দেওার অধিকার কতটুকু—।”

রোজী বলে “রঘুদা আপনাব তো টি.ভি. রয়েছে তাইনা?”

“হ্যাঁ যাবে যখন খুশি যেদিন খুশি।”

“কেয়া বলে আমি কিন্তু ভটভট চড়বো—। কেয়াব কথায় সবাই হাসে। রঘু কেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে তোমাকে আমি ভটভট চালানোই শিখিয়ে দেব।”

রাস্তায় নেমে রঘু বলে “তোকে কি বাড়ি পৌঁছে দেব?”

“না তোর ঘরেই যাবো, চালা।”

অনেক রাতে ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবি নীলার ব্যবহারে হালকা কিছু ধরা পড়েনি তো। রোজী কেয়ার কথায় কোন হ্যাংলামী নেইতো, অথবা এই সব রীতি নীতির কোন প্রসঙ্গ'তো আমাব নেই। টি.ভি. নেই, মোটর সাইকেল নেই। কত টাকা হলে একটা টি.ভি. কেনা যায়। একটা মোটর সাইকেল আর একটা টি.ভি. আমার মাথায় চক্কব দিচ্ছে ক্রমাগত। এখন টের পাই একটা অসুখ আমার বুকের

ভেতর বেড়ে উঠছে। একটা রাক্ষস আমাকে খেয়ে ফেলছে যেন।

জীবনের উপরি পাওনা হিসেবে নীলাকে পেয়েছি। বোধহয় পেয়েছি। কিন্তু জীবনযাত্রার জন্যও কিছু উপরি দরকার। সঞ্চয় আমার কাছে স্বপ্নমাত্র, একটা বিড়ম্বনার সামিল। অথচ স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে নীলার মনের কাছে কখন পৌঁছে গেছি। আর মনের সুরঙ্গপথে পেয়ে গেছি ভালবাসায় এই অনুপম দীঘল শরীর। আমার কামনা। শুধু দিন যাপনের বাইরের এই বিস্ময় আমাদের প্রত্যাশা। ভাললাগা ভালবাসা। ভালবাসার শরীর নিয়ে রঙমহলা প্রাসাদে ছুটোছুটি।

"আমি একটা মোটর সাইকেল কিনতে চাই রঘু তোর তো সব চেনা জানা রয়েছে—হাজার পাঁচেক নগদ দেব—বাকিটা তুই কিস্তি করিয়ে দিবি...।"

"তোর কি ঘোড়া রোগ হয়েছে...?"

"তা বলতে পারিস...।"

"না কোন পারাপারিবি কথা নয়—তেলের দামের খবর রাখিস...আর সাইকেল তোব দরকারটা কোথায়...তেমন দরকার হলে, আমাবটাতো রয়েছে।"

আবার অনুকম্পা। মনে মনে আহত হই।

"তোর—তোর কাজকর্ম চলবে কেমন করে?"

"আমাব জীপটা তো সামনের মাসে ডেলিভারী পাচ্ছি, ওহহো কথাটা তোকে বলাই হয়নি।...

মাথাটা জমাট বেঁধে থাকে আজকাল। মোটব সাইকেল কেনার সখটা মবে যায়, বলতে গেলে খসে যায় আমার স্বপ্নকল্পনার একটা পাপড়ি। নীলাকে পেছনে বসিয়ে ছুটবো। তার শাড়ীর আঁচল উড়বে হাওয়ায়। বিজয় নিশানের মতো। তার এলোমেলো চুল আমার চোখে মুখে। এইসব মরে যায়। রোজী কেয়া রোববার সকালে রঘুব ঘরে গেছে টি.ভি. দেখতে সন্ধ্যাবেলায খুশি মনে সেই গল্প আমাকে শোনায়। সীমাহীন ঈর্ষায আমি জ্বলতে থাকি। রোজী কেযাদের জন্য আমার ঘরে কোন আকর্ষণ নেই। আমার ঘবেব শ্রীহীনতা আমাকে পীড়া দেয়। পৃথিবীকে ঘৃণা করতে থাকি। নিজের অক্ষমতাকে ক্রোধে পরিণত কবতে থাকি। বিষণ্ণতার জ্বর আমাব গায়ে লেগে থাকে সারাক্ষণ।

"আমাকে একটা এস্টিমেট দে রঘু।"

"কিসের এস্টিমেট?"

"বাড়ি তৈরীব।"

"বাড়িব!"

"হ্যাঁ আপিস থেকে পঞ্চাশ মাসের মাইনে আগাম নেব।"

"কতো টাকা হবে?"

"তা প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ হাজাব—"

"কেমন করে শোধ দিবি?"

"মাসে মাসে অর্ধেক মাইনে কেটে নেবে।"

"কেন টিনের ঘরে বুঝি ঘুম আসে না আজকাল?"

"তুই বুঝছিস না কেন—এখনই এসব করতে হবে..... তা নইলে কোনদিন

কী করব?"

রঘু চুপ করে থাকে। পায়চারী করে...আমি পরপর দু'গ্লাস গলায় ঢালি। নেশা চড়তে থাকে। গলার স্বর জড়িয়ে আসে।

"আসলে বুঝলি, ওসব বাড়ি টাড়ি না হলেও চলবে কিন্তু টি ভি মোটর সাইকেল এখনই চাই....।"

"ওহ্ সেই ঘোড়া রোগ......আমি তো বলেছি আমার সাইকেলটা নিয়ে নে....আর টি ভি ক'দিন ভাল লাগে...বড় জোর দু'তিন মাস....তারপর ধুলো জমে... অনর্থক পাঁচ-সাত হাজার আটকে রাখার কোন মানে হয়?"

"প্লীজ....প্লীজ আমাকে আর জ্ঞান দিতে আসিস না—।"

"আরে আমি তো মুখখো মানুষ তোকে জ্ঞান দেবাব কে...তবে কথাটা ভেবে দেখতে পারিস..."

"ভেবেছি ঢের ভেবেছি....আমি তোর কাছে টাকা চাই বলে তোর পয়সায় মদ খাই বলে তুই আমায় অপমান করবি..."

রঘু হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী নজর দেয় আমার দিকে। আমার মনের ভেতরটা ও যেন যাচাই করে নিতে চায়। আমি গেলাসে মদ ঢালি। রঘু বলে "এই আজকের মতো শেষ" তোর নেশা হযেছে...শেষ কর, তোকে বাড়ি রেখে আসি...।"

"না না আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরবো একা।"

"না তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তোর অসুখ করেছে।"

হ্যাঁ আমার অসুখ করেছে। একটা রাক্ষস আমার মাথায় বাসা বেঁধেছে। আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভয়ংকর সেই মুদ্রারাক্ষসের পাল্লায় পড়ে গেছি আমি। মাঝে মাঝে ভাবি নীলাকে ঘৃণা করার অধিকার আমার আছে কিনা। তার মধ্যে ভ্রষ্টতার ছিঁটে ফোটাও যদি খুঁজে পাই। কিন্তু কীসের অধিকার নিয়ে। নীলা কি আমার বিয়ে করা বৌ! হলেই কি তার আত্মাকে কিনে নেবার অধিকার জন্মায়।

আর আমি যদি তাব আয়াস আরামের আযোজন না কবতে পাবি। আমি করুণা করতে পারি—নীলাকে, নীলার বাবাকে। ওদের পবিবাবকে অবহেলা করতে পারি কি! এই বাজারে কী দিয়ে ভাত খায ওরা রোজ। চাযের সঙ্গে দুধ থাকতে রোজ কি দিয়ে জল খাবার কবে সকাল বিকাল। নীলাব ক'খানা শাড়ী—ক টাকা দামের চপ্পল পায়ে দেয়। এই সব চোখে আঙুল দিযে দেখিয়ে যদি বলি...সাবধান নীলা...রঘুনাথ দত্ত...ওর স্বপ্ন দেখে তোমার লাভ নেই...না না কী সব ভাবছি যাতা...রঘু আমার বন্ধু...নীলা কী একটা খুকী! আর যদি রঘুর দিকে ঝুঁকেই যায় আমাব করার কী থাকতে পাবে। কীসের অঙ্গীকারে ও আমাতে লেগে থাকবে? ভালবাসার! ওকে চুমু খেয়েছি বলে...ওর বুকে মুখ রেখেছি...এই কী।

সে সব কিসসু নয আজকাল...ওই সব শারীরিক রীতিনীতি...পারস্পরিক প্রয়োজন মাত্র। প্রেম যে আসলে শরীরের ভেতব কোনখানে নেই তা কী এখনো বুঝিনি। এ ভাবে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে থাকি আজকাল। নষ্ট শুষ্ক পাখীর মতো ছটফটানি। অসম্ভব মন পোড়ানি। আমি তো আর উনিশ বছবের উঠতি যুবক নই।

সন্ধ্যাবেলা বেরুই না আজকাল। বাড়ির সামনে গাড়ী থামার শব্দ হয়। কারা যেন কলরব করতে করতে আমার বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে থাকে। গলার স্বরে বুঝতে পারি রোজী কেয়া জয় টিটো ওরা সব। নীলাও রয়েছে। সবার পেছনে রঘু। "এখন ভাল আছিস? কী হয়েছিল—জ্বর...?"

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে বলি এব কী কোন দরকার ছিল নীলা? বাড়ি বয়ে আমাকে কষ্ট দিতে আসা।

"আরে পরশু দিন গাড়ী ডেলিভারী পেয়ে যাই—কাজের তাড়ায় তোকে খবরও দিতে পাবিনি। আজ তোব অপিসে ফোন করে জানলাম তোর নাকি অসুখ কবেছে—ছুটি নিয়েছিস। এদিকে সকালেই প্ল্যান করেছি সবাইকে নিয়ে ঘুরবো—আব তুই কিনা অসুখ বাঁধিয়ে বসে বয়েছিস। কি হযেছে বলতো?"

"না—তেমন কোন অসুখ নয মনে হয়।"

"নে তাহলে উঠে পড়—মাসীমাবা গাডীতে বসে রয়েছে—ওঠ।"

"ববং তোরা—আমার ঠিক ভাল লাগছে না...।"

"অ—আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে নীলা তুমিও বসো। নিজের মাল সামলাও। ফেরার পথে দু'জনকে তুলে নেব। আজ কিন্তু সবাই মিলে নাইট শো...আমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া।"

আমাকে বিমূঢ় করে বেখে হই হই করতে কবতে ওরা চলে গেল। গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে যায।

নীলা বসে পড়ে আমার খাটে। কপালে হাত বাখে।

"কী হয়েছে তোমার সত্যি করে বলবে।"

কিছুই বলতে পারি না। একবার বলতে চাই আমাকে ক্ষমা করো। বলতে গেলে হয়তো চোখে জল আসবে। মনে মনে বলি একটা রাক্ষস আমায় খেয়ে ফেলছিল। পারেনি। তুমি রয়েছ যে।

অসিত দত্ত

ছবি মানুষের ব্যাখান

চক,
কাঠকয়লা ও
ইটের গুড়া।

তোমাব উপকবণ এইটুকুই, ববাবর এটুকুই। সামগ্রী বলতে আব কি বোঝাতে পাবে কিংবা আব কি হতে পাবে তোমাব জন্য! তোমার স্বচ্ছ যন্ত্রণাব জন্য এই তিনটি বস্তু অনেক বেশি মাত্রায উপকরণ। এবং এই তিনটি বস্তুই তোমার জন্য আর তারজন্য তোমার অধিকার অনেক বেশি। বাকি সমস্ত কিছু তোমার ধাবেব জন্য, দুষ্প্রাপ্য এং দূবেব নক্ষত্রেব মতো আশাতীত।

একটি চক,
কাঠ কয়লা ও
ইটের গুডা।

এ নিয়েই তুমি শুরু কবো। যা কবো প্রতিদিন। তুমি স্থান পাবে যেকোন শহরেব ফুটপাতে। তোমাব জন্য ফুটপাত একটি আদর্শ স্থান হিসাবে ববাবরের মতো চিহ্নিত হতে পাবে। কেননা, এব চেয়ে ভালো স্থান আব কোন ভালো সহবে অবশিষ্ট নেই। অবশ্য, তুমি ভাবতে পারো সমুদ্রের কথা। সমুদ্র বেখাব কথা, তটের কথা কিংবা একটি নির্জন তীর। এসব ভাবনায় তোমাব চোখে সমুদ্রেব জল নাচবে। কিন্তু তুমি ফুটপাতেব কোন আপাত পালিশ জাযগা খুঁজে বেডাবে। এবং সব কিছুব মতো এই খুঁজে পাওযাব মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দ যুগল নাচবে বুকেব ভেতব। এবং সেই স্থানে পাতাল ফুঁড়ে ছবি বেবোতে থাকবে।

তুমি চক নিয়ে শুরু কবেছো— একটি মানুষেব ছবি। কযলা দিযে চোখ ও চুল। হযতো লোকে বলবে, তাব পিতা ছিলো কোন মেষ পালক। সেই লোকটির ছবি, যাকে সবাই করুণাময় বলে। একটা আপত্তি তোমাব থাকতেই পাবে, কেননা তুমি চাইছো ছবিটা শুধু 'যন্ত্রণা'ই হোক। এবং তাবজন্য তোমাব মনোনিবেশ হযে উঠে মাছ শিকাবীর চেয়েও যত্নবান। তোমাব লালিত কৌশলে ইটের লালগুড়া তাব বুকে রক্ত হয়ে যায়। এভাবেই একটি মানুষেব ছবি প্রতিদিন ঈশ্বরপুত্র হযে পাতাল ফুঁডে ওঠে, নিষ্কলঙ্ক ভাবনা আব পবিত্র যন্ত্রণা নিযে।

তার চোখ দুটি ভবে থাকতে পারতো মাযাব গভীব আচ্ছন্নতায কিন্তু তুমি তা পরিহার কবে নির্লিপ্ত অথচ সতেজ রাখো। অবশ্য তারজন্য তুমি তোমাব দু'চোখ ঐখানে স্থাপন করতে প্রস্তুত আছো। তার বুকে ছডাতে থাকো আরো ইটের গুড়া, কিন্তু ক্ষরণ যথেষ্ট কিনা সেটা তুমি বুঝবে তোমার শরীর দিয়ে, অনুভূতির দানা

দিয়ে। এবং ঐ টুকুই দরকার যতটুকু প্রতিদিন ক্ষরিত হয় তোমার শরীর থেকে। তার শরীরে কয়লা মাখো আরো— যেরকমটা হওয়া উচিত কালো মানুষের কোন ঈশ্বরপুত্রের রঙ।

তুমি এসব শুরু করো দু'পা হাঁটু গেড়ে অথচ পাতাল খোঁড়ার জন্য তোমার শরীরের অবস্থান যথার্থ হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি কি করো? যা করো— শরীবটা নুইয়ে আর বাঁ হাতে ভর দিয়ে, এভাবে ক্রমশ নোয়াতে থাকো এবং তোমার পিঠেব ক্ষত থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত—রস ঝবতে থাকে যেভাবে পুরনো লণ্ঠন থেকে তেল চোয়াতে থাকে। আসলে, তুমি এভাবেই শুরু করতে বাধ্য, কেননা হৃদয়ের বিশ্বাস ও মস্তিষ্কের কুশলতা দিয়েও শরীরের পতন তুমি বোধ করতে পারোনি। এবং তাই, তোমার পা ও হাতেব সন্ধিস্থলে ক্ষত রস বয়ে যেতে থাকে উৎস্যন্দ জলধাবার মতো। তখন. তোমার হাত ও পায়ের ক্ষযে যাওয়া আঙুলগুলি অবশ্যই শিথিল ও অবশ থাকে।

কুষ্ঠ তোমাব কাছ থেকে আঙুলের সজীবতা ছাড়াও অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। যাবফলে, তুমি তোমাব পাযের অবস্থান আর বদলাতে পারোনা। এবং তাই তোমার চলার জন্য দরকার হয়ে পড়ে একটা কাঠের গাড়ী, পিঁড়ির মতো দেখতে কিন্তু তাব চারটি চাকা লাগানো থাকে— পরিত্যক্ত বিযারিং দিয়ে। আর, এটা হচ্ছে তোমার মতো প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গদের জন্য এক আশ্চর্য বাহন। যা দিয়ে তুমি পরিক্রমা করো যন্ত্রের ঘোড়াব মতো। কিন্তু বিকলাঙ্গ শব্দে তোমাব আপত্তির ঠোঁট নড়ে উঠবে। তোমার কাছে বিকলাঙ্গ হলো সেই জিনিষ যা কেবলমাত্র মানুযেব করুণা পেতে সাহায্য কবে, যা তুমি মনে প্রাণে ঘৃণা করো। এবং বিকলাঙ্গ হচ্ছে তা, যা মানুষকে শুধু স্মৃতি সম্পর্কে সজাগ বাখে, যেমনভাবে অকর্মণ্যতা মানুষের ক্ষুধা বাড়িয়ে তুলে। কিন্তু তুমি যাই ভাবোনা কেন, এমনকি যখন দু'হাতের চেটোতে ন্যাকড়া জড়িযে রাস্তায় ছুটতে থাকো স্কি কবার মহিমাময ভঙ্গিতে, তখনো তোমাব পায়েব অবস্থান পাল্টাতে পাবোনা। অহমিকা বা হীনতা যে ভাবেই তুমি তোমাব কাঠেব গাড়ী থেকে নামো না কেন. তুমি তোমাব পা সম্পর্কে অনেক বেশি ভীত ও সতর্ক থাকো। কেননা, তোমাব পাযেব নড়াচড়ার মতো কোন স্বাধীনতাব সাথে জড়িয়ে গেছে মাংস খসে পড়ার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা। হয়তো, তুমি বলবে যে, চলাফেবাব ক্ষমতা হাবিযে, তুমি হতভাগা হতে জানো। কিন্তু এভাবে একসময তোমাব চোখেব মণি ছাড়া আব কি থাকবে?— ইট, কযলা আর চক ছাড়া? আর কি থাকবে. যখন নখ সবে পড়ছে তার অবস্থান থেকে এবং শবীরে যখন পচা দইযেব মতো সাদা ঘা থিক থিক করছে। হয়তো, তখনো তুমি বলবে যে, কুষ্ঠ আর ক্ষুধা নিয়ে তুমি দুর্ভাগা হতে জানো।

তুমি যখন ছবিটা শেষ করতে ব্যস্ত, যখন শুকনো ঠোঁট ফুটিয়ে তুলতে মনোযোগ রাখছো, তখন তোমাব শরীরে অসংখ্য মাছির ভীড়। বোদ বাড়ার সাথে সাথে যাদের ভীড় বেড়ে যাবে, যারা কখনোই ধন্যবাদের ভঙ্গিতে উড়তে জানে না। এবং এতদিনে তুমি তাদের কথা অনেক জেনে ফেলেছো— যারা বেঁচে থাকে মানুষের ক্ষত রস পান করে, যাদের নৃত্য বাসনা জেগে উঠে কনুই বা ঘাড়ের কোন ক্ষতস্থানে।

তুমি যখন ছবিটা শেষ করো, তখন কিছু লোক জড়ো হয়, যেরকমটা হয় প্রতিদিন। তাবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে জানে, আর তুমি জানো যে, এদের কেউই কানাকড়ি ফেলবে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করবে, যেরকমটা ওবা বলে থাকে— 'কি সুন্দব এঁকেছে' কিংবা 'আহা বেচাবা'। প্রশংসা ওদের ঠোঁটে লেগে থাকে, যা দিয়ে ওবা লিপস্টিকের কাজটা সারে। ওদেব চোখমুখের ভঙ্গিটা এমনভাবে সাজানো থাকে, যে, মনে হতে পারে যাবতীয় শিল্পরস হজম করে ওরা বেড়ে উঠেছে। ওদের চোখে আশ্চর্যতা থাকে কাঁচের শীতলতায় ভরে এবং অবাক হওযাব ভানটা ওবা সহজভাবে কবতে জানে। লোক দেখানোর অভ্যাসটা ওরা কোনমতেই ছাড়তে পাবেনা। কিন্তু ওদের পকেট নিয়ন্ত্রণেব দক্ষতা থাকে অনেকবেশি। এবং এবমধ্যেই যখন পথচলতি কেউ একটা আধুলি বা সিকি ছুঁড়ে ফেলে যাবে, মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি দম দেওযা পুতুলের মতো চলতে থাকবে, বা তাডিয়ে দেওয়া মাছিরা যেভাবে উড়ে যায় সেভাবে ছিটকে যাবে।

ছুঁড়ে ফেলা কোন মুদ্রার অহংকারী শব্দে তুমি যখন তাকাবে. তখন দেখবে. কাঁধ ঝাঁকিযে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে একজন, মনে হতে পারে লোকটির সাথে ভ্রূক্ষেপেব সাক্ষাৎ হয়নি কোনদিন। তোমাব অনুমান এটা বলে দেবে যে, ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা সে নিশ্চয়ই রাস্তায় পেযেছিল। একথা তুমি ভাবতেই পারো যে, অনেকেই দানেব অভ্যাসটা বজায় রাখে, বাস্তায় পযসা কুডিযে পেলে, যেভাবে মানুষ অসুস্থ হলেই হঠাৎ কবে শরীব চর্চা শুরু কবে। এবং অনেকেই এক-দু'টাকার অচল বা ছেঁড়া নোট এমনভাবে ছুঁড়ে দেয় যেন নাকেব সর্দি ঝাড়ছে, যেন ঘবের ময়লা ফেলছে ডাস্টবিনে। অথচ, তুমি চাও ছবিটা দেখে লোকে পযসা দিক. যেটা হবে তোমার পরিশ্রমেব পুবস্কাব। এবং প্রতিদিন তুমি যা পাও তারজন্য ছবিটা অত্যন্ত জরুরী —লোকে যার মূল্য নির্দ্ধাবণ কবতে পারে না। অবশ্য ছবিটা না থাকলেও হয়তো কিছু পেতে. কিন্তু তাতে, তুমি ভিখিরি হয়ে যেতে, তাকে তুমি অধঃপাতে যাওয়া বা নিঃস্বতা বলে মনে কবো। এবং তাই, তুমি একটি সম্পদ বাঁচিযে বেখেছো বুকের ভেতর, মস্তিষ্কেব কোষেব ভেতব— মহার্ঘ করে, যা দিয়ে তুমি প্রতিদিন শুরু কবো।

কিন্তু একথা ভাবলেই তোমার আশ্চর্য লাগে যে, সম্পূর্ণ সুস্থ শবীর নিযে যদি তুমি তা করতে, তাহলে কতটুকু পেতে। মাদাবিব খেলা যে দেখায, সে হাততালির পব আব কতটুকু কি পায? অথচ তুমি একজন বাজিকবও হতে পারবে না। এখন লোকে যা দেয, তা হচ্ছে অসুস্থতাকে সেলাম করা অথবা পয়সা দিয়ে ঘৃণাব সম্পর্ক বজায় বাখা। পযসা হচ্ছে সেই জিনিষ, যাব পিঠে সবসময় সহানুভূতিব সীলমোহর থাকে না. যাব বুকে পরিশ্রমেব মূল্য অংকিত থাকে না।

এসব ভাবতে ভাবতে রোদ আব পরিশ্রমের ফসলেব মতো একসময ক্লান্তি আসে ভাবী বোঝা হয়ে। তুমি ছবিব পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ো। এবং এটাই হযে উঠে অপেক্ষাব নিজস্ব ধরণ যতটুকু না বিশ্রামেব কায়দা। এখন. তোমাকে দেখে যেকোন লোক অনায়াসে বলতে পারবে যে. শারীরিক যন্ত্রণা প্রকাশেব গুণাবলী তোমার যথেষ্ট আছে। তুমি অবশ্য বলবে যে, তাদেব মুখগুলিও তোমাব পড়া আছে, যারা তোমার চিত্রণ নিয়ে গম্ভীর ব্যাখ্যা দিতে পারে. ছবিব সৌন্দর্য নিয়ে কেবল

তুলনা চালিয়ে যেতে পটু। মানুষের মুখ, তুমি অনায়াসে পড়তে পারো, তাই চোখ বুঁজে আছো। কিন্তু তুমি জানোনা, তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা কলেজে পড়ায় বা স্কুলে, যারা নিজেদের বিদগ্ধ ভাবতে ভালোবাসে এবং তুমি যাদেরকে হাড় বজ্জাত বলো।

তুমি যখন শুয়ে থাকো, তখন মানুষের পায়ের শব্দ তোমার কানে ঘণ্টমের আওয়াজ তোলে। জুতোর শব্দ কখনো কখনো তোমার কাছে মধুর মনে হয়। দ্রুত বা ধীর লয়ের মধুরতা তুমি আবিষ্কার করতে পেরেছো, হয়তো তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো বলে কিংবা তোমার পায়ের ঘাটতি দিয়ে। সেই মধুবতা মিশে যেতে থাকে পয়সাব শব্দে। যে পয়সা পড়লো অনেকক্ষণ পরে এবং লোকটি নিশ্চয়ই মচ মচ করা নতুন জুতো কিনেছে। তোমার মনে হলো ক্যাথিড্রালেব সিড়িতে যাজকের ভাবী বোতামটা ছিঁড়ে পডলো। পয়সাব শব্দে তোমার অনেক কিছু মনে হয়। যেরকম ভাবে মনে হয়েছিলো, ঠাকুরমার বেঁধে দেওয়া শৈশবেব আধুলিটা কোমরের তাগা ছিঁড়ে টুপ কবে ঝরে পডলে— চুপসে যাওয়া আতাফলেব মতো, অথচ যুবকটি তার এক বিসর্গও টের পেলো না।

আধুলি যখন গডিয়ে আসে, তখন রেলগাড়ির ছুটন্ত চাকার কথা তোমার মনে হয। তোমার মনে হয— নোটগুলি আকাশে উড়ে পাখনাওয়ালা ঘুড়ির মতো দাম্ভিক চেহাবা নিয়ে. যেগুলি ধববাব জন্য একটা উঁচু মাথাওযালা বাড়ি ও চন্দনকাঠের মই দরকাব।

কিন্তু, লোকে যেভাবে পয়সা নিয়ে স্বপ্ন দেখে, তুমি তা পারো না, এমনকি মানুষ বেঁচে থাকাব জন্য স্বপ্ন ধার কবে, সেটাও তুমি জানো না। তাই, যে রাতে ঈশ্ববপুত্র এসে তোমাকে কানে কানে জিজ্ঞেস কবলো— তুমি কী হতে চাও? —যাদুকর না রঙমিস্ত্রী?— যাজক না ধীবর? না যাজক— না যাদুকর, তুমি ধীবব হয়ে সাবাবাত সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ফিরে এলে সকালে হাজাব বছরেব ক্ষুধা আব কুষ্ঠ যন্ত্রণা নিয়ে। আব সাতসকালে ক্যাথিড্রালে গিয়ে যাজককে জিজ্ঞেস কবলে —গীর্জাব ঘণ্টাধ্বনি সমুদ্রকে কেন শান্ত কবতে পাবেনা। ক্যাথিড্রালের যে সিড়িতে তুমি আগে পড়ে থাকতে, এবং যেখানে বসে যে যাজক তোমাকে শিখিয়েছে ঈশ্বরপুত্র চিত্রণের ব্যাকবণ, সেখানে তুমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলে— আজকাল দুঃখ শব্দটা তোমাব কাছে কত সাদামাটা মনে হয়। তখন যাজক নিশ্চয়ই ভেবেছিলো যে, মানুষেব বেঁচে থাকাব জন্য যে একজন দেবতাব প্রয়োজন হয়— আত্মপোলব্ধির এই দর্শনটা তুমি এতোদিনে জেনেছো। আব তুমি ফিবে এলে. এই ধারণা নিয়ে অনায়াসে যেভাবে তারা উপদেশ ধাব দিয়ে বেঁচে থাকে. যারজন্য কোন শুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়না। ফিরে এসে তোমার মনে হয়েছিলো, জরুবী কথাটাই বলা হয়নি।

তোমার এরকমটাই হয়, সব এলোমেলো আর তালগোল পাকিয়ে যায়। হয়তো তাই, তুমি কোন স্বর্গীয় উপমার সাথে মবচে পড়া পুরনো বাক্স খোলার শব্দ খুঁজে বেড়াও। তোমার শরীবেব বিশ্রী গন্ধে যখন তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন তোমার মনে পড়ে লাইট হাউসের বাতি এবং গরম ভাতের কথা। কাক দেখলেই তোমার চোখে ভেসে উঠে বৃদ্ধ লোকেদের ছবি, যাদের হাতে থাকে আদবণীয় ঈর্ষাব মতো কোন বাঁকা লাঠি এবং তারা নাকি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে কেবল স্মৃতির মতো বর্জ্য

পদার্থ গিলে। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীদের কোন স্মৃতি থাকেনা, যেভাবে সাপের কোন পা থাকেনা।— এভাবে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে তুমি কি বলবে? হয়তো বলবে যে, তোমার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই তার কাজটা ভালোভাবে করছে না। কিন্তু তুমি তা বলবে না, অথচ তুমি এটাও সঠিক জানোনা যে, মনে করতে পারাব যেমন নিজস্ব চরিত্র আছে, তেমনি ধাবণারও একটা অবয়ব থাকে।

তুমি এটাও জানোনা যে, অপেক্ষা যখন তোমাকে নির্বিকাব সাজায়, তখন তোমার মুখমণ্ডল ক্ষযে যাওয়া শিলাখণ্ডেব মতো দেখায়। যে শিলাখণ্ডের বযস গোনাব নামতা এখন তোমার কাছে অজানা। যেমনভাবে তুমি আব মনে করতে পারোনা, কোন ভবদুপুবে আদৌ বিয়াল্লিশ পেরিযে ছিলো কিনা। তুমি কেবল নির্বিকারের তবঙ্গহীন বঙ মেখে চুপ চাপ বসে আছো। তুমি শুযেছিলে, কিন্তু রোদ পড়ার সাথে সাথে একথা ভেবে হাসি পেযে উঠে পড়লে যে, সমুদ্রচাবী এক ধীবর বলেছিলো— সূর্য নিশ্চযই আজ বেশি মদ গিলেছে. না হলে আজ তাব অত তেজ হতোনা। তোমার হাসি পেযে যেতে পাবে, কিন্তু ভেবে দেখো লোকটি তাব তেষ্টাব কথা কি ভাবে জানিযেছিলো। আব তেষ্টা পেলে তুমি কি করো— ফাটা ঠোঁটে কেবল জিভ চালাতে থাকো, যেখানে লেগে থাকে বিড়ির কষের মতো স্বাদ। এখন তুমি তাই কবছো এবং এখন তোমাকে পানীযেব কথা বললে, তুমি নিশ্চযই বলবে, ডাব ও দেশী মদ কি কি কাবণে তোমাব প্রিয, যাব স্বাদ সম্পর্কে বলতে তুমি একটু কুণ্ঠিত হবে, এইজন্য যে. অনেকদিন তা তুমি পাওনি। এমন কি, পবিপূর্ণ আহাব বলতে কি বোঝায, তা তুমি ঠিক ঠিক বলতে পাববে না, তারচেযে ববং বিড়ি ধাব দিতো যে ভিখিবি তাব কথা তোমার কাছে অনেক গুরুত্বপর্ণ মনে হয। কেননা, সে বলেছিলো— আহাব হচ্ছে, মলত্যাগেব মতো একটা নিত্যকর্ম মাত্র এবং মানুষ মলত্যাগ না কবেও অনেকদিন বাঁচতে পারে। তুমি এমন এক কথা শুনেছিলে, যা তোমাকে কোন ধর্মযাজক শোনাতে পাবেনি। এখন তুমি আহারে কোন আশ্চর্যতা খুঁজে পাওনা, কেননা মাছ হচ্ছে বোদ চশমার মতো যা সবাইকে মানায না আব গবম ভাত শীতবস্ত্রেব কথা মনে কবিযে দেয যাবজন্য সাবাবছব অপেক্ষা কবতে হয।

এখন তুমি ধীবে ধীবে গুছিয়ে নিচ্ছো, তোমাব যা কিছু উপকরণ ও উপার্জিত মুদ্রা। তুমি গুছিযে নিচ্ছো শুধু দুপুব ফুবিযে গেছে বলে নয, তুমি তৈবী হযে নিচ্ছো এইজন্য যে, এবপব অফিস আব স্কুল ফেরত মানুষেব বাড়াবাড়িতে তোমাব ছবি হবে বাজাবেব মাছেব মতো. বেলা বাড়াব সাথে সাথে যে মাছগুলিব পচন শুরু হয। খানিক পবেই তুমি রূপান্তবিত হবে এক আশ্চর্য স্রষ্টা থেকে ফুটপাত দখল কবা এক আবর্জনায— লোকেবা তাই ভাবে। এবং তুমি ভেবে দেখো, ভেড়াব দল যেভাবে ঘবে ফেবে ধূলা উড়িযে, তারা সেইভাবে হেঁটে যাবে— জুতাওয়ালা মানুষগুলি, যাদেব পাযে থাকে ফুটপাত পালিশ করাব এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তখন তুমি কষ্ট পাও, সত্যিকাবেব এক কষ্ট— যারজন্য চোখেব জল থাকে না অথচ বুকেব ভেতর সমস্ত ইট গুড়া হতে থাকে। আজও তাই হবে. যা হয প্রতিদিন, ছবি— তার অবয়ব হাবাবে, তার গঠন ভেঙে যাবে তোমাব মতো এবং একসময় ছবিটা বিকৃতভাবে থেৎলে যাবে. ব্ল্যাকবোর্ডেব মতো মুছে দেওয়া হবে বেয়াদপের

মতো আঁকা তোমার ছবিটা। চক, কাঠ কয়লা আর ইটের গুড়া একাকার হয়ে রঙ ধরবে পরিত্যক্ত উনুনের এবং সেখানে থাকবে শুধু জুতাওয়ালা মানুষের পদচিহ্ন।

তুমি এখন চলে যাবে সেখানে, প্রতিদিন যেখানে যেতে তুমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো। সমুদ্রের তীর হচ্ছে সেবকমই এক আশ্চর্য স্থান, যে স্থান সব শহরে থাকেনা অথচ যার সাথে তোমার সম্পর্ক আশৈশব।

তুমি যখন তৈরী হয়ে বসবে তোমার কাঠের গাড়ীতে, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাবে কাঠের ঘোড়ার মতো। তুমি চলবে সেইভাবে যেভাবে লোকে চলতো বাণপ্রস্থে।

তুমি চলতে থাকো সেই আশ্চর্যকর ছন্দে, যে ছন্দে যন্ত্রণার মত্ততা থাকে। এবং তোমার ভাবখানা এমন যে, মনে হতে পারে— তুমি এইমাত্র রওনা হচ্ছো অনুপস্থিতির সমষ্টি ভাঙতে।

রাস্তা তার ভীড় বজায় রাখে, এবং তুমি গাড়ী, স্কুটার আর মানুষের মধ্যে কাঠের গাড়ীতে বসে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভারসাম্যের খেলার মতো চলতে থাকো, তখন অবশ্যই এক রঙ্গভূমির কথা মনে করা উচিত। এবং তোমার মনে বাখা উচিত, রাস্তা হচ্ছে সেই ফাঁদ—যে ফাঁদে মৃত্যু সবসময় কেতাদুরস্ত আবির্ভাবের জন্য উদ্দীপ্ত থাকে। যাব দেখা পেতে পারো ট্রাফিক পুলিশের মতো যেকোন মোড়ে। এবং রাস্তা হচ্ছে, সার্কাসের সেই তার— যাব উপর তোমাকে ভাবসাম্যের খেলা দেখাতে হয় প্রতিদিন। তখন তোমার শরীরের উকুন সতর্কতায় নড়াচড়া কবে না এমনকি শরীরের দুর্গন্ধ তোমার দিকে চেয়ে থাকে বিমুগ্ধ হয়ে। কিন্তু তোমার তা মনে হয় না, কেননা, তোমার কাছে বাস্তা হচ্ছে দানবের জঠরের মতো, যেখানে মৃত্যু হলো নিদ্রার সহোদরা, যার সাথে ইশারায় কথা হয় প্রতিদিন। এবং ব্যস্ত রাস্তা তোমাব কাছে দাবি কবে সেই মনোযোগ ও অনুশীলন, যা দিয়ে একজন বাজিকর চোখ বেঁধে ছুরির খেলা দেখায়।

ভাবসাম্যেব খেলা দেখাতে দেখাতে তুমি যখন সমুদ্রের তীবে এসে পৌঁছবে, তখন বালুভূমিতে তোমার কাঠের গাডী তার গৌববেব দ্যুতি হারাবে। তার চাকা বালুর ভেতর ডুবে যাবে, যেভাবে মানুষ দিবানিদ্রায় ঢলে পড়ে। তুমি তার উপর বালু জড়ো করে ঢেকে দেবে, সে থাকবে বালুর গোপনীয়তায়।

তুমি যখন কাঠের গাড়ী থেকে নেমে শুরু করো আরেক আশ্চর্য্যজনক যাত্রার, সূর্য তখন তার প্রখর যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারেনা। তখন সে সত্যি ঢলে পড়ে সন্ধ্যার উৎসব দেখার অছিলায়। অবশ্য বালু তোমাকে স্বাগত জানায়, যখন তুমি দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলে ধরে সামনে নিয়ে যাও এবং এগোতে থাকো ক্রমশ সমুদ্রের দিকে। তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করো বা না করো— তোমাকে সহ্য করতে হয় বিরামহীন এক বিশ্রী যন্ত্রণা, তোমার হাত ও পায়ের ক্ষতে করাতের সূক্ষ্ম দাঁতেব মতো বালুর কামড় বসতে থাকে। তোমার ন্যাকড়াগুলি, যেগুলি ক্ষতের উপর মমতার কাজ করে, সেগুলি অবশ্যই দরিদ্র, ফলে তোমাকে অনুভব করতে হয় শরীর দিয়ে, পরিপূর্ণ যন্ত্রণা বলতে কি কি বোঝাতে পারে। তোমার চোখে মুখে ঝুলে পড়ে সহনশীলতা। ঝকঝকে বাসনের মতো তোমার যে ধৈর্য্য ছিলো, তা হারিয়ে যায়, তুমি হাঁফাতে থাকো কামারের উত্তপ্ত হাপরের মতো। তারজন্য

তুমি লজ্জা করোনা— কোলাহল নিয়ে যারা এখানে এসেছে— তারা কখনোই তোমার দিকে তাকাবে না। তারা এখানে এসেছে স্বাস্থ্য উদ্ধারের বিধিসম্মত নিয়ম পালন করতে, তাবা এসেছে বেড়ানোব অভ্যাস বজায় রাখতে অথবা অবৈধ প্রেমের গভীরতা মাপতে, অনেকেই এসেছে প্রথমবাব সমুদ্র দেখতে। বাকিরা যারা দোকানি তাবা উন্মুখ থাকে কেবল সেসব দ্রব্য নিযে যেগুলি নির্মিত হয় শঙ্খ বা ঝিনুক দিয়ে। এবং তারা শুধু ব্যস্ত থাকে এটা বোঝাতে যে, এবচেযে দুষ্প্রাপ্য আজ আর কিছু হতে পারেনা। এভাবেই এখানে উৎসবেব ভীড় লেগে থাকে প্রতিদিন, বিকাল থেকে বাতেব বিস্তাব পর্যন্ত।

তুমি যখন সমুদ্রেব খুব কাছে এসে পৌঁছাও— সেটা হযে উঠে সাধনার ফল, যে সাধনা সিদ্ধ হয় ইচ্ছা ও যন্ত্রণার মিশ্রণে। তুমি ইচ্ছে কবলেই এখন সমুদ্রেব জল তুলে নিতে পাবো চোখে-মুখে। ঘবে ফিরলে যা যা করতে। ঘব— অত্যন্ত সাদামাটা এই একটি শব্দ তোমাকে উত্তপ্ত কবতে যথেষ্ট। আসলে, তুমি তখন বিশ্রীভাবে ভেঙে পড়ো। তোমার কথায ঝড়ে পড়ে সামুদ্রিক ব্যথা— ঘর হচ্ছে একটা নিষ্প্রয়োজনীয় শব্দ, যার মাথায তালপাতার ছাউনি থাকে, ভেতবে জমে থাকে কুৎসিত ব্যথার অন্ধকার ও আক্ষেপেব অজস্র পেবেক যা কফিনে ঠোকা হয়। তোমাব কাছে ঘব হচ্ছে, সেই স্থান— যেখানে মানুষ প্রতিদিন অন্তত একশো' বার মবে। যেখানে পালন কববাব মতো থাকে কেবল শোক উৎসবেব নীববতা। তোমার ঘর বলতে এখন আব এটা বোঝায় না যে, তার অবস্থান সমুদ্রপাবেব কোন ধীবব পাড়ায়, যাব ভেতবে দুলতো ভাঙা চিমনীর একটা লণ্ঠন আর প্রবীণ এক কাঠের চৌকি বিছিয়ে বাখতো তালপাতার মাদুব। ঘর বলতে বোঝায় না, কেবল তেল চিটচিটে বালিশ, ঘাম-ময়লা মেশানো অপরিচ্ছন্ন কাপড়েব গেঁজালো গন্ধ, স্মৃতিব কাণ্ডকাবখানা নিযে ছিটিযে থাকা নিতান্ত কিছু সামগ্রী, ছাড়পোকার ডিম ও পিঁপড়েব বাসা। ঘব হচ্ছে ব্যথাব সমষ্টির মতো একটা শহীদ স্তম্ভ। যেখানে ঝোলানো থাকে গেরস্থালির বিবর্ণ ক্যালেণ্ডার, বাচ্চাবা পেচ্ছাব ছিটিয়ে যাব সাথে নৈকট্য বজায় বাখে। তোমাব বিচাবধাবা এবকম হতে পাবে, তুমি মনে কবতে পাবো যে, গেবস্থালি হলো —অবিশ্বাসের নিস্তবঙ্গ তামাসা আব চেঁচামেচিব উপদ্রবে ভরা একটা বেলুন। তুমি যেরকম ভাবেই ভাবো না কেন— ঘব শব্দটাকে তুমি হাবাতে পাবো না, সে ফিবে ফিবে আসে এবং তোমাব মস্তিষ্কে আঘাত কবে আব বুকেব ভেতব তাব চিহ্ন বেখে যায।

তুমি প্রশান্তিব স্তব জানো না, কিন্তু বসে আছো সেভাবেই। তালগাছেব গুঁড়িব মতো এক গভীব মৌনতা নিয়ে। মৌনতা এক আশ্চর্য সঙ্গী যে জীবনভব অনুসবণ করে। সেই মৌনতা তোমাকে শুদ্ধ কবে, প্রস্তুত কবে তোলে এবং মৌনতা প্লাবিত করে তোমাব অস্তিত্ব।

তুমি শুরু করতে থাকো— যা কবো এখানে প্রতিদিন, যাবজন্য উপকরণ বলতে কিছুই লাগে না, এখানে বালু ছাড়া আর কিছুই মানায় না। যখন তুমি শুরু করো, শরীরের ভঙ্গিটা হযে পড়ে কবব খোড়াব মতো। কিন্তু প্রথম কাজটা করো বেঁচে থাকা আঙুল দিযে, সেটা হলো বালুর উপর আঁকা। শায়িত একটা মানুষের গঠন তৈরী হয়, যার দু'হাত থাকবে বুকেব উপর, যার চোখ থাকবে বুঁজে। তোমাব

আসল কাজটা শুরু হয় এরপরই। বালু জড়ো করে সেই শরীরে স্থাপন করো হাড়-মজ্জা-মাংসের গঠন, যা করে একজন ভাস্কর বা মৃৎশিল্পী। কিন্তু তুমি করো নিজস্ব ধাঁচে— যার কোন শুদ্ধ ব্যাকরণ নেই। সমুদ্র পাড়ে পড়ে থাকা ঝিনুকের ভাঙা কোন টুকরো হয়ে ওঠে যাদুকাঠি, যা দিয়ে তুমি বালু কেটে কেটে তুলে আনছো শরীরের ভাঁজ, পেশীর সংকোচন বা চামড়ার শিথিলতা, বুকের পাঁজর আর চোয়ালের হাড়, নাকের খাঁজ ও চোখের নীচের গভীর দাগ। এভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও সমুদ্র পারে শুয়ে থাকে বালুর একটা মূর্তি, যাকে তুমি বলো বালু দিয়ে গড়া ঈশ্বরপুত্রের ছবি।

তোমার ছবি থাকে সমুদ্রের খুব কাছে, সন্ধ্যা গড়াবার সাথে সাথে যার ঢেউ এসে কোলে নিয়ে যাবে। এবং সেটা হবে ভাসানের মতো আর তুমি রেখেছো সমর্পনের কায়দায়। যদিও তোমার ভেতরে গুমরে উঠে সমুদ্রের প্রতি অভিমান ও ভালোবাসা, যা তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং তোমার কাছে সমুদ্র হচ্ছে একজন দেবতা, যে ইচ্ছে করলে সব ফিরিয়ে দিতে পারে— তোমার ডিঙি নৌকা ও জাল ফেলার ক্ষমতা। কিন্তু তার আচরণ হচ্ছে সৎ-মায়ের মতো, যার কাছে গেলেই ঝড় তুলে আর ঢেউয়ের মতো চোখা চোখা কথা বলে। তোমার এখন সত্যি চিৎকার করতে ইচ্ছে করে, তোমার বলতে ইচ্ছে করে— দেখো, আমি কি বানিয়েছি, পারোতো ভাঙো— যাকে তুমিও স্মরণ করো, আমি তার দোসর হয়েছি। কিন্তু তুমি তা বলতে পারো না, কারণ সমুদ্র তোমাকে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না, তুমি যা যা পারতে। সমুদ্র যে হিংসুক তা তুমি জেনে এসেছো শৈশব থেকেই। সমুদ্র নাকি প্রতিদিন একা একা ইডলির মতো দেখতে চাঁদটাকে গিলে ফেলে। আর তোমার মনে হয়, মানুষও সমুদ্রের মতোই বড়ো একা, যার ভেতরে থাকে নোংরা ব্যাধির মতো কুৎসিত এক ভয়াবহ হিংস্রতা। তবুও তুমি সমুদ্রের কাছে আসো।

তুমি এখন ঈশ্বরপুত্রকে শুইয়ে রেখে, তার পাশে বসে আছো, যে কোন এক অনন্ত যাত্রার প্রতীক্ষা। মানুষ ভীড় করে, দেখে, পয়সা ফেলে ও বলাবলি করে তোমাকে নিয়ে। কিন্তু তাতে তোমার কোন আগ্রহ নেই, পয়সা গোনার উৎসাহ নেই। চোখ ঝাপসা করে দেবার মতো দৃষ্টি নিয়ে তুমি চেয়ে আছো সমুদ্রের দিকে অপলক। সমুদ্রের শব্দের ভেতর যে নিঃস্তব্ধতা থাকে, তা তোমাকে গ্রাস করতে থাকে, তুমি আচ্ছন্নের মতো শুধু চেয়ে থাকো সমুদ্রের শেষ প্রান্তরে।

এখন সন্ধ্যা তার নোঙর ফেলবে, সমুদ্র তাই তার শব্দ বাড়ায়। কিন্তু তোমার কোথাও ফিরে যাবার তাগিদ নেই। কেবল ভেতরে ভেতরে উথাল পাথাল ঢেউ। এখানে জেগে থাকে তরতাজা মাছের মতো তোমার অনেক স্মৃতি। তোমার অনেক কথা মনে পড়ে, তোমার শুধু ক্ষরণই বাড়ে। তুমি শুধু বলতে চাও— আমাকে একবার জাল ফেলতে দাও, সমুদ্র পাখির হলুদ গানে একবার ভিজতে দাও।

এখন শুধু সন্ধ্যা বাড়ে। তুমি কিছুই বলতে পারো না, কিন্তু মানুষ ভিজতে থাকে, শিশুর মতো লাফাতে থাকে জলে। সমুদ্র-পূর্বের সেই যাদুকর, যে সবার বয়স কমিয়ে দিতে পারে, শুধু তোমাকে ছোঁবে না। তুমি থেকে যাবে ঘর থেকে সমুদ্র পযন্ত এক অচ্ছুত হয়ে। অথচ, তুমি চেয়ে দেখো, রুগ্ন ছেলেটাকে তার মা কি ভাবে সমুদ্রের জলে দাঁড় করাচ্ছে। দেখো, ছেলেটির শরীর থেকে অসহায়ের

বিবর্ণ রঙ খসে পড়ছে। তাব মায়ের চোখে নিশ্চয়ই সমুদ্রের নোনা জল। তুমি দেখো, যে ছেলেটি দাঁড়াতে পারেনা, তাব মা কি পরম মমতায কোলে নিয়ে এসেছে —এক গভীর বিশ্বাসে যে, সমুদ্র তাব পাযের শক্তি ফিরিযে দেবে। দেখো, মা তাব ছেলেকে কি ভাবে ধবে ধবে দাঁড় কবাচ্ছে এবং সমুদ্রেব স্পর্শে তার শরীব থেকে পুলক ও শিহবণেব দ্যুতি ঠিকবে পড়ছে। তুমি দেখো ছেলেটি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—। সে পারছে এবং অবশ্যই তাব মা কাঁদছে। তোমাব চোখেও সেই জল —যা সংক্রামিত করে, যাকে আনন্দ বলা হয অথচ যার কোন ভাষা নেই। আহা, দয়া যদি তোমাব জন্য এইটুকু কবতো। দযা কি তোমাব জন্য মা হতে পাবতো।

দযাব কথা মনে হলেই, চোখেব জল তাব উষ্ণতা হাবিযে ফেলে। যে বলতো, এখন থেকে তুমি বাবান্দায থাকো কিন্তু কাউকে ছোঁবে না। ছেলেমেয়েদেব সে বোঝাতো, কুষ্ঠ হচ্ছে সমুদ্র দেবতার অভিশাপ— যে কাবণে ঝড ওঠে ও নৌকা ডুবে। দযা হচ্ছে এক অদ্ভুত নারী, যে অকপটে বলতো— তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু এই অবস্থায নয। উপদেশ দিতে সে পছন্দ কবতো, বলতো—তুমি কিছু মনে কবো না, কিন্তু বাস্তায বসলে লোকে নিশ্চযই সহানুভূতিব পয়সা দেবে। দযা, তোমাব বউ, সন্ধ্যায যে ফুল বিক্রী কবতো এবং ফুলেব সাথে নিজেকেও। অথচ তাব ভেতবে অনুতাপেব কোন আগুন ঝবতো না ববং তোমাকে দাযী কবতো। দযাকে তুমি কি বলে আখ্যায়িত কববে?— তুমি তা আজো জানো না। অথচ সে রুগ্ন ছেলেটিব মাযেব মতো হতে পাবতো। কিন্তু তুমি নিশ্চিত যে— কেউ এসে তোমাকে দাঁড করাবে না। এমনকি যে আসতো প্রতি সন্ধ্যায— ভবঘুবে তৃষ্ণা, ভালোবাসা ও নির্মম উপদেশেব ফ্যাল ফ্যাল কবা দৃষ্টি নিযে সেও আসেনা আব পযসা নিতে। যাকে তুমি বলতে, তোমরা আমাকে গোব দিও সমুদ্র পাবে। সে আসেনা দীর্ঘদিন, নিশ্চযই তোমাব ছেলে এতোদিনে বঙমিস্ত্রী হতে পেরেছে।

এখন জোযার বাডছে। সবাই ফিবে গেছে— ঝিনুকেব দোকানি ও বেডাতে আসা মানুষ। ফিবে গেছে সমুদ্র পাবেব ঘোড়াও— এখন কেউ নেই, শুধু তুমি একা। সমুদ্র এখন তোমাব শবীব চাটছে। এবাব ভাঙবে ঈশ্ববপুত্রেব শবীব। দেখো, ঢেউযেব বাজনা তুলে সমুদ্র কিভাবে নিযে গেলো তোমাব ছবি। এবাব নিশ্চযই তোমাব পালা। কিন্তু তুমি, আবেকবাব দেখে নিতে চাও সমুদ্রেব দম্ভ। আবাব শুরু করতে থাকো— ছবি। বাগ তোমাকে অদ্ভুত শক্তি আব দ্রুততা দেয, কিন্তু সমুদ্র তোমাকে সুযোগ দেযনা কোন অবযব গডতে। সব ভাসিযে দেয। কিন্তু তুমি পাগলেব মতো আঙুল দিযে আঁকতে থাকো— আর সমুদ্র তা বাববাব মুছতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তুমি প্রতিদিনেব মতো হেবে যাচ্ছ, একটা উন্মত্ত ঢেউ এসে তোমাকে দূবে ফেলে দিয়ে যায। সমুদ্র তোমাকে তফাত বাখে।

তুমি একা পড়ে থাকো— নক্ষত্রেব ধাঁচে স্থির হযে। তুমি পডে আছো— ছবি মানুষ হয়ে।

সদানন্দ সিংহ

চক্রব্যূহ

হঠাৎ কানের কাছেই যেনো গাঁক—গাঁক—গুঁক্ করে একটা আওয়াজ। ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরে শচীন্দ্র চেয়ারে একটু বসতে যেতেই এই অমানুষিক আওয়াজটা শুনে চমকে ওঠে। আওয়াজটা অবার হয়, গাঁক—গাঁক—গুঁক। চেয়ারে না বসেই সে দাঁড়িয়ে যায়। আওয়াজটা কীসের তা সে বুঝতেই পাবে না। এইসময় কুসুম ঘবে ঢুকতেই সে কুসুমকে জিজ্ঞেস করে, ওটা কীসের আওয়াজ?

কুসুমেব হাতে একটা গামছা। ও হযতো একটু আগে হাত মুছছিলো ওটাতে। গামছাটাকে আলনায ঝুলিযে দিয়ে কুসুম জবাব দেয়, হেমেন্দ্রবাবুদের শুয়োর। সকালের দিকে একটা শুযোরকে বাঁধা অবস্থায় ওদেব বাড়িতে ঢোকাতে দেখেছি। পালবাব জন্যে বোধহয।

কুসুমের মুখ থেকে কথাগুলি শোনার পর শচীন্দ্রেব চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে ধপ করে চেয়াবে বসে বলতে থাকে. পালবার জন্যে আর জিনিস পেলো না। আজ থেকে শুরু হলো আরেক যন্ত্রণা। একটু শান্তিতে থাকবো তারও উপায় নেই। যত্তোসব—।

এবার শুয়োরটা ঘ-র-র-র কবে আওয়াজ করে ওঠে। শচীন্দ্র ডান হাতে কপালের দু'পাশটা চেপে শব্দ করে, উঃ। জ্বালালে দেখছি!

কুসুম ঘর থেকে বের হযে যাচ্ছিলো। একটু থেমে জিজ্ঞেস কবে, চা করবো?

—কর।

মিলি চা নিয়ে ঘবে ঢোকে। শচীন্দ্র ততক্ষণে অফিসেব জামা-কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জী পরে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানার এক কোণে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। পত্রিকার চাবিদিক জুড়ে খুন, জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্যাঙ্কলুট, নিরস্ত্রীকবণ নিয়ে আলোচনা, স্টার ওযার, নারী ধর্ষণ, ভূমিকম্প, আগ্নেযগিরির অগ্ন্যুৎপাত, এরোপ্লেন হাইজ্যাক, গুপ্তচববৃত্তির অভিযোগ, কূটনীতিক বহিষ্কার—ইত্যাদি সব সংবাদে পরিপূর্ণ। সংবাদগুলি যখন শচীন্দ্র একটা ঔৎসুক্য নিয়ে পড়ছে তখনই মিলি বলে ওঠে, বাবা চা।

এইসময় আবাব শুয়োরটা গাঁক—গাঁক কবে ডেকে ওঠে। ইতিমধ্যে আওয়াজটা একটু গা সহা হয়ে গেছে শচীন্দ্রের। পত্রিকাটা সরিয়ে মিলিকে দেখে আব বলে, টেবিলে রেখে দে।

মিলি চায়েরকাপ সহ ট্রেটা টেবিলের ওপব নামিয়ে রাখে। চায়ের কাপটা ছাড়াও মুড়ি ভাজা রাখা একটি বাটি রয়েছে ট্রের ওপব। রেখেই মিলি চলে যায়। শচীন্দ্র পত্রিকা পড়তে পড়তে চা-মুড়ি খায়। পাঞ্জাবে শিখ চরমপন্থীদের তৎপরতা, মণিপুবে সেনাবাহিনীর গুলিতে পি. এল. এ. নেতা নিহত. বিহাবে দুই নিম্নবর্ণ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে

সংঘর্ষ—এইসময়ই আবার ঘরের ভেতর ঢুকে মিলি শচীন্দ্রকে ডাকে, বাবা আরেকটু মুড়ি ভাজা দেবো?

পত্রিকা পড়া থামিয়ে শচীন্দ্র মিলির দিকে চায়, না রে, আর খাবো না।

মিলির হাতেও চায়ের কাপ। সেও চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে মিলি আস্তে আস্তে বাবার পাশে এসে বসে। বাবাকে দেখে। বাবা আবার পত্রিকার মধ্যে ডুবে গেছে। ইস্, কী রোগাই না হয়ে গেছে বাবা! সারা বছর ধরে পেট খারাপ। প্রায় সারাক্ষণই খিটখিটে মেজাজ। সংসারের নানা ঝামেলা। এসবের জন্যেই বোধহয় বাবার মাথার সামনের দিকের চুলগুলি একদম উঠে গেছে। অথচ আগে এমন ছিলো না। সে যখন ছোট্ট ছিলো তখন বাবাকে কি সুন্দরই না দেখাতো। এক ঝলক হাসি যেনো বাবার মুখে সবসময়ই লেগে থাকতো তখন। অফিস থেকে ফিরে এসেই তাকে কোলে তুলে হেঁটে বেড়াতো। রাত্রে ঘুমোবার আগে কতোরকম সুন্দর সুন্দর ভয়ংকর রূপকথার গল্প মেজদা, ছোড়দা আর তাকে বসিয়ে শোনাতো। বড়দা বয়সে একটু বড়ো বলে বই পড়ার ভান করে দূর থেকে কান পেতে চুপিচুপি শুনতো। সেসব দিনগুলি আজ কোথায় বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেছে। বড়দার কথা মনে এলে বুক ফেটে কান্না আসে মিলির। কয়েক বছর আগে প্রকাশ্য রাজপথে লোকজনের সামনেই বড়দা খুন হয়ে গেলো। তিনজন আততায়ীর ছোরার আঘাতে বড়দার হৃদপিণ্ডটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো। ওর একমাত্র অপরাধ—অন্যায় জিনিসটাকে ও কোনোদিনই মানতে শেখে নি। কতোবার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকেই বাবাও কেমন জানি পাল্টে গেলো। মেজদা আর ছোড়দার জন্যে বাবার আরো দুঃখ এবং রাগ। আর্টস গ্র্যাজুয়েট হয়ে আজো বেকার মেজদা শুধু চাকরীর দরখাস্ত করে যায়, কারণ দেড়বছর পরই তার বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে যাবে। ফলে সে সরকারী চাকরী আর পাবে না, এমন কি কোন প্রাইভেট ফার্মে কোনোদিন যে চাকরী পাবে তাও আশা করা যায় না। এদিকে আজ একবছরের ওপর মেজদা তার ভালোবাসার পাত্রীকে ঘরে এনে তুলেছে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে এবং বৌদি এখন সাত মাসের গর্ভবতী। বাবা-মা অবশ্য এই বিয়েতে খুব একটা আপত্তি করে নি। শুধু বাবার মন্তব্য ছিলো, 'আমার যতদিন চাকরী আছে ততদিন না হয় কোন চিন্তা নেই; কিন্তু এরপরের ব্যাপারটা যেন তোরা ভেবে রাখিস।'

মিলি তার বাবাকে ডাক দেয়, বাবা।

টিভি দেখতে ভালো লাগছে না শচীন্দ্রর।

তাজা সব খবরগুলি পড়ার পর পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যে শচীন্দ্র যখন বিশেষ বিজ্ঞাপনের কলামগুলি খুঁজছে তখনই সে মিলির এই ডাকটা শুনতে পায় এবং পত্রিকার পাতা ওল্টাবার সময় মিলির দিকে চোখ পড়তেই সে দেখে মিলি তার দিকে মমতায় মাখা একটা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, কি রে? কিছু বলবি?

বাবকে হঠাৎ তার দিকে চাইতে দেখে মিলি হাসে। বলে, তোমার ঘাড় টিপে দেবো বাবা?

মিলি জানে প্রায়সময়েই শচীন্দ্রের ঘাড়ে ব্যথা হয়। ব্যথা বেশী হলে সেটা আস্তে আস্তে মাথার দিকে চলে যায়। মিলি প্রায়ই ঘাড় টিপে দেয় বাবার।

—দিবি টিপে? আচ্ছা দে তাহলে।

চায়েব কাপ আব পত্রিকাটা টেবিলেব ওপব বেখে শচীন্দ্র বিছানাব ওপব উপুড় হয়ে শুযে পড়ে। মিলিও তাব হাতেব চায়েব কাপটা বেখে শচীন্দ্রেব ঘাড় টিপে দিতে আবম্ভ কবে। বেশ আবাম লাগে শচীন্দ্রেব। সত্যিই তাব এই একমাত্র মেয়েটা সবসময়ই তাকে আবামে বাখতে চেষ্টা কবে। ভালো মেয়ে মিলি। সুখে ঘব করুক ও স্বামী নিয়ে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ওকে পাত্রস্থ কবতে পাবলো আব কই। কতো খোঁজাখুঁজি, পাত্রেব বক্স নম্বরের ঠিকানায় লেখালেখি—কোন কিছুই কাজে লাগেনি। মিলিব বয়স আজ ত্রিশেব কাছাকাছি। ছ'বছব আগে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে চাকরীর চেষ্টা করতে করতে ও এখন আবার শর্টহ্যাণ্ড শেখার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মিলির জন্যে একটা সৎপাত্র না পাওয়া পর্যন্ত বোধহয় তার মুক্তি নেই। মিলি সে তাব বড়ো স্নেহের।

—বাবা।

মিলিব ডাকে শচীন্দ্রেব চমক ভাঙে। শুয়োবেব আওয়াজটা এখন আব শোনা যাচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে বোধহয়। শচীন্দ্র উত্তব দেয়, কি বে?

মিলি তাব বাবাব ঘাড় টিপে দিতে দিতে বলে, আজ পুলিশ এসেছিলো আমাদেব বাড়ি।

—পুলিশ?

বাগ ধবে যায় শচীন্দ্রেব। গত বছব দুই থেকে পুলিশ আসছে তাদের বাড়ি। হারামজাদা নিমুটা কীসব করে বেড়াচ্ছে—মাবপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ছিনতাইবাজিব কথাও মাঝে মাঝে শুনতে পেয়েছে সে। তাব এই ছেলেটাই হয়েছে সবচেয়ে বখাটে, বেশ কয়েকবাব পবীক্ষা দিয়েও হাযাব সেকেণ্ডাবী পাশ কবতে পাবেনি। তাই অনেক বছব আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে সে। কুসুমেব ওপবও বাগ ধরে যায় শচীন্দ্রেব। ছেলেটাকে বেশি করে লাই দিয়েছে ওব মা-ই।

মিলি আবার বলে, ছোড়দাকে ধবে নিয়ে গিয়েছিল।

—বেশ হয়েছে। ভালোই হয়েছে। আপদটা গেলেই বাঁচি।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে শচীন্দ্র। আসলে ওগুলি তার রাগেব কথা। কিন্তু ছেলে অন্ত প্রাণ কুসুম তো তাকে অন্যবাবের মতো কিছুই বলে নি এ ব্যাপাবে। মিলিকে জিজ্ঞেস করে সে, তোর মা জানে?

—জানবে না কেন। মা-ই তো দাবোগার কাছে কতো কাকুতি-মিনতি করলো। কিছুক্ষণ থামে মিলি। তারপর আবার বলে, বিকেলবেলা ছোড়দা এসে বাড়িতেই খেয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পাবে শচীন্দ্র। নিমুকে ছাড়া হয়েছে দেখেই কুসুম এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বলে নি, নইলে—।

মিলি এমন সময় ঘবেব সুইচটা টিপে দেয়। আলো জ্বলে ওঠে। শচীন্দ্র জানালা দিয়ে বাইরেব দিকে তাকায়, চাবিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। হঠাৎ শুয়োরটা আবার ঘ-র-র-ব করে ডেকে ওঠে। শচীন্দ্র একটু চমকে যায়। ইতিমধ্যে সে শুয়োরটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো।

পরদিন সকালে হেমেন্দ্রবাবুদের ওখান থেকে হৈ-হুল্লোড়-হাসির শব্দে শচীন্দ্রর ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে সে দেখে ঘরে কেউ নেই। মিলি, কুসুম—দু'জনেই উঠে পড়েছে। বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে সে দেখে ছ'টা বেজে গেছে। উঠতে ভালো লাগেনা তার। আবার চোখ বুঁজে পড়ে থাকে সে। তাছাড়া আজ ছুটির দিন। শুয়ে শুয়েই সে মিলি আর বৌমার কথাবার্তা শুনতে পায়। কুসুম বোধহয় বাসন-টাসন মাজছে। দুই গুণধর ছেলের তো এইসময় বিছানা ছেড়ে ওঠার প্রশ্নই নেই। আজ রোববার। আগামী সোমবার বকেয়া ডি. এ.-র একটা এরিয়ার বিল হবার কথা। একশো টাকার মতো সে পাবে। ধুস্, বারবার অফিসের চিন্তা তার মনে এসে পড়ে। কতোবার সে ঠিক করেছে অফিসের কোন চিন্তাই আর সে বাড়িতে এসে করবে না। কিন্তু বারবারই তার ভুল হয়ে যায়। ছটফট করে কেউ যেনো ঘরে এসে ঢোকে। শচীন্দ্র চোখ খুলে তাকায়। মিলি ঘর ঝাট দিতে ঘরে ঢুকেছে।

চোখ-মুখ ধুয়ে শচীন্দ্র যখন চা খেতে খেতে বাজারে গিয়ে মাছ কিনবে কিনা চিন্তা করছে তখনই শুয়োরটা ভীষণভাবে গুক গুক করে আওয়াজ করতে আরম্ভ করে দেয়। সকালবেলায় এই আওয়াজটা অসহ্য লাগে শচীন্দ্রের। তাড়াতড়ি চা খেয়ে নেয়। তারপর বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়ে। পেছন থেকে কুসুম চেঁচায়, শাকসব্জী কিছুই নেই ঘরে। নুনও লাগবে।

রাস্তায় নেমে আসে শচীন্দ্র। শুয়োরটার আওয়াজটা ভীষণভাবে আসতে থাকে গু—ও—ক গু—ও—ক। এই আওয়াজের সঙ্গে কিছু লোকের মিলিত হৈ-চৈও কানে আসে। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শচীন্দ্র কৌতূহল বশতঃ হেমেন্দ্রবাবুদের বাড়ির দিকে চাইতেই দেখে দু'জন লোক খুঁটির সঙ্গে পেটে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা শুয়োরের পাগুলি বেঁধে ফেলবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে হৈ-চৈ করতে করতে। আশ্চর্য, শুয়োরটা ওর পাগুলিকে বেঁধে ফেলতে একদম দিচ্ছে না। যার ফলে লোক দু'জন বাঁধতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। শুয়োরটা খুঁটিটাকে কেন্দ্র করে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। শচীন্দ্র দাঁড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা দেখতে থাকে। লোক দু'জনের একজন নুয়ে মুখ দিয়ে আঁঃ আঁঃ শব্দ করে শুয়োরটার পেছনের পা দু'টোর উদ্দেশ্যে দড়ি ঢুকিয়ে দিতেই শুয়োরটা লাফ মেরে সরে যায়। আবার অন্য লোকটা একই চেষ্টা করে। শুয়োরটা আবার বেরিয়ে যায়। তীব্র আওয়াজ হতে থাকে গু—ও—ক গু—ও—ক। শচীন্দ্র মনে মনে তারিফ করে, বাঃ শুয়োরটার বেশ বুদ্ধি তো। কিন্তু দু'জনের মধ্যে একজন কোত্থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা সংগ্রহ করে এনেছে। এনেই লোকটা লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে শুয়োরটার মাথায় জোরে এক ঘা বসিয়ে দেয়। শুয়োরটা আর্তনাদ করে ওঠে। এই ব্যাপারটা দেখে শচীন্দ্রের যন্ত্রণা হয়। একটা নিরীহ জন্তুকে বাঁধা অবস্থায় এইভাবে—ছিঃ। মনে হয় ডাণ্ডার ঘা-টা যেনো ওর মাথায়ই বুঝি এসে পড়েছে। শুয়োরটাকে কিন্তু তবুও বাঁধা যায় না। লোকটা তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে শুয়োরটার মাথায় পরপর লোহার ডাণ্ডা বসাতে থাকে আর বাঁচার জন্যে শুয়োরটা তীব্র আর্তনাদ করতে করতে খুঁটিটার এদিক ওদিক দৌড়োতে থাকে। শুয়োরটার জন্যে শচীন্দ্রের বেশ কষ্ট হতে থাকে। আহা-হা একটা অবুঝ জন্তুর ওপর এইরকম অত্যাচার। উঃ। কিছুক্ষণের মধ্যে শুয়োরটার মাথা ফেটে রক্ত

ঝরে। আস্তে আস্তে শুয়োরটার আর্তনাদ কমে আসতে থাকে। একসময় শুয়োরটার আর পালিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না। দাঁড়িয়ে শুধু হাঁপাতে থাকে রক্তাক্ত অবস্থায়। মার খেতে থাকে। শচীন্দ্রের আর দেখবার ইচ্ছে হয় না। শরীরটা যেন দুর্বল লাগতে আরম্ভ করে। এই সময়ই সে দেখে লোক দু'জন চটপট করে পাগুলি বেঁধে নিয়ে শুয়োরটাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। তারপরই লোক দু'জনের মধ্যে একজন ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে, কি রে হলো নাকি? চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকজন লোক ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। লোকটার হাতে কাঠের হাতলওয়ালা আগুনে তপ্ত লাল টকটকে একটা লোহার শলাকা। লোকটা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে মাটিতে শোয়ানো শুয়োরটার হৃদপিণ্ডে ভুঁ-স করে লাল লোহার শলাকাটা ঢুকিয়ে দেয়। শুয়োরটা আকাশ বাতাস ফাটিয়ে আর্তনাদ করতে থাকে ছটফট করতে করতে। শচীন্দ্রের হাত থেকে বাজারের থলিটা পড়ে যায়। একটা কেমন যন্ত্রণায় সে দু'হাতে তার হৃদপিণ্ডটা চেপে ধরে আর দেখে দোতলার ওপর থেকে হেমেন্দ্রবাবুরা শুয়োর মারা দেখছেন। শুয়োরটার আর্তনাদ যেনো সবকিছুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বুকটা চেপে শচীন্দ্র রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে।

সন্তোষ রায়

এঁটো

ভাস্কর্যের ছায়াটি উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে সরে এসে এখন কিবণলতাব শরীরেব ওপর পড়েছে। উত্তব-দক্ষিণে পা-মাথা কবে ঘুমিয়েছিল কিবণলতা। কিছু দূরে বাস্তা পেরিয়ে তেলপাম্প। একটু আড়াআড়ি ডানদিকে বটচারাব নিচে শহুবে কলমিযুবকদেব হাঁটু গেরে দম দেযার জাযগা; যাবা কিরণদেব প্রতিবেদনও ছাপায কাগজে। আকাশ-কুসুম কথাবার্তা বলে. যে সব জোড়া দিয়ে কিরণ বোঝে—বাবুবা সাংগাতিক শিক্কিত, কি কয কিচ্ছু বুজা যায় না। কিরণ, পঁয়তাল্লিশ হলেও শরীরে আবেদন ছিল। গম্ভীর হলেও উদাবতা ছিল শবীবে। বাবুরা এলে প্রথম কিরণলতাকেই খোঁজ করতো। দর একবারই বলতো, সেটা বাবুরাও জানতো।

এখন কিরণলতা দিনেব লম্বা সমযটি ঘুমিযে কাটায় বা শুয়ে। সন্ধ্যাব পরও সোজা হযে দাঁড়াতে পাবেনা। হাসপাতালে ডাক্তার কি বলে কিরণ বোঝেনা। তবে তলপেটের নিচে যন্ত্রণা টের পায। বিকেল শিথিল প্রায, ছায়াটি পুবে লম্বা হযে ক্রমশঃ মিশে যাচ্ছে। ঝাঁকা মাথায় একটি মেয়ে লম্বালম্বি ময়দান পেবিযে সোজা কিরণলতার দিকে আসে। নাভির ওপব গিঁট দিয়ে বাঁধা প্যান্ট। কুঁচকানো ব্লাউজ, খোলা পেট, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। নাক-চোখে টানা কিরণলতার ছাপ। নাম রেখেছিল 'রানী'। খানিকটা নাদুস-নুদুস শরীর। কিরণ কষ্ট কবে উঠে দাঁড়ায়। ঝাঁকাটাকে চাব হাতে নামায়। কচুর লতা, হেলেঞ্চাব নিচে দু'একটা ভাঙা টিন, শিশিবোতল ঘডঘড় করে ওঠে।

—আর কিচ্ছু পাইছস না?

—না গো, এহন কুনো বাইত ডুহনই যায় না। কইত্যে আইছছ? কই থাহছ? ইহান না, মন্ত্রী অফিসো যা। মাইযা দেইখ্যা মাইর খাইছি না। কালকের থিক্যা খালি কচুর লতি আনন লাগব।

কিবণলতা ধীব-স্থিব। সহজে সবটাই বোঝে। এ-অঞ্চলে অনেক দিনেব বাস। মেয়েটিকে কাছে টেনে হাত-মুখের ময়লা ঘষে ঘষে তুলে দেয়। পুরনো পাড়ের টুকরোয চুলের বেণী বেঁধে তরতর করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয। নিজেব মাথা থেকে তেল ঘষে বাণীর মলিন মুখটাকে তেলোজ্জ্বল করে। দু'জনে হেলেঞ্চাগুলো পরিষ্কাব করতে থাকে। আজকে খাবেনা বলে মা-মেয়ের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

রাণী বলে—গুবতে গুরতে বডারো গেছলাম গো মা। দান খেতে বরা। হেরা কইলো, হেই দিকে সব্বের দেশবারি।

রাণীর কথা শুনে কিবণলতার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

—আমরাবও আছিলনিগো?

ক্রমে ঝমঝম রেলব্রিজের শব্দ হয় মাথায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটে কপালে।

—আছিলনিগো?

কানে তাক লেগে যায়। আর কিচ্ছু শুনতে পায়না। হুইসেল একটানা হুইসেল কেবল। গরম বাতাস বেরোয কানে।

—নাই গো, মা?

মাঠের ওপর দেশপালানো দৌড। চিৎকাব। দৌড়। আগুনের হল্কা। দৌড়। শবীর ঘেঁষে একটা শবীর খসে পড়ে ধানক্ষেতে, চিৎকার। কাঁপতে কাঁপতে ধানগাছগুলো নিথর হয়ে যায়। আব কিছু দেখতে পায়না কিরণ। দৌড-দৌড-দৌড। রাণী জোর গলায বলে—

—নাই গো, মা?

সম্বিৎ ফিরে আসে কিবণেব—হ্যাঁ, হ, আছলো। থাকলেই কি? যাইতি? না, আব পারা দিতাম না। বলতে বলতে অন্যমনে কিবণলতা আবাব জমিনটা খোঁজে। কিন্তু কোথায সে-বাত। বাতেব আঁধাব। আঁধাব আইল, মন চায মাটিটাকে ছুঁতে। আবার পাথব হযে যায মনটা। বলে—না, আব পাবা দিতাম না। কথা শেষ হলে বাণী আবার বলে—

—দেশবাবিত থাকলে তো কুনো চিন্তা আছিলনা, না মা।

এখন সুদৃঢ কিবণলতা বদলে যায। বাণী এব কাঁচা মুখটিব দিকে তাকিয়ে থাকে প্রতিমাব কাবিগবেব মতো। স্বপ্নবিভোব মেযেব চোখটা পাকা হযনা। পাকা না হলে বঙ ফোটেনা। কিবণ বঙ হাতে বসে থাকে পাশে। চোখেব নিচ থেকে জল উডে যায। শেষ হয না। বাষ্প, এক অবিবত আবর্তি চলে।

—মা, ইহানো যদি কুনো বাঈত কামো ডুইক্যা যাইগা...কথা কিছু না ফুবাতেই কিবণেব ধ্যান ভেঙে যায। বাডিওযালাব স্বাদ জানে সে। ক্ষুব্ধ হযে ওঠে চোখ। কোন কথা বলে না তাই চোখ জ্বালা কবে। আবার সামলে নেয নিজেকে। রাণীব আবো কাছাকাছি হয। অপলক তাকিয়ে থাকে বাণীর স্বপ্নময চোখ দু'টিব দিকে। বাণী হেলেঞ্চা খোঁটে। কিবণ-ই জানে এই মূর্তি কিভাবে গডেছে। দিন-ক্ষণ? তিথি-নক্ষত্র? বাতাসে ফাটল ভাসে। কাকচক্ষুব ভেতব এক গভীব জলাশয। স্নান সাবতে চেযেছিল কিবণ। ফিবে আসতে আঁচলে ঠোঁট। ঝাপটায ঝাপটায সর্বাঙ্গে কালো পালক ঝবে পডে। সেই থেকে কিবণেব আব স্নান নেই। জলেব ভেতব নডে পাষাণ মূর্তি। অবশেষে কিবণ এসে বসে ভাস্কর্যেব পাদদেশে। মাঠময নবম সবুজ ঘাস। বিফিউজি লতাবা যে যেমন পাবে দখল কবে নিচ্ছে মাটি। শতবর্ষেব ঘাসগুলিও সাদা হয়ে যায। পাষাণ সন্তান. মূর্তিব পায়েব কাছে বেখে, বাতভব মানুষ হাতডায় কিবণ। মানুষেব নাক-চোখ-বুক-ঠোঁট সর্বাঙ্গ। পাথব ছাড়া কোন মাটিব আদল পাযনা। কিরণের চোখেব সাম্নে এখন একটিই কাঁচামুখ। গডতে গিয়েও থমকে যায় কিবণ।

সন্ধ্যা গাঢ় হযে আসে। বেলিঙ-এ ঠেস দিযে বাণীব কথাই ভাবে কিবণ। 'দেশবাড়ি......বারিওলা' মুখের ভেতব থেকে প্রকাণ্ড হা-মুখ বেরিয়ে আসে। জিহ্বাব ভেতর থেকে দীর্ঘাযত জিহবা। শ্যাওড়া গাছেব ছাযার মতো নডে চুল। দেশবারি... বারিওলা—নখগুলি দীর্ঘ হয়।

—মা, কইলা না, ডুকতাম নি......।

কিরণ জিহবায় চাটে রাণীব মুখ। কাঁচা বুক। বাছুরেব গা শুকালেও কাঁচা মূর্তি শুকায না। চোখের ভেতর চোখ জ্বালা করে। তপ্ত কিরণ ডাকে—আয়. ইহান

আয়। দু'পায়ের ফাঁকে রাণীকে বসায়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মুখ দেখে, নীলাভ সাগর চোখে কিরণের মুখ দেখা যায় ঊর্ধ্বে উড্ডীন শকুনের মতো। রাণীর উরুতে হাত রাখে। বুকে হাত রাখে। রাণীর ঘুম পায়। দু'জনেই শুয়ে পড়ে। তপ্ত কিরণ ঘুমায় না। রাণীর পেশী চেপে ধরে শুয়ে থাকে। ময়দানের কোণ ক্রমশঃ ফর্সা হয়ে ওঠে। এখন আর তেমন খিদে হজম করতে পারেনা কিরণ। উঠতে কষ্ট হয়। শুয়ে থাকে। ভাস্কর্যের মাথা থেকে বিষ্ঠা ঝরে পড়ে। ভাস্কর্য গম্ভীর। এ পাথরে কার বাস? বিবেকানন্দ? নিবেদিতা? বীরবিক্রম? কিরণ এসব কিছু বোঝে না, চেনে না। ছায়াটি চেনে কেবল। ভোরের কাক ময়দানে নামে। রাণী কাঠি হাতে সংসার বাঁচায়। ভোর হলেও আজ রাস্তায় গাড়ির কোন শব্দ নেই। ছোট বাবুদের স্কুলে যাবার হিড়িকও নেই। শুনশান। কিরণ ওঠার চেষ্টা করে। রাণী বলে—বুদ্অয় দর্মগট। 'গু'-এর গারি ছাবা আর কুনো গাবি আইতাছেনা।

হেলেঞ্চাগুলি নর্দমায় সতেজ মাথা দোলায়। কিরণ উঠে বসে। অবসন্ন শরীর। ভেতরের 'ঘা'টি বড় হচ্ছে দিনদিন। সবসময়ই শ্যাওলা পড়া স্যাঁতস্যাতে ভাব। 'ঘা' যতো বড় হয়, উচ্চতা ততো কমে আসে কিরণের। শহর নির্জন। কিরণ রাণীকে বলে—চাইর দিগে চোক রাহিছ। দেহিছ কুনো খানে কাওয়া নি উরে। রাণী মানে বোঝে। দু'জনেই নরম হয়ে বসে থাকে। মেয়েটির চোখ আকাশের অনেক দূরে চলে যায়। কিরণের হাত নেমে আসে রাণীর গায়। পাৎলা গাল, উরু, বুক বুলাতে থাকে। কোন আঁশটে গন্ধ নেই। বের হয়না। বুলাতে থাকে। উত্তাপ-আনন্দ নেই। বুলাতে থাকে। অনেক ছাদ পেরিয়ে দুপুর আসে। রাণী মাথা উঁচু করে নিরীক্ষণ করে।

—কাওয়া না মা, উরতাছে যে?

কিরণলতা চেয়ে দেখে, খুব দূরে নয়। এক ঝাঁক কাক নামছে, তাড়া খেয়ে আবার উঠে বসছে এ্যান্টেনার ওপর। রাণীর কাঁধে হাত রাখে কিরণ। দেবী সয়না। সড়ক ছেড়ে গলিমুখে ঢুকে পড়ে দু'জন। চোখের ভেতর কাকের ওড়াউড়ি। সানাইর সুর ক্রমশঃ বড় হয়।

কিরণরা চ'লে গেলে, ময়দানের সংসার বলতে কিছু থাকে না। ভাস্কর্যের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার হয়ে যায়। উনুনের ভেতর বাসন-কোসন ইট চাপা। অন্ধকার, শরীর খুলে পড়ে থাকে ঘাসে। আলোহীন পার্কে বাবুদের আনাগোনা জমজমাট। ওদিকে ক্লান্ত দু'জন ফিরে আসে। হাঁটুতে থুতনি লাগিয়ে ভাষাহীন তাকিয়ে থাকে রাণী। কারো হাতে এঁটো গন্ধ নেই। কিরণলতা টের পায় পেটের ভেতর হাজারো কাকের ওড়াউড়ি। এঁটো গন্ধ নেই। মেয়েটির শরীরেও না। জিভের ভেতর জিভ লকলক করে ওঠে কিরণের। ক্ষিদে পেলেই জুলজুল তাকিয়ে থাকে রাণীর শরীরের দিকে। হাত দীর্ঘ হতে থাকে। রাণীকে জড়িয়ে ধরে। জটলা চুল বাতাসে সটান ওড়ে। মুখের বাইরে লতানো দাঁত হি-হি করে। আজ প্রত্যেকটি নক্ষত্রই ফুটেছে আকাশে। রাণীর চোখে আকাশ ছড়ায়। শরীরে জড়ায় কিরণ। জড়িয়ে আদর করে। কিরণ আকাশ দেখে না। রাণীর পেশীতে হাত ছড়ায়। পেশীর পর পেশীতে ছড়ায়। রাণী উষ্ণতা পায়। ঘুম আসে। ঘুমায়। কিরণ ঘুমায় না। রাণীকে নগ্ন করে। বড়ো জাগ্রত মনে হয়। বুকে হাত বুলায়। শস্য দানা জাগে। জড়ায়। জড়িয়ে বুলায়।

ঘনশ্বাসে বুক ওঠে-নামে। দু'পাশে জলচাক নড়ে। শস্যকণা জলচাক। কিরণ ডলতে থাকে—জলচাক-শস্যকণা। পর্বতচূড়া আকাশের মেঘ। ডলতে ডলতে পেশী সব দানা হয়ে ওঠে। দানাগুলো ভিজে যায় শীৎকারে। ঘাসের ফাঁকে রাণী গড়ায়। কিরণকে জড়িয়ে গড়ায়। কিরণ নাক ঘোরায়। অবিকল। অবিকল এঁটো ঘ্রাণ। স্ফীত রোমকূপে এঁটো ঘ্রাণ ভাসে। রাণীর প্রতিটি রোমকূপে নাক ঘোরায় কিবণ। কিরণ হাসে। অনেকদিন পর হাসে। পাঁজর কাঁপিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে নেমে যায় ঘাসের গোড়ার দিকে।

শ্যামল ভট্টাচার্য

বাঁদর

কৃষ্ণ ওর মায়ের পেটের ভাই। বাসব ভুল বুঝেছে। ঝড়ে কখনো এপাশে আবার কখনো ওপাশে ডালপালাসহ ঝুঁকে যাওয়া মহীরুহর মতন দিশাহারা হয়েছে। হেমবতীর সাধারণ স্রোত গরুরে বাঁধা পেয়ে উজ্জ্বল। দশবছরের সংযত চালকজীবনে এই প্রথম এরকম হচ্ছে। পি ডব্লিউ ডির জীপ। হাসান অন্তরীক্ষ কেন্দ্র থেকে গরুরের পথে উদ্দাম। এক্সিলারেটরে পা চুম্বকের মতন লেপটে আছে। অজান্তেই চাপ বাড়ে। মানুষজন সরে যায়। দুপাশের গাছপালা, ধানক্ষেত দ্রুত পেছনে ছোটে। খানাখন্দ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—কী হলো বাসব?

সুভদ্রা বলেছিলো—লম্পট! বাসব এমনটা আশা করেনি। সুভদ্রা নরম প্রকৃতির মেয়েছেলে। পরিপূর্ণ করে রেখেছে দুই বছর। ওর উপর রাগ করবে কি? জোরে কিছু বললেই চোখে আতঙ্ক। সুভদ্রা দুঃখে দুঃখে বড় হয়েছে। বাসব নতুন করে দুঃখ দিতে চায় না। ও এখন গর্ভবতী।

সূর্য ডুবছে তখন। শব্দটা আয়তনে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। স্মৃতি ডানা ঝাপটায়। তখন বাসব দশম শ্রেণীতে পড়তো। কৃষ্ণ পঞ্চম শ্রেণীতে। সেদিন আপ্পার গাল ধুয়ে যাচ্ছিলো। রোগশয্যার খোঁচা দাঁড়িগোফের গোড়ায় গোড়ায় আশ্রুর ছোঁয়া। সেদিনই এতো বিস্তারিত পারিবারিক ইতিহাস, আপ্পার স্বপ্নের কথা শুনেছিলো। পরিশ্রমের ফসল বেচে তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

চিক্কাপ্পা লেখাপড়া করে এখন বড় মানুষ। তিনি আইনকানুনের প্যাঁচ বোঝেন। বড়ভাইকে বঞ্চিত করে তাড়িয়েছেন। আপ্পার দুঃখ সেজন্যে নয়। শরীর ও সততা সম্বল করে প্রৌঢ় বয়সেও আবার যা গড়লেন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নেই। সৎমা; চিক্কাপ্পার গর্ভধারিণীও সঙ্গে ছিলেন। বুড়ি পেটের সন্তান থেকেও আপ্পাকে বেশী ভালবাসেন। আপ্পা এই ব্যাপারটাকেই জয় ভাবতেন। উনার দুঃখ এতো কষ্ট করেও ভাইকে মানুষ করতে পারেননি বলে। দুঃখ স্বপ্নভঙ্গের। কত লোকের সর্বনাশ করেছে ও— কাঁপা হাতে বাসবকে ছুঁয়ে শুধু কৃষ্ণকে মানুষ করার চেষ্টা করতে বলেছিলেন। শেষমুহূর্তে বাঁধভাঙ্গা মানুষটার এই আকাঙ্খা বুঝতে সময় লেগেছে বাসবের। আপ্পার সবকথার অর্থ আজও বুঝে উঠতে পারেনি ও।

শ্রাদ্ধে চিক্কাপ্পা এসেছিলেন। কতো বড় মানুষ! কতো ক্ষমতা! অসহায় পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যান বাসবকে। ড্রাইভিং শেখার ব্যবস্থা করে দেন। আজও বাসব সেই রঙীন দিনগুলি ভুলতে পারে না।

সকালে মাদার ডেয়ারীর দুধ আনার পর মুখচোখ ধুয়ে ইডলি, ধোসা, উত্তপ্পম বা ওকমা খেতো। ভাইবোনকে কনভেন্ট স্কুলে পৌঁছিয়ে বাজার ঘুরে টাটকা সব্জি ব্যাগভরে ফিরতো। গুনে গুনে চিক্কাপ্পাকে পয়সা ফেরৎ দিতো। সমস্ত মিষ্টি আদেশ

মোহগ্রস্তের মতন পালন করতো। চিক্কাম্মা বড়ঘরের মেয়ে। বলতেন—চিক্কাম্মা নয় আন্টি বলবি। কী ফর্সা! পায়ের গোছা কী নরম! টিপতে টিপতে শরীর শিরশির করতো। পা ছড়িয়ে রঙীন ছবিঅলা ফিল্মী পত্রিকা পড়তেন উনি। বাসবের কানে ঝিঁ ঝিঁ গান গাইতো। হাসানে এতো মিষ্টি কাউকে ছোঁয়ার কথাও ভাবতে পারে না। দশটা থেকে একটা তিনঘণ্টার ড্রাইভিং ক্লাশ সপ্তাহে ছয়দিন। ঘরে ফিরে স্নান খাওয়াব পর শরীর অসাড় কবে ঘুম আসতো। চিক্কাপ্পা বিধানসভায় অথবা বাইরে কোথাও থাকলে ডাক পড়তো বাসবের। টিপতে টিপতে ঘুম ছুটে যেতো। সমস্ত চেতনায় মিষ্টি সুবাসের অমোঘ আকর্ষণ। বিরক্তি আনুগত্যে পাল্টে যেতো। ফিল্মী পত্রিকার সুন্দরীদেব হাসি। অজান্তেই মনের মধ্যে শুরু হতো তালবেতাল নৃত্য। সেইজন্যেই হয়তো চাকরী পেযেও ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিলো না।

বাসবকে হাসানে পৌঁছে চিক্কাপ্পা কৃষ্ণকে নিযে যান। উনাকে খারাপ মনুষ ভাববে কী কবে? হয়তো দাদার মৃত্যুতে কষ্টও পেযেছেন। বাসবেব চাকরী ধরিয়ে কৃষ্ণকে নিজেব কাছে বেখে মেট্রিক পাশ করিযেছেন। এবকম বডমনের মানুষ না হলে কেউ মন্ত্রী হতে পাবেন! লোকের শ্রদ্ধাভক্তি এমনি এমনি পান? গুণী না হলে ঈশ্বর কাবো উপর এতো সদয় হন? এতো সুন্দরী বউ! বাসবের শয়নে স্বপনে ফর্সা পাগুলি। ঈর্ষা হতো। চাকবী পেযে বাসব হাসানেই দশবছর ধরে আছে চিক্কাপ্পার প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ হস্তক্ষেপে।

কৃষ্ণ পাশ কবার পরই কিছুদিন শহরের বড় রাস্তার পাশে চিক্কাপ্পাব বিলাতী মদেব দোকানে কাউন্টাবে বসতো। বাসব একবার দেখেছে কী সুন্দব নীল জিনস আব হলুদ টি শার্ট। ছোটভাই ভাবতেই গর্বে বুক ফুলে উঠতো। বাজপথেব নানা বঙেব আলোয মাযাময় উদ্যান শহব। মনে হতো এবকম আয়েস কবাব ভাগ্য নিয়েই কৃষ্ণবা জন্মায়।

কিন্তু হতচ্ছড়া পালালো। চিক্কাপ্পাব চিঠি পেয়ে কী লজ্জা! বাসব কিভাবে মুখ দেখাবে ভেবে পাচ্ছিলো না। সদাশয় মানুষটাব ছাযা আব আন্টিব মিষ্টি ছোঁয়া অগ্রাহ্য কবে কৃষ্ণ পালায কে ন কবে। বাসব হলে আজীবন সেবা করতো। কিন্তু চিক্কাপ্পা বাসবকে কাছে রাখেননি। বলতেন—তোর মাথায় গোবব ঠাসা; কৃষ্ণটার বুদ্ধি আছে; এই কি বুদ্ধির পবিচয? প্রতাবণা কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ?

ভোটেব আগে চিক্কাপ্পা হাসান আসেন। বুড়ি আম্মা এবং বিধবা আত্তীগের পা ছুঁযে আশীর্বাদ নেন। সাংবাদিকবা ফটো তোলেন। ব্যস্ত মানুষ। কৃষ্ণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেন নি। সাদা গাড়ী চলে গেলে বাসব যেন হাফ ছেডে বাঁচে। কৃষ্ণেব পালানোব মতন ক্ষুদে ঘটনা চিক্কাপ্পাব মতন বিশাল লোকের কাছে কিছুই নয। পাখী বাসা ছেড়ে উড়ে যায—গাছ চুপচাপ থাকে।

বাসবেব আম্মা কাঁদতেন। চিক্কাপ্পার আম্মা বিড়বিড় করতেন। চিক্কাপ্পাকেই দোষাবোপ করতেন। বাসব কী বলবে? ওরও তো খাবাপ লাগতো! ছেলেটা কোথায় কেমন আছে কে জানে! ভোটেব ফল আশানুরূপ না হওয়ায় নাকি ভীষণ ব্যস্ততায় কে জানে, আম্মা নিজে গিয়ে বলে আসা সত্ত্বেও বাসবের বিযেতে ব্যাঙ্গালোব থেকে কেউ আসেন নি। বাসব আশা কবেছিল—অন্ততঃ ভাইবোনদেব নিযে আন্টি আসবেন! ভাবলে আজও কষ্ট হয়।

গরুর বাঁধের কাজ বাসব চাকরী পাওয়ার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। কঠিন মালভূমির ধানক্ষেতগুলিকে আরো সজীব করতে জনদরদী সরকারের এই সেচপ্রকল্প। ওদের বাপদাদার প্রাচীন জায়গাজমি এখন জলের তলায়। বাসবের জ্ঞান হওয়ার আগেই চিক্কাপ্পা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যে সম্পত্তি ও কোনদিন দেখে নি তার জন্য কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে। জলের তলায় এখন সেখানে হয়তো সব জলজ উদ্ভিদ আর নানারঙের মাছেরা খেলা করে। দুপুরে জলাশয়ের কিনারায় গাছের ছায়ায় ঘাসে বসে টিফিন খেতে খেতে ইচ্ছে করে ডুব সাঁতার দিয়ে দেখে আসে। কিন্তু এতো বিশাল জলাশয়ে ওদের জমি কোথায়? হু হু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ দেখে একটা সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ খেলা করতো।

বাসবের বড়সাহেব হাসান থেকেই যাওয়া আসা করেন। সেদিন বাসব উনাকে নামিয়ে নিজের বাড়িতেই গাড়ি নিয়ে আসে।

সেদিন ফিরে বাসব দেখে কৃষ্ণ। দাদাকে দেখে আকর্ণ হাসে। এখন ও তাগড়া জোয়ান। টি, ভির সামনে বসে চায়ের গ্লাসে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছিলো। এমনি করে আপ্পা খেতেন। বাসবকে দেখে কৃষ্ণ উঠে এসে পা ছোঁয়। বাসব বুকে জড়িয়ে ধরে। কোথায় গেলো ওর রাগ, অভিমান? কৃষ্ণের শরীরে কী সুগন্ধ! চোখগুলি শুধু কোটরে ঢুকেছে। একসঙ্গে মনে এতো প্রশ্ন জাগে যে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না বাসব।

কৃষ্ণ নিজে থেকে যা বলে, শুনে বাসবের বুক ফুলে ওঠে। ও এখনো সবার সবকথা বিশ্বাস করে। বোম্বাই থেকে আনা দামী সিগারেটের তামাক সুগন্ধী। ঝকঝকে সোনালী লাইটার ধরিয়ে কৃষ্ণ দেখিয়ে দেয় কেমন করে জ্বালাতে হয়। দামী সিল্কের শাড়ী এনেছে। সুভদ্রার বিয়ের শাড়ী থেকেও এটা সুন্দর। আনন্দে ভরে ওঠে বাসবের মন। সুভদ্রার মুখ গম্ভীর কেন? এতো সুন্দর শাড়ীটা পছন্দ হয়নি? বোকা মেয়ে।

দেশ-বিদেশের বড় বড় অফিসার আর মন্ত্রীদের কনফারেন্স গরুর গেষ্ট হাউসে। ইসরোর বৈজ্ঞানিকরাও যাবেন। কী একটা খটমটে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। রাতে আমোদ ভোজন। বন্দোবস্তের ভার কৃষ্ণের উপর। এ ধরণের কাজ নাকি ওর ব্যবসার অঙ্গ। কতো ব্যস্ত মানুষ এখন তাম্মা। ওর থাকার ব্যবস্থা ইসরো গেষ্ট হাউসে।

বাসব জীপে করে ওকে পৌছে দেয়। কৃষ্ণ হাত ধরে টেনে ওর রুমে নিয়ে যায়। বেয়ারা স্যালুট ঠোকে। বাতানুকূল ঘর। লাগোয়া স্নানঘর। স্নানঘরে চিনেমাটির কমোড। খোলা আলমারীতে তাম্মার দামী দামী জামাকাপড় কয়েকজোড়া। বেয়ারা বিলাতী মদ নিয়ে ঢোকে ট্রেতে গ্লাস সাজিয়ে। এই জিনিসটার প্রতি লোভ বাসবের সেই ব্যাঙ্গালোর থাকার সময় থেকেই। তবে তাম্মার মতন চুমুক চুমুক খেতে পারে না। চা ছাড়া সবকিছু ঢকঢক করে পান করা অভ্যাস। বাসব বলে—এখন তো সুন্দরী মেয়ে দেখে তোকে বিয়ে করাতে হয়—

ওর কথা শুনে কৃষ্ণর গাল নীল হয়। বাসব একদৃষ্টে দেখছিলো। কৃষ্ণ কি ভয় পেলো না লজ্জা পেলো? নীলরঙে বাসবের চোখে শঙ্কা ফুটে ওঠে। কৃষ্ণ চোখ নামিয়ে নেয়। ওর কানও নীলচে তখন। বাসব সহজ হওয়ার জন্যে হা হা

হাসে। বেয়ারা খাবার রেখে যায়। ভাত ডাল সব্জি ছাড়াও গোটা গোটা মুরগীর ঠ্যাঙ। কী সু-স্বাদু!

এই কৃষ্ণকে লম্পট বলেছে সুভদ্রা। কেন? নিশ্চয়ই গূঢ় রহস্য এর পেছনে। যে কোন রহস্য ওকে অস্থির করে। জটিল কোন ব্যাপারই ভাল লাগে না। বাসব সত্যের সম্মুখীন হতে ভয় পায়? কিন্তু মুক্তি কোথায়? বড়সাহেব দুবার জোরে চালানোর জন্যে ধমক দিয়েছেন। আজ অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোব যেতে হয়েছিলো। বড়সাহেবকে বাড়িতে নামিয়ে ও সোজা ইসরো গেষ্টহাউসে চলে আসে। কৃষ্ণ নেই।

ইসরো বাসেব ড্রাইভার লিঙ্গরাজ সজ্জন ব্যক্তি। যদিও জিহ্বা ক্ষুরধাব। সত্য কথা বলতে ভয় পান না। বাসব সমীহ করে। আজ ওর কথা শুনতে শুনতে বাসবেব কানে ঝা ঝা। আব থাকতে পাবে নি। ওক্কালিগা বংশের মানমর্যাদা এভাবে ডোবাবে কৃষ্ণ। বাসব কিছুতেই তা হতে দেবে না। ও ছুটে গিয়ে জীপে বসলো। শক্তি চাই। সদরমার্কেটেব সারাই আঙ্গেবী তখন সবে খুলেছে। সিকি বোতল দেশী সারাই কিনে অর্ধেকটা গলায ঢালে নির্জলা। বাকিটা কোমরে গুঁজে ষ্টিয়ারিঙে বসে মনে হলো—লাগছে। আবার বের করে ও, এবাব পুবোটাই শেষ করে। বোতলটা ড্যাশবোর্ডে চালান করে। গিয়াব বদলে এক্সিলারেটর দাবায। শক্তকথা বলতে পারে না ও। গলা ও বুক জ্বলছে। নিজের উপর বিশ্বাস জম্মায। ও পাববে। অবশ্যই পারবে। মাথা থেকে একটা ঝাঁকুনি সারা শবীরে ছড়ায়। এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ ভারি হয়। মালভূমিতে প্রবল ঘূর্ণি। গাছপালা ছুটতে থাকে।

কৃষ্ণেব কুকর্মেব কথা সুভদ্রা কেমন কবে জানলো? এই তো প্রথমবার দেখেছে। যেবকম মেয়ে এরমধ্যেই এতো অন্তরঙ্গতা অসম্ভব। তাহলে কি কোনভাবে পাপী চেহারা দেখেছে? অথবা জোবকবে...ওকে আর ভাবতে পারছে না। পথের রঙ এরকম বেগুনি, এরকম শ্যাওলা রঙেব আকাশ কখনো দেখেনি। বাঁধ পেরুলেই ডানপাশে দোতলা গেষ্ট হাউস। একটা নাম না জানা পাখী ওর উইণ্ডস্ক্রীনে লেগে রাস্তাব কিনারায় ছটফট করে। মুহূর্তের মধ্যে কী যেন হযে যায়। সামনেই গাছ। রাস্তার মাঝে গাছ এলো কোত্থেকে? এতো মোটা গাছ?

৩

লাল রক্তে কৃষ্ণের সাদা জিনস্ রাঙা। আন্নার মাথা ওর কোলে। অপরাধবোধ সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কেন নতুন পরিচয়েই এতোকথা বলতে গেল? শুনতে শুনতে আতীগের সহজ চেহারা কেমন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। ধীরে দূরত্ব বাড়িযে চা আনার ছুতোয় রান্নাঘরে পালিয়েছিলেন। তখুনি বুঝেছিলো—ঠিক করেনি। গ্রামের সাধারণ মেয়ে। হজম করতে পারবে না। চা দিতে এলে হাত বাড়িয়েছিলো। চোখে তাকিয়ে বলেছিলো—দোহাই আতীগে, আন্নাকে এসব বলো না, তোমার আমার মধ্যে গোপন—কথা শেষ হতে না দিয়েই আতীগে আন্নার ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

বাসবকে আজও ভয়ভক্তি করে কৃষ্ণ। কতো সরল স্নেহের উৎস! কথায় কথায় বোঝা যায় বুকের পাঁজরের মতন ভালবাসে। এই আন্না আর মমতার মুখ আম্মাকে কতো কষ্টই না দিয়েছে! কিন্তু এছাড়া কী-ই বা করতে পারতো! আতীগে

যদি আন্নাকে বলেন? আম্মা যদি জানতে পারেন! আন্নার অফিসের পাশেই তো গেস্টহাউস। অবশ্য দিনের বেলায় কিছুই বুঝতে পারবে না। তবু আশংকায় বুক কাঁপে। যদিও এতোদিন পব মনের কথা কাউকে খুলে বলতে পেরে বুকটা হালকা লাগছিলো। পাশাপাশি ভয় ঢুকেছিলো মাথায়। আন্না যাতে তখুনি জানতে না পারে সেজন্যে ও গেস্টহাউসে মাঝরাত অব্দি আটকে রেখেছিলো।

পবদিন সন্ধ্যায গেস্টহাউসেব দোতলাব বারান্দায় আরামকেদারায বসে অনেক কথাই ভাবছিলো। কিচেন থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছিলো। অন্যদিক থেকে সাজগোজেব খুশবু। নিচের আলোচনাকক্ষের গমগম শব্দ ঢিমে হযে আসছিলো। ইসরোর বাবুরা কিছুক্ষণেব মধ্যেই ফিবে যাবেন। বাসটা কখন আসবে কে জানে! মনটা ভীষণ চঞ্চল। আরামকেদারায় বসে অস্থিবতা বাড়ছিলো। আজকের বাতটা তাড়াতাড়ি ফুরালে হয়! রাতে থাকবেন কতিপয মহামহিম। তাদেব জন্যই দালাল কৃষ্ণ। এই জীবন আর ভাল লাগছিলো না। সূর্য দিগন্তেব নিচে নেমে গেছিলো। নানা বঙেব মেঘের শবীর গোলাপি লাল বেগুনি। আম্মা, আন্না, আতীগে কত প্রিয় সব। হেমবতীর স্রোতে নানাবঙ ভাসে। বাতাস কতো তাজা। এইসব ওব ভাগ্যে নেই। দীর্ঘশ্বাস সর্বস্ব অন্ধকার ঘনিযে আসছিলো।

তখুনি দেখতে পায় বাঁধেব উপর দিযে ঝড়েব মতন একটা জীপ। গেস্টহাউসেব সামনেব বটগাছ থেকে এক্ঝাঁক পাখী উড়ে বাস্তায় বসে। কৃষ্ণেব দৃষ্টি স্থিব। দেরীতে আওযাজ পায পাখীবা। দিশাহাবা। কেমন ছিটকে এপাশ ওপাশ। ঝড়ের গতিতে জীপটা বটগাছে ধাক্কা মাবে।

হাসপাতালেব গাড়ীতে কৃষ্ণেব কোলে মাথা বাসব অবচেতনে বিড়বিড় কবে। কৃষ্ণ বুকে নাক ঠেকিয়ে ঠোঁটেব কাছে কান পাতে। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তাবপব আবার বিড়বিড়—আমাব তাম্মা লম্পট, তোমাকে আব কিছুই বোঝা যায় না! কৃষ্ণের বুঝতে বাকি থাকে না—আগুন কিভাবে লাগলো। মাথাটা কোলে ঠেসে ধবে কৃষ্ণ। ওব মনে পড়ে একটি বাঁদবেব কথা। বাঁদবটার অতীত জানে না কৃষ্ণ। ওর মনে পড়ে পোষা কুকুবেব মতন গলায বেল্ট বাঁধা ছিলো। সেই বেল্টেব হুকে লাগানো ছিলো লোহার সরু শেকল।

হাসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এম্বুলেন্সে পাঠিযেছে। সঞ্জয গান্ধী এক্সিডেন্ট রিলিফ এণ্ড ফিজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টাব। একশো বিরানব্বই কি. মি. এম্বুলেন্স চালক যথাসম্ভব দ্রুত চালিযে এসেছেন। তখন রাত সাড়ে তিন। নযঘণ্টাব বক্তপাতে শরীর ঠাণ্ডা, ফ্যাকাশে। শুধু ধীরলযে হৃৎস্পন্দন ভবসা। বক্ত চাই এক্ষুণি। ডাক্তাব গৌরী লঙ্কেশেব চাহিদা অনুমান কবেই ইমাবজেন্সি স্টাফনার্স উপস্থিত সবার রক্ত পরীক্ষা করিযেছেন।

ডাঃ লঙ্কেশ বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। স্টাফ নার্স ডাইরেক্টর ডাঃ ববীন্দ্র দাসকে খবর পাঠান। অবশ্য ততক্ষণে রক্তপাত নিযন্ত্রণে আনা গেছে। ডাঃ দাস এসে পেশেন্টেব অবস্থা দেখলেন। মাথায় সামান্য চোট। ডানহাত ও কাঁধে মালটিপল ফ্র্যাকচার। রক্তপাত বেশী হওয়াতেই এতো খাবাপ অবস্থা। ডাঃ লঙ্কেশের চাহিদা যথাযথ। কিন্তু মাত্র দুজনের গ্রুপ মিলেছে। হঠাৎ মনে পড়লো নিজের গ্রুপও তো 'ও' পজিটিভ। নার্সকে ডেকে নিজেই প্রথম বক্তদাতা হিসেবে শুয়ে পড়লেন। তারপর

এম্বুলেন্স চালক রক্ত দিলেন। সবশেষে কৃষ্ণ গৌড়া। জীবন রক্ষার জন্যে ঐ মুহূর্তে আর কোনই উপায় ছিলো না। বাসবের স্পন্দন আরো শ্লথ হয়ে পড়েছিল।

সকাল দশটায় লেবরেটরী খুলতেই তিনজনের রক্তের স্যাম্পল স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে পাঠানো হয। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ডাঃ দাসের টেবিলে রিপোর্ট চলে আসে। রক্তদান ও রাত্রিজাগরণে মাথা ঝিমঝিম করছিলো। রিপোর্ট দেখে কষ্টটা বেড়ে গেলো। সামনের দেয়ালে বাঁধানো ফটোতে একঝাঁক ফুলের পেছনে সঞ্জয় গান্ধীর হাসিমুখ। এতদিন মনে হতো হাসি। আজ মনে হচ্ছে উপহাস। উনি কৃষ্ণ গৌড়াকে ডেকে পাঠান।

৪

ওব রক্ত আন্নাকে বাঁচাতে পারবে জেনে আনন্দ হচ্ছিলো। তৃতীয বোতল চালু হওয়ার পর আন্নার চেতনা ফিরছিলো। বাসব দ্রুত সেরে উঠছিলো। দুপুরবেলা কৃষ্ণকে ডেকে ডাক্তারবাবু আজব সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবতে থাকেন। কৃষ্ণের কান গবম হচ্ছিলো। পা কাঁপছিলো থির থির। কপাল ঘামছিলো। এতো জোরে পাখা ঘুরছিলো তবু ঘাম বিজবিজ কবে ভিজিয়ে দিচ্ছলো কৃষ্ণকে।

আন্নার চিকিৎসার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারছিলো না। ব্যক্তিগত জীবন জেনে ডাক্তার সাহেব কী কববেন? মুখ খুললেই জীবন বিপন্ন হবে। কথাটা কৃষ্ণ কেমন করে বোঝায়! উল্টাসিধা জবাব দিচ্ছিলো। ডাক্তার ধমকে বলেন ওর জন্যে আন্নার জীবন যাবে। সত্যি বললে এখনো হয়তো কোন পথ আছে। কৃষ্ণ শাঁখেব করাতে। কৃষ্ণ বিপন্ন। ওব সুষুম্না ও মেরুদণ্ডে কম্পন। অগত্যা সব খুলে বললো; শুধু ব্যবসাব রহস্য গোপন বেখে আদ্যোপান্ত। কৃষ্ণের কান্না পাচ্ছিলো।

পরদিনই বাসবকে আইসোলেশান হাসপাতালে পাঠানো হলো।

আজ একমাস হলো বাসব হাসপাতালে। আরো তেরদিন পব হাতের প্লাস্টার কাটবে। ব্যথা নেই। শুধু চুলকায। চুলকানোব কোনই ব্যবস্থা নেই। ওব পাগল পাগল লাগে। বিছানার পাশেই জানালা। উদ্যান শহব দেখা যায়। যদিও গাছগাছালিব চাইতে মানুষ বেশী। যানবাহনের আসাযাওয়াব শব্দ অনবরত শোনা যায সকাল থেকে মাঝরাত অব্দি। তখুনি একটা অ্যাম্বেসেডব পার্কিঙে ঢুকলো। বুকে মোচড দেয। তারপব ভাবে—না, চিক্কাপ্পা তো আব মন্ত্রী নয। বাসব জানালা দিয়ে থুতু ফেলে।

উনি এখন বিবোধী নেতা। আপ্পাব কথাগুলির মর্ম আজ বুঝতে পাবে বাসব। জ্ঞান ফেবাব পর কৃষ্ণকে দেখে মুখ ঘুবিয়েছিলো। যতক্ষণ ও ছিলো বাসব ঘৃণায় কথা বলেনি। ও চলে গেলে সুভদ্রা বলেছিলো বক্তের কথা। কৃতজ্ঞতায় উচ্চাবণে শ্রদ্ধা ছিলো। বাসবেব ঘৃণা তখনই ধীবে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু রাগ কমে না। ফিনাইল এবং নানা ঔষধের মিশ্রিত গন্ধে গা গুলাচ্ছিলো।

সন্ধ্যায় কৃষ্ণ এলে ডেকে কাছে বসায বাসব। জিজ্ঞেস করে—কেন এমন করিস? লোক জানাজানি হলে বংশেব মর্যাদা, চিক্কাপ্পার সম্মান—

ওকে থামিয়ে ধীবে ধীরে কৃষ্ণ যা বলে বিশ্বাস হয় না। ও যখন বিলাতী মদের কাউন্টারে বসতো একদিন চিক্কাপ্পা ওকে নিজেব অ্যাম্বেসেডরে উঠতে

বলেছিলেন। বাড়ি থেকে ওর জিনিসপত্রভরা ব্যাগ গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ যাত্রায় পাশে বসিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন সব কলা—কৌশল। উত্তেজনায় ঘুম পালিয়েছিল কৃষ্ণের চোখ থেকে। টাকা দিলেন এতোগুলি! ঠিকানা লিখে দিলেন অনেক কটা—বেলগাম, পুনে এবং মুম্বাইর। যাত্রা শেষ হয় ভোরবাতে।

বেলগামে একটা হোটেলের সামনে নামিয়ে চিক্কাপ্পা চলে গেলেন চন্দ্রগুথি। ঘর ঠিক করাই ছিলো। স্নান খাওয়া সেরে বিকেল অব্দি ঘুমিযে কাটিযেছিলো। সন্ধ্যা হতেই অস্বস্তি শুরু। চিক্কাপ্পা এতো বড দায়িত্ব দিলেন। কৃষ্ণের আনন্দ হচ্ছিলো। আবার সম্ভাব্য ঝক্কিঝামেলার অজানা আশঙ্কায বুক দুরুদুরু। নোংরা দিকটা অবশ্য তখন মাথায আসেনি।

ইল্লাম্মা মন্দিরেব মেলা থেকে ফেবাব পথে চিক্কাপ্পা ওব ঘবে এসে বলে গেলেন —বাত দশটায আসবে, তাব আগেই তৈরী থাকবি, মুম্বাই পৌঁছে চিঠি দিবি, খবরদার বাডিতে লিখবি না। কৃষ্ণ মাথা নাড়ে। টাকাব দবকাব পডলে যা বললাম—আরো বেশী লাগলে জানাবি। শুনতে শুনতে বাসবেব মনেব মধ্যে গলে বিকৃত হয়ে পড়ছিলে একটা সুন্দব চেহাবা। ক্রমে ঘোলা হযে ওঠা চোখ নিয়ে ও তাম্মার কথা শুনছিলো।

রাজা লিঙ্গায়েত ধূর্ত। চোখমুখ দেখলে মনে হবে হাবাগোবা। পনের, ষোল, সতেব বছব বযসী মেয়েগুলিকে কেমন ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতেন। কৃষ্ণকে শুনিয়েই বলতেন। যাতে পথে ফ্যাসাদে না পডতে হয। ভনিতা দেখে কৃষ্ণেব হাসি পেতো। বার্থে মালপত্রসহ তুলে দিযে ঢিপ কবে প্রণাম কবতে ভুলতেন না।—আপনারা হচ্ছেন গে দেবদাসী, দেবতা ছাড়া কাবো ভোগে আসেন না, এভাবে কি জীবন চলে? রাণীর কাছে যাচ্ছেন, দয়াব সাগব উনি—ইত্যাদি। তাবপব প্রতিবারেব মতন কৃষ্ণকে দেখিযে বলতেন—মহারাণীর কৃপায বাজপুত্তুর স্বযং নিতে এসেছেন—এতোবাতে বেলগামেব প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায ফাঁকা; নিস্প্রভ। ট্রেন ছাডাব আগে আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে নগদ গুণে সাদা ধুতিব পরত সবিযে হাঁটুঅব্দি লম্বা ডোরাকাটা ড্রাসেব পকেটে বাখতো। বিদায় নেয়ার সময চোখদুটি চকচক কবতো। অভ্যাসমতন ঠোঁট চাটতে চাটতে সাদা চাদর জড়িযে বিদায নেন।

মহাবাণীই বটে। গ্র্যাণ্ড বোডেব কোঠায় বাজপ্রাসাদেব বোণক। চাবতলা বাড়িতে ঢুকতেই রিসিপশান কাউন্টার। ইন্টাবকমে দয়াম্মার অনুমতি পেলে তবেই কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেযে উপবে ওঠা। গুণীজন বেষ্টিতা বিশাল সভাব মধ্যমনি পাশ বালিশে হেলান দিযে তাবা ও ফিরোজা খচিত পাতলা সিল্কেব চিকেব ঐপাশে বসেন। মেয়েগুলি বলিব ছাগলের মতন কাঁপতে থাকে। প্রথম দিন ঘাবড়ে কৃষ্ণরও পা কাঁপছিলো। যতক্ষণ মুজরা চলে দযাম্মা কথা বলেন না। চুপচাপ দাঁডিয়ে থাকো। এখন আর পা কাঁপে না। শান দেখলে কে বলবে দযাম্মাও একদিন দেবদাসী ছিলেন। মেয়েদের ভেতবে নিয়ে গেলে দয়াম্মার হাত থেকে টাকা নিয়ে কৃষ্ণ বেরিযে আসে গুণতে গুণতে।

ওদেব একটা কালো লম্বা লোমঅলা ছাগল ছিলো। চোখদুটি মিষ্টি সবুজ। আন্না কোত্থেকে জোগাড় করে শিঙে লাল-রঙ লাগিয়েছিলো। ছাগলটা দুধ দিতো নিয়মিত। সংসারে তখন টানাটানি। ভাতই জোটে না তো ছাগলেব দুধ। আপ্পা বাজাবে নিয়ে যেতে বললে আন্না বলে—পাববো না। অগত্যা কৃষ্ণকে সাথে নিয়েই আপ্পা বাজার

গেছিলেন। দড়ির প্রান্ত কৃষ্ণের হাতে। কসাইয়ের কাছে যেতেই ছাগলটা যেন বুঝতে পারে। হেঁচড়ে সরানো যায় না। কসাই উঠে দাঁড়ান! তখুনি কোথা থেকে ঝড়ের মতন হাজির হয়েছিলো আন্না। ছাগলটাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো। পেছন থেকে আপ্পা চেঁচাচ্ছিলেন—বাসব, রে বাসব—

এই মেয়েগুলিকে বাঁচানোর জন্যে কেউ ছুটে আসে না। শুরু শুরুতে কষ্ট হতো। নির্বাচিত কয়েকজনকে কাছে রেখে দয়াম্মা বাকিদের চালান করেন। দুনিয়ার দস্তুরই এই। মাংসের দালাল কষ্ট পেলে চলবে কেন? বিন্দুমাত্র ভুলচুক হলেই চিক্কাপ্পার গুণ্ডারা শেষ করে দেবে। চিক্কাপ্পার হাত কতো লম্বা মুম্বাই পুণা বেলগামে কৃষ্ণের প্রতিপত্তিই তার প্রমাণ।

অবশ্য মন্ত্রীত্ব খোয়ানোব পব থেকে ব্যবসাব রমরমাও কম। পুলিশের খাই বেড়ে গেছে। তবু নানা জাযগায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাপনা থেকে ভালোই টাকা আসে। দয়াম্মার কোঠা থেকে মেয়েদের আনলে নাচগান বাবদও অতিরিক্ত পাওয়া যায়। কৃষ্ণ দালাল না ক্রীতদাস। এখন ছাড়তে চাইলেও আব পারবে না।

গেট ওয়ে অফ ইণ্ডিয়া। বাঁধানো সমুদ্রসৈকতে কৃষ্ণ প্রায়ই বসে থাকতো। কর্মহীন দিনগুলি। সকাল থেকে দিনটা সোজা হতে হতে দপুর গড়িয়ে সন্ধ্যায় ঢলে পড়তো। কতো লোকজন! দূরে জাহাজ দাঁড়িযে মাঝদরিয়ায়, অথবা কোন কোনটা একদিক থেকে ভেসে অন্যদিকে হারিযে যায়। দেশী বিদেশী পর্যটক সমাগমে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছটা অব্দি গিজগিজ করে। কৃষ্ণ সমুদ্রের ধার ঘেষে বাঁদিকে অনেকদূর হাঁটে। বাঁধানো সৈকত। চাবপাপে কোথাও সবুজেব চিহ্ন নেই। সামনে কালচে নীল ঢেউ আর ঢেউ। নীল আকাশ মাথাব উপর ধোঁয়ায় মলিন। দূরেব আকাশ নানা আকাবের মেঘের রঙে এককেদিন এককে রকম। পেছনে কোলাহল। সবাই ব্যস্ত। সবার কতো কাজ! কৃষ্ণের কাজ দামী জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ানো, দুপুরে কোন মাদ্রাসী হোটেলে খাওয়া, আব রাত হলে মদ খেয়ে দয়াম্মাব একতলার অতিথিকক্ষে ফিরে গিয়ে প্রতীক্ষা করা। দয়াম্মার দয়া না চিক্কাপ্পার? পরবর্তী খববেব অপেক্ষায় এমনি অলস দিন গুজবান। খবব এলেই তৎপরতা।

ফটোগ্রাফার ডি সিলভাব গোযা সীমান্তে বাড়ি। কত ভাষা জানেন! পর্যটকদেব সঙ্গে ওদের মাতৃভাষায় কথা বলেন। বঙীন ফটো তোলেন। আজব ক্যামেবা। ফটো ছেপে মিনিটখানেকের মধ্যে ঐ থেকেই বেবিযে আসে। রইস আদমী ভেবে ভদ্রলোক ওকে সমীহ করতেন। কৃষ্ণও একটা ফটো তুলেছিলো। ছযমাস পবেই সাদা কার্ড। দৃশ্য এবং বস্তু ভোজবাজিব মতন ধোঁয়াশা হতে হতে দৃশ্য হয়ে যায়। যেমন জ্যান্ত বর্তমান একদিন অতীত হয। কৃষ্ণের কাছে বর্তমান ঐ ফটো তোলার সমযের মতনই ক্ষণিকের ব্যাপার। তারপরই তো অতীত হয়ে যায। থাকে স্মৃতি আর এই ফটোর সাদা কার্ড।

মাদারী বাঁদবের খেলা দেখান। জিনসের প্যান্ট আর টি শার্ট পবা বাঁদরটা স্মার্ট। কতরকম খেলা! ওটার হাবভাব অবিকল মানুষের মতন। কাকে বিয়ে করবি? বললে ভিড়ের মধ্য থেকেই নিশ্চিত কোন কুমারীর ফ্রক বা সালোয়ার ধরে টানতো। ভিড় হো হো করে হাসতো। শুধু বিদেশিনীদের ক্ষেত্রে বোধহয় বুঝতে পারে না। সেজন্যে কোন বিদেশিনীকে পছন্দ করতে দেখেনি।

নানা রকম জিমনাস্টিকের পর সর্বশেষ খেলা আগুনের চাকতির ভেতর দিয়ে লাফানো। মাদারী চাকতিটাতে ন্যাকড়া পেঁচান। কেরোসিন মাখিয়ে আগুন লাগান। দুদিকে দুই কাঠের হাতল। একদিকে মাদারী ধরেন। অন্যদিক ধরার জন্যে দর্শকদের কাউকে ডেকে নেন। মাদারী ডাকেন—জনি জনি কুঁদ যাও। বাঁদর মাথা নাড়ায়। জনি কুঁদো, আউর আচ্ছা কাপড়া দেঙ্গে। বাঁদর মাথা নাড়ায়। জনি কুঁদো, কেলে দেঙ্গে, রোটি দেঙ্গে। বাঁদর মাথা নাড়ায়। মুচকি মুচকি হাসে যেন। মাদারী হেসে বলেন—জনি কুঁদো, বিবি মিলেঙ্গে! বাঁদর তড়াক করে শূন্যে ডিগবাজি খায়। ছুটে গিয়ে আগুনেব চাকতির ভেতব দিয়ে অন্যপাশে লাফিয়ে পড়ে। হাততালির সঙ্গে সঙ্গে টুংটাং পয়সা জমে পাতা বস্তায়।

--আন্না, আমি এখন চিক্কাপ্পার বাঁদর। বাসব মাথায় বাঁহাত রাখে।

—যা হয়েছে সব ভুলে যা, আর যাস না, তোর জন্যে অন্য কাজ খুজব, কষ্টে হলেও সৎভাবে বাঁচবো। দুজনেব চোখেই জল। ঝাপসা হয়ে ওঠে। কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

বাসবেব কথায এবং চোখে জীবন। আদবের তাম্মা বক্ত দিয়ে জীবন বাঁচিযেছে। ডাক্তার বলেছেন—রক্তে দোষ আছে।

কৃষ্ণেব ভাবনায মৃত্যু। মনে পড়ে বাঁদরটিব কথা। সেদিন মাদারীর বিপরীতে চাকতিব হাতল ধরে ছিলেন এক বিদেশিনী। হাসি হাসি মুখ। হাঁটুর অনেকটা উপরে ফ্রকেব সীমানা। কৃষ্ণের দৃষ্টি স্থির। আহা, আজ অব্দি এবকম কাউকে বিছানায পায়নি! ফর্সা পাযে হালকা সোনালী লোম। হাঁটুব উপব একটা মশা। আহা, কী ভাগ্যবান মশাটা! মাদাবী চেঁচান—জনি, কুঁদ যাও, আজ মেমসাব বিবি মিলেগী! তখুনি বোধহয় মশাটা শুড় ঢোকায়। বিদেশিনী ঠাস কবে মাবতে যান। মশাটা উড়ে যায়। ভিড় আতঙ্কে হা হা করে ওঠে। বিদেশিনীর উরু দংশনে লাল। চাকতি কেঁপে যাওয়ায় জনির শবীবে আগুন। দুজনেই চাকতি ছেড়ে দেন। মাদারী ছালার বস্তাটা তুলে জনিকে জড়ান। বিদেশিনী জনিব জামাকাপড খুলতে থাকেন। কৃষ্ণ লাল দেখে। নিশ্চযই চুলকাচ্ছে। মহিলা ত্রাসে চুলকাতে ভুলে গেছেন।

সেদিন কৃষ্ণ চিক্কাপ্পার কাছে গেছিলো! খববের কাগজ পড়ে চিক্কাপ্পা ডেকে পাঠিযেছিলেন। সব বিস্তাবিত শুনে একবাব চেঁচিয়ে ওঠেন—স্টুপিড! তাবপরই চুপ। অনেকক্ষণ চুপচাপ স্যপ খেতে থাকেন। কপালের শিবাগুলোকে লাফাতে দেখে কৃষ্ণ। হিন্দি সিনেমার খলনাযকেব মতন লাগছে। —তোকে দযাম্মা মেয়ে পাঠাতো, পাঠাতো কিনা? একদৃষ্টে তাকিয়ে চিবিযে বলেন—কামাঠীপুরা—ধারাবীর লাইসেন্স ছাড়া মেয়েগুলোর কাছে কেন যেতিস? কৃষ্ণ কেমন করে বলবে? ওর গা গুলায়। থুতু উঠে আসে মুখে।

ঐ মেয়েটা, তেবো চৌদ্দবয়সী কচি গুল্মলতা; সেবাতে কামড়ে ধরেছিলো। কৃষ্ণ পাছায় জোব থাপ্পড় মাবে। চুল টেনে ধবে কৃষ্ণ। মেয়েটাব দাঁত আলগা হয় না। যন্ত্রণায় মবে যাচ্ছিল ও। কৃষ্ণ তখন দুহাতে গলা টিপে ধরে। মেয়েটার কী জেদ! গো গো শব্দ হচ্ছিলো মেয়েটাব নাক দিয়ে। তাবপর ধীবে অবশ হলে দাঁত আলগা হয়। রক্তে লালায মাখামাখি মেয়েটার মুখ, কৃষ্ণের তলপেট। জায়গাটা দেখতে দেখতে কুঁকড়ে ফুলে উঠেছিলো। চন্দ্রগুথির কোন মেয়েকে এরপর আর

বিছানায় নিতে সাহস পায়নি কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ বুঝতে পারে আজকাল ইল্লম্মার দেবদাসীরা স্বপ্নের রাজপুত্রকে ঘেন্না করে। এই ঘটনা কাউকে বলতে পারেনি। যতক্ষণ মেয়েটার হুঁশ না আসে বিছানায় বসে ঠকঠক কাঁপছিলো কৃষ্ণ। মরে না যায় মেয়েটা। কী সুন্দর বাড়ন্ত শরীর অথচ ভেতরে ঘৃণার বিষ। নিজের রক্তাক্ত অঙ্গে আফটার শেভিং লোশন ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে ছটফট করছিলো। জ্ঞান ফিরলেই ঠেলে ঘর থেকে বেব করে দরজা বন্ধ করে। দয়াম্মার কোঠার মেয়েগুলো এরপর ওকে দেখলেই হি হি হাসতো। টিটকিরি দিতো। সেই থেকে মুম্বাইয়েব দিনগুলি আ'ে অসহ্য হয়ে ওঠে। আলো ঝলমল মুম্বাই কখনো কখনো দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভুলভু'াইয়া হযে যায়। তখন সেই গেট ওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছাকাছি বাঁধানো সমুদ্রসৈকতে কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ঢেউ গুনতো। আচ্ছা, কোন দূরদেশগামী জাহাজ হঠাৎ এখানে চলে আসতে পারে না। ডক হয়ে জাহাজে চড়া ওর পক্ষে অসম্ভব। সঠিক জানা থাকলে কৃষ্ণ এখান থেকে মবণপণ সাঁতার কেটে পৌঁছে যেতো জাহাজে। তাবপব আর কোনদিন ফিরে আসতো না এই উন্মুক্ত কয়েদখানায়।

চিক্কাপ্পাব আদেশ পেযেও এবার ঐ কোঠার মেয়ে নিযে বেরুতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু দম দেয়া খেলনার মতন অসহায। এবাব বাসবেব দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে সবকিছু বেসামাল হয়ে পড়েছে। খবরেব কাগজের লোকেরা হৈ চৈ শুরু কবেছে। এই দুর্ঘটনায় নিজেব বিষ রক্ত প্রিয় আন্নাব শরীরে ঢুকে যাওযাব মতন কষ্টের ব্যাপার ঘটেছে। তেমনি লোক জানাজানি হযে গেছে ওদেব ব্যবসাব অনেকটা। দেবদাসীবা সাংবাদিকদের ইন্ধন জুগিয়েছে। এখনো চিক্কাপ্পাব নাম কোথাও ছাপা হয়নি। ঐ ছাপা হওযার ভযে চিক্কাপ্পা এখন চিন্তান্বিত। কৃষ্ণ থুতু গিলে ফেলে। নিজের অজান্তেই কিবকম একটা সুখের অনুভূতি ওর মধ্যে জেগে ওঠে। খুবই ক্ষণস্থায়ী, একটা বুদবুদেব মতন।

চিক্কাপ্পা খসখস লিখে চেক কেটে দিলেন। —আজ থেকে তোবা আমার কেউ না, বাসব কিম্বা তুই কাবো কাছে আমাব পবিচয দিলে কুত্তার মতন মববি। কৃষ্ণ চেকটাব দিকে তাকায়। দশ হাজাব টাকা! চুপচাপ মাথা নিচু করে নপুংশক বেরিযে আসে। সিঁড়ি দিযে নামার সময় মুখে আবাব থুতু জমে। কালো রাজপথে থুতু ফেলে। চারপাশে বিচিত্র আলো।

বাঁদরটাব সহ্যশক্তি মানতে হবে। কষ্টে দুচোখ দিয়ে জল বেরোয় কিন্তু একবারও চিৎকার কবেনি। এখানে ওখানে লোম ও চামড়া ঝলসে গেছিলো। পিঠের ক্ষত সবচাইতে বেশী গভীব। মেরুদণ্ডেব হাড্ডি দেখা যাচ্ছিলো। বীভৎস দৃশ্য। হতভম্ব বিদেশিনী কোমরে বেল্টের মতন আটকানো মানিব্যাগ থেকে পাঁচটা একশো টাকার চকচকে নোট বের করে মাদারীকে দিলেন। মাদাবী লুঙ্গির ট্যাকে গুঁজছিলেন। কৃষ্ণ ফর্সা উরুতে লালদাগ দেখছিলো। কোলাহল ডুবে গিযে পাকা সৈকত এবং গেট ওযে অফ ইণ্ডিয়ার সিঁড়িতে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর শব্দ বাড়ছিলো।

তখুনি ঝলসানো বাঁদরটা লাফিযে ফর্সা উরুর ঠিক ঐখানটায় খামচে লাল বক্ত বেব করে দিয়েছিলো।

শুভাশিস তালপাত্র

অনঙ্গহরির চশমা

অনঙ্গহরি দূরাগত ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পায়। এখনও নদীব বুকে পা নামিয়ে বসলে জলের খুনসুটিতে পুলকিত হয়। কিন্তু, নদীব ওপাবে টীলায় জুমের আগুনের হাল্কা হাওযায সাঁতাব কেটে এসে তাব শবীরে আঁচ দিলেও সে আগুনেব বঙ দেখতে পায় না যেমন দেখতে পায় না টীলার উপরে আস্তে আস্তে পোড়া একটুকরো আবাদ, অথচ শুনতে পায পাতাব মৃদু আর্তনাদ। এমনি হয। ভাবে অনঙ্গহবি। নিজের মাথায হাত বুলিয়ে শুষ্ক ছনের মতো চুলের ঝাঁকড়া অনুভব কবে। উপলব্ধি করে শরীবের ত্বকে হাত বুলিযে, এই শতাব্দীর যত বয়স তাবও তত, নেহাৎ কম বয়েস নয়। কিন্তু চলতে ফিরতে এখনো কষ্ট হয না তেমন। বাড়ীব জোয়ান ছেলেরা যখন কাজে যায়, ক্ষেতের কিংবা সবকারেব, যখন মেযেরা গেরস্থালীর কাজে কাজে ব্যস্ত থাকে তখন সে একা, হাতে লাঠি নিযে সরু পথে, গাছ গাছালি সরিযে সরিযে ছড়াব বুকে পা ডুবিয়ে বসে। গায়ে বোদ্দুর খেলা কবে, ছড়ার জল তাকে আদব কবে। কখনো ব্যতিক্রম হয না। এই নিযমেব নড়চড় হযনি এক-কুড়ি বছব। এককুড়ি বছব আগে জুমের ধান মাড়াইয়েব সময় অসতর্কে একটা ধানের ধারালো খোসা চোখে বিঁধে গেলে, বজ্রপাত হযেছিল চোখে। গাঁয়ের বৈদ্য পাতার রস দিলে কোন কাজ হয়নি, বরঞ্চ চোখ দুটি ফুলে গলে যাবাব উপক্রম হয়েছিল। সে ভয়ানক ব্যথা মনে হলে এখনও অনঙ্গহবির শ্বাসবন্ধ হয়ে যায। জলের মধ্যে ডোবানো পাযে একটা মাছ ঠোককব দিতে টেব পায় অনঙ্গহবি যে সে অতীতদিনেব ডোঙ্গায বসেছে। চোখের এই অবস্থা দেখে সুবথ বলেছিলো—এতদিন ধরে বসে এসব লতাপাতা শেকড়েব রস দিযে এই কাণ্ড বাঁধিয়েছ। চলো শহরে। আগরতলায। সেখানে বড় বদ্যি আছে, সাবিযে দেবে চোখ। দু'তিনদিনের বোঝা মোচায়বাধা ভাত নিযে শহবে গিযেছিলো অনঙ্গহবি। দুদিনের হাঁটা পথ। মাঝে তার শ্বশুরবাড়ীতে একরাত্রি থেকে পৌঁছেছিল পিচের রাস্তায়! তাবপর টিনের তৈরী বাসে করে এসেছিল শহরে। এসব সে শুনছিল সুবথের কাছে। কারণ, সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, রোদের আঁচ লাগলে টনটন করে বেড়ে উঠছিল ব্যথা। তারপর হাসপাতালে দশদিন থাকাব পব একজোড়া চশমা নিয়ে ফিরেছিল। পথে দেখেছিল শহরেব সাজানো বাড়ীঘর। সুরথ বলেছিল, একদিন আমাদের ময়ালটাও এমন রূপ ধরবে। এসব শুনে পুলকিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল অনঙ্গহবি, চোখেব হাসপাতাল? —হবে হবে, সব হবে। বড আনন্দ হয়েছিল অনঙ্গহরির, মনে হয়েছিল তার পল্লীটিতেও গাড়ী চলবে, অনঙ্গহরিব নাতি নন্দ ডাক্তাব হবে। গলায় সেই সাপের মতো যন্ত্রটা ঝুলবে। তার কাছে এসে বলবে, দাদু চোখেব হাল কেমন দেখি, দাওয়াই দিই....। নন্দকে তাই সত্বর শহরে পাঠানোর জন্য বলে, কিন্তু বাপ মা ছাড়ে না। এতে অনঙ্গর রাগ হযেছিল, বলেছিল অনন্তর মুখ দেখবে না। নন্দব বয়েস তখন

আর কত। এ-ই টুকু!

ধন্দ কাটে একদিন, মনে হয় ওসব আসলে আতিশয্য। তাই পরে ছেলেকে বৌকে ক্ষমা করে দেয়। আবার অনঙ্গহরি বৌয়ের বাড়া ভাত খায়, বৌকে ডেকে নিয়ে ময়নার বাসা দেখিয়ে আনে। দুদিন পরে বহু কসরৎ করে ডাহুক ধরে এনে দেয় খাবার জন্য, নতুন করে জুড়ে খরগোস ধরার ফাঁদ।

সুরথ এলে একদিন তাকে খরগোসেব মাংস খাওয়ায়। নানা কথা হয়। কথার পিঠে কত কথা।

সুরথ বলেছিল, কাকা আর কাঁটাতারের বেড়ার ভিতর যেয়ো না, ময়না পাখি খুঁজো না। শুধু হাঙ্গামা বাধাবে পুলিশের সঙ্গে। সুরথ ইচ্ছে করেই 'গার্ড' বলে না। তাতে অনঙ্গহরি বিপদের মাত্রা আঁচ কবতে পারবে না। কিন্তু ঝামেলাটা চশমাধারী অনঙ্গহবির সঙ্গে হয় না, হয় তার ছেলের সঙ্গে। খরায় জুমের ফসল জ্বলে খাক হয়ে গেলে দলবল নিয়ে সুরথ বিডিও'র কাছে গেছিল, যদি খয়রাত পাওয়া যায়। বিডিও বলেছিল আগে এনকোয়াবি হবে, তাবপরে রিপোর্ট। খুশি হ'লে সরকার পাঠাবে খয়রাত। বিডিও ঘুরে যায়, মাস যায। ভয়ানক আকাল নামে মহল্লা জুড়ে। ছাযা ছায়া সব মানুষ। দুঃখেব জলে চোখ ভেজে, ভেজে অনঙ্গহরির চশমাব কাঁচ। সে সবকিছু ঝাপসা দেখে। গ্রাস কবে এক অনিশ্চযতা। বড় বড় শালপাতা বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়াব আগে যখন হাওযায ভাসত তখন তার মনে হ'ত যেন শকুন নামছে। বক্ত হিম হয়ে আসত। দেবতাব চোখে এত আগুন, বুড়া দেবতাব কিসে বাগ, কার পাপ কি পাপ, সে বুঝতে পারেনা। যেমন বুঝতে পাবে না তার ছেলের বৌ-এর গর্ভে বাড়ে তার বংশ পোযাতি। বউকে না খেতে দিযে রাখতে নাই —এতে অমঙ্গল আরো বাড়ে। কিন্তু সে গোপন কথা কে জানাবে এই বৃদ্ধকে? তাই অনন্ত বাঁশের কড়ুল আর লাকড়িব খোঁজে দুতিন দিন কাঁটাতার ডিঙ্গিযে বিজার্ভ ফবেষ্ট আইন ভাঙে। কেউ জানেনি। কিন্তু ফবেষ্ট গার্ডের চোখ পডতেই সে পালায। এবং দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ পাওয়া গার্ড নির্বিকাবভাবে গুলিতে তাকে জখম করে। শুকনো বারুদে আগুন জ্বলে উঠে। কাঁটা তাবেব বেড়া উপরে ফেলে ক্ষিপ্ত মানুষ। খবব চলে যায় সদবে, রিপোর্ট যায় মুহূর্তে। উত্তরও আসে ত্বরিতে। সাবি সাবি গাড়ি আসে। ফ্রেব্রুয়ারী মাসের আকাশ যেন ফার্নেসেব মত খব। তবু নাকে রুমাল চাপতে চাপতে অফিসাববা সভা ডাকে। যাতে কোন দুর্বিনয প্রকাশ না পায তার জন্য সতর্ক থাকে। না হলে কি থেকে কি হয়ে যাবে। অনঙ্গহরির সঙ্গে এরা সম্ভ্রমে কথা বলে, তাব কাছে সহযোগিতা চায। তাদের প্রতি প্রশাসন কিরকম সদয তার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ হাজিব করে। কিন্তু এত কথা অনঙ্গহরির মনে শিহরণ তোলে না। সে শুধু চশমাব আডালে রেখে চোখ দিয়ে পোশাক, ভঙ্গি এবং আচবণ জরীপ করে। এমন এক দৃষ্টি, তাকিযে থাকা বৃদ্ধেব সামনে দাঁড়িয়ে সুসভ্য মার্জিত কর্তাব্যক্তিবা ইতস্তত করে। বাকরুদ্ধ হয তাদেব। তবুও তারা বলে, হাঙ্গামা করলে অশান্তি বাড়বে। অনন্তব জন্য তাবা ক্ষতিপূবণ দেবে। তবে অনঙ্গহরিকে কথা দিতে হবে যে আর কেউ এমন দুঃসাহস কববে না। অন্ধকার হলে এদের পদমর্যাদার ক্ষমতায সভাস্থলে হ্যাজাক জ্বলে। এমন আলোকিত অঞ্চল দেখেনি মহল্লার কেউ। নন্দর চোখ হা হয়ে যায়। এমন ঘটনা যেন একবারই ঘটে। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ এরা।

অনঙ্গহরি তাই আশ্বাস দেয়। তখন মাথার ওপরে উঠছে চাঁদ। গাড়িগুলো চলে বাংলোর দিকে। জল জঙ্গলে উপজাতি জীবনের পরশমাখা অরূপ নিকেতনের দিকে। বহুদিন পরে চিমনি দিয়ে গলগলিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। জোছনায় বনের মধ্যে এমন তাজ্জব দৃশ্যও দেখছিল মহল্লার সকলে। পেটের ভিতরে তখন নাড়িভুড়িগুলি কুচকে চুককে এক অসহনীর উপদ্রব তৈরী করছিল, তাই এদের গায়ে জোছনার এই উম স্পর্শ করছিল না। অন্যদিকে ঠিকাদারের দল মার্চ মাসের আগে ভগবদ সেবার অযাচিত সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় একটি মহোৎসবের আয়োজন করেছিল বাংলোর ভিতব। সেই উত্তাপে তখন উদোম আহ্লাদ। অরণ্যের মধ্যে এই বীভৎস রসের সূচনা স্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে গেল। একদিকে যখন স্মরণীয় রাত্রি নামে আরণ্যক বাংলোয়, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত সকালেব প্রহর গোনে এক পোয়াতী বৌ আরো স্বজনেব সঙ্গে। পেটের ভিতব দাপট দেখায়, কেরে তুই, এই আকালে। ক্লং, ক্লওং-ঙ।

এক নাম না জানা পাখিব বিকট চিৎকারে ধ্যানভঙ্গ হয অনঙ্গহবিব। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসে, তবুও তার সেই আকালে বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে হয। এই অসম্ভব ভাবে বেঁচে থাকাব দিনেই জন্ম হয বুধবাইয়ের। চশমাটাকে টেনে নিযে সে বৃথাই দেখবাব চেষ্টা করে, শুধু মধ্যাহ্নেব সূর্যের দিকে তাকাতে মনে হয় সে বোধহয় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, না হলে কি কবে এই ভযাবহ দীপ্তি সহ্য কবছে। এখন আব আকালের টানাপোড়েন নেই, কাজ আছে। সুবথ এখন সদরে, বিরাট মানুষ। তবুও দুঃখ ঘোচে না। সুবথ বলেছিল, একদিন এখানে চোখের হাসপাতাল হবে, সব হবে। কিন্তু কই? সেই কথার বযেস, চশমার বযসেব মতো এক কুড়ি। সুবথ মনে কবে কথাটা শুনতে হবে। কিন্তু তাব আগে যদি সে অন্ধ হযে যায সুরথকে চিনবে কি কবে? তবু তার সংশয যায় না, সুরথ বড় ভালো মানুষ, দবদভরা। তাই সেভাবে– হয়ত এই মহল্লা ছাড়া, এই লাগালাগি কয়েকটা বাড়ি ছাড়া সবাব জুমে ধান ফলছে। মরদরা কাজ পাচ্ছে, নাচ গানের আসর বসছে। না, বুড়া দেবতার চোখই অন্ধ। সে ভাবে। এমনতব কল্পনা কবে সে উজ্জ্বল হযে ওঠে। এক গণ্ডূষে জল ছুঁড়ে দেয দেবতাব উদ্দেশ্যে। দূবে একটা বনমোরগ ডেকে ওঠে, বৃদ্ধের হাত আলগোছে বুকে চেপে ধবে. নিচে ধুকপুক হাঁপড়েব শব্দ—সুবথকে ভাল বাখ, রাজা কর। সেই জল যখন শূন্য থেকে উড়ে তার বলিবেখা ছুঁযে গড়িয়ে পড়ে তখন এই প্রাচীন পুরুষ ভাবে, সুরথকে অবিশ্বাস কবাব যাবতীয় পাপ ধুযে গেল। সে ভারমুক্ত হয়। মযনার বাসার খোঁজে উঠে দাঁড়ায। নন্দকে যে শহবে পাঠাতে পারেনি সে দুঃখ মনের খাঁজে জমানো ছিল। তাই বুধরাই ডাগরটি হতে নিজের চরকার দণ্ডটি বিক্রি করে দিয়ে সে গাড়িভাড়া যোগাড় কবে। জুমের ভরা ফসলের একটি ভাগ সে তুলে রাখে, সবার কাছ থেকে কেড়ে। বুধবাইকে ডাক্তার হতে হবে। চোখের হাসপাতালে সে হবে প্রথম ডাক্তার। বলবে—দাদু, চোখেব হাল কি রকম দেখি, দাওযাই দিই কিছু। ভাবে, সমস্ত শবীর জুড়ে শুধু একটিই ভাবনা। বুধরাই শহরে যায়। বোর্ডিং-এ থাকে। সে এক ফালি কাপড় পবেনা। পবে সার্ট পেন্টুলুন। এসব পছন্দ না অনন্তর। ঘ্যানব ঘ্যানর কবে। কিন্তু অনঙ্গহরির অপরিসীম আদরে বেড়ে ওঠে বুধরাই। দাদুকে সে তাই বশে রাখে আদায় কবে এটা ওটা।

পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, রেজাল্ট হতে অনেক দেরী। সবাই বলেছে বাড়ি যা। জুমের কুমড়া, আদা আনিস ফেরার সময়। তাই এ যাত্রায় দাদুকে অনেকদিন কাছে পাবে। এবার সে দাদুকে তুষ্ট করতে চায়। অনঙ্গহরি নাতিকে নিয়ে যায় তার ফাঁদ দেখাতে, খবগোস ধরার জন্য সে লতাতন্তু দিয়ে এক নতুন ধরণের ফাঁদ তৈরী করেছে। দাদুর সঙ্গে যায়, তা নেহাৎই দাদুকে বিগড়াতে চায না বলে। এসব তার আর ভাল লাগে না। শহরে তার বয়েসী ছেলেরা কী সুখে থাকে। এখন হয়ত সিনেমাহলের সামনে বিবাট ভিড় হয়েছে। ছলকে উঠছে হুল্লোড়। এসব ভাবে। কিন্তু শহরটা যে তাকে ভালবাসেনা, অপাঙ্গে বিদ্রুপ কবে সে বুঝতে পারে। তবু এত আয়োজন ও এসবের হাতছানি যেন তার চোখে নেশা ধবিয়ে দিয়েছে। অনাহূত থেকেও তার নেশা ধবেছে।

বেশ কয়েক বছব হ'ল অনেক ছেলে শহবে আসছে। বর্ডিং-এ থাকে। তার কয়েকজন সঙ্গীও জুটেছে। যারা তাকে ভালবাসে, তাব সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। তাকে দুঃখ দেয় না। সবাই মিলে এই শহবে একটি আলাদা জগৎ তৈরী করে। প্রত্যেকেই এই শহরের উষ্ণতায মিশে যেতে চেযেছিল। কিন্তু সেই স্রোত তাদেব কেবলই নিক্ষেপ কবছে দূবে আরও দূবে।

তারই কযেকজন সঙ্গী নিত্যহরি, পার্বতীচবণ কিংবা মোহনবায বলে, এই দুর্দশার কথা। তাবা বলে এমন এক ভঙ্গিতে যে সবটা মেনে নিতে সাহস হয না তাব। প্রথম পরীক্ষার পর পার্বতীচবণ আব ফিবে আসেনি তারা যাবার সময় জলেব পাইপ খুলে নিয়ে গেছে, এমন অভিযোগ ছেয়ে যায়। খবরের কাগজের পাতায় চাউর হয খুব। হতেও পাবে আবাব নাও হতে পারে। এমন নির্বিকার সে বেশিদিন থাকতে পারে না, সন্দেহের আঁচ তাকেও ছোঁয়। জবাবদিহি কবতে হয় সাদা পোশাকেব পুলিশেব কাছে। বুধবাই তেমনভাবে ভেবে দেখেনি কথাটাব সত্যতা। তাবপর সেইসব ভয়াবহ দিন, পার্বতীচবণ এবং মোহনবায হযে উঠেছে আতঙ্ক। কখনও চোবাগোপ্তা মিটিং-এ যেতনা বলে বুধরাইকে নিযে ওবা তামাশা কবত, ডাকত 'মুসা' 'মুসা' বলে। গ্রামের দাবিদ্র থেকে তাব পালাতে বড় ইচ্ছে কবত। কিন্তু পালাবে কোথায? কোন ছাযায? তার জন্য কেউ দাঁড়িযে নেই। তাব এই বিহ্বলতা, তাকে অস্থির করে তোলে। হঠাৎ অনঙ্গহরি নিজেবই বিছানো ফাঁদে পা আটকে ফেলে। এক মুহূর্তের জন্য সে হতবিহ্বল হয়ে যায। বুধবাইয়েব সম্বিত ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বুধবাই এসে এক হ্যাঁচকায দাদুর হাতেব টাক্কালটা কেড়ে নিয়ে কেটে দেয় তন্তুজাল, ফাঁদ। বৃদ্ধের সারা মুখে হাসি খেলে যায়, ভরসায নাচান শীর্ণ হাত দুটো। তারপরই এক ঝটকায় বুধবাইকে জড়িয়ে ধবে, যেন তাব কুড়িটা বছর কিছুই না। সে যেন এখনও সেই শিশু। এই উত্তাপকে বড় লোভনীয় মনে হয়। কিন্তু বুধরাইয়ের ভাবনায় সেই অস্থিরতা তোলপাড় করে, তাকে দাহ করে।

দাদু অনঙ্গহবি যে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পায না, সেটা বুঝতে পারে বুধরাই। চশমার কাঁচ যে পাল্টানো দরকার, সে আবাব জানায় অনঙ্গহরিকে। সে তাকায বুধরাইয়েব মুখেব দিকে। বুধরাই হাসে এবং ধবে নেয অনঙ্গহরি তাব উপর তুষ্ট। অনঙ্গহরি গুনগুন করে, আড় চোখে বুধরাইয়ের দিকে তাকায়, বলে : মুসা তীয় পার হীন খীলাই বা। বিনি বুমুল কমরয়া...বাঘ জল পার হলেও তার গায়ের

ডোরা ধুয়ে যায় না। এই প্রবাদকে অবান্তর ভেবে হোহো করে হেসে ওঠে বুধরাই।

অনঙ্গ হরি বলে, বুধু তোকে ডাক্তার হতে হবে। বুধরাই কিছু বলে না। পাশাপাশি হাঁটে। যদি পাশ করে তবে তার ইচ্ছা, সে পুলিশের ইন্সপেক্টর হবে। কালো খটখটে বুট পরার খুব ইচ্ছে তার। যে শহর তাকে কাছে ডাকেনি তার স্যালুট আদায় করতে এই পথকেই একমাত্র বলে মনে হয় বুধরাইয়ের। উর্দি, খটখটে বুটের শব্দ এবং ব্যাটনের গুঁতো তার মাথায় ঘুবপাক খায়।

— পারব, সেই বিশ্বাস নাই দাদু।

কেমন জাতের মানুষ এই অনঙ্গহবি। বলে, আমি যাব সুরথের কাছে—

— অতদূর যাবে তুমি?

ঘোলাটে আচ্ছন্ন অনঙ্গহরি থমকে দাঁড়ায়।

— কেন নয়? শহবে গেছি আমি, সুবথেব হাত ধরে।

— আর সেই শহব নাই, সেই সুরথ নাই। বড় ব্যস্ত লোক, অত সহজে তার দেখা পাবে?

— পাবো।

তাতেই কি লাভ? বলে বুধরাই।

তিপরা ভাষায় যারা কথা কইতে লাজ পায়, তারা হুই—উঁচুতে। নাগাল পাইনা। কি নাই তাদেব, হাটুবে তিপবাদের কাছ থেকে তারা বছরে দু'একবার কঁড়ুল কিনে। গোদক খায়। এসব টিপরা দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে কথা বলে, বিবৃতি দেয়।

— টিপবা-টিপরা করিস না। বাঁশের বল্লম দিয়ে যাবা বাঘ মাবে, তাবা পারে, সব পারে।

এগুলো একধবণেব সস্তা ভাবালুতা মনে করে বুধবাই। তাই শহরেব শানবাধানো পথে হেঁটে পায়ে-ফোস্কা-পবা বুধবাইকে বৃদ্ধেব আবেগ স্পর্শ করতে পাবে না।

— যাবো সুবথের কাছে।

— ঠিক আছে। তাহলে এবার চোখও দেখাও। ...না হলে অন্ধ হবে একদিন।

— বড় ডাক্তাবেব কাছে?

— হ্যাঁ।

— ঠিক আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাবপব লোহাব মত কঠিন হাতে বুধবাইযেব কব্জি চেপে ধরে—আমাব চারদিক, মানুষজন, পাখী-পশু-লতা সব দেখতে বড ইচ্ছা হযরে বুধবাই! শহরে যাবো। সদবেব ডাক্তাব চোখ দেখে আবাব মযনাব হলুদ ঠোঁটে-চোখ ফিবাযে দেবে। কাঁচ দেবে?

বুধবাই অনঙ্গহবিব হাত ধরে ছাযাচ্ছন্ন বাঁশবন পেরিযে বনপথ দিযে যায বাড়ীব দিকে। সে ভাবে এলোপাথারি অনেক কিছু। ভাবনাগুলো তাব জড়িযে যায। এদেশ কি শুধু স্থুল, পাহাড টীলা, বুনোঘাস? না মানুষজন? এখানেব এই ক্ষুধা দাবিদ্র অজ্ঞতাব নিঃসীম বন্ধ অন্ধকার কি কোনদিন ভাঙবে? কেন এই দীনতার সমারোহ সমারোহ ঘিরে থাকে এই প্রাচীনতব পবিবারগুলোকে? এখানে শুধু দিনগুজবাণ, উৎসবহীন দিনযাপন।

বুধরাই জানে পাহাড়ে জঙ্গলে যারা বসবাস করে, তারা তাঁর স্বজন, খ্যাপা

যত। সম্মান চেয়েছিল, অনাদরে আহত। কিন্তু বিদ্রূপ পেয়ে গিয়েছে হন রেখার দিকে। তার সামনে ভেসে ওঠে নিত্যহরির পবিত্রমুখ, কিম্বা বিপিন্দ্রব বাঁশির আওয়াজ এবং ক্লীষ্ট মাধবীর মুখ। মোহনরায় এখন তাকে ভালোবাসে। তাকে চম্প্রেং শেখায়, এই নিদারুণ টানাপোড়েন—এর শেষ কোথায়? সে জানেনা, সে ভাবতে চায়না। অনপনেয় এইসব ভাবনা তাকে দিনরাত দাহ করে। সে প্রত্যক্ষ করে এই অরণ্যের মধ্যে দাহনবেলা। নিজের গহনে এক পোড়াচিহ্ন। এমন সময় তার এই ধ্যান ভাঙিয়ে অনঙ্গহরি বলে—কি ভাবছিস অত?

সে কিছু বলেনা। আবও নীরব হয়ে হয়। এইখানে, দুঃখ ভেতরটা এমন স্বাভাবিক ভাবে দেখায় সে। বৃদ্ধেব অস্পষ্ট চোখও সেই আবেগ অনুভব করে। কিন্তু কথার মর্ম সে ধরতে পাবেনা। তাই বলে, বিয়ে হবে তোর, পাশ হোক—

—সে কথা না, অন্য—

এত আস্তে বলে যে অনঙ্গহবি শুনতে পায়না। শহবে এক নেশা তাকে পাগল করে, আর এখানে এলে এক দুঃখবোধ সেই নেশাকে ঠোককব মারে। এতে সে ক্ষত বিক্ষত হয় কিন্তু পথ পায় না। মনে হয—যদি সুবথ কাকার কাছে যাই, কতদিন ভেবেছে, একদিন গিয়েছেও কিন্তু চারিদিকের ভিড়ের মধ্যে তাকে চিনতে পারেনি সুরথ কাকা, আহত অভিমানে সে চলে এসেছিল। ভেবেছিল, সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল নিজেকে—কত ব্যস্ত মানুষ সুবথ কাকা। এ তাব শুধু অভিমান; কারণ —সুবথেব কাছে যাবাব ইচ্ছে এখনো সে মনেব মধ্যে পোষণ কবে। সে একটা পথ চায়, যে পথে মর্যাদার সঙ্গে হাঁটা যায়।

সুরথ কাকা তো বিবাট মানুষ, সুরথ কাকা নিশ্চযই জানে সে পথ। কিন্তু তবু সংশয়ের বীজ থাকে, সুবথ কাকা সে পথ জানে তো! নির্ভুল সেই পথ?

বুধরাই অনঙ্গহরির কাছ থেকে তার জমানো টাকার ভাণ্ডটি পায়। মাটির ভাণ্ড, সেখানে প্রায চারশ' টাকার নোট ছড়ানো। এই খেয়ালে অনন্ত খুব বেশী একটা আপত্তি করেনি। অনঙ্গহরি পুরনো চশমাটা নাকে বসিযে হাঁটতে আরম্ভ কবে এক সকালে। সঙ্গে একটা কাপড়ের ঝোলা। ঝোলাব ভিতরে বাঙুই, বাঁশের ছোট হুঁকা। দুয়েকটা কাপডজামা। বুধরাইয়ের সঙ্গে আগেরদিনের গল্প কবে, কি রকম করে সুরথ তাকে নিয়ে গিয়েছিল শহরে। কাঁধে করে ছড়া পার কবেছিল। সব সবিস্তারে বলে। দুয়েকবার বুধরাই কান দেয়। অন্য সময় কালো পিচের রাস্তাটার দিকে লক্ষ্য করে। যদি গাড়ীর ইঙ্গিত পাওয়া। মাইল দুয়েক হাঁটতে পিচের রাস্তাব উপর এসে পড়ে অবাক হয়ে যায় অনঙ্গহরি। সুরথের সেই কথা মনে পড়ে যায়। একদিন এখানেও শহর হবে। খুশিতে মনটা ভরে যায়। একটুক্ষণ গাছের ছায়ায জিরোতে না জিরোতে বাসের হর্ন শুনে লাফিয়ে উঠল বুধরাই। অনঙ্গহবিকে কোনক্রমে গাড়ীর ভিতরে তুলল। প্রচণ্ড ভিড়। বসাব জায়গার কোন প্রশ্ন নেই। এই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধের জন্য কারো কোন সহানুভূতি হলো না। অগত্যা পাটাতনের উপর বসিয়ে দিলো দাদুকে। দাদু নিশ্চিন্ত নীরবে বসে পড়লো। পাটাতনে বসে পড়তে দেখে এক সুন্দরী মহিলা অপাঙ্গে তাকাল। এ বুধরাইয়ের গা সওয়া। এর চেয়ে ধারালো

বিদ্রুপ তার উপরে শহরে তো প্রতিদিনই বর্ষিত হয়। সে ধবেই নিয়েছে এ তার প্রাপ্য।

শহরে নেমে অনঙ্গহরির কথা মতো সে প্রথমে যায় সুরথের কাছে। এবাবও সুরথ নেই। দিল্লীতে মিটিং। তার স্ত্রী অনঙ্গহরি নামে এই প্রাচীন পুরুষকে চিনে রাতে থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিল বারান্দার সঙ্গের ঘবটাতে। রাতে যথারীতি খাবার এলো। অনেকদিন পরে বাঙাল খাবার খেলো অনঙ্গহরি। রুচি পরিবর্তনে তার ভালোই লাগল। বুধরাই লক্ষ্য কবল এরা কেউই প্রতিবেশীর মতো ব্যবহার করছে না। নিতান্ত কৃত্রিম ভদ্রতার এক মুখোশ। সে নিজেকে অন্যত্র নির্দিষ্ট কবতে চাইল। বাইরে বাগানে কতশত আশ্চর্য্য ফুল, মালী প্যান্ট শার্ট পরে জল দ্যায়। এই বাগানের জন্য তিনজন লোক। একটা জল সববরাহেব ব্যবস্থা। অথচ তাদেব গ্রামে আর একটা টিউবওয়েলেব জন্য তিন বছব ধরে বেগার্তা চলছে। এক সময় এসে সুরথের স্ত্রী বৃদ্ধকে তার আসার কাবণ জানতে চায়। সব শুনে মহিলা বলে সুরথের সঙ্গে দেখা হবে না। দিল্লী থেকে আসতে দেরী হবে। সে ববং সুবথেব ব্যক্তিগত সচিবকে বলে চোখেব ডাক্তাবকে অনুরোধ করবে। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় নত হয। আব সুবথের স্ত্রী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়।

পরদিন সকালে সুবথেব স্ত্রী ডাক্তারেব ঠিকানা বলে দ্যায বুধরাইকে। বুধরাই এবং অনঙ্গহরি বিদায় নিযে ডাক্তারের কাছে আসে। সেখানে অনেক ভিড়। ডাক্তারকে আগে থেকে বলা ছিল বলে এ ক্ষেত্রে সহজেই দেখাবাব সুযোগ পায় অনঙ্গহবি। চোখের ডাক্তারের চশমাটা ভাবী সুন্দব, রুপোলী ফ্রেম। ডাক্তাব নিশ্চয জরুরী ব্যক্তিব পরমার্শ পেযে সুবথকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। প্রথমে চশমা খুলে নেয়। তার কাঁচ পরখ করে। এক সুতীব্র, উজ্জ্বল আলো দিয়ে ডাক্তার অনঙ্গহবির চোখ পবীক্ষা করে। তারপরে একটি ছোট পেটেরায় রাখা কাঁচ এনে অনঙ্গহরিব চোখে আটকে সামনেব ফুলগুলোয ধারাবাহিক তাকাতে বলে ডাক্তার। ছোটবড় মাঝারী —একেবারে ছোট এই ভাবে সাজানো অদূরবর্তী বোর্ডে। যারা নিরক্ষর, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। একেব পর এক কাচগুলো চোখের সামনে ধবে ডাক্তার জিজ্ঞেস কবে—ভালো দেখছেন ?

আরো ভালো ?

কিংবা খুউব—ভালো ?

তারপরে পুরনো চশমাটাকে জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে এটা দিয়ে চোখের হাল আবো খারাপ হয়েছে, অনিষ্ট হয়েছে খুব।

বুধরাই সম্মতি জানায় ডাক্তারেব কথায়, যেমন আর দশজন কিছুই না বুঝে সম্মতি দ্যায় ডাক্তারের বাক্যাবলীতে।

অনঙ্গহরিকে তার স্কুল এবং বোর্ডিং দেখাবার সখ থাকলেও সেটা করার ইচ্ছে তার নেই। কারণ—স্কুলেব সহপাঠীরা দাদুকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পাবে। এই আশঙ্কা কখনোই বুধরাইয়ের অমূলক মনে হয়না, তাছাড়া নতুন চশমা নিতে হবে দোকান থেকে। দাদুকে বলবে, একটা রেডিয়োর কথা—সে হিসেব করে দেখেছে টাকায় কুলিযেও যাবে। এই টাকা বছরের পর বছর ময়না কিংবা জুমের ক্ষেতে লাগানো কুমড়ো বিক্রির টাকা। সে দৃঢ়ভাবে জানে দাদু না বলবে না। চশমার দোকানে

গিয়ে প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে চশমা কিনে আনে বুধরাই। দাদুকে বসিয়ে সে অবশিষ্ট বাঙ্গুই খেতে দ্যায়। নিজেও একটা খায়। বাস স্ট্যাণ্ডে এই ভাবে গোটা কয়েক বাঙ্গুই দিয়ে তাদের সকালবেলার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বুধরাইয়ের হঠাৎ মনে পড়ে যায় রেডিও কিনবার কথা। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সে ভুলেই যাচ্ছিল! দাদু আপত্তি করে না। এতে খুশি হয়ে নতুন চশমাটা পরিয়ে দেয় দাদুর চোখে। একজোড়া কাঁচ। একেবারে চকচকে। রোদ পড়ে যেন ফিরে আসছে। হঠাৎ আনন্দে শিশুর মতো চারিদিক দেখতে থাকে বৃদ্ধ। কি উজ্জ্বল, সব কিছু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কত বাড়ি, গাড়ি, ভিড়। কুড়ি বছরের আগের শহর আর নেই, এর বুক ফুঁড়ে যেন এক নতুন পুরী। বিস্ময়ে বৃদ্ধ তাই দেখছিল। বুধবাই দাদুর হাত ধরে কাছের একটা রেডিও বিক্রেতার দোকানে ঢুকে যায়। দরদাম করে একটা ব্যাণ্ড-টু রেডিও কেনে। দাম শুনে বৃদ্ধ প্রথমে ইতস্তত কবেছিল বটে কিন্তু বুধরাইয়েবই শেষ পর্যন্ত জয় হোল। বুধরাই বাসস্ট্যাণ্ডে ফ্রিকোয়েন্সি ঘোরায়, ক্যাচ ঘ্যাচর শোনে, ভিনদেশী ঘোষণা বা ফ্যামিলি প্লানিং-এর বিজ্ঞাপন শুনে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। গর্বিত ভঙ্গিতে অন্যরা তাকে কিভাবে দেখে সমীহ করে সেটা জরীপ করে কিছুক্ষণ পর। অনঙ্গহরিব এই স্বচ্ছ চোখ যেন শহরের বুকে ডাই করা প্রাচুর্যেব উৎস সন্ধান কবছে। যত দেখে ততই বিস্ময়ে ভরে ওঠে মুখ। উত্তেজনায় শনের মত চুলের ফাঁকে আঙ্গুল চালিযে দিচ্ছে কখনো। কখনো এই দ্যাখ বলে বুধরাইকে হ্যাঁচকা টান দেয। এইভাবে এক উম্মোচন পর্ব শেষ হতে না হতেই গাড়ী এসে যায়। বুধরাই জানলার পাশে দাদুকে বসবাব ব্যবস্থা করে দ্যায়। এই খাতিরে অনঙ্গহরি খুশি হয।

গাড়ী চলেছে। এই গতিযানের সঙ্গে যেন তার চিন্তার পাল্লা। সুরথ ঠিকই বলেছিল। সব বদলে যাবে। গাডী এগিয়ে যায়। বাঁক ঘোরে আস্তে আস্তে শহরের প্রান্ত সীমা ছাড়িয়ে, তাব ছোঁযাচে এলাকাগুলো ছাড়িয়ে গভীরে ঢুকতে থাকলো। তারপর টীলা পাহাড। পাহাড়েব চূড়োতে এসে গাডী আস্তে আস্তে গডিয়ে গড়িয়ে চলে। কিন্তু একি, একি সুব। চাবদিকে সব পাথব ভাঙছে বসে। ক্লান্ত, ক্লীষ্ট সারি সাবি মুখ। এবং দুস্থতাব ছাপ। অনঙ্গহবি এই নতুন দৃষ্টি দিযে কি দেখছে? আর সুবথ কি বলেছিল। যেতে যেতে দেখে শত পাহাড়ী পল্লীকে শুধু এক করে দিয়েছে কতগুলো পথ। আব সেই সব পথে তারা নেমে এসেছে পাথব ভাঙতে। না হলে বেঁচে থাকা যাবে না। পাথবেব সঙ্গে কখনও এমন যুদ্ধ হয়নি এই হাতে। যে হাতে তাঁত চালাত নকসা ওঠাত। জুম ফলাত, চম্প্রেঙে বোল তুলত। গাড়ী থামে। দেখে জীর্ণ টংঘর, সেই দুঃস্থ চেহাবা। সেদিনের অস্পষ্ট মুখগুলো তাব কাছে আজ স্পষ্ট। ভীষণ স্পষ্ট। দারিদ্রের আঘাতে মুচডে যাওযা মুখ—বিকৃত মুখ। অন্ধকারের মত মুখ। যেন পাথরে মুখ, যেন শুধু এবা একদিন মানুষ ছিল। কে যেন অদৃশ্য নখ দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে, রক্তাপ্লুত কবে দিচ্ছে বুকের ভেতর। সুরথ বলেছিল এইসব? বৃদ্ধের পা আটকে থাকে, চলতে পারে না। কে যেন বেধে ফেলছে তবুও চলাব চেষ্টা করছে সে। এতক্ষণে অনেকটাই সামনে এগিয়ে গিয়েছিল বুধবাই। তাই থমকে দাঁড়ায়। অনঙ্গহরিকে এতটা পিছনে দেখে, আওয়াজ দেয় হোও

-হোঃ। কানে তার তখন তুইথুলি মুইথুলি করে অজানা তরঙ্গের অর্কেষ্ট্রা। তার একাগ্র মনোযোগ সেই দিকে। তথাপিও হাটে যেন তড়িতাহতের মত। আবার ছড়ার কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এবার তার চোখে ধরা পড়ে, অনঙ্গহরি অস্বাভাবিকভাবে টলছে। যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। সে এগিয়ে যায় তার দিকে। অঘটনের আশংকা হয় তার। অন্যদিকে সেই মুহূর্তে অনঙ্গহরি বুকের মধ্যে তীব্র ব্যথা অনুভব করল। সে আর সইতে পারছিল না। তবুও কোনক্রমে ছড়ার মধ্যে এসে দাঁড়াল। সেই ছড়া যার বালুচর, খানাখন্দ এবং জলের স্পর্শ, সবই তাব চেনা। দূর থেকে নিজের পল্লীটিকে দেখতে পায় অনঙ্গহরি। ক্লীন্নতাষ এই স্পষ্টহাসি আর সইতে পারল না। অনুভবেব সংযম ছিঁড়ে তোডে চোখের জল চশমার কাচ দুটোকে ভিজিযে দেয়। বিমর্ষ গুমোট দৃশ্যগুলো মুহূর্তে অস্পষ্ট কবে তাকে এক আশ্চর্য স্বস্তি দেয়। 'ব আন্দাকুন্দা বাচাই তংগি.........' হে অন্ধকার চিবজীবী হও, ডেকে ওঠে প্রাচীন পুরুষের অন্তব। কিন্তু অসচ্ছতার জন্য প্রতিমুহূর্তে ভিখারি হবে, যে কোনদিন হাত পাতে নি কারো কাছে? বৃদ্ধ পিতামহেব এই সব আচবণ দেখছিল বুধরাই স্তম্ভিত হয়ে। কিন্তু সে বুঝতে পারেনা, কিসেব ছোঁযায় হঠাৎ মুখেব খাঁজে খাঁজে জমানো অন্ধকাব সবে যায, কেন সে এমনতর হেটে আসে তাব দিকে, হাত বাডায চিত্রার্পিতেব মত? প্রাচীন পুরুষ তথাপি তারই দিকে এগোতে থাকে। মুখের চশমা পিছলে মাটিতে পড়ে, বৃদ্ধেব রুখু পাযেব তলায় পড়ে গুডিয়ে যায। তাব ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই আগের মত, যেন একটি অভিশপ্ত মুহূর্ত পাব হযে এসেছে— তখনই অনঙ্গহরি ডাকে, অ—বুধরাই!

দীপক দেব

গুলি অথবা গুলির শব্দ

"এইসকল পাহাড়পুঞ্জের শরীরে যে আকৃতি তার সম্পূর্ণটাই ক্ষুধার। মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ কলুষিত করেছে বিভিন্নভাবে নীরবতা এবং জীবন। এইসকল পাহাড়পুঞ্জ বারবার আমন্ত্রণ করেছে মানুষকে এবং বারবার বিপর্যস্ত, উলঙ্গ হয়েছে।"

এক

কমলা রাইয়ের টঙঘর থেকে আসাম-আগরতলা রাস্তাটা সোনামুখী সূঁইয়ের মতো দেখা যায়। রোদ পড়ে চিকচিক এখন। বড়গাড়ীগুলোকে রাতের বেলায় বিড়ালের মতো মনে হয়, শুধু হেডলাইটটাই চোখে পড়ে। কমলা রাইয়ের ঘর বস্তিটার শেষপ্রান্তে এবং রাস্তামুখী।

এটা দেবতামুড়া পাহাড। বিচিত্র সব পাহাড়পুঞ্জ, চেনা অচেনা অসংখ্য গাছগাছালি; বন্যপ্রাণী যে একেবারে নেই তা নয়, তবে আশেপাশে বিপদ থাকলে আজকাল বন্যপ্রাণীরাই দূরে থাকে। দেবতামুড়ার এটাই সব চাইতে বড় জনপদ। ছোটখাট একটা হাটও বসে সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবারে, এখনও অনেক সম্পন্ন ব্যবসায়ীর কর্মচারী দোকান নিয়ে আসে শহর থেকে। নিত্য প্রয়োজনীয় যা জিনিষপত্র আসে তার কেনাবেচা বেশিভাগই ধারেই চলে; এতো বেশী হিসেব করে চলতে পারে না বাসিন্দারা। রঙীন চুড়ি, লাল ফিতাও আসে। কমলা রাই খুব কমই হাটে যায়, যেদিন যায় সেদিন শহুরে ছোকরা বুড়ো দোকানদারের চোখে মুখে যে ভাষা থাকে অনেক আগেই এই সব জানা হয়ে গেছে।

টঙ ঘরের বাইরে একটা ঝুলন বারান্দার মতো আছে। ভাদ্র মাস এখন; তপ্ত সূর্য একেবারে কাছাকাছি বড় পাহাড়টার গাছগুলোর শরীরে লেগে আছে। তবু গরম কম। দুরন্ত বাতাস শুকনো পাতা এবং রোদ উড়িয়ে নিয়ে চলে একসাথে। এক টুকরো কাপড় দিয়ে বুক বেঁধে রেখেছে, নিচে একটা পাছড়া প্যাঁচ দিয়ে পরা শুধু। আগে স্বামী দূরে বিদেশ গেলে দিন গুনতো, দশ বছর বিয়ের পর এখন তাও একঘেয়ে লাগে। আর কিইবা হবে দিনগুনে: সব পুরুষমানুষ একই রকম। বীরেন্দ্র রাই তার স্বামী, ফৌজে কাজ করে। এখন কাশ্মীরে আছে। এলেই সোহাগ এটা সেটা, খেপে বাঘ হয়ে থাকে। বড় গাছ একটা আছে একেবারে টঙঘর লাগোয়া, মুচকি হাসি এলেই মনে আকথা কুকথা চেপে চেপে বেরিয়ে আসে। দেবতামুড়া পাহাড় কমলাকে ভয় পায়।

এখানে বসে অনেকদূর দেখা যায়, কাঁচা পাহাড়ী রাস্তা, মানুষের চলাফেরা, বাঁশের ইঙ্গিত দেয়া ঘণ্টা গরুর গলায়, ধীর শব্দও অনেক জোরে পৌঁছয় এখানে। গাছের ছায়া রোদ আবার রোদ, ছায়া কাঁচা রাস্তা, দূরে কাউকে দেখা যায়, কচি

হাত পা। ভ্রু কুঁচকে থাকে। এখনতো ইস্কুলের সময় কোনও বাচ্চারা আসবে না। আর বাচ্চার বাপেরা। হাঁটুর উপর কাপড়টা ওঠানো ছিল, একটা লাল গুঁড়ো পিঁপড়ে হাটছিলো শরীরে এক আঙ্গুল দিয়েই টিপে মেরে ফেলে। কাপড় নামায় না তবু। কে আসে। টঙঘরের নিচে অনবরত শব্দ করে শুয়র দু'টি। হুড়োহুড়ি কবে। শুয়রের বাজার দামও প্রচুব।

পাহাড় কাটা মাটিতে কিছু শাকসব্জীও ফলায় সে, সময়েবটা সময়ে। যা আয় হয় তাতে কিছুটা সাশ্রয হয। সাশ্রয়েব তোয়াক্কাও করে না, মাস পুরতি টাকা পাঠায স্বামী। কমলা এগিয়ে আসা শরীরটাকে লক্ষ্য কবে, চোখ সবায় না বরং সামনে ঝুঁকে একটু, আবেকটু, কড়া রোদে স্পষ্ট জিনিষও অস্পষ্ট হয। তবু দূবে হলেও চেনাব এক দুর্দান্ত কৌতুহল বুকেব ভিতব আঁকুপাকু করে জোয়ান কেউ নয়; জোয়ান কেউ আসার সাহস এখানে নেই, কমলা বললেই আসে। আর একটা টিলা মাত্র পেবিয়ে এলেই—। শুযরগুলো কখন যে চুপ কবে গেছে বলতে পাবে না। উঠে দাঁড়ায। বাঁদিকে মোড় নিযে ছেলেটা এগিযে গেলেই চোখমুখ উজ্জ্বল হয তার—ওযাকি। ওয়াকি।

দু'হাত মুখের দুপাশে চোঙেব মতো কবে কমলা ডাকে চোখ দুটো বুঁজে যায়। আর আঁখিরাইয়ের কানে শব্দটা ঢুকলেই দৌড দৌড।

—মাসী। মাসী।

সমস্ত পাহাড় প্রতিধ্বনি করে। শবীরে এক অদ্ভুত ভালবাসা কাজ কবে কমলার। ঝুলন বারান্দা থেকে তবতব নিচে নেমে আসে। শুয়ব দু'টি টঙঘবেব তলায় হুডোহুডি করে আবাব—হেট। হেটও। দাঁড়া দাঁড়া কাটব।

আঁখিবাই তখন সীমানায় ঢুকে পড়েছে। বালক চপল শবীরে এক বোদজ্বলা আবেগ লক্ষ্য করে কমলা, আঁখি বাঁশের ঘাটাটা খুলে এক দৌড়ে একেবাবে কাছে চলে আসে, জড়িয়ে ধবে কমলাব শরীর, মাসী।

—ওয়াকি। ইস্কুল নেই আজ।

হাঁফায় আঁখিরাই—যাইনি।

রোদে ভীষণ তেতে রয়েছে বালক।

—ছায়াতে আয়।

প্রায় কোলে কবে আঁখিবাইকে নিয়ে হাঁটে কমলা।

টঙঘরের বাঁশের মেঝেয় শুয়ে পড়ে আঁখিরাই, পাশে কমলা। ঘরে সবসময়ই সে অন্ততঃ দু'তিনজনের রান্না করে রাখে কারণ দেবতামুড়াব আরো ছেলেমেয়েরা রোজই একবার এখানে আসে. মাসীকে দেখে যায়। আড়ালে আবডালে অনেকে অনেক কথা বললেও এব্যাপারে সবাই কমলাকে সমীহ করে প্রশংসা করে। এবং যারা তাকে ভালবাসে তারাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আহারে একটাও পেটে ধবল না কমলা। ভগবানের কি বিচার। অথচ বাচ্চা ভীষণ ভালবাসে মেয়েটা। দুঃখ যে তারও হয় না এমন নয়। হয তবে কি করবে। বনাজি কবিরাজী অনেক কবিয়েছে কিন্তু যে বাঁজা সেই বাঁজাই রয়ে গেছে। অনেকে অনেক কথাই বলে, পুরুষটার ওপর শেষমেশ তার সন্দেহ হয়েছে এবং থেকে গেছে, কিন্তু দুঃখ হলো সমাজে কেউ পুরুষ মানুষকে বাঁজা বলে না।

—ও মাসী।

আঁখিরাইয়ের ডাকে সম্বিত ফিরে তার। রোদ যতই কড়া হোক পাহাড়ের ছায়ার শরীর কাটতে পারে না। ঘর ঠাণ্ডা।

—বল বাপ।

—কি রেঁধেছো।

হাসে কমলা— তোর মা-বাপ কি খাওয়ার দেয় না রে।

—না। দাদা দিদিরা সব খেয়ে ফেলে।

—মিথ্যে বলবি না ওয়াকি।

—না গো সত্যি।

—সবাই কোথায়।

—জুমে গেছে। ও মাসী। পাছড়া ধবে টানে।

—র। ব।

আব্দার কমলাব ববাবরই ভাল লাগে। এমনকি স্বামী যা চায় আব্দার কবেই পায়। জোর কবে কিছু আদায় কবাব উপায় নেই, কেটে কুচিকুচি করে ফেলবে। পাহাড়ের মতেই জেদী সে, তাবড় তাবড় লোকও ভয় পায়। পাহাড়ের মাতব্বর একবাব জোব কবেই ঘরে ঢুকছিলো, দা-হাতে কমলাকে দেখে যে ভাবে বেরিয়েছে; এখনও ঐ রাগ বুকের খাঁজে-খাঁজে লেগে আছে। এমনকি সৈন্যবাহিনীর জওয়ানরাও ভয় পায় তাকে।

—ও মাসী।

—ওহ্ বাপ। আয বাপ।

আঁখিবাই. কমলার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে ঢোকে। লোভ চকচক করে তাব চোখে। মাবাত্মক ক্ষুধা লেগে আছে শুকনো হাত পায়ে, রোদে পোড়া মুখে।

—শুদক আর মুসুরী ডাল—।

—খাবো খাবো।

স্টিলেব থালায ভাত বাড়ে কমলা। নিজের জন্যও।

এখন ঠিক দুপুব নয়. একটু হেলেছে সূর্য। বাঁশেব মেঝেতে গড়ায় সে, কাপড়ের টুকবোটা বুক থেকে খুলে ফেলেছে. এই সাত বছরেব বালকেব সামনে লজ্জা পাবার কিছুই নেই। আজ অনেক খেয়েছে আঁখিরাই। চোখ বন্ধ কবে বাখে সে। ভিতবে যে অস্থিরতা আছে, সারাক্ষণই থাকে. এখন প্রায নেই; বাচ্চাবা এলে উঠোনে খেলাধূলা করলে অনেক হাল্কা মনে হয়. শরীরটাকে আবর্জনা মনে হয না। আঁখিবাইয়ের বাপও অনেক ঘোরাঘুবি করেছে আশেপাশে, এখন হাসি পায়, সবাই প্রায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এবাড়ির এলাকা ছেড়েছে। বাঁজা হয়েছে তো কি ! মেয়ে মানুষ তো মেয়েমানুষই।

—আর শরীরটা—।

বাজারে গেলেই আফসোসটা কানে লাগে তাব। এলাকাব লোভী চোখগুলি চেনে সে। এজন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পাবে। দেবতামুড়া পাহাড়টাকে শাসন করে কমলা রাই। কোনও উটকো ছেলে চিৎকার করে পেছন পেছন—রানী লো বানী।

মুচকি হাসে কমলা। —পাছড়াব প্যাঁচ খোলার ক্ষমতা নেই, আবার এসেছে

লীলা করতে!

আঁখিরাই-এব শরীরে হাত বাখে কমলা। এসময তার ঘুম আসে। ছেলেটা একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। গোবরের মতো ময়লা লেগে আছে শরীরে। কে অভুক্ত নয়। গত তিনচার বছর পুরোটা পাহাড এতো ভুখা হয়ে গেছে যে চিন্তাই কবা যায় না। জল নেই, শুখা। চিৎকাব চেঁচামেচি, কাড়াকাড়ি, এমন কি হাটে আসা পেশাদারদেব সংখ্যাও এখন নগন্য। ববংচ এখানেরই কিছু লোক, শহর থেকে গিযে জিনিষপত্র নিয়ে এসে ব্যবসা কবে। এমনকি আগেও ছিল? নিজেকে প্রশ্ন করে কমলা; ছিল তবে কম ছিল। বাইবে থেকে অনেক কিছুই পাওয়া যেতো. বাঁচা এবং বাঁচানোর চিন্তা সবারই ছিল, এখন শুধু বাঁচার চিন্তা।

—আমাদেবে মানুষ বলে ভাবে না কেউ।

কথাটা হয়ত ঠিক সত্যি নয় তবু মনে আসে তার।

—ওয়াকিবে। ওয়াকি—

—কি।

আড়মোড়া ভাঙে আঁখিরাই, চোখে পুবো ঘুম এখনও। হয়ত এই দবিদ্রবালক অনেক সুখস্বপ্ন দেখে। বিভোর হযে থাকে। আঁখিরাইয়ের প্রশংসা সবাই কবে। পড়াশোনাতেও নাকি বেজায ভালো। এই শীতে ক্লাস টুতে উঠবে। গতবার বড় কষ্টে বইপত্র জোগাড় করেছে সে। কমলা মনে মনে বলে এবার আমি দিযে দেবো। আমার খাবে কে? কিন্তু আঁখিরাই নেবে কি। নিশ্চয়ই নেবে।

সে জানে এ ছেলে ভিক্ষে করে না। তবু নেবে।

—ওযাকিরে, আমিতো তোব মাসী নারে বাবা না মা—

আঁখিবাই উত্তর করে না বরং স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, কিছু বিড়বিড়ও করে। একেবারে কাছে কান নিয়ে আসে কমলা, আঁখিবাইয়ের মুখেব সামনে, শোনাব চেষ্টা করে।

—মা—আ—সী। এবাব শী—তে-·আ—মি—স—ব—গু—লি কু—ড়ি—য়ে—ফে—ল—বো—

হা কপাল আমার। ও ওয়াকি। ওয়াকিরে—

ধড়ফড় কবে উঠে বসে বালক, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেযে থাকে। কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করে! --কি ঘুম রে তোব ব্যাটা।

আঁখিবাই তবু ঘুমঘুম; ঘুম পুরোপুরি কাটে না তবু।

পাহাড়ে সবাবই ঘুম একই রকম প্রায়, নির্ভেজাল। পুবো পেট ভাত খেলে তো কথাই নেই।

কমলা রাই নিবিড় ভাবে তাকিয়ে থাকে আঁখিরাইয়ের মুখেব দিকে, ভিতরে খচখচ করে গেঁথে যায় একেবারে হৃদপিণ্ডেব ওপরে, গুলির কথাটা। প্রথম বিকেলের তীর্যক রোদ ঘরে ঢোকে; চিকচিক কবে উঠে বাঁশের বেড়া এবং টঙঘবেব নিচে থাকা শুয়র দু'টির সাড়াশব্দ পায় না সে।

ভিতরটা ক্রোধ এবং ভয়ে জ্বলে তাঁর—এই গুলি কুড়ানোর ধান্দা কোন না কোনদিন কারো সব্বোনাশ করবে। কাকে কে আটকাবে তবু। এক শরীরজ্বালা করা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে তার বুকের গভীর থেকে।

দুই

আঁখিরাই বইখাতা হাতে নিয়ে ঢালু নামে এখন। সামনে মা-বাবা-ভাই-বোন। বস্তিবাসী আরো সব মিছিল করে সামনে পেছনে হাঁটে; সবারই হাতে মাথায় পুঁটলাপুঁটলি, তারা বস্তি ছেড়ে আপাত নতুন আবাসের খোঁজে চলে। পাহাড়ের কাছে এই সব নূতন নয়। পাহাড় তার বিশাল বক্ষে বারে বারে আশ্রয় দিয়ে চলে সবাইকে। আব এইরকম সময় পাখীরাও উড়ে চলে যায় দূরে কোথাও। শেয়াল ঢুকে যায় আরোও গভীর গর্তে।

পথচলতি অনেকে গুনগুন গানও কলে। আঁখিরাই এখন রোদ পডে চিকচিক গোমতী নদী দেখে, জলটা স্থির স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। এবার চড়তে হবে পাহাড়, অভ্যস্ত পা ফেলে তালে তালে। সাব সার গাছ ছায়া দিয়ে বেখেছে পায়েচলা রাস্তা; শবতের ঘাস সবুজ চিকচিক গায়ে লাগে। বাতাসের তেজ মাবাত্মক, রোদের তেজকে যেন ঠেলে সবিয়ে দেয। এবাব ডানদিকে চোখ পডলেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কালো চোখেব তাবা দু'টি। সে জানে সবার অবস্থা তারই মতো।

সারসার ঘন সবুজ তাঁবু পড়েছে সেনাবাহিনীর। অনেক অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে. নিচে দেখা যায়। সমতল মতো জায়গাটায। গাছের বঙের সাথে মিলেমিশে গেছে তাঁবুর বঙ, দূব থেকে মনে হয় অনেক অনেক গাছ শুধু। এখানে, এই পাহাড়ে বন্দুক ছোঁড়ার মহডা চলে, এ পাহাড় নিরাপদ, বৃদ্ধ রামলাল বলে চান্দমারী। অবিরাম শব্দ হতে থাকে তখন। প্রথম প্রথম খুবই ভয় করত তার, মায়ের খোলা বুকেব খাঁজে মুখ ঢুকিযে ভীষণ কান্না করত; কিন্তু এখন চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ব্যবহৃত সীসাব গুলি চোখে ভাসে। ধবতে পারলে, কুড়াতে পাবলে অনেক পয়সা আসবে হাতে, দালাল রামলাল আছে, কিনে নেবে পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে। আঁখিরাই থেমে যায় হঠাৎ—অনেক জমাতে হবে এবাব। অনেক। সবার থেকে বেশি। সাথে সাথে ধাক্কা দেয পেছন থেকে কেউ—হাঁট। চলা শুরু করে আবার তাডাতাড়ি।

কিন্তু মারাত্মক শব্দ পাহাড়কে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। থরথব কাঁপে গাছেব শবীব। দশ-পনেব দিনে অনেক গাছ মবে যায, এবাবও যাবে। লাল হয়ে যাবে অনেক সবুজ পাতা। আর পোড়া বারুদের গন্ধ, সহজাত পাহাড়ী গন্ধ মেরে ফেলে; পায়ে দলিত হয ভাই-বোন ফুল, লজ্জাবতী গাছের সৌন্দর্য।

কেন এই মহড়া?

তাবা জানে না। মায় কমলামাসী, যে অনেক কিছুই জানে, সেও বলতে পাবে না সঠিক। যা বলে তা হলো—নিশানা ঠিক না বাখলে যুদ্ধ করবে কি করে?

—কিসেব যুদ্ধ মাসী?

সমপতিরাই প্রশ্ন করে। পাশে বসা আঁখিরাই এবং আরো অনেকে। সবারই চোখেমুখে জানার আগ্রহ।

—সে জানি না।

আঁখিবাই বাংলা পড়া পুরোপুবি শিখে গেছে। নির্ভুল পড়ে ফেলতে পারে বানান করে। বলে ওঠে—যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।

বাবার সাথে তেলিয়ামুড়া গিয়েছিলো কিছুদিন আগে। অনেক পোষ্টার দেখে এসেছে রাস্তাঘাটের পাশেপাশে দেয়ালে লাগানো।

খিলখিল হেসে উঠে মাসী—তুই কি নেতা হবি রে ওয়াকি?

সবাই হাসে সজোরে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আঁখিরাই—কেন! কেন।

হাসি থামে না মাসীর—না মানে, এইসব কথাতো নেতারাই বলে।

গেলবারের কথা মনে পড়ে তার। সীসার গুলি অনেক অনেক কষ্টেও জোগাড় করতে পারেনি। শরীবে শক্তি লাগে। বডবড় ছেলে মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একসাথে, মাটিতে হাত পড়াব আগেই ছোঁ মেবে তুলে নেয অন্য কেউ। তার ছোট্ট মুষ্টিবদ্ধ হাতে শুধু ভেজা লালমাটি ভরে থাকে।

আঁখিবাই ক্ষনস্থায়ী বাসস্থান বানানো দেখে এবার, চিন্তাসূত্রটা কেটে যায। সমস্ত পবিবেশটা উৎসবেব মতো মনে হয়। কেউ বিবক্ত হয় না, কারণ এই বাসস্থান বদলের জন্য টাকা দেবে সেনাবাহি[illegible] [illegible] টাকাই দেয়। টাকা টাকাই। আর কোথা থেকে টাকা পাবে! সমস্ত পাহাড় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। ফসল হলেও বিক্রিবাট্টা কম।

আঁখিবাই একটা বড় গাছেব তলায বসে শরতেব রোদ দেখে বইখাতাগুলো পাশেই। বস্তিব সমস্ত শুয়র আজ একসাথে, একজায়গায় রাখা, ঘুঁতঘুঁত শব্দ কবে। বিরক্ত হয় না তার বালক শবীর। বাসস্থান বদল প্রাণীরা খুব সহজে মেনে নিতে পারে না। আশেপাশে যে ভিড় বাড়ে, না দেখেও টের পায সে। সমপতি মনিলালই তাদেব মধ্যে সবচাইতে বড়: তারা একা একা হাটবাজারও কবতে পাবে। গঞ্জেব বাজারে গিয়ে সিনেমাও দেখে আসতে পারে।

কাল থেকেই গুলি ছোঁড়া শুরু হবে। চান্দমারী।

সে জানে লোভে চিকচিক করে অনেক জোড়া চোখ। এক অদৃশ্য জেদ ভিতরে বাড়ে তার।

—অনেক গুলি জোগাড করব এবার। অনেক টাকা পাবো।

মনে মনে বলে আঁখিরাই।

বাবাব কাছ থেকে বইপত্রেব পযসা পাওয়া যায় না। আর দেবেও বা কোথা থেকে। অথচ পডা চাইই। পড়াব এই মারাত্মক নেশা ঢুকিয়েছেন তার মাষ্টারমশাই, বিমল দেববর্মা। মাষ্টারমশাইয়েব একটি মাত্র কথা অবলীলায থামিয়ে দিতে পাবে গোটা বস্তিকে। কমলামাসী পর্যন্ত বলে—"একটি মানুষ বটে।" সাধাবণতঃ পাহাড়ে পড়াশোনাব আদত কম। সমযও হয না। আর উদ্যত ক্ষুধার ফনা সমস্ত শরীবই গ্রাস করে ফেলে।

আবাব ধীরে ধীবে গড়ে ওঠা বাসস্থান দেখে আঁখিরাই। এখান থেকে কমলামাসীর টঙঘব স্পষ্ট দেখা যায়। আশ-পাশ এখন খালি। নাহ্ একবার দেখে আসতে হবে তিন পাহাড়েব সন্ধিক্ষণে, সেনাবাহিনীর মহড়ার সাজসজ্জা দেখে আসতে হবে। কথা বলাই খুব শক্ত। হিন্দিভাষা ভাল করে বলা খুব কঠিন। একমাত্র মাসীই পাবে। উঠে দাঁড়ায় আঁখিবাই, বইখাতা হাতে নিয়ে দিদির কাছে দাঁড়ায় সে এক দৌড় দিয়ে। দিদি তাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচাইতে বড়।

—কি রে ওয়াকি।

—বইখাতা আমার রাখ দিদি।

—দে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় দিদি।

—দেখে আসি একটু।

—তাড়াতাড়ি আসবি। ভাত হয়ে যাবে কিন্তু।

—আচ্ছা।

দৌড়য় আঁখিরাই। পাহাড়েব শরীর কেটে কেটে যে রোদ পড়ে, বাতাস হাঁটে, তাদের শরীর ধরে ধরে দৌড়য় সে। যে পাখীগুলোর ডাক রোজদিন আশেপাশে শোনে আজ একেবারে নিশ্চুপ। কোন এক অজানা নিষ্ঠুরতার প্রস্তুতির জন্য পাহাড়ও যেন তৈরী। অস্থায়ী বাসস্থান থেকে অনেকদূব নিচে নেমে এসেছে সে, উপবে উঁচু উঁচু গাছের মাথা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এ রাস্তা কেবল তারাই চেনে, চলাফেরা করে, চারদিকে কখনও ঘন কখনও পাৎলা জংগল। গোপন জমানো জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে পাহাড়ের বুক থেকে কোথাও। বুকভর্তি বড শ্বাস নেয সে, এবার উপরে উঠতে হবে; আবার নামতে হবে। উঠতে হবে আরবার, এরপরই দেবতামুড়া পাহাড়ের একেবারে গোপন জায়গা তিন পাহাড়ের আড়াল; একসাথে সমস্ত বাতাস আর রোদ আটকে রাখতে পাবে। ঐখানেই মহডা হয়। উত্তেজিত বালক পাহাড় চড়তে থাকে এবং সাথে সাথেই তার ক্ষীণ শরীর টেব পায, সকাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি। তবু এক অদৃশ্য উত্তেজনা শরীরে শক্তি যোগায়। উপরে উঠতে থাকে অবলীলায়, দীর্ঘ গাছেব ছায়া যেন পাহারা দেয় তাকে।

সূর্য এখন পুরোপুরি মাথার উপরে। সমস্ত রোদ বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র। আশেপাশে আর কোনও লোকজন নেই। শুধু মাঝেমধ্যে গরুর গলায় বাঁশের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, যেন পাহারা দেয় তাকে। এই পাহাড়ে গরুরাও অভ্যস্ত। ঠিক, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমানো ঘাস খেয়ে বিকেল বিকেল বস্তিতে ফিরে আসে। তবে আজ থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম হবে। কেউ গিয়ে নতুন আস্তানাতে নিয়ে আসতে হবে।

আঁখিরাই এখন সেনাবাহিনীর সাজানো তাঁবুর সামনে দাঁড়ায়। আশেপাশে অনেক কৌতূহলী ছেলেমেয়ে দেখে সে, তারই মতো। তাঁবুগুলোব একেবারে সামনে দাঁড়ানো দুজন বন্দুকধারী পাহারাদার সিপাই।

—কেয়া মাংতা?

মাথা নাড়ে সে, সবাই।

—হট।

একটু পিছন সবে আসে, দাঁড়ায। দুজন সিপাইই নিজেদের দিকে মুখ করে একবার এদিক থেকে ওদিক যায় আবার ওদিক থেকে এদিক। চলতে চলতে আরেকজন তার সামনে সামান্য দাঁড়ায়—বুলেট মাংতা?

বুলেট যে গুলি সে জানে। মাথা নাড়ে।

—কাল সামকো মিলেগা। আভি ফুট।

আরো পেছনে সরে যায় সে। এবার অজস্র গাঢ় সবুজ পোষাকের সেনা দেখা যায়। সবাই ব্যস্ত। গাড়ীও অনেক। কিছু সেনা সারবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে, আরেকজন কিছু বোঝায়। মহড়ার সময় পাহাড়ের বড়রা এখানে আসতে পারে না। শুধুমাত্র তাদের যেতে দেয় মহড়ার জায়গায়, বিকেলবেলা, মরে যাওয়া গুলিকুড়াতে, তবু নজর রাখা হয় ঠিকই।

—ভাগ যা বেটে, নেহিতো মার দুঙ্গা।

ভোঁ দৌড়। ভোঁ দৌড় শুধু আর এখানে নয়। পেছন থেকে হাহা হাসির শব্দ কানে আসে। কিছুই যায় আসে না, এবাব অনেক গুলি চাই। অনেক টাকা হবে তাহলে। বইপত্র কিনতে হবে। কাল থেকেই আসতে হবে। খালিগা বালক গাছের শরীরের সাথে মিলেমিশে দৌড়য়, সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা। আবাব জানা উত্তেজনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভরিয়ে দেয়।

গজিয়ে ওঠা নতুন বস্তি এখন চোখে পড়ে। আঁখিরাই আবাব উপার্জনেব উপায় খুঁজে পায় যেন।

তিন

সমপতি, আঁখিরাইয়ের পিঠে হাত বাখে আস্তে কবে। চমকে ওঠে না সে ববং এক নির্মম রাগ ফেটে বেরোতে চায শরীর দিয়ে।

—সর সরে যা!

চমকে হাত সরিয়ে নেয় সমপতি এবং একটু দ্রুত হেঁটে আঁখিবাইযেব সামনে দাঁড়ায়!

—ওয়াকি।

আঁখিরাই ধাক্কা মারে সমপতির বুকে, দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়, পাবে না এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। সমপতি আবাক হয না বিড়ি জ্বালায় একটা। এই বালকের মান—অভিমান এই পাহাড়ের মতো, পাহাড়ও জানে যেন।

এখন প্রায় সন্ধ্যা। তারা দীর্ঘ ছায়া ধরে ধরে হাঁটে, পাহাডের শেষ প্রান্তের দিকে, ওখানে বামলালেব দোকান। আজ মহড়ার প্রথম দিন ছিল। সমস্ত পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠেছে বাববার। এমনকি গরুগুলিকেও ডিগরা দিয়ে রাখতে হয়েছে। বস্তি থেকে বের হয়নি কোনও ছোটরা। বডরা জুম থেকে সবজি-টবজি তুলে আনতে অনেক ঘুব পথে গেছে। ছোটরা পাহারা দিয়েছে শুয়র এবং গরুগুলিকে। বারুদের গন্ধে বাতাস ভীষণ ভারি। যে ক'টা অবশিষ্ট পাখী ছিল, তারা জানে আজ সব উড়ে গেছে দূবে, ভয়ে। বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ হয়েছে সেই বিকেলে, প্রতিবারে মতো। তারপর ছুট ছুট। কে কার আগে যাবে। ঘর্মাক্ত শরীরগুলো যখন নিশানা পাহাড়েব লালমাটিতে নেমে এসেছে আবার যুদ্ধ। যুদ্ধ। কোথায় পারবে আঁখিরাই। গতবাবেব মতোই। তবে এবার একটু বড় হযেছে এই যা রক্ষা। হাতভর্তি লালমাটির সাথে গুলিও উঠে এসেছে কিছু কিছু। মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে বেব করে নিয়েছে অনেক সীসার গুলি। সে এবারও বুঝেছে শাবীরিক শক্তিই এখানে আসল ব্যাপার।

—তুই পাবিসনি তো আমাদের কি দোষ!

উত্তর করে না সে। রামলালের দোকানের কাঁপা কাঁপা আলো দেখা যায এবার। কোমরে গামছাতে বাঁধা জমানো গুলি, প্রায় তিনশ গ্রাম হবে। সমপতির মাথায় গুলির বোঝা। তিন পাহাড় থেকে সরাসরি হাঁটা দিয়েছে তারা। অনেকেই আগে চলে গেছে। এই তিনশ গ্রামকে আড়াইশ বানিয়ে ফেলবে রামলাল। ঘেন্না করে সে। লোকটাকে মেরে ফেলার চিন্তা হয় অনেক সময়ই। কিন্তু সমস্ত বস্তিটাই যে রামলালের কাছে বাঁধা। প্রথম প্রথম বাবার সাথে যখন এখানে আসত রামলালের অনেক কথাই বুঝতে পারত না সে। এখনও ঠিকমতো বোঝে না। তবে লোকটাকে

প্রথমদিন থেকেই ভাল লাগেনি তার। কমলামাসী বলে—

—শনিঠাকুর একটা!

তারা এখন দোকানের বারান্দায় দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর উজ্জ্বল আলো। এই প্রথম শরতে রামলালের ঠাণ্ডা লাগে। মাথায় বানরটুপি লাগিয়ে রেখেছে, গলায় জড়ানো মাফলার। প্রৌঢ় শরীরে উজ্জ্বল আলো পড়ে, চিকচিক করে ফর্সা মুখমণ্ডল। আঁখিবাই দেখে বারান্দার এককোনে টাল কবে রাখা ইঁদুরে-কাটা বস্তা এবং কাগজের বাক্সের স্তূপ। কেউ জিজ্ঞেস করলে রামলাল উত্তর কবে—গনেশ ভগওয়াননে খা লিয়া।

এবার তাদের দেখে, চিৎকার করে—আউ:' দো আ গেয়া। ভাগ ভাগ, গুলিব বাজাবদব নেই। এইসব প্রতিবারই রামলাল বলে; দাম কমানোর, ওজনে মারাব ধান্দা। কেউ উত্তর কবে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কাঁপা কাঁপা আলো আর অন্ধকারে। আঁখিবাইযের রক্তে এক বিজাতীয় রাগ নেমে নেমে আসতে থাকে, শক্ত হয়ে ওঠে শিশু চোযাল, তবু চুপ কবে থাকতে হয, কারণ বিক্রি করতে হবে এখানেই। একটা বিড়ি ধবিয়ে রামলাল তাদেবে দেখে।

—গতবাবেব দব পাবি।

উশখুশ করে সবাই।

—কোন কথা না। পোষালে দিবি, নইলে রাস্তা দেখ।

বফা কবে যখন রাস্তায় নামে সন্ধ্যা রাতের দিকে নেমে গেছে। আকাশে কোনও চাঁদ নেই। চেনা রাস্তায় জোনাকিরা আলো দেখায়। আঁখিরাইয়ের পকেটে বার টাকা। চেনা পাহাড়ী বাস্তা ধবে চলে আরো অনেক। কমলামাসীর বাড়িব পাশ দিয়ে গিয়ে একবার উঠো, একবাব নামো, তারপর অস্থায়ী ডেরা। কমলামাসীর বাড়ি যাবে না সে। মাসী গুলি কুড়ানো একেবারে সহ্য করতে পারে না। গতবার জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলো রাগে। আর মা-বাপ? জানলেও না জানার ভান করে থাকে, তবে এই পয়সার দিকে হাত বাড়ায় না। তবু সে লুকিয়ে রাখে টাকা, বাঁশের চোঙায় ভবে মাটিব নিচে, নিজস্ব নিশানা দিয়ে। বস্তির স্বল্প আলোয সবাব খুশিখুশি মুখ দেখে আবার মাথা গবম হয়ে যায় আঁখিবাইয়ের মনে মনে রাগ চেপে থাকে। এবার অন্য কোন উপায় করতেই হবে. নইলে বইখাতা, কাপড় চোপড় যোগাড় করা যাবে না। ভিক্ষাতো করা যাবে না। আর সাহায্যও করবে না কেউ। করবেওবা কোথা থেকে? শুকনো পাহাড় ভাতই দিতে পারে না ভাল করে। ঘরে ঢোকে আঁখিরাই। মা ভাত বেড়ে দেয়, খায়, তবু চিন্তা যায় না। একসময় বাবার ঢুলু ঢুলু ক্লান্ত মুখ দেখে দেখে ঘুম জড়িয়ে যেতে থাকে চোখে—কাল দেখা যাবে অন্যভাবে। আধা ঘুম আধা জাগরণে তার চোখে ভাসে তিনপাহাড়। মারাত্মক সম্মোহন করে যেন কেউ—আয়। আয়।

শরতেব এই প্রথম দুপুরে আকাশে গলা সূর্য, গরমের সাথে মিশে আছে দুরন্ত বাতাস, কাঁচা পাতার গন্ধ চাবপাশে। গোমতীর পার ধরে ধরে হাঁটে আঁখিরাই। স্থির চোখমুখে বালকসুলভ চপলতা নেই। ঘুর পথে যেতে হবে তিন পাহাড়ে। গুলির ক্রমাগত শব্দ, পোড়া বারুদের গন্ধ সমস্ত পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেগে আছে। সমস্ত গাছগাছালি, মাটিব কাছে এই গন্ধ অপরিচিত আজও। চোখমুখ জ্বালা করে

তার। নদী থেকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেয় সে চোখে মুখে, ভাললাগে। দলছুট এই যে যাত্রা গোপনে তার উদ্দেশ্য একটাই, অনেক গুলি চাই, অনেক টাকা। দেবতামুড়ার মূর্তি পাহাড ছাড়িয়ে গেলেই মনে হয় সমস্ত শব্দ নাকমুখ কান দিয়ে শরীরের কোষে কোষে জড়াতে থাকে। সামনেই তিনপাহাড়। নিশানা পাহাড়ের ঠিক পেছনে সে এখন। এখানে নিরাপদ, কোনও গুলি পাহাড় অতিক্রম করে এদিকে আসবে না। কিন্তু ভয়ংকর শব্দ সব, যেন কানেব পর্দা ছিঁড়েফুঁড়ে রক্ত বেব করে দেবে। তাড়াতাড়ি দুটি পাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কানে গুঁজে দিলেই এবার শব্দ একটু কম আসে। ধীরে ধীবে সে পাহাড়েব নিচু ধবে ধবে এগুতে থাকে। খালি গা, কোমবে জড়ানো গামছা, খাঁকিপ্যান্ট পবনে, দুর্বল বুক ওঠানামা কবে পবিশ্রম এবং উত্তেজনায। এবাব সামনেটা স্পষ্ট তাব কাছে. একহাত দিয়ে একটা গাছেব শরীব জড়িযে ধবে, অনববত গুলি হতে থাকে। আব মাত্র দশ-বিশ হাত ঘুবে গেলেই একেবাবে নিশানাব উপর নেমে যেতে পাববে সে। অপেক্ষা কবতে থাকে আঁখিবাই। মাথায চিন্তা ঘুবপাক খায়। গুলি ছোঁড়া শেষ হলে তাকে নামতে দেবে না কেউ নিচে। অথচ সুযোগ ছাড়তে বাজি নয সে—এতোটুকু যখন এসে গেছি, সব গুলি নিযেই যাবো, কাল থেকে আর আসতে হবে না তাহলে। ভেজা মাটি হাতে উঠে আসে এবাব। সমস্ত শবীবে মাটি মাখতে থাকে সে চুল থেকে পা পর্যন্ত, ঘষে ঘষে মাটি লেপতে থাকে শবীবে যাতে মাটিব রঙ এসে যায়; তাবপব লতাপাতা ছোট্ট গাছেব ডাল দিযে বেঁধে ফেলতে থাকে সমস্ত শবীর।

আঁখিরাইযেব বালক শবীব এবাব একটি গাছ হযে যায। অপেক্ষা কবতে থাকে সে। এখন পড়ন্ত দুপুর। দেবতামুড়া পাহাড়ে বোদের তেজ কমে যেতে থাকে। আজ আকাশে কিছুটা মেঘ মেঘও আছে। গোমতীনদীব উপব মেঘের দীর্ঘছায়া ঢলে পড়ে আছে। বস্তিবাসী ছেলেমেযেবা এখন চলা শুরু কববে এদিকে, গুলিব সন্ধানে। কমলামাসীব মুখ মনে ভেসে ওঠে তাব—মাসী সবকিছুতেই বেশী বেশী ভাবে। মুচকি হাসে সে। হাসতে গেলেই মাটিব শুকনো টান পড়ে মুখমণ্ডলে, গলা শুকিযে গেছে কখনই।

গুলিব শব্দ বন্ধ এখন। বোধহয় মহড়া শেষ হযে গেছে। আব কত!

কান থেকে পাতা দুটো খুলে ফেললেই শুধু বাতাসেব শব্দ পায আঁখিবাই। এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে সে। না কোনও শব্দ নেই গুলির। মহড়া শেষ। বোজইতো প্রায় এসময়ই শেষ হয। একটা ঝরে পড়া মাটি-শিকড়শুদ্ধ গাছের মতো ঝবে ঝবে নেমে যায সে নিশানার পেছনে। সে জানে সবাই দেখবে বুঝবে, গুলিব দাপটে বিলম্বিত ঝবে পড়েছে একটি শিশু গাছ আব মাটির চাঙড়। সামনে ছড়ানো অসংখ্য গুলি, অগুন্তি শুযে দেখে আঁখিবাই সেনাবাহিনীর কাউকে চোখে পড়ে না। হেঁচড়ে হেঁচড়ে গুলি জোগাড় কবতে শুরু কবে সে, উত্তেজনায়, আনন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে শরীব—যথেষ্ট, এইগুলো পেয়ে গেলে আর লাগাবে না। টেনে টেনে শরীরটাকে সামনে নিয়ে নিযে গুলি প্যান্টের পকেটে পুরতে থাকলে, এক পকেট ভর্তি হয়ে যায় মুহূর্তে। আরেক মুঠো গুলি মুঠোতে নিযে আসার সাথে সাথে, অজস্র গুলি বন্দুক থেকে ছুটতে থাকে নিশানা লক্ষ্য করে। এক বীভৎস

শব্দ তার সমস্ত শরীরে আন্দোলিত হতে থাকলেই মুঠো ভর্তি গুলি নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আঁখিরাই। এবং সাথে সাথেই একঝাঁক জীবন্ত আগুনে গুলি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে যায়।

একটি মরা গাছের মতো ধপ করে নিচে গড়িয়ে পড়ে আঁখিরাই। হাতের মুঠোভর্তি মরা গুলি, রক্তে ভরে যেতে থাকে লালমাটি। গুলির শব্দ বা গুলি বন্ধ হয় না তবু।

দেবব্রত দেব

মাটি

'গুরু, গুরু হে।'

অনুচ্চ উচ্চারণ খর্ব হয়ে নামে। উচ্চতা থেকে উপত্যকায়। নদী থেকে অববাহিকায়।

কুঞ্জলতার ইচ্ছেরা এমন। অনুচ্চ আর সাদামাটা। বিকেল গড়াতে আজকাল আরেক ইচ্ছে। 'বাবারে, শীতেব শেষ, সন্নিকেব উৎপাতও কম'। একবার যদি আশ্রমে যেতে পাবতেন কুঞ্জলতা।

কিন্তু কে নিয়ে যাবে। সবাবই কামের মাথা কামে খায়। যাবতীয় অভিমান শবীরের বাইবে ভিতবে জারিয়ে গেলে—কুঞ্জলতাব ভাবলেশহীনতা বেড়ে ওঠে।

অথচ নীবব শরীবে মধ্যাহ্ন বড দ্রুত গডিয়ে যায়। 'রাইজ্যের রহইস্য মুইছ্যা গিয়া —পুলাপান, পুলাপান!' কুঞ্জলতা বোঝেন না এব মধ্যে কোনটা সত্য।

আজকেরটা, না তিয়াত্তর বছর আগের!.

মাঝে মাঝে কান্নাব আতুড় খুলে বসলে—হ্যাঁ, সেসব স্বপ্নের সময়! মনে পড়ে বইকি। কাঁদতেও. ভাললাগালাগি কি কম।

বিন্তীটা হঠাৎই. একদম হঠাৎই সেদিন বইখানা হাতে গুজে দিযে— 'পড় দেখি ঠাম্মা!'

এতক্ষণে ঘষা কাচের মতো হযে গেছে পৃথিবীটা। কুঞ্জলতা চোখের সামনে তুলে —সে এক সযত্ন মেলে ধরা!

প্রচ্ছদপটে বিদ্যাসাগর। সে-ই ছবি। তখন যেমন—এখনও। কম কথা!

তিয়াত্তর বছব আগেকার মতো।

ঘোলাটে চোখেব কুঁচকে যাওযা ঝুলন্ত শিথিল চামডা চকচক করে উঠেছিল। এক বা দুই মুহূর্ত। তারপর শব্দহীন জল গড়িয়েছে।

—'কী হইল। কান্দো ক্যান?'

এসব মুহূর্ত আজকাল প্রাযই সৃষ্টি করেন কুঞ্জলতা। তখন সবার মত বিন্তীরও কুণ্ঠার হাসি। ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরেছিল মেয়েটা।

—'কই কান্দি গো সোনা। ইডিরে কান্দা কয বুঝি।'

কিন্তু কী কয়. সেকথা কুঞ্জলতা বলেন না কখনো। কেউ কি বুঝতে পারবে বললে! যেকথা বোঝাতে চান না—সেকথাই বুঝে বসবে হয়ত।

নইলে সতু কেন একটু আগে বলে গেছে— 'ওই ট্রাঙ্কের জিনিসপত্র তুমি আমারে দেখাইতা না জানি। দেহাইওনা।'

ঐ ট্রাঙ্ক। ওব ভেতর যা আছে তা তো সতু দেখতে চায় না। কুঞ্জলতা জানেন. সেসব দেখে ছেলে নিজেকেই ভাঙবে।

সেই ভয়ে চুপ করে শোনেন— 'আইচ্ছা মা, বাবার রোজগার তো কম আছিল

না! তোমার ঐ ট্রাঙ্কে—যাক, তোমার বিষয় তুমিই দেখ।'

কুঞ্জলতা জানেন, কিছু বোঝাতে যাওয়া কত বৃথা হতে পারে। ট্রাঙ্কের বাইরেটা দেখে ছেলের লোভ যত তীব্র, ততই হতাশা ট্রাঙ্কের অভ্যন্তরে।

ফরেস্টারবাবুর রোজগারপাতি ভালোই ছিল—বেশ ভালো। এগাবোটা পেটও ছিল। একটাই তো রথ!

'...বুচ্ছ মন্টুরমা, সাইরা থুইয়া যাই, কি কও। রথও আমার পথও আমার'...

ভবিষ্যৎ দেখার চোখও ছিল না, চাইতেও না। কুঞ্জলতা মাঝে মাঝে সুদূর সংশয় উপচে বলতেন— 'তারপরে! তুমি যদি আগে যাও?'

হাসলে ফরেস্টারবাবুর বিশাল পেট টিল-টিল করে কাঁপতো। আর সে কি অট্টহাস!

'...আগো মইন্টারমা, তুমি পুলাপানরে অত চাডাল ভাবো ক্যারে কওছে! বুকের দুধের কথা ভোলে—কেউ?'

বলতেন বটে। হাসতে হাসতেই বলতেন ওসব কথা। তবু কুঞ্জলতা লক্ষ্য করে দেখেছেন—সেই আত্মবিশ্বাস যেন থাকতো না। সে-ই আত্মবিশ্বাস। যা দিয়ে স্বেচ্ছাচাবী ওপরআলাকে জুতোহাতে তাড়া কবেছিলেন একদা।

'...তুমারে একখান বর দেই। শাখায় সিন্দূরে তুমার যেন বিদায় হয়।'

আবার সেই হাসি। কালক্রমে কুঞ্জলতার দেখাশোনায় কত না বদল। ওই এক ধ্বনি বাদে। আজো একা অতীতের দিকে কান পাতলে—স্পষ্ট শুনতে পান।

আজকাল জীবন খর্ব হতে হতে স্পর্শে এসে ঠেকেছে। চোখ দিয়ে হয় না —বোঝেন কুঞ্জলতা। অন্ধ না হলেও আলোব কমতি বুঝতে কোন কষ্ট নেই।

তবে এ বাড়ির ইঞ্চি ইঞ্চি তো মাপজোক হয়ে আছে প্রতি পদক্ষেপে। প্রতিটি বাঁকে। প্রতিটি দবজা জানালার কপাটে চৌকাঠে।

কুঞ্জলতার অসুবিধা নেই। চলে যায়।

ভোর থেকে গাঁটের ব্যথাটা আবাব। পুরনো ব্যথা। দক্ষিণের কোঠায় বিন্তী শোয় কুঞ্জলতার কাছে। খুব ভোরে উঠে পড়েন বলে তাব খুব রাগ ঠাম্মার ওপব। বিছানা ছেড়ে সব কটা দরজা জানালা খুলে দেয়া কুঞ্জলতার বহুকালেব অভ্যেস।

ভোরের বিষণ্ণতায় একা একা ভাবটা দোসব পেয়ে যায়। কুঞ্জলতার ভালো লাগে খুব।

রাত করে পড়াশোনা টিভি দেখা লেগেই থাকে মেয়েটার। কলেজের শেষ বছর। জন্মের পরপরই মায়ের সান্নিধ্যচ্যুত। গীতার সে এক সময় গেছে। ডাক্তার ওষুধ করতে বাকি রাখেনি সতু।

কে দেখবে ওই শিশুটিকে। সেই থেকে বিন্তীটা ঠাম্মার নেওটা।

ঘুমন্ত নাতনীর মাথায় আলতো দু-একবার হাত বুলিয়ে দেন কুঞ্জলতা। তরতর করে কত বড় হয়ে গেছে। বংশের ধারা। যত বড় হচ্ছে কুঞ্জলতার বুকে মোচড় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। অবিকল ফরেস্টারবাবুর আদল। সতুটা যেমন। বাপকে শরীরে করে বেড়েছে।

খাট থেকে নেমে, দাঁড়াতে পারেন না কুঞ্জলতা। ফ্লোরেই বসে পড়েন। কোমরের জোড় থেকে কটকট শব্দ ভোরের মুখে বড় বেমানান শোনায়।

দাঁড়াতে চেষ্টা করেন কুঞ্জলতা।

সেদিনও এভাবেই চেষ্টা করেছিলেন। যেদিন খুব ভোরে কোন কাক ডাকেনি। খাট থেকে নেমে দাঁড়াতে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়েছিলেন। তারপব সব কেমন কালো। চোখে ধূ ধূ রোদ পড়লে যেমন।

ফরেস্টাববাবু মফঃস্বল থেকে দুপুর মাথায় করে ফিরে এসে হাঁক পাড়তেন —'মণ্টুবমা, অ মণ্টুরমা মাইট্টা কলসেব জল দেও। চোখেমুখে অন্ধকার নৈরাকাব দেখতেয়াছি!'

কাবা নিয়ে এসেছিল মনে পড়ে না আজ। উঠোনে এক স্তূপ শ্বেত-অন্ধকাব দেখেছিলেন কুঞ্জলতা। ফবেস্টারবাবু কানে কানে বাতাস হয়ে বলে গিয়েছিলেন —'চোখেমুখে অন্ধকাব নৈবাকাব দেখতাছ, মই'টাবমা।'

লোকটা ঐবকমই ছিল। হঠাৎই একদিন বলে দিলেন। বলে দিলেন— 'নিঃবইংশা'। ব্যাস, কাজল বিবাগীই হয়ে রইল। বিবাগী না বাগী। কুঞ্জলতা ভাবতেন —কোনটা। ভাবলে, তাব বুকেব খাঁজে খাঁজে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠতো। শেষ গর্ভাধানে নাবীর আত্মমর্যাদার ঘণ্টা। তাই কি?

মানুষ তো অন্ধকার থেকেই শুরু হয়। এক বিন্দু নিষিক্ত বীর্যে ব্যুৎপত্তির পব ক্রমশ আলোয়। কুঞ্জলতা ভাবেন। কাজলকে যারা খুন কবেছে তাদের কথা ভাবেন। তারা কারা তিনি জানেন না। অনেকেই কাজলকে খুন করতে পাবতো। অনেক মানুষেব কাছে অনেক অন্যায় ছিল তাব। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান না কুঞ্জলতা। তাই কাজলেব হত্যাকাবীদেব কথা ভাবেন। সঘন হৃদয়ে তাদের কাছে পেতে চান। কেন কে জানে। কাজল তো অন্ধকার টপকে যেতে পারেনি—দূরে বহুদূবে। এমন কী মৃত্যুর পবও।

সেদিন শ্বেত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছিল উঠোনেব প্রতিটি কোণে। বাষ্প জমে জমে চোখে, চোখেব ভিতর প্রবল বিপর্যয়ের ইঙ্গিত টেব পেয়েছিলেন কুঞ্জলতা। আবার খর্ব হয়েছিলেন। বসে পড়েছিলেন নির্লিপ্ত চৌকাঠেব ওপর।

তখন বিন্তির ক্লাস নাইন' ছোটকাকাব মৃতদেহ তাব মনে কোথায কী এঁকেছিল, কে জানে। পেছন পেছন উঠে এসে কুঞ্জলতাকে সেই যে জড়িয়ে ধবেছিল—আর ছাড়েনি।

পঁচিশ দিন কেটে গিয়েছিল তাবপব।

শ্রাদ্ধ শান্তি শুদ্ধ হওযা। সত্যব্রত তাব ছোট ছেলেকে দিয়ে শ্মশানেই সেরে এসেছিল সব। চারদিনেই শেষ সব ক্রিয়াকর্ম।

চারদিন কেন, পুরো পঁচিশ দিন কুঞ্জলতার কোন কাজ থাকেনি। পুত্রের মৃত্যুতে মাযের কাজ কই। বহন কবা ছাড়া।

পঁচিশ দিন পর আর বোধহয় টানতে পারেন নি কুঞ্জলতা।

'—সতু, কাজলরে কেডায় মারলো, বাবা?'

খাটের এককোণে বড় ছেলে বসেছিল। এসে বসেছিল অফিস ফেরত। গরমের বিকেল গড়িযে গেলেও বিকিরণ তখনও অনেক। ছেলেকে কাছে ডেকে বসিয়েছিলেন কুঞ্জলতা—'আয, গরমে ঘামতাছত। আয়, পাইল কইরা দেই।'

'—জানি নাগো মা। কার ক্ষতি না করছে হে, কও?' আর প্রশ্ন সরেনি কুঞ্জলতার

মুখে।

গর্ভেই শিশু জানিয়ে দিয়েছিল কিছু কথা। কিছু তথ্য গর্ভেই বিলিয়েছিল মায়ের অনুধাবনে। সত্যব্রত আসার আগে কিছুই বুঝতে পারেননি কুণ্ডলতা। সব কিছু স্বাভাবিক থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিনের যন্ত্রণা—সতু এসেছিল কোলে। কিন্তু, কাজল!

সব আগেই বুঝেছিলেন কুণ্ডলতা।

'গুরু হে এইবার পার করো।'

আহা, আইজ যদি একবার গুরুপদে দর্শণ দেওন যাইতো! কুণ্ডলতা মনে মনেই ভাবেন এসব কথা। আগে হঠাৎ হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ফেলতেন। এখন বলেন না। গূঢ় কথা গোপন কথা সরবে বলেন না আজকাল। এমন কী বিন্ত্রীকেও না। 'মাঝরাত্রে বাথরুম পাইলে আমারে ডাকবা। খবরদার, একলা যাইবা না!'

কিন্তু হাসির মধ্যে লুকিয়ে রাখেন কুণ্ডলতা ইচ্ছেদেব। ডাকেন না বিন্ত্রীকে। কোনদিন ডাকেন নি এই অব্দি।

যেমন ডাকতে পারেন নি সেদিন।

শেষরাতে বাইরে যাবেন। উঠে বসেছিলেন বিছানায়। রাতটুকু ঘুম হয় না তখন কুণ্ডলতার। শুধু শেষ রাতে বুঝি চোখের পাতায় ভিড় হয়ে যেতো।

সহসা কিছু পড়ে যাবার—ভারী কিছু, নরম কিছু পড়ে যাবার শব্দে চমকে উঠেছিলেন। প্রাথমিক জড়তার ঠারেঠুরে আতঙ্ক ঘনিয়ে উঠেছিল দেহে মনে। ফরেস্টারবাবু কোথায়। পাশে তো কেউ নেই!

মেঝেতে ঠেকতেই চটচট করে উঠেছিল পায়ের তলা। স্বল্পালোক ঘরের মেঝেতে ফরেস্টারবাবু স্পন্দনহীন। গলার ভিতর হৃদপিণ্ড আটকে গিয়েছিল। লেপটে বসে মাথাটা তুলতে গিয়ে—আঃ!

'...মন্টুরমা, ডাইক্কো না। কারোরে ডাইক্কো না। একলা, তুমার সামনেই মরি...'

পালন করেছেন কুণ্ডলতা। পালনে কোন চুক রাখেননি কোন কালে। সেই রাত্রি শেষে ফরেস্টারবাবুর শেষ রক্ত বিন্দু কোল পেতে ধারণ করেছিলেন। চুকিয়েছিলেন বুঝি কোন কালান্তরের দেনা। ওভাবেই শোধ দিতে হয়েছিল তাকে।

সে রাতেও কবুতর উড়ছিল সারা দেহ জুড়ে। অন্ধকারমুখী কবুতর।

শৈশবের গ্রামে হলুদ ফুলের বনে ঢুকে কুঞ্জলতা কেঁদে উঠেছিলেন। ভয়ে। হারিয়ে যাবার ভয়ে।

বাবা ঐরকম করতেন।

বেড়াতে বেড়াতে শিশু কন্যাটি বিভোর হয়ে উঠলেই টুক করে লুকিয়ে পড়তেন।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—'কান্দলি তুই কুঞ্জ! কান্দিছ না। কান্দা ফুরাইয়া যাইবো। না কাইন্দা কিপ্টার মতন জমাইয়া রাখতে পারলে না মাইয়ামানুষ!'

কী আশ্চর্য মিল! ফরেস্টারবাবুর মাথার ফাটল থেকে লোহিত-কণিকারা তখন বেরিয়ে পড়ছিল গতিহীনা গোমতীর মতো। কোলের কাপড় চুপসে কুণ্ডলতার গভীর তলদেশে চুইয়ে নামছিল সেই তমিস্রা। ...মন্টুরমা কাইন্দো না। আমার কথা ফলে

না। ভয় নাই। কান্দলে শুকাইয়া যাইবা। শুকাইলে, শুকাইলে—এই, এ-ই...'

শেষ করে যাওয়া হয়নি অনেক কিছুই। ফরেস্টারবাবু কাকে বেখে গেলেন—জানার ইচ্ছেও ছিলনা কুঞ্জলতার। এমনকী কাজলের পুনর্বাসনেব কথাও অব্যক্ত থেকে গিয়েছিল।

পালন করেছেন এতকাল। কুঞ্জলতা পালনে চুক রাখেন নি।

বুঝতেই পারেননি। কখন বাত শেষ হয়ে সূর্য উঁকি দিয়েছে আকাশে। বিভোর হয়ে হেঁটেছেন কুঞ্জলতা সারারাত। সেই হলুদ বনেব মতো। খোল কর্তাল নিয়ে সবাই তখন যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। সতু কি আসেনি?

কাল সন্ধ্যায় সতুর সময় হয়েছিল। আসলে সময় করাব দবকাব ছিল সতুর। বোঝেন কুঞ্জলতা। পুরনো বন্ধুবা মিলে একটু আধটু ফূর্তি—বাড়ি ছাড়া এ বয়সে যাবে কোথায়!

পাশের ঘবে গীতাকে বলতে শুনেছেন কথাটা।

'—দিয়া আইযো না তাইনেরে। আশ্রমে যাইতে চায। বাড়িব মইধ্যে হৈ-হল্লা, টিভি ভিসিপি—'

সময় হযেছিল সতুব।

রিক্সা থেকে ধবে নামিয়েছিল কুঞ্জলতাকে। আশ্রমের সামনে উৎসবেব সাজ। আলোয় ভরে আছে চাবপাশটা।

'—তুমি ভিতবেই থাইক্কো। আমি বাত্রে আইযা লইয়া যামু।'

বহুক্ষণ থেকে কীর্তন চলছিলো। অহোরাত্র অষ্টপ্রহব হয় এসময। অনেক লোক বসেছিল শতরঞ্চিব মধ্যে। আভূমি প্রণতি কবে বসে পড়েছিলেন কুঞ্জলতা।

তাবপর সময যত গড়িয়েছি—হলুদ ফুলেব বনে ছুটোছুটি। তিয়াত্তর বছর ধরে একছুটে ওপাব—এপাব।

সতু কি আসেনি। ভুলে গিয়েছিল কুঞ্জলতাব কথা! সারারাত মা'কে ভুলে ছিল সতু!

কুঞ্জলতার শরীরে ছটাক খানেক কাঁচা রৌদ্র খেলা কবছে এখন। সতু, হয়তো এসেছিল; মা'কে বিভোর দেখে ফিবে গিযে থাকবে। হয়তো ভেবেছে—থাক, মগ্ন হয়ে বয়েছে—থাক। হযতো ডেকেছে—মা, মা, মা।

হলুদ ফুলের বন থেকে কি বললেই ফিরে আসা যায়!

দিনের বেলায আগরতলা শহবটা চিনতে অসুবিধা হয়না কুঞ্জলতার। বাড়ি চিনে রিক্সা থামিয়ে নামতেই সামনে—সতু। বেবোচ্ছে, হাতে বাজারের থলে। কুঞ্জলতা সামান্য সুযোগ দিতে পারেন না ছেলেকে।

'—তুই ডাকছত...বাবারে, কিচ্ছু শুনতে পারি নাই—'

অপ্রস্তুত কতিপয় রেখা ছেলের মুখ থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিজের মুখে এঁটে নিলেন মা। দক্ষিণের কোঠাব দিকে যেতে যেতে শুনতে পেলেন ছেলের গলা—'না, মানে—মা...'

শুনতে চান না কুঞ্জলতা। কানে শুধু ফরেস্টবাবুর স্বরধ্বনি 'অন্ধকার নৈরাকার অন্ধকার...'

'নাও-এর বাদাম তুইল্যা, কোন দূরে যাও চইল্যা'

হলুদ ফুলের বনে হারিয়ে যে কাইন্দা-কাইট্যা একসা—সে কিন্তু নদীর বড় আপন। সেমিজ পবতে শেখেনি তখনও সে। গাছ পাতা বন-বাদাড় শালুক-পাকুড়। বাড়িতে পুকুর ছিল পুব থেকে পশ্চিমে। অথৈ জলে শালুক আর কলমীডগা। শালুকের মালা গাথা। কোথায় তখন রাতের লুকানো শরীর!

সেইসব রাত বড় আসল ছিল। শরীবেব প্রতিটি রোমকূপে নদীটিও রোমাঞ্চের মতো।

আলতামিএগ্রা মাঝি পিতাম্বর মাস্টারেব ছোট মেয়েটাকে নাওয়ে বসালে—খিলখিল হাসতো কইন্যা। ঝুঁকে পড়ে জলেব বুকে বিলি কাটতে গেলে, আলতা মিএগ্রা- 'মাইয়নি! পইড়া যাইবাগা কৈলাম। নামাইয়া দেমু কিন্তুক' —বলতো।

কইন্যা বড় দুবন্ত। তীরে বসে তিতাসেব, পিতা গভীর হাসতেন! মিটিমিটি বকমাবী হাসি।

'—মাঝি, হেই আলতা মিএগ্রা! তাইবে ফিরাইযা আন দেহি নবিনগর ঘাট থিক্কা।

ছপ করে নৌকা থেকে জল। জল টপকে ছপ ছপ ছপ। বাপের কোলে মুখ গুঁজে—কাইন্দা দিত না কইন্যা।

নবিনগবে বড় ভীষণ টান। ফবেস্টাববাবু তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। পীতাম্বব মেযেব মাথায় হাত বুলিযে বলতেন—'আইজ হোক কাইল হোক। যাওন তো লাগবইরে মাইযা। ঐ দেখ, আলতা মিএগ্রা মাঝি যায়। লগি ঠেলা দিছে।'

তিতাসেব জলে হযতো তখন ভাটার সুর। শেষ বৌদ্র কুচি কুচি হয়ে ছোট ঢেউযেব ছাযা ভাঙে। আলতা মিএগ্রার নাও মাঝগাঙে যেতে যেতে দূরবর্তী হতো।

তাবপর তিয়াত্তর বছব।

হিসেবে ভুল হযে যায় কুঞ্জলতাব। তখন থেকে তিয়াত্তর না কিছু কম হবে! হিসেবে গড় ভুল হয তাব। গড়ে বড় ভুল হয আজকাল।

মেজ ঠাকুবঝিকে কবে পাঠিয়েছিল ওরা—মনে পড়ে না কুঞ্জলতাব। কেমন আছে কোথায়, সব খববাখবব তাব জানা নেই। অনেক খবরই কুঞ্জলতাকে দেয়া হয় না আজকাল।

সতুর কথায় রাজী হয়ে গিয়েছেন কুঞ্জলতা। তাছাড়া রাজী হওয়া না-হওয়াব মধ্যে কোন অন্তরায থাকে না, থাকে নি এতদিনে।

মাঝরাতে কী হয়ে গিযেছিল। কুঞ্জলতা বুঝতে পারেন না। ঘোর কাটতে-না-কাটতে বিছানা চটচটে। সকালসকাল রাতেই আজকাল ঘুম বড় নাছোড়।

গীতা গজগজ করেছিল। বারণ করেছিল—'খাইয়েন না। পেট গরম হইবো।'

লোভ, পোস্তবাটার লোভ দুপুরে কিছুতেই সামলে উঠতে পারেননি কুঞ্জলতা। বিকেল গড়াতেই গীতাব কথা সত্যি হয়ে—লজ্জা লজ্জা!

তিনবারের সময় তখন রাত ন'টা। ওরা সবাই বুঝে গিয়েছিল। কাপড়ের পেছনে ছোপ। সেনিটারি প্যানের বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে নোংরা করে উঠে দাঁড়াবার সময—অন্ধকার।

দরজার ভিতর থেকে খিল দেয়া কবে থেকেই মানা। ছেলের হুকুম। বছর

পাঁচেক এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাথরুমে মাথা ঘুবে পড়ে যাবার পর থেকে।

দিতেনও না কুঞ্জলতা। বিন্তী বাইরে থেকে শেকল তুলে অপেক্ষা করে' ভেতর থেকে কুঞ্জলতার সাড়া পেলে—খোলে।

কোথাও গেছে মেয়েটা বন্ধুদের সাথে। কোন বিয়ে বাড়িটাড়ি হবে। গীতার সংসার সামলে ঐসময়টা একটু টিভির সামনে বসার।

গজগজ করতে কবতে বালতি ভবা জল প্যানের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে দিতে রাগ চেপে বাখতে পাবে না।

'—না কবলাম, খাইযেন না। কাম বাড়াইছেন তো এখন!'

কাউকে ডাকতে পারেন না কুঞ্জলতা। ঘুমেব মধ্যে কখন যে কাপড়চোপড় নষ্ট হযে গেছে। জবুথবু বসে থাকেন খাটেব এক কোণে। কুঞ্জলতা বড ভরসাহীন।

আজ বিন্তীটাও নেই। বিযেবাড়ি থেকে ফিবে আসেনি।

সকালে গীতাব মুখটা কেমন হতে পাবে ভাবতে গিযে গলা অব্দি শুকিযে যায় কুঞ্জলতার। বিছানা থেকে শরীবটা নামাতে গিয়ে বুঝতে পাবেন কত কঠিন।

অসহায কুঞ্জলতা ভোবেব অপেক্ষায কুঁকড়ে যেতে থাকেন।

অবাক। গীতা কিচ্ছু না বলে বিছানাপত্র তুলে নিযে গিযেছে। মৃদুস্বরে বলেছে —'কাপডটা ছাইড়া ফালান মা।' একমুখ অবাক হযে কথামতো কাজটা কবেছেন।

ধরে ধবেই গীতাই বাথরুমে ঢুকিযে বাইরে শেকল তুলে দিযেছে। স্নান সেবে বাইরে এসেই কথাটা শুনে ফেলেন কুঞ্জলতা। সতু এইমাত্র বাইবে থেকে এলো।

'—রবিবাবের টিকেট। চিডিপত্র দিয়া দেও সোনাপিসিবে।'

পাযের সমস্ত শক্তি মুহূর্তে উধাও। একটা গাছের মতোই দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ কুঞ্জলতা। তাবপব একসময সকালে গীতার নিযন্ত্রণটা তাব কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারাটাদিন এক স্তব্ধ ঘোবেব মধ্যে কেটে যায। খববটা প্রচার হতে হতে আশেপাশের আত্মীয স্বজন কাতারে কাতারে দেখা করে গেছে। দূরেব জনেবাও আসবে। কাল পবশু বা তার পবদিন।

কড়ে গুনে কুঞ্জলতা দেখলেন আব মাত্র চাবদিন বাকী।

খুশি মনেই মেনে নিযেছেন। সন্ধ্যা পাব হতে হতে কুঞ্জলতার মেনে নেযাব কাজটাও শেষ। কুঞ্জলতা তো কোন চুক করতে পাবেন না। এযাবৎ খুশি মনে পালন কবেছেন জীবন।

রাত গভীর হলে, এই বাতে বহুকাল বাদে কুঞ্জলতাব সাধ হলো—বাড়িময় অলৌকিক হেঁটে বেড়াবার সাধ।

দক্ষিণের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতেই—আহ! তাইতো! সতুটা মাটি রাখেনি কোথাও। সবটা উঠোনে জুড়ে নির্মাণ। ঢালাই আর ঢালাই।

এই তো, এখানটায় পুকুর ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় লালমাটির ঢিবি।

বিন বিন করে কোথায় জল পড়ার সুদূর শব্দ কানে আসে। চমকে ওঠেন কুঞ্জলতা। চাঁদের আবছা রহস্যের ঘোরে খোঁজেন এদিক ওদিক। কোথায়?

এখানে! বুকে হাত রাখেন। এই তো. এখানে। লালমাটি হাতে লাগে। বুকের

উপরে লালমাটি। 'বৈরাগীটিলার মাডি বাবু। একবচ্ছর বিশ্রাম দেন। তারপরে তুলেন—কত উচা পারেন!'

সতু, ইডা কীতা করলিরে বাপধন!

এই প্রথম। নিজের মনের গভীরেও কোনদিন পুকুর ভরানোর জন্য ছেলেকে কিছু বলেন নি। আজ এই মাঝরাতে চারদিকে বিষণ্ণ রহস্য। সারা গায়ে, বুকে লালমাটির গন্ধটা উঠতেই কুঞ্জলতার নিঃসঙ্গ ঠোঁট নড়ে ওঠে। বুক বলে ওঠে কিছু কিছু কথা। যার নিচে অন্তঃসলিলা—বিনবিন জল সরে যায়। যাচ্ছে। ক্রমাগত।

বিন্তীর কণ্ঠলগ্ন হাতটা কী সাবধানী প্রয়াসে ছিন্ন করেছেন—ভেবে ভেবে কুঞ্জলতা নিজেই ছিন্ন হতে থাকেন। মাঝরাত অব্দি কেঁদেছে মেয়েটা। কান্নার মাঝখানে যখনই সামান্য যতি—তখনই ফরেস্টাববাবু ফিসফিস কবে বলেছেন—'মন্টুরমা, পুলাপান চাড়াল না। তুই মানছ না কেরে!'

মেনে নিয়েছেন। পালন কবেছেন।

কুঞ্জলতা বসে পড়েন। খুব ধীরে বসে পড়েন। যেখানে ঘাটলা ছিল। এখন লাল মাটি।

ফরেস্টারবাবু সতু আর কাজলকে নিযে বসতেন তাঁতানো রোদে পিঠ মেলে দিযে। ছেলেরা তেল মাখাতো বাবার বিশাল পিঠে। 'মাখা, সতু কাজলা—ডইল্যা ডইল্যা মাখা।' তারপর বড় বড় থাবায় একসময চুবিয়ে দিতেন ছোট্ট দুটি দেহ।

সহসা কুঞ্জলতা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সমস্ত সত্তা দিয়ে জড়িয়ে ধরেও নিজেকে স্থিব বাখতে পারেন না। ধীবে শুয়ে পড়েন সেইখানে। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মতো।

বড শান্তিতে তার দু-চোখ গলে গলে পড়ছে। বুক ভরে বাতাস পুরে নিতে গিয়ে—পরিচিত গন্ধেবা তাকে ঘিবে ধবে। গন্ধেরা কখনও শালুক-পাকুড়, তিতাসের বক্ষলগ্ন বোদ, কখনও ফরেস্টাববাবুব রক্তেব ধাবাপাত হযে কুঞ্জলতাকে ছুঁয়ে ছেনে যায়।

ছেঁড়া ঘুম জোড়া দিতে দিতে এই প্রথম কুঞ্জলতা অতীতের দূব স্বরে কান পাততে ভুলে যান।

রণজিৎ রায়

বনবাসে

বেশ কিছুদিন থেকেই এটা হচ্ছে। ভোরের আলো ফোটার আগেই অমিতাভ নেমে আসে এই বারান্দায়, দূরের নীল পাহাড়টার দিকে একবার তাকায়, তারপব আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে কচি ঘাসেব গালিচা পেরিয়ে সামনেব চত্বরটাতে। দু'এক ফোঁটা শিশির পায়ে লাগে। আলো-আঁধারিতে দৈত্যেব মতো দাঁড়িয়ে থাকে মাইক্রোওয়েভেব বিশাল টাওয়ার। অতসিফুলেব ঝোঁপটাব পাশে এসে মাটিতে বসে পড়ে অমিতাভ। তারপরই ঘটনাটা ঘটে গেলো। আচমকা। ঠিকঠাক মতো কিছু বুঝতে পারাব আগেই অমিতাভ দেখলো তাব হাত পা পুরো শবীবটাই বদলে যাচ্ছে। চেতনাহীন অনিয়ন্ত্রিত শবীর থেকে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে সে। হাল্কা হাওয়ায় ভাসতে থাকার মতো। হঠাৎ মৃত্যুভয়ের মতো ভয়ঙ্কব কিছু একটা তাকে প্রায় বিবশ কবে তুলল। বিস্ফারিত চোখ তার অসহায়ভাবে দেখলো দবদর করে ঝরে পড়া ঘামেব সঙ্গে গলে পড়ছে তার শরীব। দম বন্ধ হয়ে উঠছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেমন যেন নরম নরম সাদাটে আর ছোট হতে হতে একটা তুলতুলে খবগোস হয়ে উঠলো তিবিশ বছরের পরিচিত এই শবীব। প্রথম প্রথম ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো। তীব্র আশঙ্কা আর ত্রাসে চিৎকার করে উঠলো অমিতাভ। কিন্তু গলা দিয়ে শুধু খবগোসের মৃদু শব্দই বেরুলো। একসময় হতাশায় ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো অমিতাভ। তারপব খুব ধীরে ধীবে অনাবশ্যক বিষণ্ন নির্জনতা থেকে জেগে উঠলো সে।

আশ্চর্য হাল্কা সাদা শরীরটা নিয়ে কিছুক্ষণ ছুটে বেড়ালো। একটা ছোট ঘাসেব ডগায় লাফিয়ে উঠলো তিনবার এবং হাল্কা একধরণেব সুখ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো তার চারপাশে। শান্তার কথা মনে পড়লো। সেও যদি এমনটা খবগোস হয়ে যেতো? ধীরে ধীরে আকাশ লালচে হয়ে উঠলে, নীল পাহাড়ের তলা থেকে সূর্য মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলো যেন এই পাহাড়ী বনস্থলীতে নিঃসঙ্গ সরকারী বাসস্থান, শান্তাব নিজের হাতে লাগানো চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপের বাগান। একসময় অমিতাভ ফিবে পেতে থাকলো তার নিজস্ব অবযব। সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে আবার সে হেঁটে উঠে এলো পরিচিত বারান্দায়। যেখানে কাল সন্ধ্যায় ও বসেছিল সে আব শান্তা। কত গল্প কত কথার জাল বুনে বুনে জ্যোৎস্নায় ডুবে থাকা পাহাড়ী নদীটিব দিকে তাকিয়েছিলো অনেকক্ষণ। নুড়ি পাথর জলের শব্দ শুনতে শুনতে আবো ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দু'জনায়।

ঘুম ঘুম চোখেই শান্তা উঠে এলো। 'কি হলো, কোথায় গিয়েছিলে এতো ভোরবেলা?' অমিতাভ আশ্চর্য ঘটনাটা বলার জন্যে উসখুশ করছিলো, বলতে বলতেও থেমে গেলো। যদি শান্তা হো হো করে হেসে অবিশ্বাসের সুরে বলে ওঠে—'সত্যি, তোমার মাথাটা খারাপ হচ্ছে দিন দিন।' কেউ কি বিশ্বাস করবে তার কথা। অসম্ভব।

অমিতাভ নিজেও বিশ্বাস করতো না, অন্য অন্য কেউ বললে। চুপচাপ শান্তার পাশে কাছাকাছি বসলো সে। দুজনেই একসাথে দেখলো নাম না জানা পাখীরা উড়ে আসছে, বুড়ো রামশরণের লাল-ঝুটি মোগরটা ডেকে উঠলো একবার। বহুদূরে জুম ক্ষেতের ঢাল বেয়ে নেমে গেলো পৃথিবীব প্রথম নাবীর মতো পবিত্র এক পাহাড়ী যুবতী। ঘন অরণ্যের নির্জনতা থেকে উঠে আসছে ঝর্ণার উদ্ধত শব্দ, একঝাঁক টিয়ে পাখীর শিস, আর সবকারী যত্নে লালিত রাবার গাছের পাতা ঝরার গান।

জায়গাটার নাম শিকাবীবা ি যেদিকে চোখ যায় ঢেউ খেলানো পাহাড় আর পাহাড়। ঘন-নীল জঙ্গল আব সাবি সাবি বাবার গাছ। খুব ভালো লেগেছিলো যেদিন প্রথম অমিতাভ এলো মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশনে বদলি হযে। সবুজ লন পেরিয়ে টানা বারান্দা, প্রায় বাংলো টাইপের এই বাড়িটাকে একটা স্বপ্নে দেখা ছবিব মতো মনে হচ্ছিল।

এই নির্জন বনভূমিতে একদিন শান্তা এলো। ওর সিঁথিব সিঁদুব চুড়ির শব্দ, এলোচুল আব নূতন শাড়ীব গন্ধ ও আঁচল ঢেকে রাখলো সব একাকীত্ব। এখানে নেই কোনো জনপদ। নেই কোনো আধুনিক দ্রব্য সামগ্রীর নির্লজ্জ প্রদর্শনী। মাঝে মাঝে হাইওযে দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির হর্ণ-এর ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে এই যা।

অমিতাভ আর শান্তা হাত ধরাধবি করে ঘুবে বেড়ালো পাহাড়ময়। সন্ধ্যায় ঝর্ণার পাশে উচু পাহাড়টাতে বসে শান্তা গান গাইলো—'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' খুব ভালো গান গায় ও; সবই ঠিকঠাক চলছিলো সাবলীল কবিতাব মতো। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিতাভ বারবার অন্যমনস্ক হযে যাচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে ভোরবেলার সেই খরগোস। এখন পুরো ব্যাপাবটাই বিশ্বাস কবতে হচ্ছে। মনে মনে ভাবলো অমিতাভ—'কোনো স্বপ্নটপ্নই দেখলাম বোধহয'। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো সে অদ্ভুত ঘটনাটা। শান্তা ওব হাত ধরলো। অমিতাভ লক্ষ্য করলো এ স্পর্শ কোনো সাড়া জাগালো না ওব শরীরে। ভ্রূ ভঙ্গিতে হলো না কোনো নীবব আলাপ। অবাক চোখে শান্তা তাকিযে রইলো এক পলক, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কবলো—'তোমার কি শবীব খাবাপ লাগছে? ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো অমিতাভ উত্তর দিলো—'না, তো'। রাত্তিরে ঘুমেব মধ্যেও সেই খরগোসটা নড়াচড়া করছিলো। মাঝরাতে অমিতাভ স্বপ্ন দেখলো একটা বিশাল মাঠের মাঝখানে সে দাঁড়িযে আছে একাকী। শান্তা প্রাণপণ ছুটছে ওর কাছে পৌঁছাবে বলে কিন্তু কিছুতেই এগোতে পারছে না, একসময নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শান্তা। অমিতাভ তাকে ছুঁতেও পারে না। কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না ওর মুখে। আরচোখে একবার দেখলো শান্তা ঘুমিযে আছে তার পরিচিত ভঙ্গীতে। ওব টিকালো নাক, উজ্জ্বল চিবুক, ঘন চুলেব গন্ধ ছড়িযে পডতে থাকলো ঘবময। অমিতাভ শিশুর মতো ওবই আশ্রয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু প্রতিদিন ভোববেলা পর পব চাবদিন একই ঘটনা ঘটলো। নেশাগ্রস্তেব মতো অমিতাভ উঠে আসে বাবান্দায়, তাবপর অতসিফুলের ঝোপটার পাশে এক অনাবিল আনন্দ জেগে থাকে, শরীবময়. বদলাতে থাকে তার পরিচিত অবযব। ততক্ষণে অমিতাভ এক পবিপূর্ণ সাদা খরগোস। লাফিয়ে লাফিয়ে সে অবাক চোখে দেখে পৃথিবী। ছুটে চলে গেলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ঘন কুয়াশার মতো ছড়িয়ে

পড়ছিলো আনন্দ। ঝরা বকুলের উপর দিয়ে যেতে যেতে সে একবার পিছু তাকালো। একটা সুরেলা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার কথা চিন্তা কবলো, কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলো না কোনটা গাইবে। এক সময় সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো এই প্রান্তরে। পাহাড়টার ওদিক থেকে ইউক্যালিপটাসের বন পেরিয়ে আসা একদল মানুষ-মানুষী জল নিতে এলো বিচিত্র শব্দ করতে করতে। আর অমিতাভ ধীবে ধীরে ফিরে পেলো তার ব্যবহৃত শরীর।

এই বারান্দা থেকে দূরের পাহাড়ের সারিগুলোকে খুব আপন মনে হয়। রোজ সকালবেলা অমিতাভ আব শান্তা এখানে বসেই চা খেয়ে নেয। শান্তা খুব কাছে বসে, গল্প করে—কলেজের বন্ধুদেব কথা, মা-বাবাব কথা। দু'একবার নাড়িয়ে দেয় খেলাচ্ছলে অমিতাভর একমাথা ঝাকড়া চুল। কিন্তু আজও অমিতাভ ভোরবেলাব কথাটা কিছুতেই বলতে পারে না শান্তাকে। আজ তাকে বলতেই হবে—খরগোসের সাদা সাদা রেশমি লোমে লুকিয়ে আছে অমাবস্যাব রাতেব শেষে সূর্যোদয়ের মতো এক সুখ। মনে মনে গল্পটা সাজিয়ে নেয় অমিতাভ: ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে। গত দুদিন ধরে রিহার্সাল দিচ্ছে সে কিভাবে শান্তাকে জানাবে এই আশ্চর্য ঘটনাটা।

কিন্তু হলো না, শেষ অব্দি বলা হলো না। শান্তার অবিশ্বাসী ঈষৎ হা করা মুখ বিস্ফারিত চোখেব কল্পনা ক্রমশই তাকে দূর্বল কবে তোলে। অথচ প্রতিদিন ভোরবেলা ঘটনাটা ঘটেই চলেছে। দূর্নিবার এক আকর্ষণে অমিতাভ অপেক্ষা করে কখন নামবে চরাচর অন্ধকার করা রাত্রি এবং নববধূব মতো এগিয়ে আসবে আব একটা ভোর। প্রাথমিক ভযটা কেটে যাবার পর ঘটনাটা অমিতাভকে রোমাঞ্চিত করে, ফুলের পাপড়িতে বসা মৌমাছির গানের মতো সুব এখন শুধু খরগোসেব এই শরীরেই।

আজ ভোরে অমিতাভ লাফাতে লাফাতে চলে গিয়েছিলো অনেকটা দূর। পাতাঝোপের আড়াল থেকে তার ছোট লাল চোখ অবাক হয়ে দেখলো একটা হাতি শুঁড় তুলে তার বাচ্চাকে আদর করছে। আরো এগিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে স্বচ্ছ জলের সেই ঝিলটাও দেখে এলো আজ। পাহাড়েব ছায়া পড়েছে জলে, প্রেয়সীর চোখের মতো শান্ত সেই ঝিল দেখতে দেখতে শুধু শান্তার কথাই মনে পড়ছিলো। একটা চিত্রল হরিণশিশুর সতর্ক জলপানের দৃশ্য এতো কাছে থেকে খবগোস হযে শুধু অমিতাভই দেখতো পেলো।

'এ্যাই জানো, দক্ষিণেব পাহাড়ে একটা বিশাল ঝিল আছে। ওখানে হবিণবা আসে ভোরবেলা জল খেতে।'

—'তুমি কি দেখেছো? ভারী বাতাসে নিরাসক্ত প্রশ্ন শান্তার।

'নিশ্চয, আজই তো দেখে এলাম।' অমিতাভ প্রাণপন স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। শান্তার গলার স্বর বিষণ্ণ এবং উদাস শোনালো। কথা হারিযে গেলো। নির্জনতা ছায়া ফেলতে শুরু করলো ওদের দু'জনাব মাঝখানে।

বাথরুমের আয়নায় অমিতাভ নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিযে দেখে অনেকক্ষণ। কিন্তু বহস্যটা কিছুতেই বোঝা যায় না। কোথা থেকে আসে এই সাদা খরগোস, শরীব বেয়ে কুল কুল করে নেমে যায সুখের নদী হয়ে। কথাটা যে কিছুতেই বলা যাচ্ছে না শান্তাকে। অনবরত সুযোগ খুঁজছে সে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে বলা যায়।

রোজই ঘটছে যে। বারান্দায় আগেব মতোই বসে শান্তা আর অমিতাভ। দু'জনে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে পাতা ঝরা উর্দ্ধবাহু রাবার গাছেদের সারি। আকাশের ফ্রেমে আটকে থাকা পাহাড়ের উচ্চ রেখা, কিন্তু কি যেনো হারিয়ে গেছে, কথা হয়, বিনিয়োগযোগ্য কোনো একক ভূখণ্ডে এসে আর দাঁড়ানো হয় না। ইঙ্গিতে, স্পর্শে যে কথা হতো, শান্তা কাছে দাঁড়ালে ওর চুলের গন্ধে যে আবেশ ছড়িয়ে পড়তো, তা যেন হঠাৎই উড়ে গেলো। ক্রমশই এক অদৃশ্য চোরাবালিতে আটকে যাচ্ছে যেন যৌথ উদ্যোগের এই জীবন গেরস্থালি, ভালোবাসা। অমিতাভ অস্থির হয়ে ওঠে। নৈঃশব্দের ওপারে ধীবে জমা হচ্ছে ক্রোধ, শান্তাব চোখে মুখে বিরক্তি এখন সরব। প্রায়ই শান্তা দূর থেকে জিজ্ঞেস করে—

—'তোমার কী হয়েছে, বলো তো?'

শান্তা একবার সহজ হবাব চেষ্টা করে। বোধহয় আর কিছু করার থাকে না বলেই। অমিতাভ কোন কথা বলে না। শুধু উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর শান্তা উঠে যায়। স্পষ্টতই একটা অদৃশ্য দীর্ঘশ্বাস রেখে গেলো এই ঘরে।

এখানে কোনো জনপদ নেই, নেই কোনো কোলাহল। হাবিয়ে যাবার মতো নেই কোনো আধুনিকতা। রোজ ভোরের কিছুটা সময় বাদ দিয়ে অমিতাভ সারাদিন ডুবতে থাকে এক আশ্চর্য বিষণ্নতায়। সাদা খবগোস তার চেতনাকে বিমুক্ত করে। ভাবতে বসে—'আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? কতো উদ্ভট কথা মনে আসে। যদি এমন হয়, একদিন সাদা খরগোস হয়ে হারিয়ে যাই কোনো গভীব জঙ্গলে। অথবা নিয়ে যায় কোনো অজানা পাহাড়ী যুবক। শান্তা অপেক্ষা করে কবে বিরক্ত হবে, অধৈর্য্য হবে, তারপর একসময় ভেঙে পড়বে। একাকী নির্জন এই বাংলো মতন বাড়িটাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ওব শরীব দুলে উঠবে। অসহায় শান্তা কি করবে তাবপব? হয়তো তখন অমিতাভ সাদা ফুল, সবুজ ঘাস ডিঙ্গিযে লাফিযে লাফিযে দেখছে নূতন আকাশ, পায়ে মাখছে ভোরের শিশির, আর তাজা শিউলিফুলের সুবাস।

না, সেদিনকার মতো আজো ফিরে আসে অমিতাভ। মানুষের দীর্ঘ পদক্ষেপে উঠে এলো বাবান্দায। আব তখনই দেখলো শান্তা দাঁড়িয়ে আছে বাবান্দার ওপ্রান্তে লতানো পাতাবাহারেব গায়ে হাত বেখে। অমিতাভ বিষণ্ন অথচ অপরাধী চোখে তাকায একবাব, তাবপব চোখ নামিয়ে হাঁটতে থাকে।

—'বোজ ভোবে তুমি কোথায যাচ্ছো আজকাল?' শান্তার গলার সুর অধৈর্য্য শোনায়। 'প্রতিদিন কাক ভোবে এই আধো অন্ধকাবে কোথায় যাও তুমি?' প্রায় কান্না চেপে কথাগুলো বললো শান্তা।

অমিতাভ দেখলো শান্তাব দুচোখে নেমে আসছে আদিম সন্দেহ, চিবুকে ছায়া পড়ছে বুঝিবা অবিশ্বাসের। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো সে। সত্যি সত্যি দুঃখী হয়ে উঠলো অমিতাভ এখন।

শান্তা কোনো উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো স্নানঘরের দিকে। একটা দরজা বন্ধ এবং একনাগাড়ে জল পড়ার শব্দই শুধু শুনতে পেলো অমিতাভ। সারাদিন শান্তা নিঃশব্দে এঘব ওঘর হাঁটলো, পুরনো দেশ পত্রিকার পাতা ওল্টালো, নিঃশব্দে ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ সারলো। রাত্তিরে দেয়ালেব দিকে মুখ করে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো অথবা ঘুমোবার ভান করলো। কিন্তু অমিতাভ

কিছুতেই অতিক্রম করতে পারলো না বিছানার মধ্যিখানের এই মসৃণ দূরত্বটুকু।

তার আধো স্বপ্নে অথবা জাগরণে আবার ভোরের বাতাস শরীব ছুঁয়ে গেলো। নিশি পাওয়া মানুষের মতোই অমিতাভ নাচের মুদ্রায় এগিয়ে গেলো রজনীগন্ধার পাশ দিয়ে, শুকনো রাবার পাতার উপর দিয়ে, আবার দৌড়ে ছুটে এলো শান্তার হাতে অতি যত্নে পালিত গোলাপ গাছের তলায়। টকটকে লাল পাডিতে ছেয়ে গেছে মাটি। বাতাসে মৃগনাভিব মতো প্রচ্ছন্ন এক সৌরভ। ছড়িয়ে পড়া গোলাপের রক্তিম পাপড়ির ওপর বসে আছে শুভ্র এক খরগোস।

অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে শান্তা। আজ সে দেখবেই কোথায় হারিয়ে যায় অমিতাভ অথবা তার যাবতীয় মানুষিক প্রবৃত্তি। লঘুপায়ে অতসির ঝোপটা পেরিয়ে যেতেই শান্তা অবাক চোখে দেখে তীব্র গোলাপ লালেব মাঝে বসে আছে মিষ্টি নরম এক খবগোস। মুহূর্তে উডে যায় শবীর থেকে অকারণ সব গ্লানি। চেতনা আচ্ছন্ন করে অবিকল্প এই খরগোস। ধীরে ধীরে সমর্পণের ভঙ্গিতে দুহাতের মাঝে তুলে নেয় শান্তা, আলতো কবে গালে গাল ছুঁইয়ে আদব করে, আব প্রথম বৃষ্টির মতো শরীর বেয়ে নামতে থাকে সম্পূর্ণ অজানা এক সুখ। ভরা সুখের আবেশে দুচোখ বুঁজে আসে শান্তার আব তখনই অমিতাভ দ্রুত ফিরে পায তার মানুষ শরীর। ভোরের এই বনানীতে বিশুদ্ধ আলিঙ্গনে জড়িযে থাকে পবিপূর্ণ অর্থেই এক পুরুষ ও নারী—দেবপুরুষ আর উর্বশী। অনেক অনেকক্ষণ পর সূর্যকে পেছনে রেখে অমিতাভ আর শান্তা হাত ধরে এগিয়ে যায় শিউলি ফুলেব ওপর দিয়ে, গোলাপের পাপড়ি ঝরিয়ে।

সুজয় রায়

তোষক

'তোর বাপের অবস্থা খারাপ শুইন্যা আইছিরে? মইর‍্যা টইর‍্যাও যাইতে পারে? তুই বাড়িত যাইগ্যা অক্ষণ, কয়ডা দিন আমি[illegible] চালাইয়া লমুনে?' বিলাস তাকিয়ে থাকে মালিকেব দিকে। ভাবলেশহীন। বাপ এবং খারাপ ও শেষে মরা, তিনটি শব্দ কচ কবে বুকের মধ্যে বিষাক্ত কাটার মতন বিঁধে ধরে। তাকে পরিপাটি তার এক নিজস্ব জগৎ থেকে প্রবলবিক্রমে ধাক্কা দিয়ে কে যেন ফেলে দেয়। সে যেন অসহায়ের মতন শূন্যে বিপন্নতায় ঝুলতে থাকে। বাপ কী এক অনুভূতি, এই ব্যাটা কি বুঝতে পারেনা? বিপুল ক্ষোভের মধ্যে বিলাস বুঝতে পারে গরীবের বাপ, বাপ থাকে না জিনিস হয়ে যায়। কেমন যে এক পাষণ্ডের মতন মালিক, কেবল তো একটা চায়েব দোকান এই গর্বে তার পা মাটিতে পড়ে না। বলে কী না 'মইর‍্যা-টইর‍্যা?' বিলাসদের মতন জীবিত মানুষদের জন্য মৃত্যুও মহান হয় না। কুকুর-ছাগল বেওয়ারিশ মরে থাকা রাস্তায়, বিলাসের বাপের মৃত্যুর চিত্রকল্প আঁকা হয় ঠিক এভাবেই। বিলাস মালিককে আব কী বলবে? নিশ্চিত মৃত্যুব সংবাদ তার তেড়ে ওঠার ওজস্বিতাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বাপ মানে তার প্রাণ, ফুসফুসের বায়ু। বাপই বলে কয়ে এই দোকানটায় ঢুকিয়েছিল বিলাসকে। বাপের ছিল অনুনয়-বিনয়, তার ছিল মেজাজ। মালিকটা বেয়ারা, কথাবার্তায় রুক্ষ কর্কশ যেন ভিখারি অথবা চোরবদমাসের সঙ্গে কথা বলছে। আমি করতাম না, এই দোহানে কাম? বিলাস ঝামটা মারলে বাপ সহ্যশক্তির ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। কস কী? খাইবি কী? আমি কি পারুম? বিলাস দমে যায়। কিন্তু তবুও তার জেহাদ থাকে। ব্যাডা, আমরারে গুলা[illegible] মতন দেহে ক্যারে? হেঁতে যেমন মানুষ, আমরাও মানুষ? কুত্তা খেদানের মতন [illegible]ই হেই করে কেরে? বাপ ঠিকই বোঝে পুলার মান সম্মান ইজ্জত বড় টনটা[illegible] [illegible]বাহাসি পায়। তাবও তো ছিল? একদিন? এই বয়েসে। বিলাসেব এই যে [illegible]সটা? বাপের অন্তবের সায় থাকে, কিন্তু বাইরে পুলারে কয় হজম করার কথা। রাগ বিরক্তি ক্ষোভ আক্রোশ এইসব শরীরে এখন রাখতে নেই। রাখলে খাওন জুটত না। বিলাস বাপের কথা বলে, মনে রেখেছে। পোষ মেনেছে। মালিকের কাছেও তাই সে পোষা! তাই বলে সবসময় তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয় না, তা ঠিক নয়। আক্রোশের ওকগাছগুলি তাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। মালিকটার কথাবার্তা শূয়রের মতন গোঁয়ার, গুঁদ গুঁদ করে। বিলাসের চা বানানো ও খদ্দেরদের হাতে তুলে দেবার সময় একটু বেশি গেলেই ভাঙা চেয়ারে পেট বাওয়াইয়া বসে হোঁতকার মতন চিৎকার, কিভাবে বেশি খাওন অইয়া গ্যাছে? শরীলে তেল অইয়া লরতে-চরতে পারসনা যেমুন? বিলাস এই আগ্রাসী বুলি প্রায়দিনই শোনে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। বাপটা না করে গেছে। পত্তিবাদ কবিসনা রে বিলাস? খাওন পাইতি না? তাইনরে কাহা ডাহিস। ম্যার ভক্তি করিস।

এক্ষণ তার এই কথাটাই মনে হলো বারবার। অথচ তাঁর বাপকে অপমান কবার জন্যই বাপের কথামতন মুখফুটে কোন কথা বলতে পারল না। দুপুরবেলা এখন। বিলাসের খাওন হয় মালিক চান খাওয়া ও দিবানিদ্রা দিয়ে এলে। দোকানটার পিছনদিকে কিছুটা পথ গাছগাছালি পার হলেই খোয়াই নদী। বর্ষায় তার ভয়াল চেহারা। এখন হেমন্তকাল, স্থানে স্থানে বালির চরা। মাঝখানেও। দুই ধারে জলরেখা বয়ে যায়। কোথাও গভীর, কোথাও হাঁটুজল। কাশফুল এখনও ফোটে চরায় এবং পাড়ে পাড়ে তবে অধিকাংশই বিবর্ণ এবং বাসি। বিলাস এই জলে নেমে চান করে গামছা পবে। ভাত সেদ্ধ খায় দোকানেই। তাকেই বানাতে হয় ভাত। খোবাকিটা মালিকেব সুতবাং খুবই সংক্ষিপ্ত। কথাটা শুনে বিলাস মালিকেব প্রতি রাগ ভাব দেখায়। কিন্তু গভীর গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বাগ হজম কবে পেটে চালান দিযে বলে চান কইব্যা খাইয়া লই, হেবপব যামু নে? আমি তো হেই দিন একটুক জ্বব দেইখ্যা আইছি? এবই মইধ্যে মইর্‌য়া যাওনেব কী আছে? মালিক কথাটা শুনে বিলাসেব শক্ত ও কঠিন মুখমণ্ডলেব দিকে তাকায় এসময। কী ভাবে কে জানে, শুধু বলে, বুজছি বুজছি! তুই যা করনের, তাড়াতাড়ি কব। তারপর বাড়িত যা। দিড়ং করিস না?

বিরক্তি আর উৎকণ্ঠাব জগাখিচুড়িতে বিলাস বেসামাল হযে আর নদীতে যায় না। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিযে মগে জল ঢালে মাথায, তেলচিটচিটে গামছায় মাথা মুছে দ্রুত। গোগ্রাসে গিলে দলাপাকানো ভাত। উত্তর রামচন্দ্রঘাট পৌঁছুতে তার কম করেও ফাঁড়ি পথ দিযে চল্লিশ মিনিট লেগে যাবার কথা। বিলাস যেখানে কাম করে সেখানে ছোটখাট বাজার। খুব কাছেই চেবরি ব্রীজ। এই ব্রীজেব দুটো মুখই থুবরে আছে। ফলে কাঠের পাটাতন দিয়ে মুখদুটো জোড়া লাগানো মূল কংক্রীটের ব্রীজের সঙ্গে। ব্রীজটার ঠিক নিচেই ও প্রান্তের পাড়ে শ্মশান। মড়া পোড়ানো হয় সেখানে। মরা মুখ, শবযাত্রা এইসব মনে হতেই বিলাসের চোখে একঝলক ভাসে শ্মশানটার কথা। কতদিন কত ধোঁয়া দেখেছে, মরা পোড়াব গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। বাপটা কি সত্যি মবেছে? এই সেই শ্মশান, তাকেও যেতে হবে বাপের শব পোড়ার মুখ্য অংশীদার হতে, বোধহয় মাত্র কযেকঘণ্টার মধ্যে। নাকি, মালিকের এইসব ভাষণ, তাব সাথে মস্করা? অবশ্য বিলাসেব সাথে মস্করায় অংশীদার হয়ে মালিক বিলাসকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। শেষ দেখাব ক্ষেত্রে যদি মালিক আত্মসমর্পণ না কবে মালিকও জানে ভগবান তার পবিবাবেই অমঙ্গল ডেকে আনবে সে নিজেই। ভয় ও পূন্যার্জনের ইচ্ছা পাশাপাশি ছিল বলেই বিলাসকে যে সে ছাড়ত বাধ্য হচ্ছে বিলাসেব এ বয়েসে এটা না বোঝাব কাবণ থাকে না। একারণেই বিলাস বাপকে গিয়ে না দেখাব ভয কবতে থাকে, সারা শরীব যেন তার গভীর অবশ। তিনদিন আগে দেখে এসেছিল বাপ বিছানায় শোয়া। বাপ শুতে চায় না কোনসময়। জ্বর বাইছিল, ম্যাজম্যাজ আব গাঁটব্যথা করছিল সাবা শবীব। নতুন তোষকে শুযে বিলাসকে বলেছে খুব আরাম রে তোষকটায় ঘুমাইযা? তুই একদিন থাইক্যা আমার লগে ঘুমাইয়া যাস না? বিলাস তোযকটা পছন্দ করেনি, অবশ্যই কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ। রাগে রক্ত টগবগ কবেছে। সবটাই তার বাপেব উপব। মা-ও কম যায় না। ওখানেও রাগ শেয়ার হয় একটা অংশ। বাকি ভাইবোনগুলো থেকে বিলাস

নিজেই ব্যতিক্রম? বাড়ির সবাই যেখানে সব মেনে নেয় এবং সহ্য করে, দুঃখ কষ্ট মেনে নেয় বিনাপ্রতিবাদে আপোসে সেখানে বিলাস কেন আপোস করতে পারে না? বোধহয় একারণেই বাপের পিঠের তলায় পাতা নতুন তোষকটা বিলাসের পছন্দ হয়নি। ঝাঁঝালো রাগ জন্ম নিয়েছে অতিদ্রুত। আমি ঘুমাইতাম না! আমি দোহানে গিয়াই ঘুমামু। মা রে কইও লগে ঘুমাইতে!

বিলাস যখন দোকান ছাড়ে তখন গনগনে রোদ। এই হেমন্তেও মধ্যদুপুরে রোদ যেন আগুন ছড়ায়। মালিকের বাড়িতে ঘুমটা ভাল হয়নি। দোকানে পাতা কালো চিটচিটে বেঞ্চটায় চিৎ হয়ে শুযে থাকে। নাকে শব্দ হয়, বিলাস বুঝতে পারে ব্যাটা অঘোর ঘুমে রয়েছে। রাগ না আক্রোশ বোঝা গেল না, কিন্তু অত্যন্ত বিনয় ও ভদ্রতার আবরণে ঢাকা হয়ে বিলাস মালিককে নিচু গলায় ডাকে, কাহা, ও কাহা! আমি যাইতাছি। দোহানে কেউ নাই। চাইয়া থাইক্কেন। মালিক আবেশ জড়ানো স্বরেই বলে, ঠিকাছে? কিন্তু তুই দিডং কবিস না। ফিবা আহিস তাত্তারি। দিড়ং করলে আমি অন্য পুলা লইয়া লমু।

বিলাস বিষ-দৃষ্টিতে তাকায়। যেন পরশুরামের মতন তেজ বিকিরণ করতে করতে বেরিয়ে যায়। শালা কুত্তার বাচ্চা, বাপেব মরার খবরটা তার কাছে খববই নয়? কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! অনুশোচনা, সমবেদনা সবই যেন উপরের দিকে ঘোরে? নিচের দিকটা কি এতই অচ্ছুৎ? অবাঞ্ছিত? শিয়াল কুত্তা মরলে যেমন এক ঠ্যাঙে ধরে নদীতে ছুঁড়ে মারে তেমনি তাদের মৃত্যুও পশুর মতন, ছুঁডে ফেলে দেবার সামিল। বিলাস কাঁপতে থাকে রাগে, ক্রোধে, অসহায়বোধ করতে থাকে নিরাবলম্বন হয়ে। আশা ও আশংকা এখনও তার মনের ভিতর পাশাপাশি উঁকি দিচ্ছে। এইটুকুন জ্বরে অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটার কথা না? তার বাপ তো কাজ কবে খায়। প্রতিদিন মুনিগিরি করে অবণী শীলের বাড়ি। তাদেব বিশাল ক্ষেত, অঢেল জমি, বিরাট বাড়ি। চেবরি বাজাবে বড ব্যবসা। এঅঞ্চলে দালান উঠেছে সবার আগে তাদেরই। কিন্তু বিলাস দেখেছে তাব বাপ কাম না করলে খুরাকি পায় না, পয়সা পায়না। এটাও তার লক্ষ্য এড়াযনি তাব বাপ গাধাব মতন খাটে, পরিশ্রম কবে তিনগুণ কিন্তু পয়সা পায় গুনেগুনে। সোজা পথে কিছু হয় না দেখে বাপ তাব মাঝে মাঝে শীলেব বাগানের ফল চুরি কবে, সব্জি কেটে আনে। কোনসময় পুকুবেব মাছ তুলে বিক্রি করে দেয়। যদিও বিলাসকে বাপ বুঝতে দেয়নি এটি শ্রেফ চুবি, বলেছে ভালবাসার দান। এই বিশাল বাডির মালিক তাকে নাকি প্রচণ্ড ভালবাসে। নিজ হাতে তুলে খাবার জন্য স্বাধীনতা দিয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অন্যচোর খবর পায় নতুন চোরের। চোরেব শবীবে চোরগন্ধ আছে। বিলাসকেই জানায় দাগী চোররা। তোর বাপে তো শীলেব বাড়িতে চুরি কইব্যা ফালাইতেছে। জানসনি কিচ্ছু? যেই দিন ধরা পড়ব, দেখবি পুটকি দিয়া আইক্কাঅলা বাঁশ হামাইযা ছাড়ব? বিলাস কথাটা শুনে কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে নিঃশব্দে প্রতিবাদ রেখেছে, চোররাব না বাপেব বিরুদ্ধে বোঝা যায নি। তবে বিলাস বুঝতে পাবে তার বাপ নিত্যদিন এবং চিবকালের অভাব বোধ থেকে এইসব কর্ম করে যাচ্ছে। ছোট সময়ে বিলাস বাপের এইসব কাজ মনে করেছে স্বাভাবিক, আর পাঁচজন মানুষের কাজ করার মতন। বিলাস বড় হয়েছে, গোঁফ দাড়ি উঁকি দিয়েছে। সে বুঝতে পারে বাপের

প্রতি দীর্ঘ বঞ্চনা আর হতাশাই বাপকে মরিয়া করে তুলেছে। ঘরের মানুষের পেটের ভাতের চিন্তা ক্রমশঃ সংকুচিত করে তাকে বানিয়েছে আরো স্বার্থসর্বস্ব। নইলে তার বাপ নিজে ভাল করে ঘুমানোর জন্য নতুন তোষক কিনে আনে কেন ভাঙ্গা চকি ও ঘরের ভেতর? এমন জীর্ণশীর্ণ বাড়িটায়, মা-ভাইবোনদের মলিন ধূসর জামাকাপড় ও চেহারার মধ্যিখানে এই আগন্তুক যেন অপ্রত্যাশিত এবং অতি বেমানান। অবশ্য বাপ বলেছে এটি কিনে আনেনি, কেউ দিয়েছে—শীল বাড়ির মনিবরাই। কিন্তু বিলাস কি এটাও বিশ্বাস করে নেবে? চুরি নয় তো? সে যা-ই হোক এই তোষকটা ঘরে এসেছে বলেই কি বাপের জ্বর হয়েছে? বাপ মরে যাচ্ছে? বিলাস চলতে চলতে খানিকক্ষণ এইসব অলুক্ষুণে কথা ভেবে চলে অনবরত।

আজ তিনদিনের দিন বাড়ি যাচ্ছে বিলাস। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ভেতরে জামা, প্যান্ট গামছা আরো কিছু টুকিটাকি। আকাশ পবিস্কাব। বোদে এখনও ঝাঁজ আছে। এবাব বৃষ্টি কম। ফলে গরম বেশি। থেমে থেমে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে। কিন্তু সকাল হলেই রোদ্দুর। দুধারে ধানের মাঠ। তাব বাপ মাঝেমধ্যে শীলেব জমিতেও কাম করেছে। বিলাসও আরো কম বয়েসে বাপের সঙ্গে এসে কাম দেখেছে আর ছড়ায় নেমে গামছা পেতে মাছ ধরাব আনন্দে মেতেছে। তার সঙ্গে রয়েছে আবো তিন চারজন পোলাপান। এইতো, তুলাগাছটা?

এবার বা দিক ঘুরে যায় মেইনরাস্তা থেকে। বা দিকে টীলা। বেশকিছু গাছগাছালি। ফাঁকে এবং তলা দিয়ে দেখা যায় মাটির ঘব, বেড়াব ঘর। বিলাসদের বাড়িতে একটাই ছোট মাটিব ঘব আর একটা ভাঙা বেড়ার ঘর। দূর থেকেই উৎকর্ণ থাকে কান। সত্যিই কি কোনো দুঃসংবাদ? বিলাস ঠিকই জানে দুঃসংবাদ বেঠিক থাকে না, বরং সুসংবাদ কোনদিনই গরীবের সঙ্গী হয় না। একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভাসছে বাতাসে। গাছগাছালির ফাঁক ফোকর দিয়ে যেন বিলাসকেও ছুঁযে যাচ্ছে। ঠিকঠিক ভাবে মৃত্যুব গন্ধ এসে যায় চলমান বিলাসের নাকে। তার বুক থেকে কী যেন দলা পাকানো কষ্ট নিংবে নিচ্ছে তার শরীরেব সব কিছু। এবার বিলাস ছুটতে থাকে। বাপের স্পর্শ তাব চাই-ই, যেন মৃত্যুকেও সে পন করতে রাজী। মার বিলাপকে ভেদ কবে বিলাস উল্কার মতন ঝাঁপিযে পড়ে উঠোনে তুলসীতলায শুইয়ে বাখা বাপের বুকে। আকাশ ভেদী চিৎকার তার। একই সঙ্গে চিৎকারের কোরাসে মা-ভাই-বোন। প্রতিবেশীবা হতচকিত হয়ে যায়। তারা ততক্ষণে টের পায় পিতাপুত্রেব চিরকালেব বিচ্ছেদ তো? ঠিক অতটাই মর্মস্পর্শী হতে হয়। ওদেব চোখেও জল আসে। সবটাই গরীবের চোখেব জল কেউ দাম দেয় না। তবুও তো এক আকাশেব নিচে সবমানুষই এক, চোখের জলও অভিন্ন। বিলাস কেঁদেই চলেছে। হাতের ব্যাগটা ছিটকে পড়ে আছে উঠোনেব এককোনায। তার বাপ শুয়ে আছে একটা নতুন ধারির উপর। একটা পুরানো কাপড় পেতে দিয়ে রেখেছে নিচে। কিন্তু তোষকটা নেই। বিলাস আক্রোশ, ক্ষোভ, দুঃখকষ্ট চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যখন মাটিতে আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন আবারও দেখে তোষকটা বেরই করা হয়নি। প্রতিবেশীরাও যখন দেখে, বিলাস শক্ত এবং স্বাভাবিক অনেকটা। কে একজন বলে উঠে : কিরে বিলাইস্যা, আর কতখন তোর বাপরে হুতাইয়া রাখবি? এইবার আমরা বাইন্দা লাই? তোর লাইগ্যাই আমবা বইয়া আছিলাম।

রাহো কাহা, আরো কাম আছে। বাবারে তোষকটায় শুয়াইলা না? হিডা কই?

তুষকটা একেবারে নতুন। তোর বাপ আইন্যা, তিনদিনও ঘুমাইতে পারছে না। ইডা আর দিমুনা।

না, ইডাও লগে যাইব। বাবারে ইডাতেই শুয়াইয়া শ্মশানে লইয়া যামু।

কস কিতা, তরা কি বড়লুক নাহি? ইতা বড়লুকরা করে। আমরা মরলে ধারিত বাইন্দাই শ্মশানে যামু। হেই চিন্তা আর কোনদিন করিস না। বরং তুষকটা রাইখ্যা দে তোব মা বা তোরা ঘুমাইতে পারবি একদিন। তোব মা-ও হেই কথাডাই আমরারে কইছে?

না কাহা, না। এই জিনিস বাড়িত থাকতে পাবত না। বাবার লগেই যাইতে অইব। কাহা আমরাব আর একটা অনুবোধ রাখতে অইব বাবাবে ছবাব পারে বাইখ্যা পুড়াইবেন না। নদীর পারে লইয়া যাইতে অইব। হেই চেববি ব্রীজের তলায।

বিলাসেব কথায় সবাই মুখ চাওযা চাউয়ি করে। অথচ এই পবিবেশে মৃতের পবিবাবেব ইচ্ছাগুলিব দাম আছে। সবাই-ই মূল্য দেয। সুতবাং পাড়ার কাকার নেতৃত্বে ধনামুনির শবদেহ বাধ্য হযে চলছে চেবাবি ব্রীজেব তলায, নদীর পাবে। বিলাস দেখেছে সেখানেই অবণী শীলকে কয়েক দিন আগে পোড়ানো হযেছে। মবদেহ এসেছে পালংকের মতন খাটে চেপে। তোষক. লেপ, চাদব, অগরু, ওডিকোলন —কী ছিল না? যেন ভদ্রলোক যাচ্ছেন বিযেবাড়িতে ভোজ খেতে। ব্রীজে দাঁড়িয়ে বিলাস দেখেছে সব। ভিড়ের মধ্যে তার বাপকেও দেখেছে সে। শব পোড়ানোব কাজে ব্যস্ত। অবণী শীলেব পোলাদেব ফবমাস খাটছে। তাদেব সবাব চোখেমুখে শোকেব চিহ্ন কম, কিন্তু খরচেব উদারতা অনেক বেশি। তাব বাপই যেন অনেকটা শোকগ্রস্ত। 'ধনা' করে ডাক দিলে ছুটে গিয়ে মাথা নিচু কবে দাঁড়ায়। বিলাস জানে তাব বাপকে ধনামুনি বলেই এ অঞ্চলে সবাই চেনে। এটাই তো আধুনিক যুগেব কৃতদাসেব লেবেল। আজাইরা কাম কবন, যাব কোন মজুরী নাই—বিলাস বোঝে না-এর আসল মানেটা কি? বাপ-ই বা কেন এই অবস্থাটাব শিকার হয? বোঝার উপায নেই। বাপটা তো তাব মর্জিব স্বাধীনতাকে স্বীকার কবে নিতে পারে? কিন্তু করে না। বিলাস ঠিক বোঝে তাব বাপ এক অদ্ভুত চবিত্র। আজকেব যুগে এই ভূমিকার কোন মানে হয়। পত্তিবাদ করিস না? তাইলে খাবি কী?'

বিলাস অবণী শীলের দেহটা চিতায় তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা কবেছে। বড় একটা উৎসব যেন। মরে যাওয়া ও পুড়িয়ে ফেলার দৃশ্যও যে এমন মনোবম হয়ে উঠে বিলাস তা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করে। আগুন ধরে গেছে। ধোঁয়াময় পুবের অঞ্চলটা। নদীব পারে, বালুর চরে চিতা। সেসমযই বিলাস লক্ষ্য করেছে বাপের হাতে কিসের এক বড়রকমের পোটলা। দলাপাকানো। আব সেদিনই বিলাস সন্দেহ কবেছে, যেদিন তার বাপ তোষকে শুয়ে বলেছে, তুইও শুইয়া দেখতে পারস বিলাস—খুব আবাম! এ তোষক কি তাব বাপের পাওয়া? না অবণী শীলের মরদেহের শয্যা? কিন্তু সেদিন তো তোষক আসেনি বাড়িতে? বিলাসের সন্দেহ তখন থেকেই বুকে চাপা ছিল। কাউকে বলেনি, না তাব মাকেও না। বিলাস বুঝে গেছে এখন এটা মরাব তোষক। মরে গিয়ে যাবা শোয়, তাবা এ তোষকেই ঘুমিয়ে থেকে ভাসতে ভাসতে শ্মশানে যায়। আর যারা জীবিত থাকতে শোয় তারা মরার জন্য ঘুমায় এবং ধীরে ধীরে

মরে। বিলাসের বাপ এ তোষকে শুয়েছে বলেই তিনদিনও যায়নি, মরতে হয়েছে। লোভ মোহ এবং এর সাথে আরামে থাকা, গরীবদের সহ্য হয় না। বাপটার সংকোচ ছিল বলেই প্রথমদিন তোষকটা বগলদাবা করে বাড়ি আনেনি। তার ভয় ছিল তারই ছেলে বিলাসকে। তার চোখ আর কথাকে। কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল দু'তিনদিন তোষকটা।

অনেক সময় নিয়েছে শবদেহ কাঁধে করে চেবরি ব্রীজ পর্যন্ত আনতে। সবারই পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। কিন্তু বিলাসের কোন কিছু হয়নি। তার পায়ে কোন ব্যথা নেই। চলার মধ্যে কোন জড়তা নেই। কথার মধ্যে কোন সংকোচ নেই। দ্বিধায় তার মুখ যেন আর কোথাও আটকায় না। সে অনুভব করে সে নির্ভয় এক মুক্ত পুরুষ। তার স্বাধীন চলাফেরা, তার চারপাশ। বিলাস আরো যেতে চায়, শ্মশানটা ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর।

ধূ ধূ করা বালির চরে একপাশে শীর্ণকায়া খোয়াই নদী। অন্যপাশে নিবিড় গাছগাছালি, ক্ষেত, বাড়িঘর। এরই মাঝখানে চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে মধ্যরাতে। তখনই সবাই বলেছে : তোর বাপের রক্ত মাংসের মরা শরীরডা ছাড়া আর কিছু পুড়াইবার নিয়ম নাইরে বিলাইস্যা। বরং তুষকটা কাউরে এমনি দিয়াদে। বিলাস কারো কথা ভ্রূক্ষেপ করেনা। গর্জমান নিচু কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য রেখে একটা আস্ত পুরুষ মানুষ বলে উঠে : আমিই এই নিয়ম ভাঙ্গুম। কারুরে এ্যাইডা দিতাম না। কেউ এই বুঝাড়া বহন করুক, আমি চাই না। আমি এই চিতাতেই অক্ষন ইডা হক্কলের সামনে পুড়ামু!

দুলাল ঘোষ

আঁতুড়

হরিগঙ্গা বসাক এখন একজন রাস্তার নাম। আগরতলার ব্যস্ত সমস্ত একটা পথ। এসময় যদিও ঘরের মানুষ ঘুমিয়ে থাকার কথা। রাত কটা হবে? তার দুইপাশে যতসব দালানবাড়ি দোকানপাট আছে, গভীব বাতে ঐসব বারান্দাও বেদখল হয়। বেওয়ারিশ গরু, ছাগল, বেওয়ারিশ মানুষ তবু ঘুম কি আর হয়? ঘুমের নামে বুক ভাঙে, ভোরের আগে জায়গা খালি করে দিতে হবে।

শুধু কাংরীর কোন দায়িত্ব নেই এখন। সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হাটছিল। পা তুললে স্তম্ভ, ফেললে ঢল। নিচে জল পাথরও নরম লাগে তাব, ভাল লাগে। আর আলো ধুয়ে ধুয়ে আজ একেবারে হযরাণ হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে জেব্রা অন্ধকাব—ঝড় ঝাপটা, কনকনে বাতাস। যেন আলোব জ্যোৎস্না গলে খানাখন্দে নূতন ধন্ধ হযেছে।

কাংবীব পিঠে পাছায় ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমকায়। সে নিষ্কম্প হাঁটে। সঙ্গে একটানা আঘাত করার শব্দ ও এইমাত্র কানেব ভিতর কিছু জল ঢুকে পড়লে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। চোখের চুল বেয়ে ঢল নামে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কত সময়। অর্থাৎ মুখের ওপর বৃষ্টিপাত বেশি পায। ক্রমশ কষ্ট হয় তার। একেবারে অসহ্য হলে আবার তাকায়। এইবার চোখের পাতাগুলি একফালি রোদের মতই হেসে ওঠে—কাবণ সামনে আরেকটি নেড়ি কুকুরেব বাচ্চাকেও দেখা যাচ্ছে। ভিজে একসা। তাবপব নর্দমা ঘাঁটা-ঘাটি করতে থাকলে—

চিত্রকথা সিনেমা হলের ঠিক উল্টোদিকে যে ল্যাম্পপোষ্ট দাঁড়িয়ে আছে, তার নিচে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা যত আবর্জনা জড়ো করে। এই আলো আবর্জনা আর বৃষ্টির মধ্যে এখন কাংরীও ভিজছে। কিছুই তো নেই, শুধু একটা নর্দমা এবং কয়টা ডিমের খোসা ভাসতে থাকে। বড়সড বৃষ্টির ফোটা পড়লে আবার গা থেকে গা আলগা হযে পড়ে খোসাগুলি।

বুকের ভিতব শূন্য হয়ে পড়ে। তখন জয়বাংলার যুদ্ধ। একদিন মা তাকে কানে কানে বলেছিল—তোর তো তেরো বছব বয়স হয়ে গেল তবু বাঁজা, আমাদের পরিবার থেকে তুইই যা বাঙ্কারে। প্রথমে কথাটা সে বুঝতেই পারেনি—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল জগদ্ধাত্রীর দিকে। শালি কয় কিতা! শুনছি বাঙ্কার থাইক্যা রোজদিন গণ্ডায় গণ্ডায় শাড়ি ব্লাউজ ছায়া হাবিজাবি কতকিছু ছুইড়া মারে ওরা। তারপর গাছ সাইজ্যা পরিবারের জিনিস খুইজ্যা লইয়া যায় জয়বাংলার মানুষ। কিন্তু আমার একটাই মাত্র জামা। নিচে পেন্ট পর্যন্ত নাই।

সেদিন জলজংলার পাশে সে কি তার চোখগুলি বন্ধক রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে, দুই হাত ও বুকে ঠোকাঠুকি, শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল? না। এখনওতো হাত ধরে হ্যাচকা টান দিলে—দাঁত কপাটি আলগা হয়ে পড়ে তার।

সে মাটিতে চিৎপাত শুয়ে পড়ে।

কাংরী হাসেও। মরণরে অত সহজে মেনে না নিলে—এতদিনে সে তো মরেই যেত। তখন জামার নিচে সাধারণত প্যান্ট থাকত না তার। এইভাবে নাই নাই ভাবটা আমার শরীরে সবসময় জিইয়ে রাখতো মা। আর তাড়া দিত কেবল। আরেকদিন অন্যমনস্ক হাঁটতে হাঁটতে, পেছনের জঙ্গল ধরে, অনেকক্ষণ ধরেই সে একটা উইটিবির উপব দাঁড়িয়ে পুঁইগোটা বঙ দেখছিল আঙুলে—বেশি দিন থাকে না। থুতনিটা বুকে ঠেকিয়ে রাখলেই লোলের সূতো জড়িয়ে যায়। কিন্তু এত কাছে এসেও কেন বাঙ্কারে ঢুকতে পারছিল না কাংরী এবং কোন কিছু করতে না পারার যে কান্না আছে, তাই দাঁড়িযে দাঁড়িযে কাঁদছিল। অনেকটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললেই ঠিক হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফলও মিলল। দেযালেব উপরেই একটা বন্দুক চিৎকার করে উঠল—হল্ট! এবং আমিও তখন দুইহাত গাছেব উপরে তুলে ধরেছিলাম কেমনে কেমনে। তারপর সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ভিক্ষা মনে হবে—

তবে ওদেব যে জল-বাতাসাব চল নেই আমি জানি। ওবা তেলেভাজা রুটি আব তরাকারি দিল আমাকে। মগ দিয়ে একমগ জল দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু পরপব দুইটা ঢেকুর উঠে গেল আমাব। স্বাভাবিক আমি আর সান্ত্রী একে অন্যের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। তাবপর হাত ধরাধবি করে ঢুকে গেলাম বাঙ্কাবে। সবাই আমাব জন্যেই অপেক্ষা করছিল। একজন বয়স্ক লোক বলল—কুত্তো কা মাফিক নেহি, আদমি কি তরা, সামালকে সামালকে।

বাঙ্কার তো আসলে জঙ্গলই, গুহা, বালুর বস্তা ঘেবা। তখন ত্রিসন্ধ্যা হবে। স্যাতস্যাতে জলজংলা, ক্রমশঃ তার পিঠে পাছা ও মাথার চাপে কয়টা বনগাঁদাফুলের গাছ থেঁতলে গিয়েছিল, ঔষধি গন্ধ ও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল কাংরী।

দুই

সেই ব্যথাটা এখন আবার তলপেট থেকেই শুরু হয়। তাবপর বৃষ্টির দাপট কমে এলে তবু পিনির পিনিব পড়ছিল। বাস্তাব আলো ক্রমশ স্পষ্ট হযে উঠছে। তবে ক্যাকটাসের বলেব মত। আরেক জাযগায় সে খামচে ধরে রযেছে নাভি, চোখ মুখ কুঁচকানো, তাই ছুঁচোব মত অস্থিব হযে পড়েছে এখন। একটু নুযে নাবালিকাটি তাবপর আগবতলার কোন গলির ভেতর ঢুকে গেলে, কানাগলিব শেষে পোড়োবাড়ি থাকে একটা। এটা বাজাব দেশ বলেই আমরা জানতাম। এখন গলিব মাঝামাঝি একটা আলো লক্ষ্য কবে। বৃষ্টি থেমে গেছে। উপরে তারা, আরেকটা জলে ভিবি পাতা উড়ে উড়ে কাংবীব পাযেব কাছে পড়লে সে শিউবে উঠে, এবং একদিন বুঝতে পাবে ব্যাটামানুষেবাই সব, মেযেবা কিচ্ছু না—নিজেব বলতে তাদেব শুধু ক্ষুধা আর হজম করাব শক্তি আছে।

আঃ! পাযের দুই পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্তই তড়িৎ ব্যথা। অথচ সে কেন পেটের কাছে নুয়ে পড়ে আছে শুধু? আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস! যেন তাব ইচ্ছা অনিচ্ছাব কোন মূল্যই নেই। সেই যে বাংলাদেশী—যে তারে একদিন গভীর রাতে সীমান্ত পাব করে দিযেছিল—লোকটা ভাল ছিল না মন্দ—এখনও তেমন স্পষ্ট নয় কেন? মনে হয় নিজেব বাপকে অন্তত মেয়েবা সন্দেহ করতে শিখেনি।

লোকটা ফাঁক পেলেই আমার শরীরে খাম্‌কা খোঁজাখুঁজি করত। আমিও ভাবি বুড়া তুই খুঁজতে খুঁজতে কি পেয়ে যাস দেখি!

আরেকদিন আখাউড়া বর্ডারে, আমরা এমনি বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে। বাবার লুঙ্গির খুঁটে আট দশটা জিওল মাছ বাঁধা ছিল। পথে আধমরা এক নদীর শরীর থেকে আমি আর বাবা খপাখপ ধরে নিয়েছিলাম। তখনও আঁঠালি মাটি —চিহ্ন দু এক জায়গায় লেগে রয়েছে আমার। বিশেষ কবে ঘন বোমকূপগুলিতে কামড়ে ধবে ঝুলছিল। কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগছিল টানটান। স্বাভাবিক আমিও অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি কয়জন পুলিশ ভাবী বন্দুক ঝুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। এসবের সঙ্গে যথেষ্ট পবিচয় এবং অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও এখন আমি আৎকে উঠেছি কাবণ আচমকা ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়ার মতই হঠাৎ আমাকে কে ঠেলে দিল এপারে? হাসির রোল উঠল। আমি একটা লুলি, তাকিয়ে দেখলাম—আমাদের জিওল মাছ, বাবার লুঙ্গিব খুঁট সবই এখন ধরে রেখেছে পুলিশ। ফাঁকে ফাঁকে তাদের পানলাল জিহ্বা দেখা যাচ্ছে। তাই ভয়ে পেছন ফিবে দেখি—আরো এক নাগা সন্ন্যাসী যার চুল দাড়ি সবই সাদা—পড়িমরি করে তিরিমিরি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ এই লোকটাকে আমি বাবা বলে ডেকেছি, এজন্যে যে যুদ্ধের পরে তিনিই তো আমাকে বাঙ্কার থেকে টেনে বের করে এনেছিলেন। তাছাড়া বাবাদের শরীবে আব কি জিনিস আলাদা থাকে? তারপব থেকেই আমরা হাঁটছিলাম। উনার তিন তালাকেব ছয বউ, একটিও মেয়ে অবশিষ্ট নেই. সবই বাঙ্কারে গেছে। তাই যুদ্ধের পবে কেবল আমরাই এখন মুক্ত। শুধু হাঁটছিলাম আর মাঝে মাঝে মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম। বুড়ো মানুষ—বেশি দোষারোপও কবা যায় না। একদিন এমনি বাবা আব মেয়ে একটা গাছেব নিচে শুয়ে গল্প করাব মত তিনি আমার পাছায় হাত বাখলেন, বললেন—তুই কিন্তু ইণ্ডিয়ায় গিয়ে, সাবধান কোন ক্যাম্পে উঠবি না। তাহলে আবাব ঠেলে দেবে এপারে।

—চাচা. আমাব মায়েব কি হবে?

—মা মারাইছ না বেটি, কত বাঙ্কার খুইজ্যা যে তোরে পাইছি—

—আইচ্ছা আইচ্ছা। ইণ্ডিয়ায় কিতা কামকাজ আছে নি চাচা? গরু গোয়াল?

—ভর্তি ভর্তি গোলা। তর কোন চিন্তা নাইরে।

তিন

তারপর পুলিশেরা যখন আমাকে মুক্তি দিল, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ায় ঢুকতে দিল, তখন আমি ক্ষেতের আলজমিন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি মাত্র। মনে হয়েছিল যেন শূন্য একটি শ্মশান, সদ্য আগুন নেভানো গন্ধ চারিদিকে, কাংরী কোনদিকে যাবে ঠাহর কবতে পারছিল না—চুলার দিকে নাকি নদীর দিকে! ভ্যাবাচ্যাকা দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। পরে বুঝতে পেরেছিল—নূতন চিতা একটা জ্বলে উঠেছে তার পেটে। বাংলাদেশে রাজাকার বা খান সেনারাও তাকে মাঝে মাঝে বাসি রুটি দিত, ফলে এখনও দোয়া মাগার মতই তার হাতদুটি কাংরীর আগে আগে হাঁটতে থাকে।

বয়স কত হল কাংরীব? বর্ডার পার হয়ে এসে রাতের বেলা একসময় সে

একটা বড়সড় বাড়ি দেখে ঢুকে পড়েছিল। খানে খানে অনেকগুলি পেট্রোমাক্স জ্বলে। কালো মস্ত মস্ত মটকা। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই—বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আর রাবণের চুলাও মনে হয় তত বড় নয়। শুধু ধান সেদ্ধ হচ্ছে। পুলি পিঠার গন্ধ কিন্তু ললিত গুঁড়ওতো একসময় অসহ্য লাগে। এবং নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সামনে যত দূব চোখ যায়—সবই তাদের উঠান, ধান শুকানো হচ্ছে। পালা করে কাজ করে সবাই। একদল খায় তো আরেক দল ঘুমায়, একদল ঘুমায় তো আবেকদল কাজ কবে। কোন কথা নেই। আমিও একটা লাইনে বুদ্ধি কবে ঢুকে পড়েছি। আব টুকরি টুকবি গবম ধান নিয়ে ফেলতে হবে আবেক জায়গায়। একসময় একটার পর একটা হাই উঠতে থাকল। কী কবব আমি? লাইনে লাইনে এসে এবাব খাবার ঘবে ঢুকে পড়েছি। লঙ্গর করে কলাপাতায় খেলাম আমরা। বয়স্কবা চলে গেল একঘবে। কমবয়সী মেয়েবা একঘরে। তারপব সব বয়সেব বেটামানুষেবা পালা করে আসতে থাকল। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লে অন্যঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পবদিন অনেক বেলা করে উঠেছি আব সর্ব অঙ্গে ব্যথা। বাড়িব বুড়া মালিকের সঙ্গে পবিচয় কবিয়ে দিয়েছিল সর্দারনি। থুরথুবা লোকটি সত্যিই ভালা মানুষ। প্রথমেই মা ডাকল আমাকে। ওবাও নাকি বাংলাদেশ থাইক্যা আগরতলায় আইছে। তাবপব দুঃখ কইবা কইল—ছিলাম ভারতবাসী, পাকিস্থানি হইলাম, তাবপব বাংলাদেশী, অখন আবার ইণ্ডিয়ান। কাংরী যদিও কথাগুলি কিছুই বুঝে উঠতে পাবেনি তবু একটা চোবা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। পরে বুইড়া বেটা, তাব পিঠে হাত বাইখ্যা কইল—তুই তো কচি মাইয়া, আমার ইখানে ধামবা বেটি না হইলে কোন কাম অইত না।

কী আব কবা যাবে। মনেব দুঃখে কাংরী এবাব বাস্তায় বাস্তায় হাঁটতে থাকে। একদিন হঠাৎ ভি এমন হাসপাতালের সামনে তার কিনার ঘেইস্যা একটা বিকসা দাঁড়াইল। মেয়েটাবে আমি চিনছি। নাম ভটলি, ঐ বড় বাড়িতেই দেখেছিলাম। আব রিকসাওয়ালাটা হইল পবাণ, তাব আসিক। সে জিগাইল—কাম কববিনি? কাংবী উত্তর দিল না। তাবপব কইল—একটা ইট ভাট্টা আছে। সে মনে ভাবলো—বহু দূব থাইক্যা দেখছি—খুবই উচা, জাহাজেব মত ধূয়া উড়ে! ভটলি একটু সইরা বইল, কাংরী উঠল। তারপব আসাম আগরতলা রাস্তা ধবে নিজেকেই প্রশ্ন কবল—কই যাইতাছি? তখনই ব্রেক কষল পরাণ, ওবা নামল, ভিতবে ঢুকল—এখানেও লঙ্গব খানা দেখি! সারি সারি লোক কাজ করছে। শুধু পরাণ ভটলি ওরা এত লীলা খেলায় ব্যস্ত এখন, দুই এক কদম পিছিয়ে পড়ে কাংবী হাওয়া। তারপর থেকে রাস্তায়—চিকনি ভটলি, কুটুম—কত বেটা বেটিরে দেখলাম কামের নামে কুকাম কবাইল। তাও সে চইল্যা যাইতে আছিল বেশ। হঠাৎ কইরা সে আবিস্কার করল—ভাদ্রর শেষে আশ্বিনে যেমন কুত্তিব শবীবে ফুল ফোটে—তেমনি কাংরীও এক্কেবাবে ফুইট্যা গেছে গিয়া! সে পালিয়ে বেড়ায় এখন।

দেশের বাড়িতে থাকতে মা মাঝে মাঝে দিদি পিসীদের নিকাব বাতচিৎ কবত। লক্ষ্য করত কাংরী—তারে নিয়া অবশ্য নাকের শ্বাসটুকু ফেলতো না কেউ। কিছু একটা কমি নিশ্চযই ছিল। এখনও একগাছা সুতারনাল নেই শবীবে। এইটা যদিও অন্য গল্প। আসলে তার নিচের অংশ শরীর ঢাকতে গিযেই পরনের জামা ধরে

সবসময় টানাটানি করত। সেটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে একসময় নাভির উপরে ওঠে। তারপর আরো উঠতে চাইলে টেপ জামাটা খুলে একদিন ড্রেইনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর যে কয়দিন গেছে, সবসময় সূতার জাল লেগে রয়েছে ভেবে অস্বস্তি হত।

এখন আর কোন দুঃস্বপ্ন নেই। সব বাতাসই তার গা সহ্য লাগে। প্রতিদিনের ধূলো বালিতে লোমের গোড়াগুলি আরো শক্ত হয়েছে—সাধারণ কাঁপাকাঁপিতে আর কিছু ভাবে না বা ভাবায় না। শুকনো গোবর এবং মাটির চট্টা লেগে বয়েছে। এখন কোনমতে শুয়ে পড়তে পারলেই হল বা ওরাই শুইয়ে দেয তারে প্যাক কাদায়, ঝামা, পাথরে, টিলা টংকরে। আহা কতদিন একটা তক্তপোষ চোখে দেখেনি। আর একবার শুয়ে পড়তে পাবলেই আর উঠে দাঁড়াতে পারে না, যদি না মাযা করে কেউ তারে টেনে তুলে দেয়। তখনো টইল্লায় কিছু সময়। তারপর সবই সহ্য হযে যায়। আর যদি নরম মাটির মধ্যে পায়ের ছাপ রেখে চলে যায় কেউ? এখন শুধু মাছি উড়াউড়ি কবে যেখানে তাব মুখ গহ্বব। কিছু খুচরো, কটা অচল পয়সা রেখে যে যাব চলে গেলে—

কাংবী নিজে নিজেই উঠে বসতে চাইছে। পিঠ দেখাচ্ছে বারবার। আবার চিৎ হয়ে যাচ্ছে। তার পাশে ছোট্ট একটা নালার দুই পাড়ে পা দিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে কাংরী। জলে স্রোতস্বিনী আলো দেখে, শ্রাবন মাসের বৃষ্টি। তখন দিদি তারে দেমাক কবে বলেছিল—তোর কি রক্ত যায় মাসে মাসে? সেদিন কোন উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু আজ? যদিও তার আগেই ত্রিভুবন দেখা শেষ কাংরীব। এখনও সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না—এই শুরু, নাকি শেষ? যাই হউক নালাটার দুই পাড়ে পা দিয়ে এখন সে দেখছে—অন্য কোন উৎস থেকে একটা অচেনা, অথচ বড় আপন প্রপাত, জলীয় শব্দ করছিল জলে, যেন নিজেকে এখন খুবই জীবিত মনে হচ্ছে। এমন কি নিঃশেষিত হয়ে যদি, শুধু পোষাক আসাকই পড়ে থাকে—তবু বোধ হয় সুখ। কাংরী স্বপ্ন দেখে।

চার

গলিব শেষে বহু পুরোনো একটি দৈত্যবাড়িব এক অংশ ভেঙে অনেক দিন হয় এপথ বন্ধ হযে গেছে। ইয়া লম্বা লম্বা ঘাস। পোষা বৃক্ষগুলিও এতদিনে বন্য হয়েছে। বুড়ো তেতুল গাছটা বোদে পুড়তে থাকলে কানাবাদুড় সব অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকে যায। খানে খানে চুণ সুবকির ঢিবি। ভাঙা জানালা দিয়ে মোটা কৃষ্ণচূড়া বেরিয়ে গেছে একটা। একটুকরা শিকড়ে মাথা রেখে এখন টক্কা, অইরা, তারপর কাংরী শুয়ে থাকে।

—অইরাবে, রোজ রোজ রাতের বেলা তুই যাছ কই?

অইবা হাসে। দীর্ঘ ব্যবহারে এখন অন্ধকাবও অনেক সহজ হয়ে গেছে। দুই জাতেব ক্ষুধা আছে তার। সে একই সাথে দুইটাকে দমন করতে পারে ইদানিং। কিছু পয়সাও বেঁচে যায়। হালকা হাওয়া লাগে। পুৎ পুৎ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে অইরা। যতসব নিশক্তির কুযুক্তিতে সে নেই। তাছাড়া ছোটজাত ছোটঘরে তাব জন্মও মনে হয না। তাহলে কী মনে হয় আপনার? অইরা রাগ করে। ভিংলাইয়া

ভিংলাইয়া চায়। মনে হয় মানে মনে হয়। যেমন শুধু অইরার নিচেই এখন একটা সুপারীর খোল আছে, শুকনোমাটিতে ফু দিয়ে মুড়ি চিড়া খেতে ভাল লাগেনা তার। রোজই চান করা, চুল আঁচড়ানো এসব বাতিকও আছে। মাঝে মাঝে গাছেব গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চান দেখা, অইরা বলে—আমি সমুদ্র দেখিনি কোন দিন। অথচ বাকি সব কাজই তার পশুদের মত। যেমন জালালি কবুতরের মুণ্ড ছিড়ে রক্ত। এমন আর কি। আবার সবই সে হাসতে হাসতে করে। মুখটা হাড়ের উপর তেলতেলে চামড়া। একটাও লোম নেই, লম্বাটে। মেয়েদের মত মাঝখান দিয়ে সিথি পাড়ে!

—আমার মা বাপ কে হইতে পারে, ক চাই দেখি তোরা? অইবাব কথা শুনে টক্কা খুক খুক হাসে। জানলা দিয়ে গম্বুজগুলি দেখায়। তখন অইরা ভাবে—হতে পাবে আমি রাজ-বংশী। আবাব ভাবে কার বক্তে দোষ নাই? এক মন্দিবের পুরোহিতকে সে চেনে, লোকটা গোপনে গোপনে কবিরাজী কবে, সহরের সব কর্তাব্যক্তি-দের বাড়ি ঘরে যৌবন-বটিকা না কি যেন নাম, সাপ্লাই কবে লোকটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হতে পাবে. এদেবই অপকর্মের ফল হতে পাবে অইবা—কথাটা সে বিশ্বাস করে। তবে পালিয়ে বাঁচাবও যে একটা প্রবৃত্তি তাব আছে—সেটা কাব বক্ত? কোন সম্প্রদায ভিত্তিতে কি তাব বিচার কবা যাবে?

এইরকম বাতাসের জন্য হা করে থাকলেই বোঝা যায় অইবা অন্যমনস্ক। তাছাড়া শুধু কি আর বাতাস—তার গুড়িগুড়ি অগুনতি পাখাও আছে। ঘরেব ভিতব এই অন্ধকাব। হঠাং হা-মুখে এক দঙ্গল মশা ঢুকে পড়লে, দ্রুত ঢোক গিলে অইবা।

অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তার শরীবে একটা পবিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দুই চোখ ঠিকরে জলেব তোড় বেবিযে আসতে চাইছে। আসলে বাঁচতে চাইছে অইবা, মানুষ হালে। তবে তার কোন লিঙ্গ নাই। সে একটা পাইড়া বেটামানুষের প্রতি বড দুর্বল। এবং বেটাবা বেটি দেখলেই—খালি কেন্নায়। আহা টক্কাব গোঁফদাড়ি, এমনকি বুকের লোম পর্যন্ত নাই। কিন্তু ঢাউস গুড্ডিব মত ছিনা আছে। নিজেব মুঠো হাতটাকেই এবার আংটিব মাপে মেলে ধবে, ভাবে এব বেশি নিশ্চয়ই বড হবে না টক্কার কোমর তবে নিচের দিকটা পুরো পাথুরে—বাতাসে বাতাসে কাটা। পাযেব দুইটা থাবা যেন চেপে ধরেছে পৃথিবী। অইরা আবো বুঝতে পারে এই মাটির মতই সহনশীল হতে হবে তারও—নইলে কলসি ফুটো করে একদিন ঠিক চলে যাবে আমাব প্রেমিক।

বুকের দেযালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়, মুচডে মুচড়ে ওঠে কান্না, আব পাবে না, আচমকা চিৎকার করে ওঠে—মবার পরে আবার জন্ম হয়নি গো বাবা? তুই কোন শালার শালারে?

ত্রিপুরার রাজবাড়ির বাইরে যে নহবৎ মঞ্চ আছে, তার পাশেই ফুটপাত ঘেঁষে একটা ডাস্টবিন—সেখানেই একদিন নাকি তার জন্ম হয়েছিল, লছমীর কাছে শুনেছে। তাই এখন সে আবার স্বস্থানে হাত দেয়, নিজের ত্রুটি খোঁজে, পাপ পায়—তার বা পূর্বপুরুষের। ফলে আবর্জনা ভর্তি মিউনিসিপ্যালিটির লম্বা গাড়িটার জন্যে সেদিন তার অপেক্ষা করতেই হত, যতক্ষণ পর্যন্ত না গামবুট পরা একজন লছমীর কোদাল তারে শূন্যে তুলে নেয় এবং সে কেঁদে ফেলে। আরে না না। সে কোন মাটি খুঁড়ছে না এখন। তবু ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে ওঠে শরীরে। দিনের মধ্যে কতবার যে এমন হয়। নিজেকে আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না, তার হাঁপানী আছে।

এইভাবে ক্রমাগত ক্রোধই কি ক্ষুধার সুড়সুড়ি? কোন উত্তর নেই। তাই অন্য কোনো মানুষের মুখোমুখি হলেই চোখে চোখ বিঁধে রাখা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে অইরার। লোকে বলে তার চোখের পুতলিগুলিতেও নাকি ধর্ষণকারীর ভূত নাচানাচি করে। আর মানুষ মাত্রই চোখ নামিয়ে ফেলা স্বাভাবিক।

তখনই খুব কাঁদতে ইচ্ছে হয়, মানুষের জন্যে মায়া হয়, নিজের জন্যেও কষ্ট হয় তার—মৃত্যুর পরে আত্মা যেভাবে আর প্রিয়জনের শরীর ছুঁয়ে দেখতে পারে না।

পাঁচ

আমাদের আগরতলা শহরে সে পালিয়ে বেড়ায় অন্য অন্য কারণে। এখানে গুর্মা হিজড়াদেরও একটা সংগঠন আছে। সম্পাদক শ্রীদাম দাসী, সভাপতি রতিরমণ। এবং অইরারে দেখলেই ওরা মারে। এইতো সেদিনও গোলবাজারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল। আর হাঁটু দিয়া তলপেটেই বেশি মারে ওরা। দুই তিনটা কিক মারার পরেই মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তবু সে যায় নি। ওরা বাড়ি বাড়ি যায়। গুর্মা নাচে গায়। এসব তার ভাল লাগে না। যেমন ভিক্ষা না দিলে পরনের কাপড় খুলেই ওরা ছেলে খেলা করে।

একটু আগে যদিও তার যৌনতার অজুহাত ছিল অন্ধকারে একদঙ্গল মশা গিলে ফেলা, এখন আবার ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে ক্রমশ ভিজে উঠেছে মাটি। পাকা গয়ামের গন্ধ ফুটে ওঠে তার শরীরে। হাতের কাছে টক্কাও আছে—যে তারে বিষ্ঠার চেয়ে বেশি ঘৃণা করে। কিন্তু উপায় নেই আরো ধৈর্য্য ধরতে হবে তার। আপাতত দুই দাঁতে একটা না একটা ঠোঁট কামড়ে ধরলেই কাম হবে। তারপর একই কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে অইরা।

—কালো মোটা ঐ দোকানদারটার সাথে তোর কি সম্বন্ধ আছে রে?

অইরার হাতে কিছু পয়সা আছে এখন সে বিড়ি টানতে থাকলে গাঁজার বিচি ফাটা শব্দ হয়। শালার বেটা দোকানদার—দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকলে ভুড়িটা মাটি ছোঁয়। প্রথমে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় প্রণাম করে অইরা, তারপর যত্ন সহকারে বেটাদের লিঙ্গ নিজের মুখে নিয়া কসরৎ করতে থাকে। তার বড় বেশি ক্ষুধা। সে দাঁত ও জিহ্বা দিয়া অনবরত কসরৎ করতে থাকে। অবশেষে দুই জাতের ক্ষুধাই একসঙ্গে নিবৃত্ত হয়।

ছয়

সর সর শালা খচ্চর। কৈ থাইক্যা একটা উলুমভোস আইয়া উঠছে। টক্কার গোসা দেখে অইরাও নানানে বিনানে শব্দ করে। ফিস-কারি মারে কাংরী।

আমার টাক্কালটা কাছে থাকলে প্রথমেই গুর্মার গলা ফলাইয়া দিতাম আমি। টক্কা পাশ ফিরে শোয়। আসার সময় মাইল্যাটারে যে কই ফালাইয়া আইছি। কিতা অইব ইতান দিয়া। শুকনা গাছের ডাল হাত দিয়াও ভাঙা যায়। আর জ্বালানী জড়ো কইরাই বা লাভ কিতা—দানা কই? পাইড়ারাতো অনেকদিন ধইরাই মাইট্যা ইন্দুর হইছে। শিকড়বাকড় খাইয়া বিষ বেদনায় মরতাছে। তাছাড়া ত্রিপুরার পাহাড়ে কোটি

কোটি সুড়ঙ্গ শুধু। জুম নাই, জল নাই, গাছ গাছালি, এমনকি পাখির পালক পর্যন্ত কুড়িয়ে পাওয়া যায় না।

যাই হউক দীর্ঘসময় একপাশে শুয়ে থাকলে, তারপর পাশ ফিরলে ছাতের শরীর থেকে মাকড়সার জাল, এখন ছিন্ন হয়। সূতা ছিড়ে মাকড়সাও টক্কার শরীরে কম্পন সৃষ্টি করে, চঞ্চল হয়ে পড়ে টক্কা। তার মনে পড়ে কাংরীর নর্দমা শরীরটাকে যেদিন টানতে টানতে এইখানেই তুলেছিল, সেই থেকে অইরাও টক্কার সাথে আর কথা কয় না। কেন? বুকে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। কদিন ধরে তাব মাথাটা বড় ভাব। কদিন ধরে কাংরীর বুকে পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে—এই এট্টু আট্টু আদোল আদোল। কাংরী ছাড়াও শরীরে অন্য কেউ কেউ আছে মনে হয়, নদীর মত ছলবল করে উঠে হঠাৎ হঠাৎ। টক্কা শুনেছে—কোন সময় ঘুমেব মধ্যেও নাকি বন্যা হযে যায়। ভয় বাড়ে। কোন দিন তার দুই কূল ভাসিয়ে কি চলে যাবে কাংরী? স্যাতস্যাতে মাটিতে পুরনো পাতাব মত সেও কি মাটি হয়ে যাবে? তারপর একটা চিমটে ধরে টক্কাব কঙ্কালটাকে বাইবে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসবে অইবা। টক্কা ঘামে তারও তলপেটে খিল ধবে এখন। সে আরো নিচে হাত দেয়—সবই অর্থহীন মনে হয তাব। যেমন পাহাড়ে জঙ্গলে পশু পাখিব সাথে কিছু মানুষও বেঁচে থাকে। পৃথিবীটার আদি বাসিন্দা তারা। লংতরাই পাহাড়ে সেই ঝর্ণা জলেব ছিটা এখনও তার সম্বিৎ ফিবায। সেইদিন সে একটা টিলাব পেটে বসেছিল। ছাই মাটির শেষে জুমটিলা। পোড়াজমিব সবখানে তখনও নূতন পা পড়েনি। ছোট ছোট ছাই উড়ছে। আধমবা একটা ঝর্ণা জলের গুড়া—যতটা পারে ভাবি হযেছে বাতাস. টকাই জামাতিয়া আজ শহরে যাবে। টং ঘরেব লোকগুলি অবশ্য এর বিন্দু-বিসর্গও জানে না, নিচে আসাম-আগরতলা, একবার পা পিছলে গেলে মুশকিল আছে। সাপটা মাঝে মাঝে নড়েচড়ে। দু-একটা বাস যায়। ছাদভর্তি মানুষ। টকাই কিন্তু অপেক্ষা কবতে থাকে মাল মানুষ ছাড়াই শূন্য একটা লবীব। কারণ সে তো আর বিদায নিয়ে যাচ্ছে না শহরমুখী ভিড় সহজে মেনে নেবে।

তাব পবনে ধুতিব মত করে এক টুকরো মার্কিন কাপড ছিল। আবেকটা হাফহাতা নিমা। আগবতলাব মটরস্ট্যাণ্ডে নেমে সে কোন দিকে যাবে ভাবতে না ভাবতেই কামান চৌমুহনীব ফলেব দোকানগুলিব সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দুই পাশে ডাবেব ছড়া ঝুলে আছে দেখে খুবই তেষ্টা পেযেছিল তার। ঐ পর্য্যন্তই মনে আছে। তারপব তো একেবারে হতভম্ব অবস্থা। দিনদুপুরেই একপাল বন্য কুকুর ছেকে ধরল তারে। সে আঁৎকে ওঠে। তবে আওয়াজগুলো একেবারেই অন্যরকম ছিল। ঘেসঘুস যত নরক নরক শব্দ। আর পাইড়া ল্যাবা লোলা ইত্যাদি যেন খই ফুটছিল—মকাই। তারপর পেচ্ছাপের উপক্রম হলে, একজন পুলিশ এসে, একটি অশৌচ গরু লম্বা লাঠি খুঁচিযে খুঁচিয়ে ফুটপাত পার কবে দিয়েছিল।

তারপব অবশ্য সে আব বুক-শহরে যাওয়া আসা কবে না বেশি। কাংরীও তাবে কোনকিছু কিনে আনতে পাঠায় না বা কোন কিছু বেচতে। কারণ টক্কারে দেখলেই মানুষ বেশি বেশি দাম রাখে বা খুব কম দাম দিতে চায় জিনিসের। তাছাড়া সে কোন কামকাজও খুঁজে পায়নি। শুধুই পাইড়া ল্যাবা লোলা ইত্যাদি শব্দগুলি ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকতে থাকে মাথায়। মনে হয় আমাদের মুখ ও ভিতরের

জড়ভরতটাই এর জন্য দায়ী। এমন কি কান্নায় যখন উল্টোমুখি বুক ভাসে তখনও লোক দেখাতে পারি না আমরা বা যখন লাথি মারার কথা তখনই পা দুইটা শেওড়া গাছের জড় হয়ে যায়। টক্কা ভাবে এজন্যে কে দায়ী—আমরা নিজে, নাকি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ভগবান বা প্রতিপালকেরা?

মোদ্দা কথা হল টক্কা এখন এই খশুহরে আছে আর শিষ্য হয়েছে সে কাংরীর। কেবল ফরমাস খাটাখাটি করে, পোদ্দারি। আসলে যৌথ জোগার থেকে চলে টক্কাও।

আর সারাদিনে একবার মাত্র কুশল জানতে চাইলে অইরার চোখে যাবতীয় আগুনই নিভে যায় সে দেখেছে। ডগমগ করে ওঠে নপুংসকটা। তারপর গহন বনের মতই আপনমনে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কাংরীর চোখগুলি ইদানীং ঘোলা ঘোলা। যদিও স্বপ্নপাখিটা এখনও উড়ে যায় নি। তবু চুলেব জল ঝেড়ে ফেলার নামে বারবারই সে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তাই টক্কাই একমাত্র প্রহরী এখন জেগে বসে আছে। এবং অন্ধকাব শিয়রে বটের শিকড ছুঁযে ছুঁযে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে এইমাত্র। বিকাল হয়ে গেছে। ঘরে ফেবা কিচিব মিচিব শুরু কবেছে পাখিরা। সূর্য চলে গেলেও তাব শরীরেব গন্ধ রয়ে গেছে মবা বোদে। এখন শূন্য টক্কা স্মৃতির খলই খুঁজে আর একটি দাডকিনা মাছও পায় না। চোখ তুলে দেখে—আবার সেই বাজবাড়ির গম্বুজটাই চোখে পড়ে যেদিক থেকে যেদিকে। সে শত চেষ্টা করেও তাব পূর্বপুরুষেব মুখ মনে কবতে পারছে না এখন। অথচ মজাব কথা হল—যখনই স্মৃতি এবং চোখ বুজে পিতৃপুরুষের মুখগুলি খোঁজার চেষ্টা কবে. তারা—জলের মত কাঁপতে কাঁপতে এসে স্থির হয়ে দাঁডিযে পড়েন বাজা। আশীর্ব্বাদি হাসতে থাকেন। কিছুটা অস্পষ্ট হলেও তার সঙ্গে আছেন রাজপুরোহিত চন্তাই।

সাত

এর বেশি স্মৃতিব সুড়ঙ্গে ঢোকার কোন ইচ্ছেই নেই তার। তাছাড়া রাজায় প্রজায় ভেদাভেদ পায় না সে। প্রজাবাও তো রাজা হইছে—কিতাই এমন আর উল্টাই লাইছে। কম দেখলাম না তো। থুক কবে বিড়িব টুকরাটা ছুঁড়ে দিল। অবশ্য তার আগেই তো চর্তুদশ দেবতা, রাজা, চন্তাই—সবই একবার একবার মনছবি দেখা শেষ। শেষমেষ একটা বুড়া বরাকবাঁশ, নিঃসন্তান, টক্কার চোখের সামনে তার কঞ্চিগুলি কেবল দুলছিল। কচি কাঁচা বাঁশ খুব স্বাদ। তার গন্ধ এখনও পাগল করে টক্কারে। বাঁশ পূজাও করে তারা।

হাই উঠল একটা, তারপর আরেকটা। এবার বারান্দা থেকে সে ফিরে আসবে কি আসবে না করছিল। কাবণ গাছের পাতার সঙ্গে শরীরের রঙও মজে যাচ্ছে পলকে পলকে। ঘরের ভেতরে আগুনের কুণ্ডলীটার কথা হঠাৎ মনে হতেই ফিরে আসে সে। তাদের সংসারে এই একমাত্র আলো এই চুলা দিনরাত জ্বলে। যেন তিন তিনটে প্রেতের প্রাণ থাকে এইখানে, কেউ দুষ্টুমি করে জল ঢেলে দিলেই ব্যাস—সব খেলাব শেষ। সেই কৃষ্ণচূড়ার শিকড়ে সে আবার শোবে এখন। তার ঠিক আগে আধশুয়ে ভাবে—কাংরী আর অইরা—দুই মেরুর দুইটা একসাথে কই গেল গিয়া? মাথাটা তখনও শিকড়ে নামিয়ে রাখতে পারেনি। হুড়মুড় করে ওঠে সিংহদরজা। যেন যাবতীয় পথ বন্ধ করে আরো এক প্রস্থ ছাদ ভেঙে পড়ল। ছিলা

ছিঁড়ে টান টান দাঁড়িয়ে পড়ল টক্কাও।

এই ঘরে মাত্র তিনজন কেন—একসাথে দশটা মানুষও ঢুকতে পারে এতবড় দরজা। টক্কা সিনেমা দেখছে, নাকি স্বপ্ন? একজনের হাতে ছোটমোট একটা বন্দুকও আছে। আর লোকগুলি কোন কথা বলছে না এখন। জলের মত কাঁপছে তাদের কালো রঙের মুখোশ বা টক্কাব নাইয়ের গোড়াও হতে পারে। কোন ফাঁকে যে বন্ধুবা এসে তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল কবেনি। এখন বড় প্রশ্ন হল—আমাদের প্রাণের আগুন তো নিভে আসছে ক্রমশ—তাতে সঞ্চয় দেবে কে? তখনই ফস করে জ্বলে ওঠে ঐ লোকগুলোর হাতে দেশলাই কাঠি। আবার নিভে গেল। এক মুহূর্ত। বাপ দাদার নাম মনে পড়ছে না যদিও। তার আগেই ভোমা বিড়িধরানি জ্বলে ওঠে লুক্কা। মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে টক্কা অইরা আব কাংরী। অপরপক্ষে আলোব নিচে একটা হাত দেখা যাচ্ছিল শুধু।

বুট জুতার মচমচি শব্দগুলি তারপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বন্দুক পকেটে পুবে তিনজনেই সিগারেট ধরালো একই দেশলাই কাঠির আগুনে। বর্মা নামে একটা লোক বলল—কমরেড, ডাকলেও কিন্তু ওদেব সাড়া পাওয়া যেত না। তাছাড়া এটা তো লোকালয় নয় রে ভাই। শ্রমেব কোন প্রশ্ন নাই এখানে। শ্রেণী বিন্যাসও না। শুধুই ঘাটের মরা আছে কযটা। প্রকৃতি আছে জালালী কবুতর এবং তক্ষকেব ডিম। এখানে আর যাই হোক—কোন সংগঠন হয না। একটু আগে কে যেন হাই তুলেছিল একটা! সেটাই এখন সংক্রামিত হল সবার মধ্যে। ঘোষণা হল —ঘুম পাইছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে আগুন নিবু নিবু অন্ধকাবেব জীবগুলিও কী করছে বোঝা যাচ্ছে না। ইনারা শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক এক কবে তিনটা সুখটান দিযে ফেলে দিলেন আজকের দিনগুলি।

তিন তিনটা আগুনের ফুলকি মিলিযে গেল বাতাসে। কিন্তু মুশকিল হল পুলিশেবা জোনাকি পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে এখন জরুরী অবস্থা।

ওরা ঠোঁটে আঙুলে ইশারা করে—চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকতে হবে। কোন বকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই। আশ্চর্য্য, এখানে অন্য অস্তিত্বের কথা কি ভুলেই গেলেন আপনারা? এই বাড়িটাতে কোন চৌকাঠ নেই তাই অনুমান হয ওবা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যত উপেক্ষা অভিসন্ধি বিদীর্ন করে কয়টা স্বদেশী বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। মনে হয় কোন দলামোচা টিনের ভিতর একখণ্ড গাছের শিকড় ঢুকিয়ে ঢন ঢন ঢন। তাবপব দাঁতাল তাড়ানি শব্দেব সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতও শুরু হল এখন—আউর মারো, কাৎলা মারো, আউর মারো বোয়ারি! পুলিশ পুলিশ। শেষমেশ অইরা নাকি এই আর্তনাদগুলি শুনেছিল। তারপব সব ঠাণ্ডা। এখন হাতড়ে হাতড়ে একমুঠো গোবর গুড়া খুঁজে পায়, ছুঁড়ে মারে—আহা, প্রাণটা আবাবো চিরবির করে ওঠে। অনেকটা ঘর আলোকিত হয়। সবই ঠিকঠাক মনে হয় নিজস্ব আছে। উপরে বন্ধু মাকড়সা, নিচে ছেঁড়া জাল ঝুলে ছুঁযে যায়। এক এক করে আবার শুয়ে পড়েছে ওরা গাছের শিকড়ে। আবার অইরার মানব জন্মের আকাঙ্খা ভূতগ্রস্ত হবে। আবার ভীত হয়ে পড়বে টক্কা—ফাঁক পেলেই কাংরীটা তারে ছেড়ে চলে যাবে। কিরকম জানি ধুচুনুচু শুরু করেছে কদিন ধরে। জেগে থাকলে জানালার পাশে কৃষ্ণচূড়ার ডালে গিয়ে বসে থাকে। শুয়ে থাকলে পাশ ফিরে শোয়, এমন

সময় আকাশে একটা চাঁদ উঠলো, যেন ঘুম থেকে উঠল কাংরী, আড়মোড়া ভাঙলো ও চুটি মেরে হাই তুললো এটা দুইটা—এই লোকগুলোকে ঘুমে গুতা দিতে হবে।

—টক্কারে তক্ষকের ডিম আছেনি আর?

—নাই।

কাংরী খিল খিল করে হেসে উঠে—আছে, বেটামাইনসের ডিম আছে দুইটা।

—কাংরী শুনছসনি?

—কিতা?

—তুই যাইছ না।

—আইচ্ছা, আনন্দমেলা দেখাইবেনি ক?

—দেখিছ।

আট

বুকটা হু হু কবে ওঠে কাংরীব। কান্নাগুলি যেন ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়েছিল। টক্কাব মুখেব ভাষাও বড় অপবিচিত লাগে। তবু, তবু মিছিমিছি এই পিছু ডাক তাব ভাল লাগে। তালেব রসের মত ভাবি হয়ে ক্রমশই বুক বাডছে তার। বাচ্চাকে দুধ দেযার মত উন্মুক্ত হতে ইচ্ছে কবছে। কথা শুনে মনে হচ্ছে টক্কাও এইবার আমাব আবু হতে পারে। আরো আবো নুযে পডতে পারে কাংরীও। দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জীবনে এই প্রথম তাব কাছে কেউ কিছু চাইল। অথচ সে কিছুই দেবে না টক্কারে। এখান থেকে চলে যাবে। কাংরী স্বপ্ন দেখে—

শাড়ি পবা কাংরী, সে অন্য কোনখানে চলে যাবে। এখন পায়ের নিচে ঠাণ্ডা নরম ঘাস. কাংরী ছুটতে থাকে, তাব আলতা পরা পা। ছুটতে ছুটতে ঢল নামে সে টেব পায। তাব পাযের পাতা একটু বেশিমাত্রায় মাংসল এখন। চিহ্ন ছড়িযে পডছিল নবম ঘাসে।

ফলে পা পিছলে পড়েও যায় কাংরী। পড়ে গিয়ে লাভই হল তাব। স্বপ্নমগ্ন পতন। দুইহাত দশ নখে এখন সে খামচে ধরল এঁটেল মাটি। তাতে সদ্য গোবরগুলে লেপাপুছা শুরু করে দিল সে—মস্ত উঠান, দাওযা দেয়াল। শেষে তেল-সিঁদুরের ফোটা দিয়ে আমপাতাগুলিকে ঝুলিকে বাখল চৌকাঠে।

—এই কাংরী, তুই বাববাবই কই ফিসকাইয়া যাছ গিয়া লো? তোর কিতা কোন ঠিকানা আছেনি?

আবেকটা অস্পষ্ট নদী সাবাবক্ষণ কাংবীকে পেঁচিয়ে রাখে। তন্ময় হয়ে কোন কিছু ভাবতে গেলেই পায়ের কাছে তাল পডাব অভ্যাস আছে তার।

এমনি আরেকদিন সন্ধ্যা বেলা—ঢেউ-এর মত দ্রুত কয়টা নৌকা এসে ঘাটে লাগল। কয়জন খানবাহাদুর নেমে এল। দ্রুত ধরতে হবে অথচ পথ পিছল। একই সঙ্গে মায়ের হাত থেকেও কেরোসিন কুপিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর জলে ঝুপ করে শব্দ হল একটা। আবার অন্ধকার।

স্বাভাবিক ভাবেই আগুনের কুণ্ডলীটাব দিকে এখন আবার চোখ পড়ল কাংরীর। ঘরময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। এই স্যাতস্যাতে মাটি সাপ সাপ। শুকনো পাতার আগুনে গোবর গুড়া ছুঁড়ে মারে অইবা। লেলিহান শিখা তার ঠোঁটের কোণে—গনগনে হাসিটা

দেখে ভয়ে আঁৎকে ওঠে কাংরী। নিজেরই হাত পা হাতড়াতে থাকে। ফলে অদ্ভুত এক পরিবর্তন খুঁজে পায়—সত্যি সত্যি নারী হয়ে গেছে নাকি সে? কি যে নোংরা পরিবেশ। এখনই স্নানের ইচ্ছে হয় তার! টলটল পরিষ্কার জল চাই।

—সব আছে, সব দিমুরে, তুই যাইছ না।

—ছাড় ছাড়, শালা পাখিব ডিম-খাওরা, ইতর—

—যা চাই তোর, সবই দিমু আমি দেখিছ।

—ছাড়, আমারে ছাইড়া দেরে টক্কা, আইজ রাইত অইব।

—কাংরী, খুব খিদা পাইছেনি তোর?

—মর মব।

এমনসময একজন মানবীব যাবতীয় স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়—আঁচল খসে পড়ে। বিশ্রীভাবে ব্যবহৃত মনে হয় বুক। যদিও তাব শবীবে অনেকদিন ধরেই সূতার নাল পর্যন্ত নাই। এখন আবাব অন্ধকাব। ঘামে কপালে চুলের গোছা লেপ্টে রযেছে কিনা কে জানে? কাংবী শান্ত। প্রতিটি ঝড ঝঞ্ঝাব পবে তো মেয়েবা স্বাভাবিক উঠে দাঁড়ায, বাইরে যায়, আবাব ফিবে আসে। তবে কাংবী আর আসেনি।

নয়

ঘরেব ভেতর কিছু জোনাকি ঢুকছিল চুপি চুপি। আবেকটা গোববা পোকা হঠাৎই অস্থির ভোঁ ভোঁ শুরু কবে অইবাব চাবপাশে। বেশ নাদুস নুদুস। তডপানিও ভালই লাগছে তাব। হলে কি হবে—বাববাবই ছক ভাঙে, বারবারই সে ছক কাটে অতি গোপনে। একাই সে তাব ঈশ্বব এখন। একবাব, অন্তত একবার একটা মানব জন্মেব কল বানাবে সে। কোনবকমে অতি ধর্ষিত একটি যোনি জোগাড কবতে পেবেছে। আবেকটি ক্রীতদাসের লিঙ্গ। শালাব শালা নিবীর্য কিনা তাও জানি না। ঐসব যৌনরোগী বনজবভূমিব কাছ থেকে তুমি কী ফল কামনা কব?

—বিষ্ঠাব পোকাবা শোন! কোন কামনা বাসনা নয—আমি একটি পুরুষ বানাব। পূর্ণ দৈর্ঘ লিঙ্গ চাই আমাব। একটি বীজ। প্রকৃত বীর্যবান।

এখন টক্কাব শবীবেব প্রতি তাব যাবতীয দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যমনস্ক হয় অইবা। আমাব কি কোন উত্তবাধিকাবী থাকতে পাবে না? গোববা পোকাটা বেশ বড ও ভারী। উদভ্রান্তেব মত বাববাবই অইবাব ভুডি ছুঁযে দিচ্ছিল। তবুও আগুনেব আঁচে, তাব গনগনে হাসিটা ঠিক আছে। এবং অস্থিবতা ইত্যাদি খুবই উপভোগ কবছে অইবা। পোকাটা একসময থপ কইরা মাটিতে বইসা পডে।

দশ

বছব বছব বেশ সুন্দর আনন্দমেলা চলছিল আগরতলাব চিলড্রেনস পার্কে। গতকাল চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। কে একজন নাকি খুন হযেছে। চারদিকে পুলিশ। তবু অন্যদিনের মত আজও হরিগঙ্গা বসাকে উপচে পডছে ভিড়।

চিত্রকথা সিনেমা হলের ঠিক উল্টো দিকে ডাস্টবিন, যে রাস্তা দিয়ে সেইদিন রাতে কাংবী চলে যাচ্ছিল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, এখন দাঁড়ায। কত শত ধ্বজভঙ্গ পুরুষ দেখে। ওরাও যেতে যেতে কাংরীকে দেখছিল। সে নিজে পোকাকাটা হলেও

কিন্তু লোকগুলোকে দেবতা জ্ঞান করে, গনেশঠাকুর। এতদিন কে বাঁচিয়ে রেখেছে? কাংরী গড় করে। শুধু টক্কার কথা মনে হলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কেন সে কি করেছে?

—ও দাদাবাবু, সোনামামা, পিসাগো, মৌসা তোমরা শোন—শালার শালা টক্কা আমার আশা নদীতে বান্ধ দিছে। রুটি রুজির পথ বন্ধ কইরা দিছে এক্কেবারে।

ভিড়গুলির স্বভাবও ঠিক পিঁপড়ের মত—চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে, গলা উঁচিয়ে একটুখানি উঁকি দিয়ে আবার চলা। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই যে বাদলা দিনের মত: আজও তো নর্দমা লক্ষ্য করছে কাংরী! আরেকটা বুড়া কুত্তা দুই পা পাড়ে দুই পা ডুবে। সিনেমা হলগুলির আশেপাশে যে কয়টা খানাপিনার দোকান আছে, গভীর রাতে তাদেরই পুষ্যি কুকুর বেড়াল, যত উচ্ছিষ্ট ভোগের পরেও যা পড়ে থাকে, বাসনমাজে যে বেটিটা—খুটে জড়ো করে এনে ঢেলে দেয় এই নর্দমায়। ভাতের রোয়াগুলি কিন্তু ডোবে না। কালো প্যাক কাদা থল থল করে। এখন ল্যাম্পপোষ্টের নিচে নর্দমার কাছাকাছি যতই সে নামিয়ে আনতে চাইছে মুখ, ততই একটা অস্বস্তিকর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। সাদা পুতির মত ভাতগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে কাংরী আর দেরী করে না, একটা ঝাপ দেয়। এইবার তার শরীর মাপের যতটা খাদ্য তলিয়ে যাবে তো যাবে। বাকিটা অন্তত খুটে খুটে খেতে পারবে সে। একবার ছলকে উঠে আর নর্দমার ঢেউ নেই এখন। বেশ অর্দ্ধেক ডুবে রয়েছে কাংরী। নিচে হাত পা পর্যন্ত কল্পনা করা যায় না, পাড়ে দাঁড়িযে কয়টা গলা ভাঙ্গা কুত্তা শুধু ঘেউ ঘেউ করে।

সব দেখে শুনে এইবার সে পাখির মত দুই ঠোঁটে অন্ন খুটতে শুরু করে। পুট পুট করে আওয়াজ হয, সঙ্গে জলীয় ভাব। বাংলাদেশে নদীর পাড়েই তাদের বাড়ি ছিল। ছোট ছোট এক জাতের মাছেদেব গল্প শুনেছিল কাংরী। ওরা দলে চলে। তাদের দাঁতগুলি ক্ষুরের চেযেও বেশি ধার। হাতিও যদি সে পথে পড়ে —সব বেটাকেই সাবাড় করে দিতে পারে ওরা। এবার কাংরীও যতটা ডুবে রয়েছে নর্দমায় তাব সবই ঠিকঠাক আছে মনে হয়।

সাদা সাদা মধুফুলগুলির মধ্যেই এখন তন্ময় হয়ে পড়েছে। আসলে একাগ্রতাও একধরণের ধান্ধা। দেখতে দেখতে নর্দমার প্যাক কাদাও যে কোন ফাঁকে মা বনে গেল। অসংখ্য বিষ্ঠাপোকার জন্ম দিযে চলেছে ক্রমাগত। ছোট ছোট লেজও আছে তাদের হঠাৎ করে ধরা যায় না। কাংবীর পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

এগার

পাখি উড়ে যাওয়ার পর ইদানীং মাঝে মাঝে বাজারে যায় টক্কা। নূতন কিছু কথা শোনে। নাসবন্দী, ইমারজেন্সী ইত্যাদি। একদিন কাঁচা মরিচ বেচইন্যা বেটা টক্কার কান টাইন্যা নিয়া কইল—ইতান বাদ দে, ছুন্নত শুনছসনি ক? তবু টক্কা হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকলে, বেটাটা এমনই জোরে ধাক্কা দিল—শালা, রফিক আলিরে জিগা গিয়া যা।

রফিক মিঞা খুবই আদর কইরা তারে কাছে বয়াইলে, প্রথমে মুখ টিপ্পা, তাবপর হাইস্যা কইল—দুইটা দুই জিনিস রে ভাই। নাসবন্দী অইল—তোর একটা

পথ বন্ধ কইরা দিলে আর বাইচ্চা অইতনা, খুইল্যা দিলে আবার অইব। আমারে দেখছ্না—আমি তো কত টাকা পয়সাও পাইছি, কোন বিষ বেদ্নাও নাইরে।

টক্কার বেবাইট্যামি শুনতে শুনতে এখন অইরাও লুটুপুটু খায়।

—ইতান তো বেটা যত নিবীর্য মাইনষের কথা। আমার কিতা? সেই নপুংসকটা আজ আবার খরার দিনে এমনই একটা বানের খবর লইয়া আইল—দেখ গিয়া, তোর মাগিটা মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেমনে ভেংচি কাটে!

কাংরী চলে গেলেও কিন্তু এই খশুহরে একজন বনকর্মীর মতই চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে সে রাত কাটাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। কুণ্ডলীর ওপারেও যে একজোড়া হিজড়া চোখ তারে সারাক্ষণ পাকে পাকে বিঁধে রাখে—টক্কা জানে। খুবই সতর্ক থাকে সে। আর অবসর পেলেই শালির খিলখিল হাসি। আচমকা কথা চড়াই পাখিব মত এখনও শরীরে তুষ ওড়ায়। গরম লাগে। ঘাম হয়। রুটির জন্য আজকাল রিকসাও চালায় টক্কা।

সকাল বেলা থেকেই আজ গা গরম তাব। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তবু ভূতের মুখে খবর শুইন্যা আর স্থির থাকতে পারেনা। কান ঝা ঝা করে। ঠাণ্ডা বাতাস বলতে যত পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। কত ভয়, সাপের গাথায় হাত ঢুকিয়ে কাংবীর মন পাওয়া ইত্যাদি।

এখন আর একটুও সময় নষ্ট কবেনা। এক দৌড়ে বেরিয়ে যায় সে। —কাংরী তাইলে বাইচ্যা আছে দেখা যায়!

বারো

বেটিমুখা বেটাটা এইবার খশুহর থাইক্যা বাইরইয়া গেলে গিয়া অইরা আবার তার স্বস্থানে হাত রাখে, বিড়বিড় করে—

—কিযের লাইগ্যা যে কথাটা কইতে গেলাম টক্কারে? কাংরী চলে গেলেও কিন্তু শালার শালা আমারে এক্কেবারেই পুছতো না। রাইত দিন আগুনেব ভোম্বা একটা সঙ্গে রাখতো সবসময়।

—এর লাইগ্যাই তো রে শালার শালা, তোরে খববটা দিলাম দেখ গিয়া যা —তোর মাটি মাগীর শরীর থাইক্যা কেমনে ইন্দুরে ধান লুইট্যা পুইট্যা ঝাঝরা কইরা দিছে।

একজন টিপরা বেটার প্রতি এত লোভ থাকলেও কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষেব প্রতি তার অভিযোগ নেই। এই সমাজটাকে সে ঘৃণা করে। পবিবর্তনেব নিজস্ব চিন্তা ভবানাও আছে তার, একটা কাবখানা। মানুষ বানানির কারখানা গডতে চায় অইরা।

তার ছকটা কি আবারো মাঠে মাবা পড়ল? সে কারিগর রইল ঠিকই, কিন্তু খড় মাটি ছন বন নাই আর। অনেক কষ্টে এক জোড়া কবুতব জোগাড় করেছিল সে, দুইটারে জিতা রাখছিল খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া। আব ডিম পাড়ার ঠিক আগে উইড়া গেল গিয়া। জীবনে এই প্রথম একজন উত্তরাধিকাবীর শোকে সে কেঁদে ফেলে। কিছুতেই শ্রীদাম দাসী আব বতিবমণের কাছে ফিরে যাবেনা। তাইলে কি করা এখন? একটা আধলা ইট অনুমান কবে আস্তে আস্তে বসে। কোমরের প্যাঁচখুলে

বিড়ি আর দেশলাই নেয়। আবার কি মনে করে সে হাঁটুর উপর হাত রেখে বারুদ বিচি ধরে বসে থাকে কত সময়।

তেরো

ফাল্গুন মাস। বিকেলের শেষ রোদে তেমন তা নেই, শুধু রাতে একটু শীত শীত করে। আজ ম্যাটিনীসিনেমার মানুষই বেশি ভিড় করেছিল পোষ্টাপিস চৌমুহনীতে —সেই নর্দমা থেকে ঘটনাটা বেশী দূরে নয়।

দেখোরে! দুইটা কাঠি দিযে এবাব নিজের পেটেই ঢোল পিটাতে থাকে কাংরী। তার নাকমুখ ফুঁড়ে দলা দলা গরম শ্বাস সাপের জিহ্বার মত তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে আসছিল বোঝা যায়। খুব গোঁসা। সে দীর্ঘ মাইট্টল নখগুলি দিয়া অনবরত আঁচড় কাটতে থাকে বা ঢোল পেটাতে থাকলে—দেখোরে শালার বেটা টক্কা—আমার স্বপ্নচোখ উপড়ে নিল বাদুড়ে, তার রক্ত খাই আমি। সত্যি হাতের কাছে যা পায় এখন তাই গিলে খাচ্ছে কাংরী। বিশেষ করে এখন উড়ে আসা যত গাছের পাতা ও পায়ে পায়ে শিকড় জাতীয় সবকিছু। আবেকদলা গলিত গোবর মুখে পুরে দিলে ট্রাফিক পুলিশও হেই হেই করে ওঠে।

কাংবীবে, খুব খিদে পাইছেনি তোব?

—মর মব। তাব চোখের পুতলি দেখেই বোঝা যায়—এখন আর মানুষ থেকে মানুষ আলাদা কবতে পারে না কাংবী। ফলে বাতাসেই বিষ ছুড়ে দিচ্ছিল সে। হাতেব চেটো ও আঙ্গুলগুলিব অবশিষ্ট গোবরে বালুমাটি মাখে এইবাব। তাবপর লম্বা জিহ্বা দিয়া শব্দ কবে আচাব চাটতে থাকে।

এই দৃশ্যটিকে বাঁশে বালুতে কডকডি শব্দ করে ওঠাব মত কিছু একটা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে পথুয়া পোলাপানও ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। হেই হেই করে ওঠে ট্রাফিক পুলিশ। শুধু কাংবীকে কেউ ধবে রাখতে পারে না। বৃত্তেব ভেতরে বুড়িছুঁই খেলার মত ছুটোছুটি করতে থাকে— মার মার, টক্কাব মাথা সই কইরা মার। চিৎকাব করতে করতে এইবাব সে তাব পবিণত পেট তুলে ধবে জনসমক্ষে। অথচ উড়ন্ত আধলা ইটগুলি এসে পড়ে তাবই মাথায। পিচকারী দিয়ে রক্ত। এক্কই—শব্দ করে মাটিতে বসে পড়ে সে।

—কাংরীরে ওঠ ওঠ— ১. ২, ৩, ৪, ৫...। সে পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে কিন্তু তার সামনে এসে দাঁড়ায়নি টক্কা। গায়ে হাত দেয়নি।

চোদ্দ

সতীর দেহ নিয়ে শিব যখন খশুহরে এসে পৌঁছল, তখন আবার অন্ধকার। সদ্য রাত হয়েছে। আগুনে টায়ার পুড়া দিছে অইরা। বল্কা বল্কা ধোঁয়া তাছাড়া ঘাড়েও তার ভীষণ ভার লাগছে। হাঁটু দুইটার খিল খুলে যাচ্ছে। কাংরীকে আবার ফিরিয়ে আনা গেছে। ফলে ঘরময় এখন কেবল গোঁসা, কালো বল্কা বল্কা। এরই মধ্যে লোম পোড়া একটা শূয়র নামিযে রাখার মত—প্রথমে লেজ, তারপর ফটাশ কইরা মাটিতে ফেলে দিল টক্কা। এছাড়া আর কোন শব্দ হল না। এবার একটা বিড়ি লাগে! কিন্তু টায়ারের তীব্র ঝাঁঝ গিলে খায় সে। বমির ভাব করে। সেই

কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়ে এখন গায়েগায়ে টক্কাও শুয়ে থাকে অন্য কারণে। আবার কি পাহাড়ে ফিরে যাওয়া যাবে? টাক্কালের একেকটা কোপ, আর কয়টা মাত্র বীজ পুতে বিড়ালের গু লুকোনোর মত এই জীবন—শুধুই আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকা আর ভাল লাগে না তার। এখানে আর কিছুই না হউক, প্রচুব জলের ব্যবহার আছে, পেট ভরে ঢেকুর তুলে আগরতলা শহরে ঘুমিয়ে থাকাও অনেক ভাল।

যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। কে জোর কবে তার চোখের পাতা এক করে দিচ্ছে। বড় ভয়। অইরাটা কই? শুযে পড়েছে নাকি টক্কারই পাশে? খপ কবে যদি ধরে ফেলে? আর না ছাড়ে? কাংবীটাও ভীষণ বোকা। খালি উচাটন কবে, হাতের একটা পাখি যে বনের দুইটা পাখির চেযে অনেক ভাল, বোঝে না।

তখন তারে নিয়া খণ্ডহবে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ দাঁড়িযে পডেছিল টক্কা। চিতাব চাবপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো কি? নডাচড়াও করে কালোর মধ্যে সাদা সাদা। হলকাগুলি আবার উড়ে উড়ে আগুনে পুড়ছিল। আসলে তাদের চাবপাশে ছড়িযে ছিটিয়ে ছিল জালালী কবুতবেব পালক, ছাল চামড়া ইত্যাদি। অইবার গোসা এমনই। সবই লণ্ডভণ্ড কবে ফেলে। কয়টা নারকেল ঠুলিও আছে তাব নিজস্ব। গোপন লবন, মরিচের গুড়া ইত্যাদি সবই গড়াগড়ি যায় এখন। ছাদেব শবীর থেকেও ঝুব ঝুর চূণ সুড়কিব বৃষ্টিপাত চলে। এবং কানের কাছে হঠাৎ এক ঝড়বাতাস বয়ে গেলে, আতঙ্কে চিৎকাব করে উঠে বসে পড়ে টক্কা, ভযে কাঁপতে থাকে—মা তক্ষকটা প্রতিশোধ নিতে আসেনি তো? না। শালা, কানাবাদুড় সব ঘব করেছে এখানে।

পনের

কাংরীর শিওযের পাশে সেই আগুন আবাব নিবু নিবু। কিন্তু হাতেব কাছে এতটুকু জ্বালানী পায় না টক্কা। অন্ধকাব যত বাড়ে আবো অস্থিব হযে পড়ে সে। অইরাটা গেল কই? কথা কছনা কেবে লো কাংরী?

কিছু সময এইভাবেই কাটে। অল্প আলোয় এক দৃষ্টে তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকে টক্কা। এবার কার শরীব কাঁপছে—ওর না আমার? আবো ঘনিষ্ট হয। সন্দেহ বাড়ে। আশাও জাগে।

—জল খাইবিনি লো কাংবী?

দাঁতে দাঁতে বিকট শব্দ করে ওঠে। আবেকটা হাত এসে পড়ে টক্কার কোলেব কাছে। তীক্ষ্ণ নোংরা নখ। একজন বযস্কা মাকড়ি কোনরকমে বেটাটার নাভি খুঁজে পায়, আলতো হাতায়, হঠাৎ খামচে ধরে।

—ছাড় ছাড়।

গাছ-হরিণীর শিং। এইবার কোন দিশা মিশা নাই, টক্কার পেটের ভিতরেই গুচ্ছমূল ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

—আমারে ছাইড়া দে। টক্কা কাঁদতে থাকে। আগুনের ধারে কাছেই হাতড়াতে থাকে কেবল। বগলের রগগুলিও এখন মনে হয় ছিড়ে যাবে, তাই শেষবাবের মত সে শিথিল হয়ে পড়ার আগে আর ছুঁইতে পারে না কিছুতেই। একসময় একখণ্ড ঘর্মাক্ত কাঁচাকাঠ, তার ধোঁয়ার গন্ধও পায, পেয়ে যায় টক্কা। উন্মাদ হয়ে যায় আর

কি! এলোপাথাড়ি ছেকা দিতে থাকে কাংরীর চোখে মুখে। —মা তক্ষক এইবার অন্তত ছাইড়া দে আমারে—

ভেতরে ভেতরে অনেকক্ষণ ধরেই ছাই হয়ে যাচ্ছিল কাংরী। এইবার বেশ জোরে বাতাস বইছে খণ্ডহরে। বাতাসই কথা কইছে। তাড়াতাড়ি সঞ্চয় পুড়ে আগুনও নিবু নিবু এখন। শুধুমাত্র শুকনো ছায়া একটা কোথা থেকে উল্টে পাল্টে এসে কাংরীর তলদেশ থেকে একখণ্ড মাংসপিণ্ড কোলে তুলে নিল ঝটিতি। ছেড়া তেনা গামছা দিয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলল। আবারো ·'ড়িমসি করে উল্টে পাল্টে একই দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এল এই খণ্ডহর থেকে।

রাস্তায় নেমে এসে অইরা দেখল একটা ল্যাম্পপোষ্ট। তার নিচে দাঁড়িয়ে প্রথমেই যত ভাবী জল সরিয়ে সরিয়ে মাংসপিণ্ডটার শবীরে কোনখানে লিঙ্গ আছে নেড়েচেড়ে দেখল, একটু সময় ধবে থাকল, ভালোইতো। তারপর স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে মিলিয়ে গেল ভিড়েব মধ্যে।

অনুপ ভট্টাচার্য

জলোচ্ছ্বাস

ব্যাপারটা ঘটে গেল কালই। রাজধানী শহরের ক'জন লোক পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে মাটির এবড়ো থেবড়ো পথ ধরে লাল মারুতি নিয়ে গাঁয়ে ঢুকল। ঢুকে প্রথমেই খোঁজ করল কোন বাড়িতে থাকেন অনিন্দ্যসুন্দর।

আর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হরবচন। এই হববচন এখন ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া সরকারি ছাতার আড়াল থেকে শক্তিধর হয়ে ওঠা গ্রামেবই এক যুবক। তাব সম্ভ্রম মেশানো 'দাদু মশায় দাদু মশায়' ডাক শুনে বাইরে বেবিয়ে এলেন পয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই অনিন্দ্যসুন্দর। দেখলেন, হববচনের সংগে ক'জন লোক. কাপড় চোপড়ে বেশ সম্ভ্রান্ত। শহুরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলেন প্রৌঢ়।

ওবা এগিয়ে কাছে এসে নমস্কার করতেই ভ্যাবাচেকা অনিন্দ্য যেন হুঁস ফিরে পেলেন। প্রতিনমস্কার করে ডেকে নিলেন ঘরে। পাটি পেতে মেঝেয় বসতে বললেন আন্তরিক ভাবে।

মিটিং-এর মত গোল হয়ে বসলেন তারা। কথায় কথায় জানালেন, সবাই এবা শহরেব নামী দামি লোক। এসেছেন, অনিন্দ্যসুন্দরের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য স্বীকৃতি জানাতে। মাস দেড়েক পরে সরকাবের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের দশজন সেরা গুণীকে রাজধানীর টাউনহলে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর রয়েছেন সর্বাগ্রে। তাদের বক্তব্যে তাঁর নামটা এল বাব বাব ঘুবে ফিরে। একজন তো হরবচনদের লক্ষ্য করে বীতিমত বক্তৃতার ঢঙেই শুরু করলেন, কমরেডস, চেয়ে দেখুন এই মানুষটিকে। বহুকাল আগে উনি পার্টির কালচারেল ফ্রন্টের হয়ে কাজ করে গেছেন নীববে। নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু কাজই করে গেছেন। বিনিময়ে কোনো চাহিদা ছিলনা জীবনে। কালচারেল ফ্রন্টের এই গণসংগীত শিল্পীব নামটাও বোধহয় আজকাল অনেকে জানেন না। তিনিও অনাদৃত হয়ে পড়ে রযেছেন গাঁয়ে। কিন্তু আমরা তো তার এতদিনকার গানের মধ্য দিয়ে জন জাগরণেব সাফল্যকে খাটো করে দেখতে পারি না। আজকে পার্টিব সাফল্য সরকারে আসা—সবই এইসব নিঃস্বার্থ প্রবীণ কমবেডদের জন্যে। তাই বছবের সেরা দশজন মানুষের মধ্যে উনি আজ পার্টির নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত। আসছে বর্ষপূর্তিতে শহরেব টাউন হলে ইদানীংকার বিদ্বজন সমাবেশে এই বিশ্রুতপ্রায় কমরেড শিল্পীকে আমরা আমন্ত্রন জানাতেই এসেছি।

এই মুহূর্তে কী রকম একটা লজ্জা মিশ্রিত আনন্দে আপ্লুত হয়ে নতমস্তক হয়ে রয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেয়া নেমন্তন্ন পত্র হাতে নিতেও কেমন যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। হাত বাড়ালেন যখন, হাতটা তখন কাঁপছে রীতিমত। আনন্দে ডগমগ হয়েও অসীম বিনয় নিয়ে ভাবছেন, সত্যিই সম্বর্ধনা পাবার যোগ্য লোক কি তিনি? কী এমন করেছেন জীবনে।

কাল বিকেল থেকেই এই তল্লাটে যেন কদর বেড়ে গেছে অনিন্দ্যসুন্দরের। একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু করেছে তাঁর কাছে। বুড়ো শিবতলায় দোকান পাটে পার্টির অফিসে কেবল তাঁকে নিয়েই চর্চা। এদ্দিন বুড়ো লোক বলে যারা তাঁকে ফালতু ভেবেছে, দেখেও দেখেনি তারাই কৌতূহলে বলাবলি করছে, আরে আমাদের গাঁয়ে এরকম একজন গুণী মানুষ রয়েছেন জানা ছিল না তো! একবাক্যে এখন সবারই মনোভাব, সত্যি—আমাদেব সকলের গর্ব এই অনিন্দ্যসুন্দর।

হরবচন তো এখন সকাল সন্ধ্যে দু'বাব করে আসতে শুরু করেছে। তার চেলা ক্ষেপা নিতাই অনিন্দ্যকে ধবে আজ পার্টি অফিসে নিয়ে এল। গোল জমায়েতে বলল, আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাকেই দাঁড করানোর প্রস্তাব রাখবে সে পার্টির কাছে। সম্বর্ধনা পর্ব চুকে গেলে অনিন্দ্যসুন্দরেব এগেনস্টে অপজিশন পার্টি ক্যাণ্ডিডেট দিতে ভয় পাবে। মনে মনে হাসেন অনিন্দ্যসুন্দর। রাতারাতি তাব যেন একটা পুনর্জন্ম হয়ে গেছে। আজকাল শ্যামলীরও একটা রূপান্তর লক্ষ্য কবেন অনিন্দ্যসুন্দর। তার চালচলনে এক সশ্রদ্ধ বোধ।

এই মাত্র গোয়াল ঘব থেকে দুধ দুইয়ে দ্রুত গবম কবে এক গ্লাস দুধ হাতে করে সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামলী। মিষ্টি করে বলল, দুধ টুকু খেয়ে নিন বাবা। তারপর দীর্ঘদিন ধরে যা করেনি তাই করে বসল, কুশল সংবাদ জানতে চাইল সে, বাতেব ব্যথাটা খানিকটা কমেছে কি বাবা? আজ আপনাব ছেলে ফিরলে বলব ডাক্তাবকে বলে মালিশ তেলটা যেন এনে দেয় আবার। হঠাৎই আবার অনুনয়ের গলায় বলে শ্যামলী. এই ক'দিন সন্ধ্যার দিকে আর বাইরে না-ই বা বেরোলেন বাবা। এই শেষ হেমন্তের বিকেল গুলোয় বাইরে কী রকম কুয়াশা পড়তে শুরু করে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পাবে।

সব কথাই বুঝতে পারেন অনিন্দ্যসুন্দব। তবু বড় ভাল লাগে। যে দিনগুলো বড্ড ফ্যাকাসে ক্লান্তিকর দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছিল এদ্দিন, এখন সেইগুলো যেন বড় বেশি বেশি উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে।

আমি সমঝে চলব। ভেবো না বৌমা। বিছানায় চোখ বুজে আরাম করে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুমিনিট হবে বোধহয। শ্যামলী ঘর ছেড়ে বেরিযে গেছে মাত্র, হই হই কবে ঘবে ঢুকল শঙ্খ। ঢুকেই দাদুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল যেন। এখনও শুয়ে রয়েছ দাদু? পার্টি অফিসে যাবে না? হরবচনদা যে দু'দু'বার লোক পাঠিয়েছে। জবাব দিলেন না অনিন্দ্যসুন্দর। তার দিকে চেযে মৃদু হাসলেন। এবার কাছে এসে শঙ্খ তার হাত ধরে টান দিল। চল দাদু, পার্টি অপিসে যাবার আগে রোজদিনকার মত কিছুটা বেড়িয়ে আসি।

সদ্য কলেজে পড়া এই একমাত্র নাতিটির প্রতি অনিন্দ্যসুন্দরের টান অপরিসীম। শঙ্খ রোজই দাদুকে নিয়ে পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ায়। ছোট বেলা থেকে বিকেলে দাদুর সংগে বেড়ানোটা তার অভ্যেস। এবং ছোট বেলা থেকেই সে দাদুর কাছে গল্প শোনার জন্যে পাগল।

অনিন্দ্যও তাকে নিজের বিগত জীবনের টুকরো টুকরো করে এক একদিন এক একটা গল্প শোনান। বলেন, যৌবনে কী করে বিপ্লবী পার্টিতে ঢুকে পড়েছিলেন। গানের গলা ভাল থাকায় কালচারেল ফ্রন্ট টেনে নিয়েছিল। তখন তো পার্টির দালান

কোঠার অফিস ছিলনা। কারো বাড়ির খড়ের চালা ঘরে বসতো অফিস বসত মিটিং। মিছিলের পুরোভাগে গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন পথে পথে। গলায় গান বেঁধেই পার্টির নির্দেশে ছড়িয়ে পড়তেন জায়গায় জায়গায়। গ্রামে গঞ্জে পথে ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে, হেজাকের আলোয় সেই সব শুনতে কতই না ভিড় হত সাধারণ মানুষেব। উৎপল দত্ত খালেখ চৌধুরী পর্যন্ত অনিন্দ্যসুন্দরের গানের গলার বড় তাবিফ করেছিলেন একসময়। যেখানেই মিটিং সেখানেই উদ্বোধনী গানটা অনিন্দ্যসুন্দরকে দিয়েই গাওয়ানো চাই। কলকাতা, আসাম কত জায়গায়ই না গান গাইতে গেছেন তিনি। নিজেব বাঁধা গানে সুর জুড়তে পারতেনও নিজে।

বাঁধেব উপব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাদুব গল্প শুনে এক একদিন ধন্ধে পড়ে যায় শঙ্খ। সন্দেহ প্রকাশ করে বসে, তুমি এতোটাই পার্টিব জন্যে করেছিলে, তা আজ তোমাকে ডাকে না কেন কেউ। গান গাইতে বলে না কেন কোন জনসভায়? শঙ্খের প্রশ্নে আহত হল অনিন্দ্যসুন্দর। তবু হেসে বলেন, যা বলছি সত্য বলে মেনে নাও দাদুভাই। মিথ্যে বলে এই বয়সে কেন ফাঁকিতে জড়াই। অন্যদিন হয়তো প্রতিবাদ করে শঙ্খ, তুমি এতো বানিয়ে বলতে পার দাদু। বানাতে তোমাব জুড়ি নেই। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েন অনিন্দ্যসুন্দর। মুখোমুখি চেয়ে বলেন, যা নয় তা বলে লাভ কি আমার। আর তুমিও তো ছোট্টটি নও দাদুভাই।

তাহলে গাও তো শুনি, তোমাবই বাঁধা একখানা গান। যে গানে উতলা হত সে সব দিনকাব জনসভা।

বাধ্য হযে গান ধবেন তিনি। কাঁপা কাঁপা গলায় গান। শঙ্খের কাছে গাযকিটা অনেকটা সবিতাব্রত দত্তের সংগীত ধাবাব মত মনে হয তবে কথা ও সুরে ভেতবে কোথায় যেন একটা উদ্দীপনা জাগায়।

সুর উঁচু পর্দায উঠতেই কাশির দলা উঠে আসে অনিন্দ্যসুন্দরের। বেগতিক বুঝে শঙ্খ মাঝ পথে তাকে থামায়। বুকে গলায় হাত মেজে দেয়। হাত ধরেই বাঁধের উপর বসায। উদ্বিগ্ন গলায জানতে চায়, কষ্ট হচ্ছে দাদু? হার মানতে চান না অনিন্দ্যসুন্দর। কাশি আটকে যাওযা ফ্যাসফ্যাসে গলায জানতে চান, গান শুনে বিশ্বাস হল দাদু?

শঙ্খই এবার নিজে থেকে জয়ের মালা তার গলায় পবিয়ে দিয়ে এক গাঢ় বিপন্নতা থেকে বৃদ্ধকে বাঁচায। সত্যি তুমি ভাল গাইতে দাদু। কথাগুলো কি অসাধারণ বাঁধতে পারতে তুমি।

পাকা রাস্তা ধরে এখন শঙ্খের হাত ধরে শ্লথ গতিতে হাঁটছেন অনিন্দ্যসুন্দর। দূরে. বাস্তার প্যারালাল বাঁধ। বাঁধ ছুঁতে গেলে একটু ঘুরিয়ে যেতে হয়। মাঝখানে মাঠ। এখন ধান কাটা হয়ে গেছে। ক্রমশ একটা মেঠো পথ বেরিয়ে পড়েছে। লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে বলে। মেঠো পথ দিয়ে গেলে পার্টি অফিস একদম কাছে। এখন অঘ্রান পড়েছে মাত্র। বিকেল তাই দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যায়। সন্ধ্যে নামাব সংগে সংগে কুয়াশা নামে ঝাপসা করে দেয় মাঠ পার্টি অফিস দূরের মন্দির। অনুষ্ঠানের দিন তুমি কি করে শুরু করবে দাদু? তোমাকে নিশ্চয়ই খানিকটা বলতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করে শঙ্খ।

চোখের চশমা খুলে কাপড়ের খুঁটে কাচ ঘসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। চশমাটা না পরেই চারদিকে তাকালেন। চশমা ছাড়া সব কিছুই তার কাছে আজকাল বড় অস্পষ্ট। এই যেমন শঙ্খের মুখ। চশমাটা চোখে পরতেই নাতির মুখ স্পষ্ট হল আবার। বললেন, এসব মহড়া দিয়ে বলা যায় না। পরিস্থিতি বুঝে আপনা আপনি বলা যাবে।

তা ঠিক। হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়ে শঙ্খ। থেমে তারপরে বলে, তোমার উপর আমার কেন জানি খানিকটা আস্থা ফিরে আসছে দাদু। শুনে ভাবলেন অনিন্দ্য, আজকালকার ছেলে ছোকরা গুলোর ধ্যান ধারণা বড় ঠুনকো। সময় নেয় না মোটেই। সহসাই যেন গড়ে ওঠে। সহসাই ভেঙে যায়। যাচাই করার সময় লাগে না। অথচ তিনি নিজেই জানেন না, আজকালকার অনুষ্ঠানগুলো কেমন হয়। তাদের সময়ে ওতো সাজ সজ্জা মাইক্রোফোনের ব্যবহার আর ঘড়ি ঘণ্টা ধরে চলা বলা ছিলনা কোন মিটিং কিংবা উৎসবে। আলোয় ভাসানো মঞ্চকে তো তারা মিথ্যে মায়াজাল বিস্তার বলেই ভাবতেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল শঙ্খ। আর এগিয়ে কাজ নেই। আঁধার নামছে। তুমি চোখেও ভাল দেখতে পাওনা দাদু। চল পার্টি অফিসের দিকেই যাই। হরবচনদা অপেক্ষা করছে।

আমার কি না গেলেই নয় রে শঙ্খ? ইতস্ততের ভাব করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। না, না তোমাকে যেতেই হবে। আজ ক্রিটিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। তোমার মতামত দেয়াটা জরুরী। কালই প্রথম হরবচনের মুখে ব্যাপারটা শুনেছেন তিনি। সব শুনে তার মনে হয়েছে, এসব স্পর্শকাতর ব্যাপারে মত দেয়াটা বড় কঠিন। তিনি ভেবেও দেখেছেন, পার্টি অফিসে গেলেও তাকে কথা বলতে হবে কেবল পার্টির স্বার্থে নয়, মানবিকতার দিকটাও লক্ষ্যে রেখে।

গাঁয়ে একটা রাস্তা হবে। বামুন পাড়া থেকে আদিবাসী বস্তি অবদি। আর জুনিয়র বেসিক স্কুলটার আপগ্রেডেশন নিয়েও আজই নাকি পাকা সিদ্ধান্ত হবার কথা।

রাস্তাটা গড়তে গেলেই খানিকটা জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। অথচ যে সব জমিন রাস্তার আওতায় আসছে, তার বেশির ভাগের মালিকই সাধারণ চাষী পরিবার। সরকারকে ধরে কয়েই হচ্ছে রাস্তাটা। মন্ত্রীও এসে দেখে গেছেন। তবে ফ্যাসাদ বেধেছে কমপেনসেশন নিয়ে। সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ফাণ্ডে টাকা নেই। মালিকেরা স্বেচ্ছায় জায়গা ছাড়লে তবে রাস্তা হবে।

হরবচন ইঙ্গিত দিয়েছে, ওরা জমি না ছাড়লে সে পার্টির পোলাপান নামিয়ে দেবে। আর এতে অনিন্দ্যসুন্দরদের মত প্রবীণ কমরেডদের আগাম সমর্থন চায়। তবে উনারা আগে চেষ্টা করে দেখুন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে জমির মালিকদের আগে পথে আনা যায় কিনা।

স্কুলটা নিয়েও আবার এক ঝামেলা। দত্তদের নিজেদের গড়া স্কুল। কিছুতেই সরকারের হাতে দিতে চান না তারা। পরিবেশ পড়াশুনো দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে। কারো ডোনেশন নিয়ে স্কুলটা বড় করতেও তারা অনিচ্ছুক। কোথায় যেন বাধে। এখন অর্থ আর প্রতিপত্তির টান পড়লেও এককালে গাঁয়ে এরা একমাত্র ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবার। অপজিশন পার্টির লোক। হরবচনের রাগ এদের উপর এজন্যে খানিকটা বেশি। সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে সে স্কুলটাকে বাড়াতে চাইছে। শর্ত

মত স্কুলটাও তখন চলে যাবে সরকারেরই হাতে। দলবল নিয়ে গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছে হরবচন, এতে মঙ্গল হবে গাঁয়েরই দশ জনের। আজ মিটিংয়ে দত্তদের ডাকা হবে। সোজা কথায় না হলে নানাবিধ চাপ সৃষ্টি যে করতে হবে এদের উপর, খোলাখুলি অনিন্দ্যসুন্দরকে বলেছে হরবচন।

হাঁটতে হাঁটতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস লুকোলেন তিনি বুকের ভেতর। এবং এই মুহূর্তে যেন আরো বেশি বেশি সতর্ক হলেন, কোথায় যেন একটা রাজনীতির অন্ধ আক্রোশ লুকিয়ে আছে তলে তলে।

দু দুটোই তো জনহিতকর কাজ। তবু মনে হয়, দুটোই যেন গাঢ়তর বিরোধের জলজ্যান্ত ইস্যু। না সিদ্ধান্ত নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, তিনি এখন পার্টি অফিস যাবেন না। এবকম সমাজ কল্যাণ বা রাজনীতি তিনি করেননি, কোনোদিনও। যে নীতিব সঙ্গে মানবতাব বিরোধ পদে পদে তাকে আকড়ে ধরে লাভ কি। এজন্যেই বোধ হয় ধীরে ধীরে জনান্তিকে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন কবেছিলেন তিনি। এই মূল্যহীনতার সঙ্গে তার পক্ষে মেলানো কঠিন।

কী হল, বাড়ির পথ ধরেছ কেন? পার্টি আফিসে যাবে না? বিরক্ত হয়ে ওঠে শঙ্খ। নারে দাদু ভাই। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। তুই একাই যা। আমার শরীরের কথা বলিস ওদের। আর আজ যদি মিটিংএ কোন ডিসিশন না হয হরবচনকে বলিস, কাল যেন সে একবাব আমাব কাছে আসে। ওব সঙ্গে কটি কথা আছে। বলেই শঙ্খের কোন অভিব্যক্তি লক্ষ্য না কবে হন হন কবে ম্যাডম্যাডে জ্যোৎস্নায সামনেব দিকে হেঁটে গেলেন। কী যেন ভাবতে ভাবতে বিপরীতমুখি হল শঙ্খ।

বাঁশের গেটে শব্দ হতেই দবজা খুলে হ্যাবিকেন হাতে দ্রুত বাইরে ছুটে এল শ্যামলী। হাত উঁচিয়ে আলো দেখাল। প্রশ্ন কবল, একি, আপনি একা ফিরে এলেন যে! শঙ্খ কোথায?

পার্টি অফিসে গেছে মা। অনিন্দ্যসুন্দর জবাব দিয়েই আগে আগে হেঁটে গিযে ঘরে ঢুকলেন। একটু দূরত্ব বেখে কী যেন ভাবতে ভাবতে পেছনে পেছনে শ্যামলীও।

ঘরে মাদুব পাতা। মাদুবের উপব হাবমোনিযাম। আব ডাযবীব মত একটা খাতা। চোখ ফেলে খানিকটা বিস্মিত হয়ে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দব। হাবমোনিয়ামেব উপর হ্যাবিকেনটা বাখতে বাখতে তাব দিকে চেযে হাসল শ্যামলী। বলল, ফাংশনে আপনাকে গান গাইতে বলতে পারে। তাই গুছিযে রাখলাম। কদিন গাইলে আগের গলাটা ফিরে পাবেন।

কিরকম একটা মমতা মাখা চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন অনিন্দ্যসুন্দর। তার এই আকস্মিক তৎপরতা যেন ভাল লাগে। নির্বাক তাকিয়ে দেখেন এক কালের ধুলোজমা পুরানো হারমোনিয়াম। আবার চোখ তুলে শ্যামলীব মুখ।

হঠাৎ শ্যামলী ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল, এখন কাপড ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিন তো বাবা। আমি চা করে নিয়ে আসছি। চা টা খেয়ে না হয় হাবমোনিয়ামে বসবেন। ওঘরে চলে গেল শ্যামলী। কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিতে বিছানায় টান টান শুয়ে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। এখন তার যেন অবসর নেই। টানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ছেন আবার। আবার কতদিন বাদে এই ব্যস্ততা ফিরে এল তাব জীবনে? সুধার মৃত্যুর পর? চালের কড়িবরগার দিকে তাকিয়ে হিসেব করতে থাকেন তিনি। সুধার

জন্য কিছু করেননি অনিন্দ্যসুন্দব। তাকে দিতে পারেননি জীবনে সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের ছিঁটেফোঁটাও! অথচ বিয়ের পর থেকে তার জন্য এক দাবীহীন পরিচর্যা জুগিয়ে গেছে সুধা। একা হাতে গেরস্থালী সামলে অনিন্দ্যসুন্দরকে তার মনোমত ভুবনে ঠেলে পাঠিয়েছে কেবল। বউভাতের দিনই তো তিনি পার্টির মিটিংএ গান গাইবেন বলে চলে গিয়েছিলেন সুদূর আসামে। আশ্চর্য, নুতন বউ হয়েও কোন অনুযোগ তোলেনি সুধা। দাবীহীন অথচ একটা আবেশময় সম্পর্ক কী রকম যে গড়ে নিতে পেরেছিল ভাবতে ভাবতে মনটা ভাব হয়ে এল। ধীরে ধীরে বিষণ্নতায় আবছা হয়ে গেল চোখের পাতা।

বাবা, আপনার চা। শ্যামলীর ডাকে অস্পষ্ট চাওয়া স্পষ্ট হল ধীরে ধীরে। উঠে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিলেন।

দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলী।

একসময প্রশ্ন কবল. আপনি পার্টি আফিসে যাননি বাবা?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিলেন অনিন্দ্য, যেতে ভাল লাগল না মা।

সঙ্গে সঙ্গে আব কিছু বলল না শ্যামলী। হারমোনিযামেব উপর থেকে হ্যাবিকেনটা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। চেযারেব উপবে ছেড়ে রাখা শ্বশুবের কাপড ভাঁজ করতে করতে বারেক তার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল অনিন্দ্যসুন্দরের সঙ্গে। মনে হল তার. শ্যামলীব মুখটা আলো আঁধারিতে কেমন বহস্যে ঘেবা। কিছু একটা বলতে চেযে সে যেন খানিকটা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাপড কুচিয়ে আলনায় রেখে এইমাত্র কাছে সবে এল সে। একদম বিছানাব গা ঘেষে। ফিসফিসিয়ে বলল, পার্টি অফিসে যাওযা আপনি ছাড়বেন না বাবা। শঙ্খ বলছিল, আপনি ঘন ঘন পার্টি অফিসে গেলে তার লাভ হবে। ও পার্টিতে ঢুকে যাবে। হববচন নাকি ওকে বলেছে. আপনার নাতি বলে শঙ্খ যুব শাখার নেতা বনে খুব তাড়াতাড়ি দাঁডিযে যেতে পাবে। তখন আমাদেব আর দুঃখ থাকবে না। আমাদেব অভাব দূর হোক, আপনি তা চান না বাবা? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শ্যামলী।

কেঁপে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কই, সুধা তো কোনদিন বলেনি, পঁচিশ বছর ঘর করছি তোমার পঁচিশটা মুহূর্ত ভেবেছ আমাদের জন্যে? পার্টি আর গান নিয়ে মত্ত থেকেছ চিরকাল। একবাবও চিন্তা কবেছ জীবনে, আমারও তো কিছু পাওনা আছে তোমাব কাছে। আমারও কিছু স্বপ্ন আছে। তোমার পার্টি আব গান কেবল মহিমা ছড়িয়েছে তোমার। আমায় দিয়েছেটা কি?

না সুধা বলেনি। কোন দিন বলেনি। অনিন্দ্যসুন্দর আবেগের মুহূর্তে ধরিয়ে দিলে কেমন যেন লজ্জা পেত। লাজুক হেসে বলত, কি বাজে বকছ তুমি!

কী বলবেন অনিন্দ্যসুন্দর, কী বলা উচিৎ শ্যামলীকে, ভেবে পাচ্ছেন না। কারো সার্টিফিকেট নিয়ে তো তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি করেন নি। কারো পরিচয়ে তো ঝাপিয়ে পড়েননি আন্দোলনে। কোন লাভের আশায় গান বাঁধেননি রাতের পর রাত জেগে। সুর চড়াননি গলায়।

এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে বিশ্রুত মুহূর্তরা ভিড় করে এল। সেই—কারো পরিত্যক্ত চালাঘরে পার্টি অফিস। জীবন সমর্পিত কটি চোয়ালশক্ত যুবকের লুকিয়ে

চুরিয়ে মিটিং। অনেক মিছিল। মিছিলের সামনে রোদে জলে স্নান করে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গান গাওয়া। লাঠি হাতে তেড়ে আসা পুলিস। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানোর শব্দ। ধরা পড়ার ভয়ে ক্ষুধাতেষ্টা নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। দীর্ঘদিন পলাতক স্বামীর খোঁজ না পাওয়া সুধার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। না, আর ভাবতে পারছেন না অনিন্দ্যসুন্দর। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামলী ভাবল, ঠিক আছে, এখন খানিকটা বিশ্রাম কবে নিন উনি। শঙ্খের পাল্লায় পড়ে সন্ধ্যার দিকে বোধ হয় বেশি হাঁটা চলা হয়ে গেছে। এই বয়েসে ক্লান্তি নামা স্বাভাবিক। আলোটা কমিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল শ্যামলী।

পবপর কিছুদিন ব্যস্ততায় অনেকটা হাপিয়ে উঠেছেন অনিন্দ্যসুন্দর। খ্যাতি ছড়ানোটাও যে একটা বিডম্বনা বুঝতে পারছেন আজকাল। শঙ্খ হরবচনরা তাকে ভাঙিযে অনেক কিছু করতে চায এখনই। তাই খুব সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে। এসবও ক্লান্তিকর ঠেকে। শ্যামলীব আদব যত্নেব বহবও দিনকে দিন প্রকট হয়ে উঠছে। ঘরকন্নাব শেষে সেও বসাব ঘবে এসে আজকাল উপস্থিত জনতাকে সামলায়। হববচন আর তাব দলবল এলে তো কথাই নেই। জটলাব মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে ছাডে। শ্বশুরের বিগত জীবনের উজ্জ্বল সাক্ষর রাখাব গল্প গুলি গল্পচ্ছলে শুনিয়ে দেয় মাঝে মাঝে বুদ্ধি কবে। অনিন্দ্যসুন্দরেব গান এবং সংগ্রামেব গল্প শুনতে শুনতে হববচনদেব চোখের দৃষ্টি যখন বিস্ফাবিত হয়ে যায়, গল্প গিলতে গিলতে মুখ হা-ফাঁক কবে অনেকটাই ধ্যানস্থ তাবা, শ্যামলী তখন চোখে মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে সব কৃতিত্বের দাবীটা ছিনিযে নেয়।

অথচ কিছুদিন, এমন কি বৎসর কাল আগেও অনিন্দ্যসুন্দর নিজের জীবনেব গল্প গল্পচ্ছলে শঙ্খকে যখন বলে শোনাতেন, শঙ্খ কেন, বিশ্বাস করত না শ্যামলীও। হাতেব কাজ সেবে হলুদ মাখা হাত কাপড়ে মুছতে মুছতে কিংবা ঝাড়ু হাতে গলায বিবক্তি টেনে তীব্র অনুযোগ জানাত, এসব গালগল্প ওব কাছে নাই বা কবলেন বাবা। তার চে' অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিলেও তো পারেন। সামনের মাধ্যমিকে কাজে আসবে। 'গাল গল্প' শব্দটা এখনোও মাঝে মাঝে কানে বাজে। ছাৎ কবে ওঠে বুক। শ্যামলীব উদ্যত বর্ষাফলক সহসাই যেন ভেতবটা এফোঁড় ওফোঁড় কবে।

তখনই মনে পড়ে সুধাকে। কী অগাধ বিশ্বাস ছিল তার স্বামীব উপব। কী অসীম আবেগ আব শ্রদ্ধা নিয়ে শুনেছে সে তার উত্থান পতনের গল্প। কখনো তো সন্দেহের সূঁচে হুল ফোটায় নি কোনো। অথচ তার এমন কোন সাফল্যের বার্তা শুনে যেতে পাবেনি সুধা। আজ সুধা বেঁচে থাকলে বড় ভাল হত। সাফল্যের আনন্দেব ভাগ দিতে চেয়ে একজন নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ত অংশীদার পাওয়া যেত। ভাবতে ভাবতে বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দবের। বড় একা, বড় বেশি খালি খালি লাগে। না, গান আর গাওয়া হয়না। শ্যামলীর নিত্যদিনের মত রেখে যাওয়া হারমোনিয়ামের সামনে একান্ত বাধ্য ছাত্রের মত বসে থাকেন। কথায় সুর জড়াতে চান। ক্লান্তি আসে। শেষে মনকে বোঝান, সময় মত সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে। কেবল বর্ষপূর্তির দিনটা প্রতীক্ষা করেন। অলক্ষ্যে থেকে অপেক্ষা করছে সুধা। শ্যামলী

আর শঙ্খকে ঐ দিনই চমকে দেবেন তিনি। মনে জোর টেনে এনে ঠেলে দেন হারমোনিয়াম। জানালায় এসে দাঁড়ান। এই রাতে মধ্য গগনের চাঁদটাকে বড় বেশি ফর্সা ফর্সা লাগে।

অনিন্দ্যসুন্দরের উদ্বেগ উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার মাঝে দিন কাটাতে কাটাতে আগামী কালই বর্ষপূর্তি উৎসব পড়ছে। চতুর্দ্দিকের টানটান উত্তেজনায় তিনি অনেকটাই হতভম্ব। শ্যামলী আর শঙ্খের মধ্যে উদ্যোগপর্বের ব্যাপারটা তাকে থ বানিয়ে ছাড়ছে। তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি মত বিনিময় সন্ধিস্থাপন যন্ত্রবৎ ব্যস্ততা কী রকম অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দরের মাঝে। ভাবছেন, কালকের দিনটা কি ভাবে কখন আসে কে জানে।

সময়ের চলমান ঘূর্ণিতে আজই বর্ষপূর্তির ভোর। কাল রাতটা বড় উত্তেজনাময় কেটেছে অনিন্দ্যসুন্দরের। তাকে তাড়াতাড়ি শুতে পরামর্শ দিয়েছিল শ্যামলী। তাড়াতাডি রাতের খাবার খাইয়ে শুতে পাঠিয়েছিল বিছানায়। একটা নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মাঝে এপাশ ওপাশ করতে করতে চোখে নেমে এসেছিল পাতলা কুয়াশার মত ঘুম। ঘুমের মধ্যে ছেড়া ছেড়া স্বপ্ন। স্বপ্ন কেটে যেতেই জেগে উঠেছিলেন আবার। বাইরে গেছেন তখন। এসে অন্ধকারেই বিড়ি ধরিয়েছেন। বিড়ি টানতে টানতে চাপা টেনশন ধোঁযার সাথে গিলতে চেষ্টা করেছেন গলায়। তাই বিড়িটা শেষ করেও কতক্ষণ জেগে পড়ে রইলেন বুঝতে পারেননি। অনুভাবনায় তখনই এক ঘন আনন্দ চেতনা দেখা দেয় তার, শঙ্খ আর শ্যামলীর কাছে কালই বিজয়ী হতে যাচ্ছেন তিনি। কতদিন থেকে চেষ্টা চালিযে যাচ্ছেন অনিন্দ্যসুন্দর শঙ্খ যেন তাকে বিশ্বাস কবে। সামান্য মর্যাদা দেয। কিন্তু বার বার তার বক্তব্যের সারৎসার তাব কাছেই ফিবে এসেছে। শঙ্খ নেয়নি। নীরবে থেকেও বুঝিয়ে দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর তার সন্দেহের উর্দ্ধে নন। কিন্তু যেদিন গুণীজন সম্বর্ধনার চিঠিটা পেলেন, এরপর থেকে শঙ্খ আচানকই দাদুর প্রতি অবাক করা মনোযোগ খুঁজে পেয়েছে। দাদুর কাছে শোনা গল্পই শুনতে চায় আবার। চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারেন অনিন্দ্যসুন্দর প্রিয় নাতিটি তাকে খানিকটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে আজকাল। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে এক প্রত্যয়ী পুরুষ গভীর ঘুমে চৈতন্য হারিয়েছিলেন বুঝতে পারেন নি।

আজ মিছিলের 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে জেগে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এই প্রথম তিনি পার্টি আফিসে দলীয় ফ্ল্যাগ তুলতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। গেল কাল সন্ধ্যার দিকে হরবচন দলবল নিয়ে এসেছিল তাকে আমন্ত্রণ জানাতে। দক্ষ সেক্রেটারীর মত শ্যামলী তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে আটটার মিটিং শেষ হতে হতে দশটা এগাবোটা বেজে যাবে দুপুরের আগেই নাওয়া খাওয়া করে শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন তিনি। শহরটা তো কম দূরের পথ নয়। বিকেলে বিকেলে পৌঁছে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে খানিকটা বিশ্রাম নেবেন অনিন্দ্যসুন্দর। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যেতে হবে টাউন হলে। ছ'টায় শুরু হবে গুণী বরণ আসর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়েছে হরবচনদের। নিজে থেকে কোনো কথায়

জড়াননি তিনি।

তারপরও হরবচন আবদার করেছিল, তারা একটা জীপ ভাড়া করে নিয়ে আসবে। পার্টির ছেলেরাও চাইছে অনিন্দ্যসুন্দরের সংগে টাউন হলে যাবে বলে। কী জানি কী বুঝে বারণ করে দিল শ্যামলী। বলল, দত্তদের টেম্পোকে আগে থেকেই বলে রেখেছে শঙ্খ। বিশালগড় পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে তো পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর বাস।

কিন্তু হরবচনের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল, সে যেভাবেই হোক টাউন হলে যেতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যপাল নিজের হাতে দেবেন মানপত্র আর পট্টবস্ত্র। পার্টির অনেক নামী দামী লোক জড়ো হবে। টিভি ছবি নেবে। বেতার সংগ্রহ করবে সংবাদ।

হববচনকে বুঝে, সিদ্ধান্তে অটল থেকেই এবার খুব সুন্দর করে বলল শ্যামলী, তোমরা যাবে? বেশতো যাওনা। এ তো ভাল কথা। উনাকে অভিনন্দন দেয়া হচ্ছে এটা তো গাঁয়েরই গর্বের বিষয়। আলাদা ভাবে গেলেও টাউন হলে শঙ্খই তোমাদের খুঁজে নেবে। তোমরা সংগে রয়েছ জানলে, এখানে আমিও স্বস্তিতে থাকব।

না, একদম চটল না হরবচন। শেষ পর্যন্ত বেশ হাসি মুখে মেনে নিল সিদ্ধান্তটা।

অনিন্দ্যসুন্দর দেখেছেন, হরবচন আজকাল শ্যামলীকে বেশ প্রাধান্য দেয়। দেবে না! অনিন্দ্য ছেলের জন্যে শহর থেকে পার্টি ঘেঁষা বউ এনেছেন। তায় সে আবাব বি.এ. পাশ। স্বামী বিদেশে চাকবী করলেও ছেলে নিয়ে গাঁয়েই থেকে গেছে এই নির্বিরোধী মেযেটা। তবে স্বামী এবং শ্বশুরের উপর একদম প্রভাব বিস্তার না করতে পেরে একটা ক্ষোভও জন্মেছে সঙ্গোপনে। টের পান অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু বিদ্রোহিনী হয়নি সে কোনোদিন। এখন আচমকা শ্বশুরের সূত্রে সে এক লাফেই বাইরে বেরিয়ে পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। লক্ষ্য করেছেন তিনি, কদিন আগেও যেসব লোকজন তাকে একটি সাধারণ গাঁয়ের বধূর বেশি মূল্য দিত না, তারাই তার সংগে জটিল সমস্যা নিয়ে শলা পরামর্শ করে। তার মতামতটার যথার্থ মর্যাদা দেয আজকাল। সেই শ্যামলীই যখন শেষ সিদ্ধান্ত বেশ দৃঢ়ভাবে উচ্চাবণ করল, অনিন্দ্যসুন্দব শঙ্খেব সঙ্গে আলাদা করে যাবেন, একবাক্যে মেনে নিল সবাই।

অনিন্দ্যকে নিয়ে সাড়ে পাঁচটায় শঙ্খ যখন টাউন হলের সামনে পৌছল সন্ধ্যা তখন আবছার মত নামছে।

টাউন হলের বাইরে ভেতরে এখন এক চোখ কাড়া আলোক সজ্জা। সামনের লনের একপাশে সার সার স্কুটার আর চকচকে মোটর গাড়ী। অগুন্তি লোকজন বাইরে ভেতরে। কী বকম বাহারি সাজ পোষাকওয়ালা যুবক যুবতীর ভিড়। কেমন যেন একটা আভিজাত্যের আবহাওয়ায় সহসাই এসে পড়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন, এতো সুখী সুখী সম্ভ্রান্ত মানুষ সবই কি আজকাল কমরেড। প্রবীণদের চেহারা চরিত্র আদব কায়দাও অচেনা ঠেকেছে। খুব অস্বস্তির মত হচ্ছে। হবে না! আগে যখন পার্টির মিটিং কিংবা ফাংশন হত, তখন হত দুর্গাবাড়ি বা চিলড্রেনসপার্কের খোলা মঞ্চে। রবীন্দ্রভবন বা টাউনহলের চোখ ধাঁধানো ডায়েস অডিটরিয়ামের সংগে তার পরিচয় নেই কোনোদিন।

অস্বস্তিটা বাড়ছে অনিন্দ্যসুন্দরের। কথাছিল, কর্মকর্তাবা গেটেই অভ্যর্থনা জানাবেন। শঙ্খকে ফিসফিসিয়ে বললেন, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা তো।

শঙ্খও ভেতরে ভেতরে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। এরকম অনুষ্ঠানে সেও খুব একটা অভ্যস্ত নয়, তার চালচলনে স্পষ্ট ফুটে উঠল। সে খুঁজছিল, হরবচনদের। কাউকে না পেয়ে ভ্যাবলাকান্ত মুখ করে চারদিকে তাকাচ্ছে।

এরই মধ্যে কর্মকর্তাদের একজন অনিন্দ্যসুন্দরকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন কাছে। সংগে সংগে পেছনে পেছনে আরো ক'জন। নমস্কার জানিয়ে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে। বসিয়ে দিলেন একদম প্রথম সারির একখানা চেয়ারে। শঙ্খ বসতে পেল কযেক সাবি পেছনে।

আরো ক'জন গুণীব পাশাপাশি বসে আছেন অনিন্দ্যসুন্দর। দু একবার এঁদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেন জানি বড অকিঞ্চিতকর লাগছে। আর সংগে সংগেই একটা ভয—কী বলতে হবে তাকে এখন। কী-ই বা বলবেন তিনি, এই বিদগ্ধ জনতাকে সম্বোধন কবে। গলাটা শুকিয়ে আসছে। একগ্লাস জল পেলে বড় ভাল হত। টাউনহলের এই অডিটোরিয়াম এখন জনারণ্য। একটা চাপা গুঞ্জন হুম হুম আকাবে ছড়িযে যাচ্ছে চারদিকে। পেছনে দৃষ্টি ঘুরিয়ে শঙ্খকে খুঁজলেন অনিন্দ্যসুন্দব। যেন অবলম্বন খুঁজলেন। কিন্তু সহসা খুঁজে পাওয়া গেলনা তাকে।

হঠাৎই একটা হই চই ব্যস্ততা। উদ্যোক্তাদেব ছুটোছুটি। ব্যাপাবটা না বুঝে ভড়কে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। পাশেব গুণী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার?

উনি দুপাশেব দর্শকাসনেব মধ্যে এক ফালি রাস্তাটায তাকিযে সম্ভ্রমেব সংগে জবাব দিলেন, রাজ্যপাল আব মুখ্যমন্ত্রী এসে গেছেন বোধহয। হ্যাঁ, দু'জন ভি-আই-পি এক ডজন লোকের ভিড়ে ভিড়ে মঞ্চে এসে উঠলেন, মাইকে তাদের আসার ব্যাপাবটা ঘোষিত হল। এরপব কি কি ব্যাপার পবপর ঘটে গেল, অনিন্দ্যসুন্দর ঠিক বুঝতে পাবেননি। একদম ভাল না লাগা থেকে একটা ভয় আর টেনশনে হাত পা অবশ হয়ে শরীবটা কেমন নির্ভাব হয়ে গেছে যেন। ঐ আলোয ঘেরা মঞ্চে উঠে তাকে কথা বলতে হবে, হযতো গানও শোনাতে হতে পারে। কী গাইবেন তিনি, কী-ই-বা বলবেন কিছুই আসছেনা মগজে ভালমত। সহসাই ভাবলেন, তিনি কি চুপি চুপি পালিয়ে যাবেন?

কিন্তু তাহলে শঙ্খের কাছে চূড়ান্ত হেরে যাবেন তিনি। সে হয়না। শঙ্খ তাকে চোখে চোখে রেখেছে। শ্যামলীও উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা কবছে বাড়িতে। আজ তার চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন।

ক'জন গুণীর সম্বর্ধনা হযে গেলে ঘোষক মাইকে অনিন্দ্যসুন্দবের নাম ঘোষণা করে তাকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করলেন। দু'জন যুবক দৌড়ে এসে হাত ধরে তাকে মঞ্চে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে রীতিমত ঘামছেন অনিন্দ্যসুন্দর। কী করে যে রাজ্যপালেব হাত থেকে পট্টবস্ত্র আর মানপত্র নিলেন যন্ত্রচালিতের মত, বলতে পারবেন না। মাইকে তখন তাঁর প্রশংসা মূলক বায়োডাটা আবৃত্তির মত পাঠ করা চলছে। একটা স্তব্ধতার পর মুহূর্মুহু করতালিতে ভরে যাচ্ছে অডিটরিয়াম।

না, কোন পুলক জাগছে না তার। উপভোগ করার মত সত্যিই তাঁর মনের অবস্থা নেই। দারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে দর্শকাসনে ব্যাকুল ভাবে খুঁজছেন কেবল শঙ্খের মুখ।

তাঁর এই ব্যাকুলতার মাঝেই পরিচালক ঘোষণা করলেন, এখন মাননীয় কমরেড শিল্পীকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তিনি যেন শ্রোতৃ মণ্ডলীকে নিজের কর্মময় জীবন থেকে দু চারটি কথা বলেন।

মাইকেব সামনে দাঁড়িযে অনিন্দ্যসুন্দর এবার পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে গেলেন। মনে হল, দেহটা পুবোপুরি অবশ হয়ে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

অধীর প্রতীক্ষায় নীরব অডিটবিয়াম। দু চারটে কথা বলতে উইংসের পাশ থেকে বার বার অনুবোধ আসছে, অনিন্দ্যবাবু বলুন। শুরু করুন। আপনার যেমন খুশি বলে ফেলুন। চেষ্টা তো করছেন তিনি। বলতে চাইছেন। ঠোঁট কাঁপছে। কিন্তু স্বর ফুটছে না। অডিটবিয়ামে এবাব গুঞ্জন উঠছে। উঠতে উঠতে বাড়ছে।

বেগতিক দেখে পবিচালক দৌড়ে এলেন মাইক্রোফোনে। পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে মাউথপিসে মুখ এনে বিরক্ত জনতাকে অনুরোধ করলেন, আপনারা শান্ত হোন। ধৈর্য্য ধরুন। কমবেড রায় কোনো বক্তা নন। তিনি আমাদেব কালচাবেল ফ্রন্টেব গণ সংগীত শিল্পী। বক্তব্য রাখতে বলে আমরা শ্রদ্ধেয় শিল্পীর প্রতি অবিচারই কবেছি। জন জাগবণের গান গেয়ে একসময় লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষকে জাগিযেছেন এই শিল্পী। তাই আজ আমবা তাঁকে তাঁরই বচিত এবং সুবারোপিত একখানা গান শোনানোব জন্যে অনুবোধ জানাতে পাবি। অডিটরিয়াম শান্ত হল মুহূর্তে।

বুকে ব্যাজ আটা কাবা যেন ছুটে এল। মঞ্চে বসিয়ে দিযে গেল অনিন্দ্যসুন্দরকে। একজন নিয়ে এল একটা হারমোনিয়াম।

মাইক্রোফোনটাব মাউথপিস নামিয়ে মুখের কাছে ফিট করে দিয়ে গেল কেউ। হাবমোনিযামেব চাবিগুলো খুলতে খুলতে অগুন্তি দর্শকমণ্ডলীব দিকে তাকাতেই এক করুণ দশা হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দরেব। মনে হল, মঞ্চ থেকে ওদেব মাঝে এক বিরাট মাঠ নেমে এসেছে। মাঠ পেরিয়ে অত দূবে তাদের কাছে কিছুতেই তাঁব গলা পৌছতে পারবে না। হাবমোনিয়ামের বাজনাব সাথে সাথে বার কয়েক কাঁপল তাব ঠোঁট। কিন্তু সুর বেবোল না। মনে হল, সবকিছু ভুলে গেছেন তিনি। কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? কী গাইবেন। না, মনে আসছেনা কিছুই।

দেখতে দেখতে মনে হল. এই হাজারো শিক্ষিত রুচিবান দর্শকের সমুদ্রে যেন পিছনে ভেসে যাচ্ছেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর শবীর কাঁপছে। তাঁর অস্তিত্বের শেকড় মাটির আকর্ষণ ছাড়িয়ে বাতাসে ভেসে অডিটরিয়াম ছাড়িয়ে বাইরে মহাশূন্যে ভেসে যাবে একটু পরেই। একটু পরেই মহাশূন্যে ভাসতে থাকবেন তিনি। এই পৃথিবী, এই শ্রোতৃ মণ্ডলী, তার রচিত গান, আজীবন সংগ্রাম সব কিছু বর্ণহীন গন্ধহীন তুচ্ছ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। অডিটরিয়ামের দর্শকরা এবার যথারীতি বিরক্ত। গুঞ্জন এখন হট্টগোলে বদলে গেছে। হাসির হুল্লোড় উঠছে।

পরিচালকবর্গ তৎপরতায় অডিটরিয়ামের আলো নিবিযে দিলেন। মঞ্চের আলোর বন্যায় এখন এক বিপর্যস্ত অনিন্দ্যসুন্দর। মুহূর্তেই তার সামনে এক ঢেউ খেলানো অন্ধকার। অন্ধকারের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা। তরঙ্গমালা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে

খিস্তি খেউড়, ঠোঙার কাগজের ঢিল, বাদামের খোসা। ব্যঙ্গভরা সিটি।

না উদ্যোক্তারা আর রিস্ক নিতে ভরসা পেলেন না। ঘোষক আবার দৌড়ে এলেন মাইক্রোফোনে। বিপন্ন ভঙ্গিতে বললেন, শ্রোতৃ মণ্ডলী আপনারা শান্ত হোন। দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন। এই মাত্র খবর পাওয়া গেল, মাননীয় অনিন্দ্যসুন্দর রায় গুরুতর অসুস্থতা নিয়েই তিনি আজ কেবলমাত্র আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর শরীরের তাপাঙ্ক এখন যথেষ্ট উপরের দিকে। রক্তচাপ ও সারাদিন বেশি বেশি ছিল। তাঁর গান শোনার চেয়ে তাঁকে শুভ কামনা জানান। এখন তাঁকে আমাদের এই অনুষ্ঠান থে.ক অসুস্থতার কারণেই বিদায় নিতে হচ্ছে।

এক দু সেকেণ্ড থামলেন ঘোষক। পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন সতর্কে। এবং শুরু করলেন আবার। এক্ষুনি মঞ্চে আসছেন, কলকাতার বিখ্যাত গণ সংগীত শিল্পী শুভেন্দু চৌধুরী। তাঁর রচিত সংগ্রামী মানুষের গান আপনাদের চিত্ত ভরিয়ে দেবে বলে আশা রাখছি। অশান্ত অডিটরিযাম শান্ত হল মুহূর্তে। কারা এসে অনিন্দ্যসুন্দরকে হাত ধরে মঞ্চের পাশে উইংসের আডালে নিয়ে বসাল। উইংসের আড়ালেই এক বুক অপমানের জ্বালা নিযে বসে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। একাকী আবছা অন্ধকারে। উদ্যোক্তাদের, ভলান্টিযার্সদের কেউ একজনও এখন তাঁর কাছে নেই। পাঞ্জাবির হাতায় মুখের ঘাম মুছে চেযারে পিঠ হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

ক'মিনিট পরেই শঙ্খের তীক্ষ্ণ 'দাদু' ডাকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কখন সে অডিটরিয়ামের পাশ-বারান্দা দিয়ে মঞ্চের পেছনের দরজায়, ভেতরে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে, একদম বুঝতে পারেন নি। শঙ্খের হ্যাঁচকা টানেই উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। সারা শরীরে ঝিম ধরা ভাবটা ভালো করে কাটেনি তখনও।

হাত ধরে হুড়মুড় করে তাঁকে বাইরে নিয়ে এল শঙ্খ। বাইবে এসে শক্ত করে ধরে রাখা হাত ছেড়ে দিতেই খানিকটা হালকা বোধ করলেন তিনি। এখন কোন কথা না বলে আগে আগেই হেঁটে যাচ্ছে শঙ্খ। খানিকটা দূরত্বে পেছনে পেছনে অনিন্দ্যসুন্দর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শঙ্খ অপমানিত বিরক্ত ক্রুদ্ধ। খানিকটা হেঁটে গিয়ে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো সে।

অনিন্দ্যসুন্দবকে আগাপাশতলা লক্ষ্য করে বলল, আজ কি হল দাদু, একেবারে আসর মাত করে ছাড়লে যে বড়?

তীক্ষ্ণ আক্রমনটা গায়ে না মেখে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, আসলে আজ কী হয়ে গেল না শঙ্খ, কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এটা কী সত্যি নয়, মানুষের গান মঞ্চে হয় না। শেষ করে দম ফেলতে পারলেন না তিনি। গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে উঠল শঙ্খ, তুমি বললেই আমি বুঝব! একটা দু'টো কথা, দু এক লাইন গানও শোনাতে পারলেনা! ছি ছি, তোমাকে নিয়ে দর্শকরা যেরকম হাসাহাসি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল, লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার।

কিন্তু তুই বিশ্বাস কর শঙ্খ, সত্যিই আমি ভাল গাইতে পারতাম। আমার গান শুনে...হন হন করে রাগে পা ফেলে এগোচ্ছিল শঙ্খ। দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। টেনে নিল বৃদ্ধের মুখের কথা। অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় অনিন্দ্যসুন্দরের গলা নকল করে

শেষ করল তারই অসমাপ্ত বক্তব্য—আমার গান শুনে দর্শকরা একদিন পাথর বনে যেত। এই বলতে চাইছ তো?

অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। সত্যিই, হাজার মানুষের জটলায় গ্রামে গঞ্জে, শহরের ময়দানে ঠায় দাঁড়িয়ে মানুষ আমার গান শুনত।

গর্জে উঠল শঙ্খ এবার. চুপ কর দাদু, চুপ কর। আব বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলো না। আজ যা ঘটে গেল, তার পরে তোমার মুখে আর যদি কোন দিন...

কে যেন চাবুক মারল অনিন্দ্যসুন্দরকে। মুহূর্তে তার ঝুঁকে পড়া শরীর ঋজু হয়ে দাঁড়াল। খপ করে এগিয়ে এসে ধরলেন শঙ্খের হাত। টানতে টানতে তাকে নিযে গেলেন চিলড্রেন্সপার্কের মাঠটায়। জোব করে বসিয়ে দিলেন বিবেকানন্দ মূর্তিটার পদতলে। সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললেন, শুনবি আমার গান, তবে শোন। দেখ, আমি কী করকম গাইতে পারতাম। মঞ্চে নয়। খোলা মাঠে। ময়দানে। মানুষের গান।

গান ধরলেন অনিন্দ্যসুন্দব। সব আড়ষ্টতা যেন কেটে গেল ধীরে ধীরে। দিব্যি তার এক উদাত্ত কণ্ঠ।

শুনে ধীরে ধীরে অবাক হয়ে যায় শঙ্খ। বিশ্বাস হয় না যেন তার। কী সাবলীল কণ্ঠ। গলায় কী এক ঘুম ভাঙানোর আর্তি। যেন পঁচিশ ত্রিশ বছরের এক যুবকের দরাজ গলায় দাদুর কাশি জড়ানো ফ্যাসফ্যাসে গলাব সুরটা ডুবে গেল। আরো অবাক হয়ে দেখল সে, দাদুর শবীবটা এখন, এই মুহূর্তে ঝুলে পড়া কুচকানো চামড়ায় মোড়া নয়। এক সাহসী দৃপ্ত যুবকের তেজোদীপ্ত গোটা অবয়ব।

কতক্ষণ সম্মোহিত হয়ে শঙ্খ গান শুনছিল বোঝে নি। হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল, তুলসীবতীর গেট, দুর্গাবাড়ির গেট, রবীন্দ্র ভবনের দিকের গেট দিয়ে একজন দু'জন করে পথচারী শ্রোতারা ঢুকে পড়ে ঘিরে রয়েছে দাদুকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে তাঁর গান। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল আলো ছাড়া ঘেরা মাঠটায়। দাদু তখনও মাঝখানে দাঁড়িয়ে তন্ময় হযে গাইছেন। গাইছেন তে. গাইছেনই—